"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

২০শ বর্ষ।

(১৩২৪ মাঘ হইতে ১৩২৫ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

২০শ বর্ষ।

অজ্ঞান বা মায়া	...	স্বামী অমৃতানন্দ	১৬৪
আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ	...	সিষ্টার নিবেদিতা	১৫,৬৫,১৩৩
আদান-প্রদান	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬৬৪
আমাদের সাধনা	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ	৬০৭
ঈশার প্রতি মরিয়ম	...	"দয়া" ...	৫৯২
ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্য		স্বামী অমৃতানন্দ	২৮৫
উদ্ধব ও ব্রজগোপী	...	শ্রীবিহারীলাল সরকার বি, এল	৪২৩
উত্তর-বঙ্গে বন্যা	...	...	৬৪১
গায়ত্রীর তাৎপর্য্য		শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ,	৪৯৫
জগৎ ও ঈশ্বর	...	স্বামী অমৃতানন্দ	৩৪৬
টলষ্টয়ের আদর্শ	...	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম,এ	১৩৭
টলষ্টয়ের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা		ঐ	৩০৮
তথাগত বশিষ্ঠ সংবাদ	...	শ্রীগোকুলদাস দে এম, এ	৬৮৩
দীনের প্রার্থনা (কবিতা)	...	স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ	২৩৪
ধর্ম্ম জিনিসটা কি ?	...	স্বামী বিবেকানন্দ	৫২৯,৬৭৭
নব বর্ষ	...	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী	২৫২
নিভৃত চিন্তা	...	স্বামী শুদ্ধানন্দ	৩২১
পত্র	...	স্বামী প্রেমানন্দ	৫৮৫
পথের সম্বল	...	শ্রীহরিপ্রসাদ বসু এম,এ, বি,এল	৪০৭,৪৫২
প্রাপ্তি-স্বীকার	...	...	৪৪২

ভারতীয় শিক্ষা ... স্বামী বাসুদেবানন্দ ১৭৪,২৩৫,
২৯১, ৩৫৯,৪৩২,৪৮২,৫৩৮,৫৯৬
মথুরা অঞ্চলে জলপ্লাবন ৬৩
মহাসমাধি ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৪৯
মা ... শ্রীবিহারীলাল সরকার বি,এল ৬১৫
মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে ... ...
বুঝিবার অন্তরায় ... শ্রীবিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত ৩১৫
মায়া ও বিজ্ঞানবাদ ... শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ ২৯
রূপ-কথা ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ১০২
বঙ্গে বস্ত্রসঙ্কট ৪৪৭,৫১০,৫৭৫
ব্রাহ্মণ ও সমাজ ... শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ ৪৯৮
বাণী-আহ্বান (কবিতা) ... শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৭১
বিলাইচণ্ডী ও মুসলমানের ...
হিন্দুত্ব ... শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস ৭৪৩
বিবেকানন্দ-স্মরণে ... শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম,এ,
পি,এইচ,ডি, পি,আর,এস, ১৪৪
বেদকথা ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ৬২১
বেদান্ত পরিভাষা ... স্বামী অমৃতানন্দ ৫২
বেদান্ত প্রচার ... স্বামী শুদ্ধানন্দ ৭৩
শিক্ষা ২৪৬
শিখগুরু ... শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র ২১০,২৬৭,৩৩৩
৪০০,৫৬১,৬২৫
শিমলা ও সিপিমেলা ... শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬৭১
শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব ... শ্রীবিহারীলাল সরকার বি, এল ৪৭৬,
৫৫৪,৬৫৭
শ্রীকৃষ্ণসেবক উদ্ধব ... ঐ ৩৫২
শ্রীশ্রীকামাখ্যাধাম ... শ্রীশঙ্খপাণি শর্ম্মা ৩০৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ... স্বামী সারদানন্দ ১,১২৯,১৯৩,৩৮৫,৫১৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
ত্র্যশীতিতম জন্মোৎসব ১৮৫
শোক-সংবাদ ২৫৬
সংবাদ ও মন্তব্য ১২৫,১৮৮,৭০২,৭৬৮
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৩৮৩,৫০৮
সৎকথা ৬১,১৮২,৫৮৮
স্বপ্নতত্ত্ব ... ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম,এ,
এল,এম,এস, ১১৫,১৫৪,২২২,৩৭০,৭৫৫
সাধুসঙ্গ ... শ্রীকুমুদবন্ধু সেন ৪৫
সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ ২০০,২৫৭,৩৯১
সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভের
উপায় ... স্বামী বিবেকানন্দ ৬৪৫,৭৩৩
সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ... ডাক্তার জিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু ৬৯১
সিষ্টার নিবেদিতা ...
বালিকা-বিদ্যালয় ... ৪৪৫,৭৭১
সৃষ্টি বা সামান্য-অধ্যারোপ স্বামী অমৃতানন্দ ৪৬৯
স্বাধীনতা ... শ্রী— ২৭৮
স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ ... ৬৬৯
স্বামী বিবেকানন্দের
স্বাভিব্যক্তি ... ৭০৯
স্মৃতি ৫৮৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(২)

(স্বামী সারদানন্দ)

ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্র সেবার পূর্ব্বোক্তরূপে বন্দোবস্ত হইবার পরে গৃহস্থ ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মতামত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কণ্ঠরোগ এককালে চিকিৎসার অসাধ্য না হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই এবং তাঁহার আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সেবা চালাইবার ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, ইহাই এখন তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ঐরূপ হইবারই কথা—কারণ, বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন তাঁহারা কেহই ধনী ছিলেন না। নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহপূর্ব্বক সেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী বহন করেন এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল কেবল মাত্র তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পূতধারা যে সর্ব্বক্ষণ একটানে বহিতে থাকিবে

এবং ভবিষ্যতের ভাবনা উহার ভাটার সময়ে তাঁহাদিগকে বিকল করিবে না একথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। ফলে ঐরূপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকলের দর্শন করিতেন যে, ঐ দুর্ভাবনা কোথায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের অন্তর পুনরায় নূতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারা দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবল মাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, তপস্যা, আহার, বিহার—এমন কি দেহের অসুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্য্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষাদির অতীত সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন! দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়া যাহাদিগের তাঁহাকে দর্শন করিবার অবসর ও সুযোগ নাই তাহাদিগের প্রাণে দিব্যালোকের উন্মেষ উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি সম্প্রতি তাহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে বিজ্ঞানের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্ব্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করিতেছে, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকাররূপ দিব্যবিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই তিনি এখন ঐরূপ হইয়া রহিয়াছেন! —তবে কেন এই আশঙ্কা, অর্থাভাব হইবে বলিয়া কি জন্য দুর্ভাবনা? যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে স্মৃতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না করেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভক্তগণকে ঐরূপ অনুভব ও আলোচনা করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন, 'ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (নিজ বাটি দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি?—বাটি বন্ধক দিয়া তাঁহার সেবা চালাইব।' কেহ বা বলিয়াছেন, 'পুত্র কন্যার বিবাহ বা অসুস্থতা কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব, স্ত্রীর গাত্রে দুই চারি খানা অলঙ্কার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি?' আবার কেহ বা মুখে ঐরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই সুরেন্দ্রনাথ বাটিভাড়ার সমস্ত ব্যয় একাকী বহন করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের ও তাঁহার সেবকগণের নিমিত্ত এককালে যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমস্ত যোগাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভক্তগণ ঐরূপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অনুভব করিতেন তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও এখানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্ব্বক এত দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের কেহ কেহ তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।

যতই দিন গিয়াছিল ততই ঠাকুরের অসুস্থ হইবার কারণ এবং কত দিনে তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানা জল্পনা ও বিশ্বাস ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যেন কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার অতীত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাবলীর আলোচনাই যে, উহাদিগের মূলে থাকিয়া ভক্তগণকে অদ্ভুত মীমাংসাসকলে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একদল ভাবিতেন এবং ভাবিয়া কেন অপরের নিকটে প্রকাশও করিতেন, যুগাবতার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা মিথ্যা ভান মাত্র; উদ্দেশ্যবিশেষ সংসাধনের জন্য তিনি উহা জানিয়া বুঝিয়া অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; যখনই ইচ্ছা হইবে পুনরায় পূর্বের ন্যায় আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। বিশাল কল্পনাশক্তি লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্য এক দল বলিতেন, মাতার বিরাট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কর্মানুষ্ঠান করিতে ঠাকুর অভ্যস্ত হইয়াছেন, সেই জগদম্বাই জনকল্যাণসাধনকারী নিজ গূঢ় সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; উহার সম্যক্ রহস্যভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে পারিয়াছেন কি না বলা যায় না; তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলেই ঠাকুর পুনরায় সুস্থ হইবেন। অপর এক দল প্রকাশ করিতেন—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এ সকল শরীরের ধর্ম, শরীর থাকিলেই এক দিন নিশ্চয়ই ঐ সকল উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিও ঐরূপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার একটা অলৌকিক গূঢ় কারণ আছে ভাবিয়া এত জল্পনার প্রয়োজন কি? যত দিন না আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি তত দিন পর্যন্ত ঠাকুর সম্বন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা আমরা তর্কযুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি; আমরা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে সেবা করিব এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন সেই ছাঁচে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে

যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনভজনে নিযুক্ত থাকিব। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরের যুবক শিষ্যবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার করিতেন।

ঠাকুরের বিভিন্ন ভক্তশিষ্যবর্গ তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ নানা ভাব ও মত পোষণ করিলেও তাঁহার মতামতের শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদিগের পরম মঙ্গল হইবে একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিলেন। ঐজন্যই একদল তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া, অন্যদল গুরু ও অতিমানব বলিয়া এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় নাই।

যাহা হউক, কিরূপ আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এখন ভক্তগণের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছিল পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্য আমরা যাহা দেখিয়াছি, এরূপ কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিব। ঘটনাগুলি ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ভিন্ন অন্য যে সকল লোক তাঁহাকে ঐকালে প্রথম দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরম উৎসাহে তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। প্রাতে, বৈকালে, মধ্যাহ্নে ঠাকুরের শরীর কিরূপ থাকে তাহা উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস আসিয়া দেখিয়া তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ করিবার পরে ঐসকল দিবসে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া অবসর পাইলেই এখন হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে ও দুই চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান্ সময়ের এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জন্য ঠাকুর একদিন তাঁহাকে

কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে। তোমার সহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। পূর্ব্বে তোমাকে দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তোমাকে জানিবার অবসর ত পাই নাই— তখন এটা করিব, ওটা করিব, ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে; তুমি যেটা ভাল বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে বলিতে পার না; অন্যস্থলে দেখি, তারা বলে এক, করে এক; ঐটে আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার খোসামুদি কর্‌চি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র! —বাপ অন্যায় করলে তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না'; ঐজন্য আমার দুর্মুখ বলে নামটা খুব রটিয়া গিয়াছে।'

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু এইত এতদিন এখানে আস্‌চ, আমি ত তার কিছুই পরিচয় পাইলাম না।'

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, 'সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য! নতুবা অন্যায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে দেখিতে, মহেন্দ্র সরকার চুপ করিয়া থাকিবার বান্দা নয়। যাহা হ'ক, সত্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভাবিও না। সত্য বলে যেটা বুঝেছি, সেইটা প্রতিষ্ঠা করিতেই আজীবন ছুটাছুটি করেছি ঐ জন্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারম্ভ, ঐ জন্যই বিজ্ঞানচর্চ্চার মন্দিরনির্ম্মাণ,—ঐরূপ আমার সকল কাজেই।'

যতদূর মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেহ এই সময়ে ইঙ্গিৎ করিয়াছিল, সত্যানুরাগ থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অপরা বিদ্যার শ্রেণীভুক্ত আপেক্ষিক (relative) সত্যাবিষ্কারের দিকেই অনুরাগ—ঠাকুরের কিন্তু পরাবিদ্যার প্রতিই চিরকাল ভালবাসা।

ডাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'ঐ তোমাদের

এক কথা; বিদ্যার আকার পরা, অপরা কি? যা হ'তে সত্যের প্রকাশ হয় তার আবার উঁচ নীচু কি? আর যদিই একটা ঐরূপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে এটা ত স্বীকার করিতেই হইবে, অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়াই পরা বিদ্যা লাভ করিতে হইবে— বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি তাহা হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না! তাদের কথা বুঝিতেই পারি না—চক্ষু থাকিতেও তারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি বুঝে ফেলেছেন, তা হলে তিনি হয় মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—না হয় ত তাঁর জন্য পাগলাগারদের ব্যবস্থা করা উচিত।'

ঠাকুর ডাক্তারের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের 'ইতি' যারা করে তাহা হীনবুদ্ধি, তাদের কথা সহ্য করতে পারি না।'

ঐ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদের —'কে জানে মন কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন* গীতটি গাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে উহার ভাবার্থ মৃদুস্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'আমার

* কে জানে মন কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণোগ লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না ধরে্বে শশী হয়ে বামন॥

ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন' ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন গুণী ব্যক্তির সহিত আলাপেই গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেনন্দ্রনাথ প্রমুখ বাছা বাছা লোক সকলকে মধ্যে মধ্যে সুবিদ্বান্ ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন বুদ্ধচরিতের অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তৎকৃত অন্য কয়েকখানি নাটকেরও অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া এক দিন ভজন শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার এক দিবস অপরাহ্নে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্ব্বক দুই তিন ঘণ্টা কাল তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেই দিন উহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে নরেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'এর মত ছেলে ধর্ম্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত, এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উন্নতিসাধন করিবে।' ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো।' এখন হইতে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া নরেন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেই ডাক্তার তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি ভজন না শুনিয়া ছাড়িতেন না।

ঐরূপে ভাদ্র আশ্বিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া ক্রমে দুর্গাপূজার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অসুস্থতা ঐ সময়ে কোন কোন দিন কিছু অধিক এবং অন্য সকল দিনে অল্প, এইভাবে চলিয়াছিল। ঔষধে সম্যক্ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্তার এক দিন

আসিয়া রোগ বাড়িয়াছে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন, 'নিশ্চয় পথ্যের কোন অনিয়ম হইতেছে; আচ্ছা বল দেখি, আজ কি কি খাইয়াছ?'

প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ, এবং সন্ধ্যায় দুধ ও যবের মণ্ডাদি তরল খাদ্যই ঠাকুর খাইতেছিলেন, সুতরাং ঐ কথাই বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন, 'তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আচ্ছা বল ত কোন্ কোন্ আনাজ দিয়া ঝোল রাঁধা হইয়াছিল?' ঠাকুর বলিলেন, 'আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দুই এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।'

ডাক্তার বলিলেন, 'এঁ্যা - ফুলকপি খেয়েছ? এই ত খাবার অত্যাচার হয়েছে. ফুলকপি বিষম গরম ও দুষ্পাচ্য। কয় টুকরা খেয়েছ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'এক টুকরাও খাই নাই, তবে ঝোলে উহা ছিল দেখিয়াছি।'

ডাক্তার বলিলেন, 'খাও আর নাই খাও,' ঝোলে উহার সত্ব ত ছিল, সে জন্যই তোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যারামের বৃদ্ধি হইয়াছে।'

ঠাকুর বলিলেন, 'সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অসুখও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম বাড়িয়াছে, এ কথা যে আদৌ মনে নেয় না।'

ডাক্তার বলিলেন, 'ঐরূপ একটুতে যে কতটা অপকার করিতে পারে তাহা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম; মধ্যে মধ্যে অজীর্ণে খুব ভুগিতে হইত; সে জন্য খাদ্যের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই না; ঘি, তেল পর্য্যন্ত বাড়ীতে করাইয়া লই। তথাচ এক সময়ে বিষম সর্দ্দি হইয়া ব্রন্‌কাইটিস্ হইল, কিছুতেই সারিতে চায় না। তখন মনে হইল, নিশ্চিত খাবারের কোন প্রকার দোষ হইতেছে। সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন প্রকার দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহসা এক দিন চোখে পড়িল, যে

গোরুটার দুধ খাইয়া থাকি তাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাসকড়াই খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কোনও স্থান হইতে কয়েক মন ঐ কড়াই পাওয়া গিয়াছিল, সর্দ্দির ভয়ে কেহ খাইতে চাহে না বলিয়া কিছু দিন হইতে উহা গোরুকে খাইতে দেওয়া হইতেছে। মিলাইয়া পাইলাম, যখন হইতে ঐরূপ করা হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতেই আমার সর্দ্দি হইয়াছে। তখন গোরুকে ঐ কড়াই খাওয়ান বন্ধ করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্দ্দিও অল্পে অল্পে কমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে সেই বার অনেক দিন লাগিয়াছিল এবং বায়ুপরিবর্ত্তনাদিতে আমার চারি পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।'

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ও বাবা, এ যে তেঁতুল-তলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সর্দ্দি হইল—সেইরূপ!'

সকলে হাসিতে লাগিল। ডাক্তারের ঐরূপ অনুমান করাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইলেও উহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কেহ উত্থাপন করিল না এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে কপি দেওয়া বন্ধ করা হইল।

ঠাকুরের ভালবাসা, সরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতায় ডাক্তারের মন তাঁহার প্রতি ক্রমে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল তাহা তাঁহার এক এক দিনের কথায় ও কার্য্যে বেশ বুঝা যাইত। শুদ্ধ ঠাকুরকে কেন, তদীয় ভক্তগণকেও তিনি এখন ভালবাসার চক্ষে দেখিতেছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া তাহারা যে একটা মিথ্যা হুজুক করিতে বসে নাই এবিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে তাহারা যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস করিত তাহা তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহার নিকটে উহা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইত। অথচ তাহারা যে উহা কোন প্রকার স্বার্থের জন্য অথবা 'লোক-দেখান'র মত করে না তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহার নিকটে উহা

এক বিচিত্র রহস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ বিষয়ের সমাধানে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ প্রহেলিকাভেদে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেও মানবের ভিতর তাঁহার অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে গুরু ও অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা পূজাদি করাটা তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বুঝিতে পারিতেন না, এবং বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া উহার বিরোধী ছিলেন। বিরোধের কারণ, সংসারে যাঁহারা অবতার বলিয়া পূজা পাইতেছেন তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা তাঁহাদিগের চরিত্রের মহিমা প্রচার করিতে যাইয়া বুদ্ধির দোষে কোন কোন স্থলে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসিয়াছেন, এবং এই জন্য তাঁহারা স্বরূপতঃ কীদৃশ ছিলেন, লোকের তাহা ধরা বুঝা এখন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে ডাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াও ছিলেন, 'ঈশ্বরকে ভক্তি পূজাদি যাহা বল তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান্ মানুষ হইয়া আসিয়াছেন এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা কঠিন—ঐ নন্দনের দলই ত দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে!' ঠাকুর ঐ কথায় হাসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'এ বলে কি? তবে হীনবুদ্ধি গোঁড়ারা অনেক সময় তাঁহাকে বাড়াইতে যাইয়া ঐরূপ করিয়া ফেলে বটে।'

অবতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগর্ভ কথা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐরূপ একান্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য্য ও প্রেম এবং তাঁহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময়ে সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল তাহা দ্বারা সে বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ

যত ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর ৺দুর্গা-পূজার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভূতিপ্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইতে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম*, ডাক্তার সরকারও উহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভাবাবেশকালে ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সঙ্কুচিত হয় কি না দেখিবার জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেও ক্রটি করেন নাই। ফলে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্ব্বস্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের রহস্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই—কোনও কালে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। বাহিরে মৃতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সে দিন ঐকালে যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া ভক্তগণ মিলাইয়া পাইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করায় উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৮ম অধ্যায়।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

সমাধি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

যে ব্যক্তি একখানি সরু তক্তার উপর দিয়া কোন গভীর গহ্বর পার হয়, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তে হঠাৎ সমস্ত অভ্যস্ত সংস্কার ও অনুভূতির কথা মনে উদয় হইয়া সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে অবস্থিত মনোরাজ্যে মানবের মধ্যে মধ্যে প্রবেশলাভ 'সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রে' যে সকল গল্প লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহারাও অনেকটা এই রকমের। সাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে যাইতে যেমন পিটারের মনে পড়িল তিনি কোথায়, অমনি তিনি ডুবিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতসানুতে নিদ্রিত কতিপয় ক্লান্ত নর জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের আচার্য্যদেব এক সম্পূর্ণ নূতন আকৃতিতে তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান। কিন্তু আবার তাঁহারা মর জগতে নামিয়া আসিলেন ; তখন সেই অপূর্ব্ব দর্শন কোথায় চলিয়া গিয়া স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাত্রিতে ক্ষেতের উপর বসিয়া মেষপালকে পাহারা দিতে দিতে এবং চুপে চুপে উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে মেষপালকগণ দেবদূতগণের আবির্ভাব দেখিতে পাইল। সেই মুহূর্ত্তকয়টী চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান এবং কালে তাহাদের মনের যে উচ্চাবস্থা আসিয়াছিল, তাহাও চলিয়া গেল। আর একি ! সে দেবদূতগণও যে সব আকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন ! তাঁহাদের শ্রোতৃগণ নিকটবর্ত্তী গ্রামে কি অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য সাধারণ লোকদিগেরই ন্যায় পদব্রজে যাইতে বাধ্য হইল।

ভারতীয় আদর্শ এসকলের ঠিক বিপরীত। ভারতের আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি মনের প্রবৃত্তিসমূহকে এমন উত্তমরূপে জয় করিয়াছেন যে, তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে চিন্তাসমুদ্রে ডুব দিতে পারেন এবং তথায় ইচ্ছামত থাকিতে পারেন; যিনি অমোঘ ভাব-স্রোতে হু হু করিয়া ভাসিয়া যাইতে পারেন, সহসা ঐ ভাব ভঙ্গ হইয়া অকস্মাৎ তিনি যে পুনরায় ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে নামিয়া আসিবেন, তাহার অনুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য শিক্ষার গভীরতা ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা দ্বারা এই শক্তিলাভের সহায়তা হয় কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একমাত্র সদুপায় কঠোর আত্মনিয়মন—এরূপ কঠোর যে, সাধক যেন ইচ্ছা মাত্র চিন্তারও বাহিরে যাইতে পারেন। যিনি এইরূপে নিজ মনকে একাগ্র করিতে পারেন যে, যখন ইচ্ছা উহাকে একেবারে নিরোধ পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট, মন আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় বা দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং শরীরও মনের অনুগত প্রজা হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ক্ষমতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ, অবিচলিত আত্মসংযম আসে না। এক-পুরুষের মধ্যে কয়টা লোক জন্মগ্রহণ করে, যাহারা এরূপ উচ্চাধিকারী হইতে পারে! এরূপ মহাপুরুষগণের কার্য্যে ও কথায় এমন একটা জ্যোতি, এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, যাহা বুঝিতে ভুল হয় না। বাইবেলের ভাষায়, "তাঁহারা এমন ভাবে কথা কন, যেন তাঁহাদের 'চাপরাস' আছে, যেন তাঁহারা পুঁথিপড়া পণ্ডিত মাত্র নহেন।"

একথা নিঃসন্দেহ যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বালক নরেন্দ্রকে প্রথম দর্শনেই 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যেমন কোন প্রবাহের বেগ নিরূপণ করে, তিনিও তেমনি বালকের ইতিপূর্ব্বেই কতদূর মানসিক উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, তুমি কি, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একটা জ্যোতি দেখিতে পাও?" বালক সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, "কেন, সকলেই কি দেখে না?" উত্তরকালে তিনি প্রায়ই এই প্রশ্নটীর উল্লেখ করিতেন এবং

প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিরূপ জ্যোতি দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। কখনও কখনও উহা একটী গোলকের মত হইত, এবং একটী বালক উহাকে পা দিয়া খেলিতে খেলিতে তাঁহার দিকে লইয়া আসিত। ক্রমে উহা নিকটবর্ত্তী হইত। তিনি উহার সহিত এক হইয়া যাইতেন, এবং সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইতেন। কখনও কখনও উহা এক অগ্নিপুঞ্জের মত হইত, এবং তিনি উহাতে প্রবেশ করিতেন। আমরা অবাক হইয়া ভাবি যে নিদ্রার প্রারম্ভই এইরূপ, তাহা কি আমরা সচরাচর নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝি তাহাই? সে যাহাই হউক, যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়স্ক বালক ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহাদের গুরুদেব তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া অপর সকলকে বলিতেন যে, স্বামিজী শুধু নিদ্রা যাইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে মাত্র, এবং তিনি এখন ধ্যানের কোন্ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর উদ্যানে পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইসময় এক দিন স্বামিজী ঐরূপে যেন কয়েক ঘণ্টাকাল নিদ্রাই যাইতেছিলেন। নিকটে যিনি ছিলেন তাঁহার ঐরূপই মনে হইয়াছিল। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার দেহ কোথায় গেল?" তাঁহার সঙ্গী—পরে যিনি গোপাল দাদা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন—নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জোরে জোরে হাত বুলাইয়া দিয়া, মস্তকের নিম্ন হইতে সমস্ত শরীরের যে অনুভূতি লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরানয়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, এবং বালক বিশেষ কষ্ট ও ভয় পাইতে লাগিলেন, তখন গোপাল দাদা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেই দৌড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যের অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। তিনি শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "থাক্ ঐরূপ! কিছুক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিলে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। ঐ অবস্থালাভের জন্য সে আমাকে বিস্তর জ্বালাতন করিয়াছে।" পরে তিনি গোপাল দাদা ও অপর সকলকে বলিলেন যে, নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ

হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে। স্বামিজী নিজে পরে এই অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, "মস্তিষ্কের ভিতরে যেন একটা আলো দেখিতে পাইতেছিলাম, উহা এত উজ্জ্বল যে, আমি ধরিয়াই লইয়াছিলাম যে, আমার মস্তকের পশ্চাতে কেহ একটী উজ্জ্বল আলো রাখিয়া গিয়া থাকিবে।" তৎপরে যে তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বন্ধনসকল ছিন্ন হওয়ায় তিনি 'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সেই রাজ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, একথা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, মনকে একাগ্র করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেহটাকে ভুলিতে পারা চাই। এই জন্যই লোকে তপস্যা ও কঠোরতা অভ্যাস করিয়া থাকে। কিছুকাল কঠোর তপস্যায় কাটাইতে হইবে, এই চিন্তা আজীবন স্বামিজীর আনন্দদায়ক ছিল। তিনি নির্ভীকভাবে বিজয়ীর ন্যায় সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও, প্রায়ই এই তপস্যার কথা উত্থাপন করিতেন। সুদক্ষ সওয়ার যেমন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দেখে, অথবা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ যেমন বাদ্যযন্ত্রের পর্দ্দার উপর দিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া দেখে, তিনিও সেইরূপ শরীরটা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বশে চলে কিনা, পুনরায় দেখিতে ভালবাসিতেন—এখনও তাঁহার যন্ত্রের উপর পূর্ব্ববৎ দখল আছে কিনা নূতন করিয়া দেখিতে প্রীতি অনুভব করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি কলিকাতার গরমের মধ্যে ও ঐ কয় মাস জল পান করিব না এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তবে মুখ ধুইবার কোন নিষেধ ছিল না। সেই সময়ে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গলদেশের পেশীসমূহ একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে গেলেও আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও জলপান করিতে পারিতেন না। যেদিন তিনি কোন ব্রত উপলক্ষ্যে উপবাসী আছেন, সেই দিন তাঁহার নিকটে থাকিলে অপরেরও খাদ্যসামগ্রী অনাবশ্যক মনে হইত এবং চেষ্টা করিয়াও তদ্বিষয়ে

রুচি হইত না। আমি একটী ঘটনার কথা শুনিয়াছি—তিনি সেদিন বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে কতকগুলি লোক তর্কবিবাদ করিতেছিল; সেই সকল তিনি শুনিতেছিলেন না বলিয়াই মনে হইতেছিল। হঠাৎ তাঁহার হস্তস্থিত একটা শূন্য কাচের গেলাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল—ঐ তর্কে তাঁহার যে কষ্টবোধ হইতেছিল, তাহার ঐটুকুমাত্র নিদর্শন তিনি দিয়াছিলেন।

কত কঠোর সাধনা দ্বারা এইরূপ আত্মসংযমশক্তি পুষ্ট হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। হয়ত কত ঘণ্টাই পূজাধ্যানাদিতে অতিবাহিত হইয়াছে, কতক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে, এবং দীর্ঘকাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে এক সময়ে স্বামিজী পঁচিশ দিন প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আবার এই অর্দ্ধঘণ্টার নিদ্রা হইতেও তিনি নিজেই জাগরিত হইতেন। সম্ভবতঃ অতঃপর আর কখনও নিদ্রা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে বা বহুক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার "যোগীর চক্ষু" ছিল, একথা বাল্যে যখন তিনি গঙ্গাবক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বজরায় উঠিয়া তাঁহাকে "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "যোগীর চক্ষু" সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় না, এবং সূর্য্যোদয় হইবামাত্র একেবারে উন্মীলিত হইয়া যায়, ইহাই প্রবাদ। পাশ্চাত্যদেশে যাঁহারা তাঁহার সহিত এক গৃহে বাস করিতেন তাঁহারা শুনিতে পাইতেন যে, তিনি রাত্রিশেষে স্নান করিতে যাইবার সময় 'পরব্রহ্ম' কি ঐরূপ কোন নাম সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহাকে কঠোরতা অভ্যাস করিতে কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবন এমন প্রগাঢ় একাগ্রতাময় ছিল যে, অপর কাহারও পক্ষে উহা অতি ভীষণ তপস্যা হইত। আমেরিকার ন্যায় রেলরাস্তা, ট্রামওয়ে এবং জটিল নিমন্ত্রণতালিকার দেশে তাঁহাকে প্রথম প্রথম কি কষ্টে ধ্যানের বেগ সামলাইতে হইত, তাহা তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন। জনৈক ভারতবাসী, যিনি তাঁহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "তিনি ধ্যান করিতে বসিলে দশমিনিট যাইতে না যাইতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, যদিও তাঁহার শরীর মশায় ছাইয়া যাইত!" এই অভ্যাসটী তাঁহাকে দমন করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম, লোকে হয়ত রাস্তার অপর সীমায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তিনি এদিকে গভীর চিন্তায় বাহ্যহারা হইয়া গিয়াছেন; —ইহাতে তিনি বড়ই লজ্জিত হইতেন। একবার নিউইয়র্কে তিনি একটী ক্লাসে ধ্যান শিক্ষা দিতেছেন, শেষে দেখা গেল যে, কিছুতে তাঁহার আর বাহ্য সংজ্ঞা আসে না; তখন তাঁহার ছাত্রগণ একে একে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যখন তিনি এই ব্যাপারটী শুনিলেন, তখন তিনি অতীব মর্ম্মাহত হইলেন, এবং আর কখনও ক্লাসে ধ্যান শিখাইতে সাহস করেন নাই। নিজের ঘরে দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া ধ্যান করিবার সময় তিনি কোন একটী কথা বলিয়া দিতেন, যাহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু ধ্যানকালের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও, তিনি সকল সময়ে প্রায়ই চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। দশজনে মিলিয়া গল্প গুজব হাস্য পরিহাস চলিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, তাঁহার নয়নদ্বয় স্থির হইয়া গিয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমেই ধীরে ধীরে হইতেছে, ক্রমে একেবারে স্থির, তৎপরে ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি। তাঁহার বন্ধুগণ এ সকল জানিতেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করিতেন। যদি তিনি দেখা শুনা করিবার জন্য কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে ভুলিয়া যাইতেন, অথবা যদি কেহ তাঁহাকে কোন ঘরে চুপ চাপ বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না; যদিও তিনি কখনও কখনও উঠিয়া, মৌনভঙ্গ না করিয়াই আগন্তুককে সাহায্য করিতেন। এইরূপে তাঁহার মন ভিতরের দিকেই পড়িয়া থাকিত, বাহিরের বস্তু অন্বেষণ করিত না। তাঁহার চিন্তা কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে বা কতদূর

ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তাই আমাদের একমাত্র ইঙ্গিত ছিল। তিনি সর্ব্বদা নির্গুণ তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রসঙ্গ করিতেন। লোকে যাহাকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বলে, উহা সকল সময়ে ঠিক সেরূপ হইত না। তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। উহা অনেক সময়েই ঐহিক বিষয়ের কথা হইত কিন্তু উহার পরিধি সকল সময়েই অতি বিস্তৃত থাকিত। উহাতে কোন কিছু এতটুকু নীচ, বা সঙ্কীর্ণ, বা ক্ষুদ্র থাকিত না। উহার কোথাও সহানুভূতির সঙ্কোচ হইত না। তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্য্যন্ত শুধু সংজ্ঞানির্দ্দেশ ও বিশ্লেষণ বলিয়াই লোকের মনে হইত। উহাতে বিদ্বেষ বা ক্রোধ থাকিত না। তিনি একদিন নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি একজন অবতারের পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারি, অথচ উহাতে আমার তাঁহার প্রতি ভালবাসার বিন্দুমাত্র হ্রাস হইবে না। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, অধিকাংশ লোকেই এরূপ পারিবে না; তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ভক্তিটুকু বাঁচাইয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ!" তাঁহার বিশ্লেষণ শ্রবণে শ্রোতার মনেও আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কোন বিরাগ বা ঘৃণার ভাব থাকিয়া যাইত না।

জগতের প্রতি তাঁহার এই উদার ও মধুর দৃষ্টি তাঁহার গুরুভক্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ভক্তি কুকুরের প্রভুভক্তির মত। আমি কারণ অন্বেষণ করি না, আমি শুধু পদানুসরণ করিয়াই সন্তুষ্ট!" আবার শ্রীরামকৃষ্ণেরও নিজগুরু তোতাপুরীর প্রতি ঐরূপ ভাব ছিল। এই আচার্য্যশ্রেষ্ঠ একদিন অম্বালার নিকটবর্ত্তী কৈথাল নামক স্থানে নিজ শিষ্যগণকে এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন, "আমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হইবে। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি যে, তথায় একজন মুমুক্ষুর আমার সাহায্যের প্রয়োজন।" দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনি আবার নিজ শিষ্যদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান আজ পর্য্যন্ত লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু যাঁহাকে তিনি দীক্ষিত করিলেন তিনি তদবধি তাঁহার প্রতি

কি যিনি চিন্তা করেন তাঁহার কল্যাণের দিক হইতে দেখিলে পথ নষ্ট হইল বলিয়া ধরিতে হইবে? প্রথমে কতকগুলি ঘটনার পরিধি, তৎপরে কতকগুলি চিন্তার পরিধি এবং সর্ব্বশেষে সেই পরব্রহ্ম! যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষগণের নিজ নিজ চিন্তারত্নরাশি অপরের সহিত একত্র সম্ভোগ করার ন্যায় নিঃস্বার্থ কার্য্য আর কিছুই নাই। তাঁহাদের কল্পনারাজ্যে প্রবেশলাভ করাই মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করা; কারণ তৎকালে শিষ্যের মনে প্রত্যক্ষভাবে একটী বীজ উপ্ত হয়, যাহা মনোজগতে আত্মসাক্ষাৎকারে পরিণত না হইয়া কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।

আমাদের আচার্য্যদেবের চিন্তা কতকগুলি আদর্শেরই সমষ্টিস্বরূপ ছিল, কিন্তু ঐ সকল আদর্শকে তিনি এমন জীবন্ত জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদিগকে বস্তুতন্ত্রতাহীন বলিয়া মনে করিতে পারিত না। ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই তিনি তাহাদের আদর্শ-সমূহের দিক হইতে, তাহাদের নৈতিক উন্নতির দিক হইতে দেখিতেন। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে,—এক দলের স্বভাব সব জিনিসকে দুই ভাগে ভাগ করা। অপর দলের তিন ভাগে। স্বামিজী তিন ভাগে ভাগ করিতেই ভালবাসিতেন। কোন গুণের দুইটী বিপরীত সীমা (যেমন শীত উষ্ণ, ভাল মন্দ) ত তিনি স্বীকার করিতেনই, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বদা উহাদের মধ্যে একটী সন্ধিস্থল দেখিতে পাইতেন, যেখানে উভয় দিকই সমান হওয়ায় কোন গুণই নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা কি প্রতিভারই একটী সার্ব্বজনীন লক্ষণ, না ইহা শুধু হিন্দুমনেরই একটী বিশেষত্ব?

কোন্ বস্তুতে তিনি কি দেখিতে পাইবেন, কোন্ জিনিস তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, একথা কেহই বলিতে পারিত না। অনেক সময়ে কথা অপেক্ষা চিন্তার উত্তর তিনি সহজে ও উত্তমরূপে দিতে পারিতেন। তাঁহার কি অদ্ভুত ভাবতন্ময়তা জাগিয়াই থাকিত, তাহা এখানে

সেখানে এক আধটু আভাস ইঙ্গিত হইতে ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যাইত—সকল কথা ও চিন্তা তাহারই সহচরী মাত্র ছিল। কাশ্মীরে গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করিবার পর তবে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা জগন্মাতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। মা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদেরই মধ্যে চলিতেছেন, ফিরিতেছেন। আবার তাঁহার জীবনের শেষ শীতঋতুতে তিনি তাঁহার শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, কয়েক মাস ধরিয়া তিনি দেখিতেছেন, যেন দুইখানি হাত তাঁহার হস্তদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছে। তীর্থ-যাত্রাকালে কেহ কেহ দেখিত তিনি একান্তে মালা জপ করিতেছেন। গাড়ীতে তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কেহ কেহ শুনিতে পাইতেন, তিনি কোন একটা মন্ত্র বা স্তোত্র বার বার আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যূষে উঠিয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তি করার কি অর্থ, তাহা আমরা একদিন জনৈক কর্ম্মীকে সংসার-সমরাঙ্গণে প্রেরণকালে তিনি যাহা বলিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম—"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যহ প্রত্যূষে অন্য কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে নিজের ঘরে দুই ঘণ্টা ধরিয়া 'সচ্চিদানন্দ', 'শিবোহহম্' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেন।" সকলের সমক্ষে কথিত এই ইঙ্গিতটুকু ব্যতীত আমরা আর কিছু শুনিতে পাই নাই।

সুতরাং অবিরাম ভক্তি দ্বারাই তিনি তাঁহার অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা বজায় রাখিতেন। তিনি সর্ব্বদাই মাঝে মাঝে যে সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আভাস দিতেন, ধ্যানই তাহাদের মূল কারণ। তিনি কথোপ-কথনে যোগদান করিতেন, যেন একজন লোক এক গভীর কূপে পাত্র ডুবাইয়া তথা হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ শীতল বারি আনিয়া দিল। তাঁহার চিন্তাসমূহের সৌন্দর্য্য বা প্রগাঢ়তাও যেমন, তাহাদের উৎকৃষ্টতাও তেমনি ইহাই প্রকাশ করিত যে, ঐ সকল চিন্তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ পর্ব্বতের চিরতুষারাবৃত শিখরদেশ হইতে আসিয়াছে।

তিনি তাঁহার বক্তৃতাকালীন অনুভূতিসমূহের যে সকল গল্প করিতেন, তাহা হইতে এই একাগ্রতার কতকটা আভাস পাওয়া যাইত। তিনি বলিতেন, রাত্রে তাঁহার নিজের ঘরে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যে সকল কথা বলিবেন তাহাই তাঁহাকে বলিয়া দিতেছে, এবং পরদিন তিনি দেখিতেন যে, বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া তিনি সেই কথাগুলিই আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। কখনও কখনও তিনি শুনিতেন, যেন দুইজন লোক পরস্পরের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিতেছে। আবার কখনও ঐ কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইত—যেন একটা লম্বা রাস্তার অপর প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তৎপরে হয়ত ঐ আওয়াজ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অবশেষে উহা চীৎকারে পরিণত হইল। তিনি বলিতেন, "একথা ঠিক জানিও যে, অজ্ঞাতকালে ঈশ্বরীয় বাণী (Inspiration) বলিতে লোকে যাহাই বুঝিয়া থাকুক না কেন, উহা নিশ্চয়ই এই প্রকারের একটা কিছু হইবে!"

কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যে তিনি কিছুই অতিপ্রাকৃত দেখিতে পাইতেন না। উহা মনেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্য মাত্র; মন যখন কতকগুলি চিন্তাবিধিকে এত উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লয় যে, উহাদিগের প্রয়োগ বিষয়ে আর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, তখন উহা আপনা হইতেই ঐরূপ করিয়া থাকে। হিন্দুগণ যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া 'মনই গুরু হইয়া দাঁড়ায়' বলিয়া থাকেন, উহা হয়ত সেই অনুভূতিরই একটা চরম আকার। ইহা হইতে আরও আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁহাতে চক্ষু কর্ণ এই দুটী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রায় সমান বিকাশ লক্ষিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয়েরই যেন ঈষৎ প্রাধান্য ছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য একবার তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছিলেন, "তিনি তাঁহার নিজ মনের অবস্থাসমূহকে যথাযথভাবে বিবৃত করিতে পারিতেন।" কিন্তু এই সকল কণ্ঠস্বর স্বসংবেদ্য ব্যাপার ছাড়া আর কিছু, তাঁহার এরূপ অনুমান করিবার অণুমাত্র আশঙ্কা ছিল না।

আর একটী অনুভূতির কথা যাহা আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি; তাহাতে মনের ঐরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়াই প্রকাশ পায়, তবে হয়ত ততটা পরিপুষ্ট আকারে নহে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখনই কোন অপবিত্র চিন্তা বা আকৃতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতেন, যেন ভিতর হইতে মনের উপর একটা ধাক্কা আসিয়া পড়িল—উহা তাঁহাকে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ, অসাড় করিয়া দিল! উহার অর্থ—'না ওরূপ হইতে পারিবে না!'

তিনি অপরের মধ্যে সেই সকল কার্য্যও অতি সহজে করিতে পারিতেন, যেগুলি প্রথমটা মনে হয় যেন আপনা আপনি হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে উচ্চতর জ্ঞানই যাহাদের নিয়ামক। যে জিনিসটী ঠিক, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না, অথচ যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের চক্ষে দেখিলে ভুল বলিয়াই মনে হইবে, এরূপ স্থলে তিনি এক উচ্চতর শক্তির প্রেরণা দেখিতে পাইতেন। তাঁহার চক্ষে সকল অজ্ঞানতাই সমান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত না।

তাঁহার গুরুদেব যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনি আবার তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ আমটী খাইতে পাইবেন, সেকথা তাঁহার বাল্যসঙ্গিগণ কদাপি বিস্মৃত হন নাই। কেহই জানিত না, কোন্ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার চরম অনুভূতি যে আসন্ন, একথা কেই কেহ সন্দেহও করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষবর্ষে তাঁহার কতিপয় বাল্যসঙ্গী একদিন সেই সকল অতীত দিবসের আলোচনা করিতেছিলেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে "নরেন্দ্র যখনই জানিতে পারিবে সে কে এবং কি, তখন আর শরীর রাখিবে না'—এই ভবিষ্যদ্বাণীরও কথা উঠিল। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কতকটা হাস্যচ্ছলে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন," "স্বামিজী, তুমি কে ছিলে এখন জানিতে পারিয়াছ কি?" তখনই এই অপ্রত্যাশিত উত্তর হইল, "হাঁ, এখন জানিয়াছি।" অমনি সকলে ত্রস্ত হইয়া গম্ভীরভাবধারণ করিলেন এবং চুপ করিয়া

গেলেন। কেহ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

যতই শেষদিন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই ধ্যান ও তপস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়াছিল। যে সকল বস্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাহাও এখন আর তাঁহার চিত্তকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারিত না। অবশেষে শেষ মুহূর্ত্তে যখন তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন যেন ঐ বিরাট অতীন্দ্রিয় শক্তির কিছু কিছু, নিকটে ও দূরে যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একজন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রজনীতে পুনরায় শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, এবং প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া শুনিলেন, দ্বারে সংবাদবাহক তাঁহাকে ডাকিতেছে। আর এক জন (ইনি স্বামিজীর বাল্যের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে একজন) দেখিয়াছিলেন, যেন তিনি উল্লাসভরে নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, "শশী, শশী, শরীরটাকে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি!" আরও একজনকে সেই সন্ধ্যাকালে কে যেন জোর করিয়া ধ্যানের ঘরে লইয়া গিয়াছিল ; তিনি তথায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মা যেন একটা অসীম জ্যোতির সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; তিনি "শিব গুরু!" বলিয়া ঐ জ্যোতির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন!

মায়া ও বিজ্ঞানবাদ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

অদ্বৈতবাদী বলেন জগৎ মিথ্যা,—এই যে সকল জিনিষ রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে নাই—মায়ার প্রভাবে আমাদের মনে হইতেছে যে তাহারা রহিয়াছে। বিজ্ঞানবাদ বা Subjective Idealism নামে পরিচিত যে মতবাদ Berkeley ইংলণ্ডে প্রথম প্রচার করেন তাহাতেও বলা হইয়াছে যে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই। আমাদের মনে হইতেছে বটে আমরা এই সকল জিনিষ দেখিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নাই। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এই দুই মতের মিল আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটী মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

Idealist এই ভাবে যুক্তি প্রয়োগ করেন: আমার মনে হইতেছে এই একটী ফুল রহিয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে কেন? কারণ, আমার মনে হইতেছে যে একটী সুন্দর জিনিষ দেখিতেছি, মনে হইতেছে যে একটী কোমল পদার্থ স্পর্শ করিতেছি, মনে হইতেছে যে মনোরম গন্ধ ঘ্রাণ করিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমার মনের মধ্যে কতকগুলি অনুভব হইতেছে, তাহারই ফলে আমি অনুমান করিতেছি যে বাহিরে একটী বিশিষ্ট বস্তু আছে। আমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছি সকলি মনের মধ্যে, মনের বাহিরে কিছু অনুভব করিতেছি না, অথচ বলিতেছি যে মনের বাহিরে একটা বস্তু আছে; সুতরাং অনুভব না করিয়াই বলিতেছি—আছে। অনুভব হইল মনের মধ্যে, অথচ বলিতেছি জিনিষটা রহিয়াছে বাহিরে—ইহা ভ্রম। থাকিবার মধ্যে আছে মনের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রকমের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধের ধারণা। মনের বাহিরে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাই নাই। সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইবেও না, কারণ, সকল অনুভব

মনের মধ্যে। মনের বাহিরে কোনও অস্তিত্বের আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অতএব মনের বাহিরে কোনও অস্তিত্ব হইতে পারে না। ("The *esse* of things is their *percipii*"—Berkeley.) আমি বলিতেছি, এই বিশ্বজগৎ রহিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক রহিয়াছে আমার মনের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র ধারণা। সেই ধারণাগুলিকে আমি বাহ্যজগৎ বলিয়া কল্পনা করিতেছি—ইহা ভ্রম। বাহিরে কিছুই নাই।

এই যুক্তি এবং এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীর অনুমোদিত নহে। অদ্বৈতবাদীও বলেন, জগৎ মিথ্যা কিন্তু সে অন্য অর্থে। তিনি ইহা বলেন না যে, আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ধারণাই বাস্তবিকপক্ষে আছে, মনের বাহিরে কিছুই নাই। এখানে জগৎ এবং মিথ্যা এই দুইটী শব্দ তাঁহারা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানা প্রয়োজন।

স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই শ্রেণীর বস্তু লইয়া জগৎ। যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি তাহা, অর্থাৎ যাহাকে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আস্বাদন করা, বা আঘ্রাণ করা যায় তাহা স্থূল বস্তু, এবং যাহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না তাহা সূক্ষ্ম বস্তু। আমাদের বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল, পঞ্চবায়ু ইহারা সূক্ষ্ম বস্তু। ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না, আস্বাদন করিতে পারি না, আঘ্রাণ করিতে পারি না। কিন্তু ধ্যানপ্রভাবে যাঁহাদের অলৌকিক অনুভবশক্তি হইয়া থাকে, সেই যোগিগণ এই সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। স্থূল বস্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তুও অতি ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত। সূক্ষ্ম ভূতের পরমাণু দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু গঠিত হয়। সূক্ষ্ম ভূতের পরমাণুগুলি আবার বিভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হইয়া স্থূল ভূতের পরমাণু উৎপাদন করে এবং এই সকল স্থূল ভূতের পরমাণু হইতে স্থূল বস্তুসকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আমাদের মনের বাহিরে একটী বস্তু এবং সেই বস্তু সম্বন্ধে

আমাদের মনের মধ্যে ধারণা,—এই দুইটী পদার্থ সম্বন্ধে Idealist বলেন, প্রথমটী কল্পিত পদার্থ, উহার বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই; দ্বিতীয়টী বাস্তবিকপক্ষে আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যথার্থ কথা বলিতে গেলে উহাদের মধ্যে কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, কারণ একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, আর কাহারও নাই। কিন্তু যে হিসাবে বলা যায় যে আমাদের মনের মধ্যবর্ত্তী ধারণার অস্তিত্ব আছে, সে হিসাবে ইহাও বলিতে হইবে যে, মনের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব আছে। ধারণাটী সূক্ষ্ম পদার্থ, বস্তুটী স্থূল পদার্থ, এবং ইহাদের যে সত্তা তাহা ব্যাবহারিক সত্তা। যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততক্ষণ ইহাদিগকে অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রকৃত যে অস্তিত্ব—পারমার্থিক সত্তা—তাহা ইহাদের কাহারও নাই। ব্রহ্মসূত্র প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।—"নতু বস্তু এবং ন এবং অস্তি নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষং। কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রং এব হি তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বা ইতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষোঽন্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানং। স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রং।"

অনুবাদ—"কোন একটী বস্তুকে এই রকম, এই রকম নহে, আছে, নাই এই ভাবে কল্পনা করা যায় না, কারণ; কল্পনা পুরুষের বুদ্ধিসাপেক্ষ। কিন্তু কোনও বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান পুরুষের বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। তবে এই যথার্থ জ্ঞান কি প্রকার? ইহা ঐ বস্তুর অধীন। একটী স্তম্ভকে দেখিয়া, ইহা স্তম্ভ কিম্বা পুরুষ, এইরূপ জ্ঞান হইলে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে না। এ ক্ষেত্রে স্তম্ভকে পুরুষ বলিয়া জানা মিথ্যাজ্ঞান, স্তম্ভ বলিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান। কারণ, ইহা বস্তুতন্ত্র। কোনও বিষয়ের প্রামাণ্য সেই বিষয়েরই অধীন।"

এই স্থলে স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, বস্তু একটী পদার্থ এবং বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা ভিন্ন পদার্থ। ইহা বস্তুতন্ত্রবাদ।

বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ Subjective Idealism এর অনুরূপ। ঐ মতে বিজ্ঞান (বস্তু সম্বন্ধে ধারণা) ব্যতীত বাহ্য কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মসূত্রে, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, ২৮শ সূত্রে এই বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। সূত্রটী হইতেছে—"নাভাব উপলব্ধেঃ।" ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ন খলু ভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যঃ অর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চ উপলভ্যমানস্য এব অভাবঃ ভবিতুমর্হতি।"

অনুবাদ—"বাহ্যবস্তু নাই এরূপ স্থির করিতে পারা যায় না—কেন? যেহেতু তাহার উপলব্ধি হয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যয়ের সময় বাহ্য বস্তু উপলব্ধ হইয়া থাকে—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট এই প্রকার। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা নাই ইহা বলিতে পারা যায় না।" ইহার পরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন -

"বিজ্ঞানবাদী হয়ত বলিবেন, উপলব্ধি হয় ইহা সত্য; কিন্তু যাহা উপলব্ধ হয় তাহা উপলব্ধি মাত্র। তাহা ব্যতিরেকে কিছুই উপলব্ধ হয় না'—ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কেহ উপলব্ধিমাত্রকে স্তম্ভ বা ভিত্তি বলিয়া মনে করে না। কিন্তু স্তম্ভ, ভিত্তি প্রভৃতিকে উপলব্ধির বিষয় বলিয়া মনে করে।"

শঙ্করাচার্য্য এই ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিবার জন্য আরও অন্যান্য যুক্তি দিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে Subjective Idealism এর মত অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করেন নাই। বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে যে ধারণা হয় তদ্ব্যতীত বস্তুর যে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—ইহা অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিবেন না। অবশ্য এই সকল অস্তিত্ব ব্যাবহারিক ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, যতক্ষণ মায়া না নিরস্ত হয়, ততক্ষণ এই সকল বস্তু নাই বলিলে চলিবে না। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' এই যে অনুভূতি, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর হয়। তখন নিখিল বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, মাত্র এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্যরূপে বিরাজিত থাকেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, কি প্রকারে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে ? যদি Subjective Idealism এর মত গ্রহণ কর, যদি বল মনের বাহিরে কোনও বস্তু নাই সকলই মনের কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে বলিতে পার, জগৎ মিথ্যা। তাহা যদি না স্বীকার কর, যদি বল যে বাহ্য জগৎ মনের কল্পনা মাত্র নহে, তাহা হইলে আবার কেমন করিয়া বলিবে যে জগৎ মিথ্যা ? অদ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্য কি ?

এই প্রশ্নের কি উত্তর হইতে পারে দেখা যাউক। এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম কারণ বা প্রকৃতি, জগৎ কার্য্য। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। একই পদার্থ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কারণ ও কার্য্যরূপে পরিচিত হয়। উহাদের যে ঐক্য তাহাই যথার্থ। উহাদের যে প্রভেদ তাহা নাম ও রূপ লইয়া, তাহা যথার্থ নহে। এইজন্য জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। জগতের যে সত্তা তাহা ব্রহ্মেরই সত্তা। তদতিরিক্ত সত্তা জগতের নাই। জগৎ মিথ্যা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের যে মনে হয় ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নানাবিধ পদার্থ রহিয়াছে, তাহা ভ্রম। ব্রহ্মের যে সত্তা তদতিরিক্ত কোনও সত্তা নাই।

এই মত সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে :–

যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।

—ছান্দোগ্য ৬, ৪, ১।

"হে সৌম্য, মৃত্তিকার একটী খণ্ড জানিলে যেমন সকল মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পদার্থ জানা হয়, কেবলমাত্র বাক্যে মৃত্তিকার বিকারকে (স্বতন্ত্রভাবে) আছে বলিয়া বলা হয়, ইহা নামমাত্র ; 'মৃত্তিকা' ইহাই সত্য।"

সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলে নিখিল বিশ্বকে জানা যায়, কারণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই বিকার ব্রহ্মই

সত্য। 'নানাবিধ দ্রব্য বলিয়া পরিচিত' ব্রহ্মের যাহা বিকার তাহারা নামে মাত্র আছে।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়া থাকে— ব্রহ্মসূত্র, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ১৪শ সূত্রের ভাষ্য।)

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি"

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"

"আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্"

"ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্"

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"

"যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হয়। সুতরাং ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন জগতের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জগতের বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে ভেদপ্রতীতি হয় তাহা মিথ্যা। বাস্তবিক পক্ষে উহারা এক, কারণ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

যুক্তির সাহায্যে এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তু যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে অনন্ত আকাশের তুলনায় তাহা নগণ্য (infinitesimal); যতটুকু সময় ধরিয়া তাহার অস্তিত্ব, অসীম কালের তুলনায় তাহাও নগণ্য। যাহা নগণ্য তাহাই শূন্য। Infinitesimal is another name for Zero. সুতরাং অনন্ত আকাশ ও অসীম কালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট বস্তুটী যে স্থান ও সময় ব্যাপিয়া আছে তাহা শূন্য, অর্থাৎ বস্তুটী নাই।

কিন্তু আমাদের পরিমিত শক্তিতে অনন্ত আকাশ ও অসীম কাল উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া আমরা ঐ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না—ইহা ব্যাবহারিক সত্তা। কিন্তু যদি মায়া কাটিয়া যায়, যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, সময় ও স্থান (Time

and Space) আমাদের অনন্ত স্বভাবকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, জগতের অসংখ্য পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সকল অনন্তের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অসীমের দিক হইতে দেখিলে জগতের বস্তুসকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এই ভাবে প্রতিপন্ন হইবে যে, যাহা দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহা পরমার্থ হিসাবে মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্ম দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, এম, এ, এল, এম, এস)

অনেক প্রকার মানসিক বিকার, উন্মাদ অবস্থা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতিকে ঠিক পীড়া বলা যায় না; কিন্তু এ সকলকে সুস্থাবস্থাও বলা যায় না। এ সকল অবস্থায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়, হিপ্‌নটাইজড্ অবস্থায় (Hypnotized state) আমাদিগের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা আলোচনা করিলে এমন সকল নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র জাগ্রৎ সময়ের মনস্তত্ত্ব আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। ঐ সমস্ত অসুস্থাবস্থায় মনের যে সমস্ত নূতন ক্রিয়া এবং শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, তাহা জাগ্রৎ অবস্থায় মনের এবং জ্ঞানের অগোচর থাকিয়া যায়।

আমাদের মনে সাধারণ জ্ঞানের প্রকাশকে সূর্য্যরশ্মির প্রকাশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সূর্য্যরশ্মিতে যে কেবল দৃশ্যমান আলোকরশ্মি আছে তাহা নহে, ইহাতে অদৃশ্য রশ্মি বা Invisible light, আছে। এই অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্ব যদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না বটে, তথাপি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ইহাদের

ছাপ পড়ে বলিয়া, ইহাদের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই গুলিকে অন্যভাবে অর্থাৎ উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিতে পরিণত করিয়াও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। সেইরূপ আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞানই যে মনের শক্তি এবং ক্রিয়ার একমাত্র প্রকাশক তাহা নহে। এই সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত হইতেছে না, এরূপ মনের কার্য্য ও শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অহরহঃ চলিতেছে। বোধ হয় জ্ঞানগোচর মানসিক ক্রিয়া অপেক্ষা এই সকল অজ্ঞাত ক্রিয়াই মানবের প্রকৃত স্বরূপ বিকাশের পক্ষে অধিকতর শক্তিশালী।

প্রসিদ্ধ অষ্ট্রীয়ান ডাক্তার ফ্রয়ড (Freud) অল্পদিন হইল মনোরাজ্যের এই অজ্ঞাত ক্রিয়া সকলের আলোচনা দ্বারা মনস্তত্ত্বের এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন—মনের এই অজ্ঞাত ক্রিয়া বুঝিবার নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়া মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ এক নূতন দিকের সন্ধান পাইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় যে ডাক্তার ফ্রয়ড এবং তাঁহার ছাত্রগণের গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে, এবং হিন্দু দর্শনেরও কতকগুলি মত আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে। এই সমস্ত বিষয় বর্ত্তমান সন্দর্ভে ক্রমশঃ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার সার-সংগ্রহ ইংরাজি বিশ্বকোষের (Encyclopædia Britannica) স্বপ্ন (Dream) বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের যে সকল মত আছে তাহার কোনটাতেই স্বপ্নতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য ভেদ হয় নাই। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়ড এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাদের আবিষ্কৃত উপায়গুলি দ্বারা মনের অজ্ঞাত ভাবসকলের বিশ্লেষণ করিয়া কিরূপে ঐ বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিতেছি। ডাক্তার এইচ, এ, ব্রিল (Dr. H. A. Brill) আমেরিকার

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং ডাক্তার ফ্রুডের শিষ্য তাঁহার এক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত স্বপ্নবিবরণ প্রায় তাঁহার কথাতেই লিপিবদ্ধ করিলাম :—

কুমারী জি—আমেরিকাবাসিনী। বয়স ২৮ বৎসর। তিন মাস স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে কষ্ট পাইয়া ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হন। এই কুমারী তিন মাস পূর্ব্বে বেশ ভাল ছিলেন ; তাহার পর অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য কোষ্ঠকাঠিন্য মাথাধরা, অকারণ ক্লান্তিবোধ, অকারণ ক্রন্দনেচ্ছা, উদ্বিগ্নতা প্রভৃতি মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাইতে থাকেন। কুমারীর মাতা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইলেন, তাঁহার কন্যার স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে বিমর্ষভাবে কালযাপন করে—এমন কি, প্রায়ই মৃত্যুর ইচ্ছাও প্রকাশ করে। কুমারী দেখিতে বড় সুন্দরী ছিলেন তাঁহার মানসিক অশান্তির এবং দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মনের মধ্যে দারুণ বিষাদ নিরন্তর অনুভব করিলেও তিনি তাহার কারণ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। তিনি জানেন যে, "তাঁহার দুঃখ করিবার কিছুই নাই। সুখে জীবন কাটাইবার যাহা প্রয়োজন সবই তাঁহার আছে। তথাপি তিনি উক্ত বিষাদের ভাব কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার মাতার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে এই দুঃশ্চিন্তা তাঁহার মনে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিষম যাতনা প্রদান করে।" এই প্রকার ভাষার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে শিখিয়াছিলাম বলিয়া আমি বুঝিলাম যে, তাঁহার মাতার মৃত্যু হউক কুমারীর মনে এইরূপ গূঢ় ইচ্ছা তাঁহার অজ্ঞাতসারে কখন কখন উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ কথা পাঠকগণ পরে বুঝিতে পারিবেন।

কুমারী আমার চিকিৎসাধীনে কিছু দিন থাকিবার পরেও তাঁহার শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক অশান্তির বিশেষ কোনও উপকার হইতেছে না দেখিয়া আমি তাঁহাকে ডাক্তার ফ্রুডের Psycho-analysis মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ উপায়ে চিকিৎসা করিবার ইচ্ছা করিয়া

তিনি যাহা স্বপ্ন দেখেন তাহা লিখিয়া আনিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং কয়েক দিন পরে নিম্নলিখিত স্বপ্নটি লিখিয়া আনিলেনঃ—

স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি কোন নির্জ্জন পাড়াগাঁয়ে রহিয়াছি এবং বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। আমার বাড়ী যেন লিকনর বে (Likonor Bay), কিন্তু সেখানে কিছুতেই যাইতে পারিতেছি না। যতবার একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি, ততবারই রাস্তার উপর একটি করিয়া দেওয়াল অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। মনে হইল, রাস্তাটি দেওয়ালে পরিপূর্ণ। আমার পা সীসার মত ভারী হইতেছিল, সুতরাং খুব আস্তে আস্তে হাটিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল যেন আমি অতি দুর্ব্বল কিম্বা অতি বৃদ্ধ হইয়াছি। কিছুক্ষণ ঐরূপে চলিবার পরে, দেখিলাম, একদল মুরগীর ছানা আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যেন আমি সহরের একটি রাস্তায় রহিয়াছি—তাহাতে ভয়ানক লোকের ভীড়। এই ছানাগুলি আমার পিছনে পিছনে দৌড়িয়া চলিল; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি যেন আমাকে বলিল, 'এস, আমার সঙ্গে অন্ধকারে এস'।"

এই স্বপ্নটি আমার নিকট প্রায় অর্থশূন্য বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্বপ্নদর্শনকারী নিজেই এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই হাস্যজনক স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইতেছে। কারণ, মুরগীর ছানা কথা বলিতেছে, ইহা কবে কে শুনিয়াছে!

যাহা হউক, আমি এই স্বপ্নটিকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজ খরচ হইয়াছিল। সমস্ত বিশ্লেষণটি এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। স্বপ্নের মধ্যে যে পরস্পরসংশ্লিষ্ট ভাবের সংযোগ (Association) ছিল তাহা এবং তাহার গূঢ়ার্থ (Symbolic expression) মাত্র এখানে দেওয়া যাইতেছে।

স্বপ্নদর্শনকারীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, স্বপ্নের কোন্ অংশটি তিনি বেশ স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে হয়। উত্তরে

তিনি বলিলেন, "আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় মুরগীর ছানাটিকেই বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম, অন্যগুলি অস্পষ্ট বোধ হইয়াছিল। এইটিই অসাধারণরূপে বড় ও ইহার গলাটি বিশেষ লম্বা ছিল এবং ইহা আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল। যে রাস্তায় ছানাটি আমার সঙ্গে কথা বলিয় ছিল তাহা দেখিয়া আমি যে রাস্তায় স্কুলে যাইতাম সেই রাস্তার কথা মনে পড়ে। ১৩ বৎসর বয়সের সময় আমি ঐ স্কুল হইতে পাশ করি। ঐ পাড়াটি প্রায় সব সময়ে স্কুলের ছেলেতে পরিপূর্ণ থাকিত—" এই কথা বলিয়া কুমারী লজ্জায় আরক্তিম হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার ঐরূপ ভাবান্তর কেন উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করায় কুমারী বলিতে লাগিলেন, "এই সব কথা বলিতে বলিতে আমার স্কুলের সুখের দিনগুলি মনে পড়িতেছে। তখন আমার কোনও দুঃখ বা কষ্ট ছিল না। আমাদের স্কুলে দুইটি বিভাগ ছিল—এক বিভাগে ছেলেরা পড়িত, অপর বিভাগে মেয়েরা পড়িত। ছাত্রবিভাগের এক জনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। স্কুলের ছুটীর পর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত এবং দুই জনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইতাম। বন্ধুটির নাম ছিল ফ—। তাহার চেহারা কিছু লম্বা এবং রোগা ছিল। অন্যান্য ছাত্রীরা তাহার বিষয় লইয়া আমাকে বিরক্ত করিত। তাহাকে আসিতে দেখিলে তাহারা আমাকে বলিত, 'সুন্দরি, তোমার মুরগীর ছানাটি এইবার আসিতেছেন।' ছেলেদের মধ্যেও তাহার ডাক নাম ছিল 'মুরগীর ছানা'।"

তখন সেই কুমারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, স্বপ্নে তিনি যে বড় মুরগীর ছানা দেখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন? তাহাতে কুমারী হাসিয়া বলিলেন যে, লম্বা গলাওয়ালা যে মুরগীর ছানা স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম সেটি ফ-, এই কথা কি আপনি বলিতে চান? তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, এখনও তাঁহার ফ—এর সঙ্গে জানাশুনা আছে কি না। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, গত কয় মাস তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই দেখা হইত।

এইরূপে আরও কিছু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা গেল যে, তাঁহাদের ছাত্রজীবনের ভালবাসা এখনও তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফ— এই কুমারীর নিকট তিনবার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু কুমারী তাঁহার স্থির মতামত কিছু জানান নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি ফ—কে পছন্দ করিতেন কিন্তু ফ—এর অবস্থা ভাল না থাকায় তাঁহার আত্মীয়েরা এই বিবাহে আপত্তি করেন।

সৈন্যদের নৃত্যউৎসবে (Military ''ball) ফ—এর সহিত কুমারীর শেষ দেখা হইয়াছিল। তখন ফ— সৈন্যবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যের পোষাকে তাঁহাকে বেশ মানাইয়াছিল, এবং বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল।

তিনি এই কুমারীর সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিলেও বিবাহের প্রস্তাব আর করেন নাই। কুমারীটি কিন্তু চতুর্থবার বিবাহের প্রস্তাবের আশা করিয়াছিলেন এবং এইবার প্রস্তাব করিলেই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কুমারী শুনিয়াছিলেন যে, ফ—সম্প্রতি অন্য একটি যুববতীকে ইঙ্গিতে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে যে খুব আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার এই কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—"আমি এই সকলের জন্য নিজেকেই মাত্র দোষ দিতে পারি, এবং আমাকে ঐ সব চেষ্টা করিয়া ভুলিতে হইবে।"

আমরা এক্ষণে এই স্বপ্নের হাস্যজনক এবং অসম্ভব অংশের, অর্থাৎ মুরগীর ছানার কথা বলার অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। 'মুরগীর ছানা' ফ—এর চলিত নাম। তিনিই এই স্বপ্নের প্রধান নায়ক। স্বপ্নে অন্যান্য মুরগীর ছানার চেহারা অস্পষ্ট ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, এই কুমারীর অন্যান্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু কুমারী তাহাদিগকে মন হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন।

মুরগীর ছানা বলিয়াছিল "আমার সঙ্গে অন্ধকারে এস।"

মনের অজ্ঞাত প্রদেশে (Sub-conscious region) অনুসন্ধান করিবার জন্য ডাক্তার ফ্রুড বাক্যজনিত ভাবসকলের (Word-asso-

ciations) বিশ্লেষণ নিমিত্ত একরূপ নিয়ম বাহির করিয়াছেন; পরে সে বিষয় আরও বিশদ্‌ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। মোটামুটি ইহা এইরূপ

বিশ্লেষণকারী একটি কথা বলেন, সেই কথা শুনিয়া পরীক্ষিত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ কি কথা মনে পড়ে তাহা বলিতে হয়। পুনরায় এই কথাটি বলিলে আবার তাঁহার কি কথা মনে পড়ে, তাহাও বলিতে হয়। এইরূপে পরীক্ষার্থীর মনের অজ্ঞাত প্রদেশের চিন্তাস্রোতের গতি নিরূপণ করা হয়। এই প্রকারে 'অন্ধকার' কথাটি হইতে তৎসংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ভাবপ্রকাশক কথাগুলি কুমারীর নিকট পাওয়া গেল। অন্ধকার - অস্পষ্ট, অননুভবনীয়, রহস্য, বিবাহ।

এই সব কথায় কুমারীর মনে পড়িল যে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, ক—র সহিত বিবাহের কথায় তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে, "টাকাই সব নহে। কে কেমন মানুষ তাহাও চেনা দায়। কোন মানুষের সঙ্গে থাকিয়া যত দিন পর্য্যন্ত না তাহার নুন খাইতেছ, তত দিন তাহাকে চিনিতে পারিবে না। বিবাহ একটি রহস্য।"

এই কথাটি তাঁহার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং বাইবেল হইতে তাঁহার মাতা যে তাঁহাকে নুন খাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কুমারী মোটেই ভুলেন নাই। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে তাঁহার মনে 'অন্ধকার' এই কথাটি গূঢ়ার্থবাচক এবং তাহার অর্থ বিবাহ। ইহা হইতেই আমরা মুরগীর ছানার উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইটি ক—এর বিবাহের চতুর্থ প্রস্তাব।

স্বপ্নের প্রথম অংশের বিবরণ এইরূপঃ—'আমি একটি জনশূন্য পাড়াগাঁয়ে রহিয়াছি—ইত্যাদি।'

সেই কুমারীর এই সুন্দর দেশটির দৃশ্য কতক পরিমাণে স্মরণ হইল। তিনি গত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের উপকূলে গিয়াছিলেন। স্বপ্নে এই উপকূলের নাম পাইয়াছিলেন লিকনর বে (Likonor Bay) কিন্তু এই নামের অর্থ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। লিকনর-

যে কথাটি লইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত ভাবসংহতি (word-association) পাওয়া গেল। 'লিকনর' শব্দের পর তাঁহার 'লুকারনো' ও 'লুগানো' এই দুই স্থানের কথা মনে পড়িল ; এই স্থান দুইটি তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং এই দুই স্থানেই তিনি বিবাহের পরবর্ত্তী "মধু-মাস" (honey-moon) যাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

তাহার পর লিকনর যে এই কথাটির মধ্যে তিনটি কথা বুঝিতে পারিলেন। Like পছন্দ করি, honor সম্মান করি, (obey) বশ্যতা স্বীকার করি। যদি Like কথাটী স্থলে Love অর্থাৎ ভালবাসি এই কথাটি বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বিবাহের মন্ত্র হয় ; এ মন্ত্র প্রত্যেক কুমারীরই জানা আছে। স্বপ্নে এরূপ দুই তিনটি কথা মিশিয়া গিয়া সংক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

স্বপ্নের প্রথম ভাগের অর্থ এইরূপ হইতে পারে। আমি একটি নির্জ্জন পল্লীগ্রামে ছিলাম এবং ভালবাসা, সম্মান এবং বশ্যতা লইয়া বাড়ী যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমি নিজেকে একেলা অনুভব করিয়া বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম।

স্বপ্নের পরের বিবরণ এই যে, কুমারী তাহার পদদ্বয় সীসার মত ভারী বোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটা কিছু ঘটিবে বলিয়া ভীত হইতেছিলেন। তথাপি মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। অগ্রসর হইবার বিশেষ চেষ্টা সত্বেও অগ্রসর হইতে পারা যাইতেছে না—স্বপ্নে যখন এইরূপ প্রতিবন্ধকের ভাব অনুভব করা যায়, তখন মনে দুইটি বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব হইতেছে বুঝিতে হইবে।

এখানেও তাহাই হইয়াছিল। কুমারী বিবাহ করিতে বিশেষ উৎসুক এবং ফ—কে পছন্দ করেন। তাহা ছাড়া তাহার বয়স হইয়া গিয়াছে। যেন তিনি অতি বৃদ্ধ কিম্বা দুর্ব্বল ; সেই জন্য চলিতে পারিতেছেন না ; স্বপ্নে এইরূপ ভাবের উপলব্ধি হইয়াছিল। অর্থাৎ যেন তিনি দুর্ব্বল এবং বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিবাহের রাস্তা দিয়া

চলা কঠিন হইতেছে। বয়োবৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিলেন বলিয়া জাগ্রৎ অবস্থায়ও আপনাকে পরিহাসচ্ছলে খুড়ী বলিতেছিলেন"। এই সব বিবেচনায় তাঁহার পক্ষে ফ—কে গ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল। কারণ, ফ—অল্প-বয়স্ক সুন্দর যুবক হইলেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে, তিনি বিবাহ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সামাজিক অবস্থানুসারে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে পারেন।

তাহার পর স্বপ্ন এইরূপ চলিয়াছে—"যখনই আমি একটু অগ্রসর হই, তখনই আমার পথের মাঝখানে দেয়াল উঠে। মনে হইল, এই রাস্তাটি যেন দেয়ালে পরিপূর্ণ।"

একটি রাস্তা দেয়ালে পরিপূর্ণ, ইহা দ্বারা Wall Street বুঝাই-তেছে। ইহা আমেরিকা দেশস্থ একটী রাস্তার নাম। এই রাস্তার পার্শ্বে বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, তাহাতে লোকেরা টাকা জমা রাখিয়া থাকে। অতএব টাকাই এই বিষয়ে প্রতিবন্ধক তাহা বুঝা যাইতেছে।

যখন এই ব্যাখ্যা কুমারীকে বলা হইল তখন তিনি কিছু হাসিয়া বলিলেন, আমিও এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া Wall Street ব্যাঙ্কে আমাদের যে টাকা জমা আছে তাহা হইতে ফ—কে সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মাতা ও আমার মধ্যে এই সর্ত্ত আছে যে আমার মাতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এই টাকায় হাত দিতে পারিব না।

এক্ষণে সমগ্র স্বপ্নটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—আমার এক্ষণে ২৮বৎসর বয়স এবং আমি একরূপ বৃদ্ধা এবং আমি ফ—কে বিবাহ করিতে ব্যস্ত কিন্তু তাঁহার এমন টাকা নাই যাহাতে আমাদের উভয়ের উপযুক্ত ভাবে ভরণপোষণ হইতে পারে। তবে যদি সে আবার বিবাহের প্রস্তাব করে, আমি হয়ত তাহাকে অর্থ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি। স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশে আপনার মনেই যেন তাহার এই গূঢ় ইচ্ছা সফলতা লাভ করিতেছে।

গত কয়েক মাস ধরিয়া এই সব চিন্তায় কুমারীর মন পরিপূর্ণ

ছিল— এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন ; এবং তিনি এই সব ভুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও বলিলেন।

স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বপ্নে যে সব চিন্তা প্রকাশ হইয়াছিল সে সব চিন্তার বিষয় এই কুমারী জ্ঞানতঃ কাহাকেও বলিতেন না ; এ সব কথা বলিতে তাহার যে লজ্জা হইত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু না বলার আর একটি কারণ এই যে, এই সব বিষয় লইয়া তিনি অজ্ঞাতভাবে অনেক চিন্তা করিলেও নিজের ভিতরের সব কথা তিনি নিজেই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই।

সাধারণতঃ সামান্য বিষয়সম্বন্ধে স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না। অনেক স্বপ্ন অনেক স্থলে অতি সামান্য এবং সরল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সকল স্বপ্ন যদি রীতিমতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, স্বপ্ন দর্শনকারীর গভীরতম গূঢ় ভাব ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য স্বপ্নের মধ্যে এই ভাব বুঝিবার সময় এত বাধা অতিক্রম করিতে হয়।

ইহা ব্যতীত স্বার্থ কামনা, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত কার্য্যের ফলে আমাদের মনের অজ্ঞাত স্তরের ভিতর একটি সেন্সর (censor) সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের সময় একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তিনি যে সকল সংবাদ বাছিয়া মনোনীত করিয়া দেন তাহাই সাধারণে প্রকাশিত হয়। গূঢ় সংবাদ সাধারণে প্রকাশিত হয় না। এই রাজকর্ম্মচারীকে সেন্সর বলে। আমাদের মনের মধ্যে যে সেন্সর সৃষ্টি হয়, তাহা আমাদের লজ্জা ও পাপজনক কার্য্যের স্মৃতি এবং অপ্রিয় দুঃখদায়ক অনুভূতি সকল আমাদের সাধারণ জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা করে। তাহার ফলে কিন্তু অনেক সময় বাতুলতা, শারীরিক ও মানসিক অশান্তি প্রভৃতি উপস্থিত হয়। স্বপ্ন সকলের ঐন্দ্রজালিকতা অনেক পরিমাণে আমাদের এই মানসিক সেন্সরের কীর্ত্তি ; তাহারই ফলে স্বপ্ন অধিকাংশ স্থলে দর্শনকারীর অবোধ্য হয় ; এবং নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অনতিবিলম্বে স্বপ্ন ভুলিয়া যাইতে হয়।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ।

(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন)

সংসার মহামায়ার লীলাভূমি! এই লীলা দেখিয়া সাধক কবি গাহিয়াছেন,—

"এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে॥"

বাস্তবিকই এই ভবরোগগ্রস্ত ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী জীবের শান্তি নাই। বাসনার উত্তাল তরঙ্গে, অভিমানী অহঙ্কারের তাড়নে এবং দুর্দ্দম প্রবল রিপুর পীড়নে জীব সর্ব্বদা অশান্তিপারাবারে ভাসিতেছে। চারিদিকে কামকাঞ্চনের কথা, চারিদিকে রোগ শোক দুঃখের ছবি চারিদিকে ভোগ বিলাসের তাণ্ডব নর্ত্তন। উপায় কি? ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য জীবনের আয়োজন, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালনের জন্য চিন্তাস্রোত অহরহঃ প্রবাহিত হইতেছে, বিষয়-গরল পানে জর্জ্জরিত চিত্ত বিকল ও বিক্ষিপ্ত এবং আত্মাভিমানের মহিমায় আমরা এত অভিভূত যে আমাদের পূজার্চ্চনা, সাধুসেবা এবং যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহার মূলে আকাঙ্ক্ষার আবেদন পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন—তিনি যেন আমাদের ভোগ-যজ্ঞের ইন্ধন জোগাইবার ব্যক্তি মাত্র—তাই তাঁহাকে নমস্কার করি, পূজা করি এবং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করি। ধন-জন-যশ-তৃষ্ণা অহর্নিশি মনে বিরাজ করিতেছে, সংসারে কামকাঞ্চনের আলাপ এবং লোকনিন্দার প্রলাপ ব্যতীত আমাদের অধিকাংশ লোকেই আর কিছু জানে না—ইহা ব্যতীত আমাদের ভাষার উপযুক্ত প্রয়োগ জানি না। ভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ করাই আমাদের পক্ষে যেন কঠোর সাধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বাস্তবিকই এই শোচনীয় অবস্থায় আমাদের উপায় কি? শাস্ত্র বলেন, সাধুসঙ্গ।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥"

ক্ষণকাল যদি সাধুসঙ্গে যাপন করা যায় তবে এই ভীষণ ভবসমুদ্র হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, ইহা মহাজনগণের বাক্য।

সাধুসঙ্গ ত করিব, কিন্তু সাধুকে চিনিব কিরূপে? এই সংসারে পড়িয়া কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্যাকুলাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন—প্রকৃত বৈষ্ণব কে? তদুত্তরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলেন,

"যাঁহারে দেখিলে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
তাঁহারে বৈষ্ণব বলি জানিহ নিশ্চয় ॥"

সাধুর—প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিকের ইহাই লক্ষণ। বাস্তবিকই যাঁহাকে দেখিলে আমরা সংসারের আবিলতা ভুলিয়া যাই—যাঁহাকে দেখিলে আমাদের ভগবৎভাব স্ফুরিত হয়—যাঁহাকে দেখিলে হৃদয়ে শ্রীভগবানের আসন পাতিতে ইচ্ছা হয়—তিনিই সাধু। যিনি প্রকৃত বিবেকবৈরাগ্যবান্, যিনি কামকাঞ্চনের লেলিহান্ বাসনাগ্নিতে হবিঃ প্রদান করেন না, যিনি এই অনিত্য সততচঞ্চল গতানুগতিক জগতের অসারত্ব দেখাইয়া প্রকৃত সত্যের পথ প্রদর্শন করেন, যাঁহার জীবন সত্যের, পবিত্রতার এবং সংযমের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ তিনিই যথার্থ সাধু। এইরূপ সাধুর সঙ্গ লাভ করিলে জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, বিষয়বিষ ত্যাগ করিয়া ভক্তির পীযূষধারা পান করিয়া জীবন কৃতার্থ হয় এবং ভগবদারাধনাই যে মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লোকে তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সাধু চিনিতে পার আর নাই পার, এইরূপ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই—তাঁহার পবিত্র অমৃতসঙ্গলাভ করিলেই তোমার অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইবে- সাধুর সরল অমায়িক ব্যবহারে এবং অসীম ভালবাসায় তোমার হৃদয় আর্দ্র হইবে এবং এই স্বার্থপঙ্কিলময় জগতে নিঃস্বার্থতার অপূর্ব্ব আদর্শ দর্শন করিয়া তোমার মোহের আবরণ ধীরে ধীরে অপসৃত হইবে। সাধুসঙ্গের এমনই গুণ যে, ঘোর পাষণ্ড

নাস্তিকও ঐশী শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্যও সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ লাভে ধন্য হইবে।

সুতরাং সাধুসঙ্গ করিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। লোকে বলে, জহুরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না। যদি সেই চিন্তামণিকে চিনিতে চাও, যদি সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এর ধারণা করিতে চাও, তবে সাধু হও—সাধুর আদর্শে জীবন গঠিত কর। সাধু না হইলে সেই চিন্তামণিকে চিনিতে পারিবে না। সাধু হইতে গেলে সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই। সাধু মহাপুরুষদিগের জীবন ও তাঁহাদের কার্য্যাবলী চিন্তা করিলেও আমরা সাধুসঙ্গের কতকটা মাধুর্য্য ও আনন্দ অপরোক্ষভাবে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি। অবতার ও আচার্য্যপুরুষগণই যথার্থ সাধু। জগতের হিতের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য এবং জনসমাজে ধর্ম্মের পুণ্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা জগতে আবির্ভূত হন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়া কৌপীনধারী হইয়াছিলেন। স্নেহময় জনকজননী, প্রণয়িণী স্ত্রী এবং স্নেহের পুত্তলী একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়া যুবক রাজকুমার জরা-মরণ-ব্যাধি-পীড়িত জীবগণের কল্যাণের জন্য কি কঠোর তপস্যাই না করিয়াছিলেন! নিরঞ্জনা তীরে উরুবিল্বের বোধিদ্রুমতলে কি কঠোর সাধনার সহিত তিনি সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সেই মেঘগম্ভীর প্রতিজ্ঞাবাণী স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ম্ সমুচ্চলিষ্যতে॥

আবার দেখ সেই কিশোর সন্ন্যাসী শঙ্কর, যিনি জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য বালকবয়সে স্নেহময়ী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভীক কেশরীর ন্যায় কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বেদান্তভাষ্য চিরোজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় ধর্ম্মজগতে

বিরাজিত থাকিয়া শত শত জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছে এবং তৎকৃত বিবেকচূড়ামণি, মোহমুদ্গর, মণিরত্নমালা, প্রভৃতি স্তোত্ররাজি পাঠ করিলে বৈরাগ্য ও ভক্তিরসে হৃদয় অভিসিঞ্চিত হয়।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের দিকে চাহিয়া দেখ—যিনি অশ্রুসিক্তনয়নে গদ্গদ কণ্ঠে বলিতেছেন—

"ন চ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূং।
সদা কামং কামং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদম্
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

—যিনি কখনও মহাভাবে গর গর হইয়া যমুনাভ্রমে সাগরবক্ষে ঝম্প প্রদান করিতেছেন—কখনও অর্দ্ধবাহ্যদশায় "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন, আবার কখনও জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে মধুর হরিনাম বিলাইতেছেন—যিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রেমের প্রবল বন্যায় আপনাকে ও সমগ্র বাংলা-দেশকে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কথা ক্ষণিক চিন্তা করিলেও কাহার না হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হয়?

আবার সেদিন পঞ্চবটীমূলে যে মাতৃগতপ্রাণ সরল ব্রাহ্মণ বালক "মা" "মা" বলিয়া রোদন করিয়া গিয়াছেন—যাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, কঠোর সাধনা এবং অভূতপূর্ব্ব প্রেম ভাষার অতীত—যাঁহার জীবন ধর্ম্মজগতের ইতিহাস ও বেদস্বরূপ—সেই জ্ঞান ভক্তির সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে এবং আচার্য্যকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র পাদস্পর্শে জগতে ধর্ম্মের এক মহাতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে—জগতে এক মহা সাম্যনীতি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব জাগরিত হইয়াছে।

বাস্তবিকই ঈদৃশ আচার্য্য-পুরুষদিগকে চিন্তা করিলে, একাগ্রমনে ধ্যান করিলে এবং সর্ব্বদা স্মরণ মনন করিলে কলুষিত মোহান্ধ-চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ঘোর অশান্তিসাগরে শান্তিলাভ করিয়া জীব ধন্য হয়।

আমাদের দৃষ্টি কামকাঞ্চনের তামস অঞ্জনে অনুরঞ্জিত তাই হিসাব করিয়া ধর্ম্মাচরণ করি। এই অঞ্জনে অনুরঞ্জিত হইয়াই অভিমানিনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,

"ধর্ম্মহেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥"
"ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥"

দ্রৌপদীর এই প্রশ্নে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,

"ধর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ বাড়ে যেন নরক ভিতরে॥"

বাস্তবিক এই বণিক্‌বৃত্তির, এই বিনিময় লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এত উগ্রভাবে উদ্দীপ্ত যে আমরা নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মাচরণ কল্পনা করিতে পারি না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমরা কিন্তু কার্য্য করিলেই কর্ম্মফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। কিন্তু সাধু সে জন্য ধীর স্থির ও উদাসীন। ভগবান্ ঈশার সেই উপদেশ ও তাঁহার একান্ত নির্ভরশীল জীবন স্মরণ করিলে জানিতে পারি সাধুর জীবন কত মহৎ ও মধুর।

"পাখীরও থাকিবার বাসা আছে, পশুরও থাকিবার আবাস আছে, কিন্তু ভগবানের সন্তানের তাহাও নাই।" "আগামী কল্যের জন্য চিন্তা করিও না" ইহা কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধুই বলিতে পারেন।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা কেমন করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিব? কোথায় সেই সাধু যাঁহার দর্শনে আমাদের অজ্ঞান-আবরণ উন্মোচিত হয়?

ভারত ধর্ম্মপ্রধান দেশ। ভারতে ধর্ম্মবীরের অন্ত নাই। যদি আমাদের প্রাণে যথার্থ ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, যদি সত্যলাভের জন্য আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মে, যদি সৎপথপ্রদর্শক সাধুর জন্য আমরা ব্যাকুল হই, তবে আমরা নিশ্চয়ই সাধুর দর্শনও পাইব। ভগবানের সৃষ্টিতে জল, বাতাস, যাহা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহা প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাই। সেইরূপ যখন আমারা সাধুসঙ্গ লাভের প্রয়াসী হইব, সরলভাবে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইব—তখন আমার জন্য সাধু—গুরু আবির্ভূত হইবেন!—সাধুর আদর্শ দেখাইতেই পরম সাধু জগদ্‌গুরু অবতারপুরুষাদির আবির্ভাব। তাঁহাদের চিন্তাই সাধুসঙ্গ—তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর জীবনলীলা প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের প্রিয় বস্তু। শুক, সনক, নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভারতে একের পর আর আবির্ভূত হইয়া "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" ইহাই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের লীলাগ্রন্থ, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলেও সাধুসঙ্গ করা হয়। কারণ, মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন—"ভক্ত, ভাগবত এবং ভগবান্ এক"। নিরঞ্জন গুরুর কৃপায় এবং সাধু সঙ্গের পুণ্য প্রভাবে আমরা অহৈতুকী ভক্তির আদর্শ ধারণা করিতে পারি।

চিত্তশুদ্ধি ধর্ম্মলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিত্তের মালিন্য সর্ব্বতোভাবে দূর না হইলে, সংকল্প বিকল্পের তরঙ্গ রোধ না করিলে আমাদের চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা আসে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এই চিত্তশুদ্ধি সাধুসঙ্গ না করিলে, সহজে হয় না। ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময়তা বালকবৎ সরলতা, নিঃস্বার্থ প্রেম এবং আকাশবৎ উদারতা আমরা সাধুর মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা বুঝিতে পারি প্রকৃত ঐশ্বর্য্য—বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম এবং প্রকৃত আনন্দ ভগবচ্চিন্তায়। ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ অপেক্ষা একটা উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা অধিকতর কার্য্যকরী। যথার্থ সাধুর সংস্পর্শে আসিলে আমরা জীবন্ত আদর্শ দেখিতে পাই এবং সেই জীবন দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি ধর্ম্ম একটা কথার কথা নহে—ইহা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ সত্য। সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়; আমরা সাধুসঙ্গে বুঝিতে পারি যে, মন মুখ এক না হইলে ধর্ম্ম সাধন হয় না, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকিলে সত্যের দর্শন হয় না, চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না এবং ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে কখনও ধর্ম্মলাভ হয় না। সাধুর কৃপায় বুঝিতে পারি,

> "কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,
> কিম্বা পুত্রকলত্রমিত্র পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
> জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,
> স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥
> "আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনম্,
> প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
> লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,
> তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥"

যদি সংসারের অসারিতর ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে চাও—যদি কামকাঞ্চনের প্রবল মোহ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চাও—যদি বাসনার বীচিবিক্ষুব্ধ উদ্দাম স্রোত হইতে রক্ষা পাইতে চাও—যদি অশান্তির অকুল পাথার হইতে শান্তির কল্পবৃক্ষমূলে আশ্রয় লাভ করিতে চাও—তবে সাধুর শরণাগত হও। তাঁহার নির্ম্মল সঙ্গে, উন্নতাদর্শে এবং পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত

হইলে তোমার হৃদয় নির্ম্মল হইবে—এবং সেই নির্ম্মল চিত্তদর্পণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইবেন।

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়॥
মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়।
আবিরাবির্ম এধি॥
রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

বেদান্ত-পরিভাষা।*

(স্বামী অমৃতানন্দ)

অনাদি অনন্ত জ্ঞানই বেদ। ঋষিগণ যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক বেদকেই সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের অন্তভাগ বা বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ড, সম্যক্ প্রকারে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া উহাকে উপনিষদ্ বলে।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়—কিছু উপদেশ দিতে হইলে অধিকারী নির্ব্বাচন আবশ্যক। কারণ, অনধিকারীকে উপদেশ দিলে তাহা নিষ্ফলই হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যার পেটে যা সয়"। গ্রন্থবিশেষের পক্ষেও ইহা প্রয়োজন. সেখানে অধিকারীও নির্ব্বাচন

* "বেদান্তসার" নামক পুস্তকের সুবোধিনী টীকা অবলম্বনে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাহারই অন্যতম। —লেখক।

আবশ্যক। সকল গ্রন্থের একটি বিষয়ও আছে। বিষয় ব্যতিরেকে গ্রন্থ হইতে পারে না। কোনও গ্রন্থ যে বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছে তাহার সহিত গ্রন্থের একটা সম্বন্ধ থাকা দরকার. তাহা না থাকিলে গ্রন্থ বোধগম্য হইবে না, এবং শেষ কথা এই যে, বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্য করা উচিত নহে। সুতরাং গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা থাকা আবশ্যক। অধিকারী, বিষয়. সম্বন্ধ ও প্রয়োজন এই চারিটিকে বেদান্তের অনুবন্ধ কহে।

অধিকারী – বেদান্তের অধিকারী হইতে হইলে স্বাধ্যায় আবশ্যক। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করাকেই স্বাধ্যায় কহে। স্বাধ্যায় দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য বোঝা যায় এবং বেদের প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারিলে জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অধ্যয়ন না করিয়াও জ্ঞান হইয়াছে, এরূপ দেখা যায়—সুতরাং অধ্যয়ন ব্যতিরেকে জ্ঞান হইবে না, ইহা কি প্রকার? ঐরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা নিজে অধ্যয়ন না করিলেও অপরের নিকট হইতে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার আবশ্যক হইল না।

তৎপরে নির্ম্মল চিত্ত হইতে হইবে। কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জন-পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই সকল কার্য্য দ্বারা ইহজন্মে বা পরজন্মে চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ হয়।

স্বর্গাদি সুখ লাভের জন্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে কাম্যকর্ম্ম বলে। নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রাহ্মণহত্যাদিকে নিষিদ্ধকর্ম্ম বলে। যে সকল কর্ম্ম না করিলে পাপ সঞ্চয় হয় তাহাদিগকে নিত্যকর্ম্ম বলে। পুত্রজননাদি উদ্দেশ্য করিয়া পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। এবং যে সকল কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপ নাশ হয় অর্থাৎ চান্দ্রায়নাদি কর্ম্ম, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত কহে।

সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানসিক ব্যাপাররূপ শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিকে উপাসনা কহে; এই উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়।

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত হওয়ার সহিত

পিতৃলোক ও সত্যলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভও হইয়া থাকে—শ্রুতিতে আছে, "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইত্যাদি। এই সকল কার্য্য দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইবে।

বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটিকে সাধন-চতুষ্টয় কহে।

কোনটি নিত্য ও কোনটি অনিত্য বস্তু, উহার বিচারের নাম বিবেক।

অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে যেরূপ ভোজন ছাড়া অন্য বিষয় ভাল লাগে না এবং ভোজনে বিলম্বও সহ্য হয় না, সেইরূপ ইহলোকের ও পরলোকের সকল প্রকার ভোগবিলাসে অরুচি ও তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শ্রবণ মননাদিতে অত্যন্ত অভিরুচিকে বৈরাগ্য বলে।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ছয়টিকে ষট্‌-সম্পত্তি বলে।

পূর্ব্ববাসনার বলে শ্রবণাদি সাধন ছাড়িয়া ভোগবিলাসিতার দিকে ধাবমান মন অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা নিগৃহীত হয় সেই বৃত্তি-বিশেষকে শম বলে।

জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদি হইতে পৃথক্ অন্য শব্দাদি বিষয়ে প্রবর্ত্তমান শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তঃকরণের যে বৃত্তি দ্বারা নিবর্ত্তিত হয় সেই বৃত্তি-বিশেষকে দম বলে।

বিধিপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম স্বীকাররূপ কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা নিত্যাদি বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ, ও 'আমি কর্ত্তা নহি' এই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিহীন অবস্থায় অবস্থানকে উপরতি বলে। মনের ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপের অভাবকেও উপরতি কহে। শীতোষ্ণাদির জন্য সুখ ও দুঃখ শরীরের ধর্ম্ম। শরীর থাকিতে উহা ত্যাগ করা যাইবে না। সুতরাং স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ নিজ আত্মতে শীতোষ্ণাদির অত্যন্ত অভাব, এইরূপ বিচার দ্বারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের সহনকে তিতিক্ষা কহে।

অমানিত্বাদি সাধন বিষয়ে মনের স্থিরতাকে অর্থাৎ নিরন্তর সেই বিষয়েরই চিন্তাকে সমাধান কহে।

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে।

মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

ছয় বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়নশীল, নির্ম্মলচিত্ত, সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্তের অধিকারী।

বিষয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্থাপনই বেদান্তের বিষয়।

সম্বন্ধ—যে বস্তুটি বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে ও যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে অর্থাৎ বোধ্য বিষয় ও বোধকশাস্ত্র এই উভয়ের যে সম্বন্ধ তাহাকে সম্বন্ধ বলে।

প্রয়োজন—বেদান্তের প্রয়োজন মুক্তি অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ ও নিরতিশয় স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি। কিন্তু অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও তাহাতে আনন্দ সম্ভবপর কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত বস্তু যে আত্মস্বরূপ তাহার পুনঃ-প্রাপ্তি ও তাহাতে আনন্দ কি প্রকারে সম্ভব?

গলদেশস্থিত সুবর্ণ হার ভ্রমবশতঃ হারাইয়া গিয়াছে ভাবিয়া লোক শোকে ও দুঃখে অভিভূত হয়, এইরূপ ঘটনা আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই; এবং কিছুকাল অনুসন্ধানের পর অপরের উপদেশ মত নিজ কণ্ঠদেশে হাত দিয়া "এই যে আমার হার" এই কথা বলিয়া আনন্দিত হয়। সেই প্রকার নিত্যপ্রাপ্ত আত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশ, নিত্য, মুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও, লোকে ভ্রমবশতঃ আমি বদ্ধ, আমি অজ্ঞান, আমি দুঃখী এই প্রকার মনে করে; কিন্তু গুরু ও শ্রুতিবাক্য শ্রবণ দ্বারা ভ্রম দূর হইলে সে স্বস্বরূপ জানিতে পারে ও নিরতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং এই প্রকারেই নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই স্বস্বরূপ জ্ঞান হইলে সমস্ত শোক চলিয়া যায় ও জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন, "তরতি শোকমাত্মবিৎ", "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

শিষ্যের কর্ত্তব্য—অতি সামান্য সামান্য জাগতিক কার্য্যে গুরুর আবশ্যক হইয়া থাকে; সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের পারমার্থিক সত্য লাভের জন্য যে গুরুর আবশ্যকতা আছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" গুরু ব্যতিরেকে আমাদের জ্ঞান লাভের উপায় নাই। যেমন নদীস্রোতে ভাসমান কীট আবর্তের পর আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে এবং কোনও প্রকারে নিজ চেষ্টায় সেই আবর্তের মধ্য হইতে বাহির হইতে পারে না; কিন্তু কোনও সদাশয় ব্যক্তি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে আবর্তের মধ্য হইতে উঠাইয়া নদীতীরে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় রাখিয়া দিলে তবে সে আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হয় ও শান্তিলাভ করে। সেইরূপ সংসারক্ষেত্রে ঘূর্ণ্যমান জন্ম, জরা ও ব্যাধি এই ত্রিতাপতাপিত ব্যক্তি অর্দ্ধপ্রজ্জ্বলিতমস্তক পুরুষের তাড়াতাড়ি সেই দাহ নিবৃত্তির জন্য শীতল জলাশয়ে গমনের ন্যায় স্বস্বরূপজিজ্ঞাসু হইয়া সংসাররূপ দুঃখের নিবর্ত্তক, বেদান্তপারদর্শী, ব্রহ্মজ্ঞ, করতলগত আমলকির ন্যায় স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ জ্ঞানের সমর্পক গুরুর নিকট যাইবে রিক্তহস্তে যাইবে না, অন্ততঃ এক টুক্‌রা যজ্ঞকাষ্ঠখণ্ডও হাতে করিয়া লইয়া যাইবে। শ্রুতিতেও আছে "সমিৎপাণিঃ" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"সাধু দর্শন করিতে গেলে শুধু হাতে যেতে নেই, একটু কিছু হাতে করে নিয়ে যেতে হয়। কিছু না পেলে অন্ততঃ দুটো ফুলও নিয়ে যাবি"। বেদান্তের অধিকারী হইয়া উপরোক্ত প্রকারে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিবে।

গুরুর কর্তব্য—ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কেবলমাত্র কৃপা করিয়া প্রকৃত অধিকারী ও জিজ্ঞাসু শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিবেন। এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে, বাক্যমনের অগোচর, অখণ্ড, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপদেশ গুরু কি প্রকারে দিবেন?

অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপের বিধিমুখে উপদেশ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রথমে নিষেধ-মুখে বলিয়া পুনরায় "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিধিমুখে উপদেশ দিয়া থাকেন।

অধ্যারোপ—বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। যেমন

রজ্জুই প্রকৃতবস্তু কিন্তু অবস্তুরূপ সর্প তাহাতে ভ্রমবশতঃ অধ্যারোপিত হইয়াছে মাত্র।

অপবাদ—বিচার দ্বারা অবস্তু আরোপের নিরাকরণকে অপবাদ বলে। যে প্রকার অধ্যারোপ ও অপবাদ-ন্যায় অনুসারে প্রকৃত বস্তু রজ্জু প্রকাশ হইয়া পড়ে ও রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ অধ্যারোপ ও অপবাদ-ন্যায় অনুসারে গুরু ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানাইয়া দেন। বস্তুরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি জগৎপ্রপঞ্চ অধ্যারোপিত হইয়াছে মাত্র, বিচার দ্বারা তাঁহার অপবাদ করিলেই প্রকৃত বস্তু ব্রহ্ম জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

ব্রহ্মে জগৎ নাই বলিলেই ত হইত? অধিষ্ঠান ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি জগৎ প্রপঞ্চ অধ্যারোপ করিয়া পুনরায় তাহার অপবাদের আবশ্যক কি?

আবশ্যক আছে। বায়ুর রূপ নাই বটে কিন্তু অগ্নিতে রূপ আছে সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চ নাই বলিলে অন্য অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া সংশয় হইতে পারে, এবং ঐরূপ সংশয় হইলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধ হয় না। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানে কোনওপ্রকার সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং, একমাত্র অধিষ্ঠান ব্রহ্মে জগৎ অধ্যারোপ করিয়া তাহার অপবাদ করিলেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধ হইবে ও নিঃসংশয় জ্ঞান লাভ হইবে।

মায়া ও ব্রহ্মের স্বরূপ—জগৎ প্রপঞ্চ মায়ার কার্য্য। অসত্য, জড়ত্ব ও দুঃখই মায়ার স্বরূপ; সত্য, জ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কোনও বস্তুর অসাধারণ গুণকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ দুই প্রকার, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ—কোনও বস্তুর অপেক্ষা করিয়া যে লক্ষণ বলা যায় এবং যে লক্ষণ সর্ব্বকাল না থাকিয়া কোন কোন সময়ে থাকিয়া লক্ষিত বস্তুর লক্ষ্যের কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন, একটি গৃহের সম্মুখে একটি গরু বাঁধা আছে, এ স্থলে ঐ গরুটা সেই গৃহের তটস্থ লক্ষণ।

স্বরূপ লক্ষণ—অন্য কোনও বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া যে লক্ষণ বলা যায় এবং যে লক্ষণ লক্ষিত বস্তুর সহিত সর্ব্বকাল বর্ত্তমান থাকে উহাকে স্বরূপ লক্ষণ বলে। যেমন স্বর্ণচূড়াযুক্ত মন্দির, এ স্থলে সেই স্বর্ণচূড়া ঐ মন্দিরের স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা গুরু ব্রহ্মের উপদেশ করেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি বলা হইয়াছে; উহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ কথাটির প্রকৃত অর্থ ভাবিলে ইহাই দেখা যাইতেছে যে "যিনি সমস্তই জানেন"। এখন তিনি যখন এক তখন এই "সমস্তের" অস্তিত্ব কোথায়? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য জগৎকে অপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। সুতরাং উহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

"সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম", "সত্য, জ্ঞান ও অনন্তই ব্রহ্ম", এই সমস্ত লক্ষণকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা যায়।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর ও নির্গুণ বলা হইয়াছে; এবং ইহাও সকলেই অবগত আছেন যে, যাহা বাক্য ও মনের গোচর এবং যাহার গুণ আছে, তাহারই লক্ষণ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকেই লক্ষণা দ্বারা বলা যায়। সুতরাং, বাক্যমনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণাদি কি প্রকারে বলা হইল?

সত্য বটে ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর এবং নির্গুণ, কিন্তু গুরু জিজ্ঞাসু শিষ্যের অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ব্রহ্মোপদেশচ্ছলে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণাদি ব্রহ্মে আরোপ করেন মাত্র।

ব্যবহারিক সত্য—জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের জগতের সকল বস্তুর সহিত ব্যবহার সম্ভবপর এবং এই অবস্থায় আমাদের জগতের সহিত ব্যবহার হয় বলিয়াই, আমরা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করি। কারণ, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহার সহিত আমাদের ব্যবহার সম্ভবপর হয় না তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি না, ইহা আমাদের স্বভাব। জাগ্রৎ অবস্থায় ব্যবহার চলে বলিয়াই এই যে সত্য বলিয়া বোধ হয়, ইহাকে ব্যবহারিক সত্য বলে।

প্রাতিভাসিক সত্য—যখন আমরা নিদ্রিত হই, তখন বাহ্য জগতের সহিত আমাদের ব্যবহার থাকে না। কিন্তু সেই নিদ্রিত অবস্থায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সে স্থলে উপস্থিত না থাকিলেও স্বপ্নাবস্থায় আমরা উহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করি। যথা, আমি কোন নগরীতে একটি বৃহৎ অট্টালিকার কোনও সুন্দর কক্ষের মধ্যে অতি কোমল শয্যাপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নে দেখিতেছি যে, আমি এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে ব্যাঘ্র আমাকে ধরিবার জন্য আমার দিকে অগ্রসর হইল আমি প্রাণভয়ে সবেগে দৌড়াইতে লাগিলাম, কত কণ্টক আমার দেহে বিদ্ধ হইল, আমিও তাহার যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই ব্যাঘ্রও আমাকে ধরিবার জন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আসিতে থাকিল। কিছু দূর যাইয়া আমি এক স্থানে পড়িয়া যাইয়া যেমন ব্যাঘ্রের ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি, অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইল এবং আমি দেখিলাম যে আমি কক্ষের মধ্যে সুকোমল শয্যায় শুইয়া আছি কিন্তু আমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত ও হৃৎকম্প হইতেছে। সুন্দর কক্ষের মধ্যে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও আমি স্বপ্নাবস্থায় বন, কণ্টক ও ব্যাঘ্র সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম এবং সেই মিথ্যা স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রের ভয়ে এতদূর পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম যে, জাগিয়াও আমার হৃৎকম্প দূর হয় নাই এবং আমার শরীরও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে! যদি স্বপ্নাবস্থায় উহা মিথ্যা আমার এরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে আমার ভীত হইবার কোনও কারণ থাকিত না। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, উহা সত্য বলিয়াই ঠিক বোধ হইয়াছিল। এই যে স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে সত্য বলিয়া বোধ—ইহাকে প্রাতিভাসিক সত্য বলে।

পারমার্থিক সত্য—যাহার কোন কালে অভাব হয় না, যাহা সকল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহাই নিত্য এবং যাহা নিত্য তাহাই প্রকৃত

সত্য। স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রদবস্থার অভাব হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক সত্যের অভাব ঘটে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্নাবস্থার অভাব ঘটিলে প্রাতিভাসিক সত্যেরও অভাব ঘটে। এতদ্বারা যখন দেখা যাইতেছে যে, অবস্থাভেদে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্যের অভাব হয়, তখন উহা নিত্য নহে। সুতরাং উহা ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্য হইলেও পারমার্থিক সত্য নহে। যাহা যথার্থ সত্য তাহাই নিত্য এবং তাহাই পারমার্থিক সত্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে, জন্ম জন্মান্তরে, এবং সমাধিতে যে সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান থাকে, কোনও রূপ অবস্থাভেদে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, সেই সচ্চিদানন্দই পারমার্থিক সত্য। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য। সংগুরু এই পারমার্থিক সত্যের উপদেশ করিবেন।

জগতের সকল বস্তুতে আমরা তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাই—স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ। যাহা কিছু অদ্বিতীয় বা অখণ্ড নহে তাহারই এই তিন প্রকার ভেদ থাকিবে এবং যাহা এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড তাহাতে স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ থাকিবে না।

স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ—একটি বৃক্ষে ও তাহার ফল এবং ফুলেতে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহাকে স্বগত ভেদ বলে। যেমন, আম্রবৃক্ষ ও তাহার ফল আম্র। একটি বৃক্ষের সহিত অপর একটি বৃক্ষের যে প্রভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। যেমন আম্রবৃক্ষে ও বটবৃক্ষে। একটি বৃক্ষের সহিত একটি প্রস্তর খণ্ডের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে।

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় এবং অখণ্ড। সুতরাং ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিত।

অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কেবল মাত্র কৃপা করিয়া প্রকৃত অধিকারী জিজ্ঞাসুকে সেই বাক্যমনের অগোচর, সর্ব্বজ্ঞ সচ্চিদানন্দময়, পারমার্থিক সত্য, অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপদেশ করিবেন।

সৎকথা।

১। পবিত্র থাকলে ধর্ম্ম একদিন না একদিন বুঝতে পারবে। সত্যের কাছে ভগবান্ প্রকাশিত হন, যেমন অর্জ্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন।

২। সৎসঙ্গ ছাড়তে নেই। সৎসঙ্গ ছাড়লেই দুর্ব্বুদ্ধি হয় ও শয়তান এসে ঘাড়ে চাপতে পারে।

৩। সদ্‌গুরু লাভ মহাভাগ্যের কথা ও ভগবানের কৃপা চাই। সদ্‌গুরুর কৃপা পেলে সদ্গতি হয়। ত্যাগীর নিকট দীক্ষা লইতে হয়।

৪। যারা ধর্ম্ম মানবে, ভগবান্‌কে চাইবে তাদের মেজাজই আলাদা। এক রকমের লোক আছে, ভাল কথা বললেও মানবে না নিজের গোঁতে চলবে নিজেও কষ্ট পাবে, অপরকেও কষ্ট দেবে।

৫। বরাবর গুরুর উপর, সাধুর উপর, ঠাকুরের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকা কঠিন। যার থাকে সে ভাগ্যবান্ পুরুষ—তার উপর ভগবানের খুব দয়া বলতে হবে।

৬। যারা একটা সত্যকথা বলতে পারে না, তারা আবার ধ্যান জপ করবে কি? যারা ধ্যান করতে পারবে না, তারা গরীব দুঃখীকে যতটুকু পারে সাহায্য করুক—সেবা করুক। তাতে ভগবান্ খুসী হন।

৭। নিজের মায়া নিয়েই মানুষ অস্থির, আবার পরের মায়া নিতে চায়!

৮। যে ভগবানকে ডাকবে, ভক্তি করবে, তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে সে বুদ্ধিমান্। তাঁকে অন্তরে অন্তরে নিজের অবস্থা জানাও, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। তাঁকে জানতে চাইলে তিনিই কৃপা করে জানিয়ে দেবেন।

৯। অর্থের দ্বারা ভগবান্ লাভ হয় না—ঘর বাড়ী হয়, যাগযজ্ঞ হয়। ভগবান্ হলেন প্রাণের জিনিষ।

১০। রূপেয়া, জরু, জমিন্ এই তিনটী হল বন্ধনের কারণ। এ তিনটী না ছাড়্‌লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

১১। লোককে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ—যতটুকু পার তাঁর কৃপায় দুঃখ দূর কর।

১২। সময়ে সব হয়, অসময়ে কিছু হয় না। ব্যস্ত হলে চল্‌বে না, ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হয়। কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়্‌লে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। ঐ অবস্থায় ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌লে পরে কল্যাণ হবেই হবে।

১৩। পরের দোষ দেখা মহাপাপ—কর্ম্মহীন হলে পরের দোষ সহজেই নজরে আসে।

১৪। মানুষ আপনার কর্ম্মে আপনিই ভোগে। মনে করে লোককে ভোগাব কিন্তু নিজেই ভোগে। অপরকে ঠকিয়ে মনে করে আমি জিতেছি কিন্তু সে নিজেই ঠকেছে। যে তা মনে না করে সেই বুদ্ধিমান্ ঠকানো বুদ্ধি ভাল নয়।

১৫। কত সংযম কর্‌তে কর্‌তে ভগবানের দয়া হয়। সংযম না কর্‌লে কি হয়?

১৬। ভিক্ষা করে খাওয়ার উদ্দেশ্য কি?—মান অপমান, লোকলজ্জা সব কাকবিষ্ঠার মত ত্যাগ কর্‌তে হবে। ভিক্ষা করে খেয়ে ভগবানের নাম কর, তাহলে তাঁর দয়া হবে।

১৭। মানুষ উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যায় তাই ত দুর্দ্দশা! যে উপকার পেয়ে উপকার মনে রাখে সেই মানুষ। যার দ্বারা যে বিষয় উন্নতি হয় তাকে কখনও ভোলা উচিত নয়।

———

মথুরা অঞ্চলে জলপ্লাবন।

গত মাসের সংখ্যায় আমরা মথুরা অঞ্চলে যে ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। পরে তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে গত ২৬শে ও ২৮শে ডিসেম্বর আমরা বৃন্দাবন হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"...আপনার প্রেরিত ৫০৲ টাকা পাইয়াছি। বৃন্দাবন হইতে আর ৭৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। মথুরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবু এবং বৃন্দাবনের ডাক্তার শ্রীপ্রমথ নাথ গোস্বামী অনেক গুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ৮ খানি ছোট কাপড় ও কিছু ঔষধও পাইয়াছি। গুজরাটের ষ্টেসন মাষ্টার ২০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। বর্ষাণা অঞ্চলে জল কমিয়া যাওয়ায় ব্যাধির প্রকোপ অনেক কমিয়াছে। সেই জন্য বর্ষাণার কেন্দ্রটী গোবর্দ্ধনে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অঞ্চলটাই এখন বিশেষ আক্রান্ত দেখিতেছি। গোবর্দ্ধন হইতে আশ পাশের ১০।১২টা গ্রামকে সাহায্য করিতে পারা যাইবে।

আপনি কুইনাইনাদি বাবদে কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। প্রেমমহাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে ১৫।৶৫. এবং কয়েক জায়গায় পত্রাদি লিখিয়া ১৯৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। বন্যার জল প্রায় দুই ফুট কমিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষেত জাগিয়াছে; চাষীরা প্রাণপণে চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে— এবং গম বুনিতেছে। কেবল যাহাদের বলদ মরিয়া গিয়াছে বা যাহারা বাজের গম খাইয়া ফেলিয়াছে অথচ হাতে টাকা নাই, তাহারাই কাঁদিতেছে; জল কমিতে আরম্ভ করায় অনেক গ্রামের সুবিধা হইয়াছে। বর্ষাণা অঞ্চলের জল প্রায় কমিয়া আসিল, নন্দগ্রামের জল শুকাইয়া গিয়াছে, বর্ষাণা কেন্দ্রের সেবকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়া ৭ দিনের ঔষধাদি দিয়া কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ অঞ্চলের

লোকেরা কেহ সেবা করিতে আসিলে ভয় পায়! কারণ, তাহাদের কেহ কখন ভালবাসে নাই, নিঃস্বার্থভাবে যে কেহ কথা কহে এরূপ তাহারা কল্পনায় আনিতে পারে না। কষ্ট স্বীকার করিয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঘরে ঔষধ দিয়া বেড়াইতেছে অথচ তাহাদের কোন মতলব নাই, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতেই পারে না! তাই অনেক করিয়া বুঝাইয়া তবে ঔষধ দিয়া আসিতে হইতেছে। যাহাদের বলদ মরিয়াছে তাহাদের বলদ এবং যাহাদের গমের বীজ নাই তাহাদের গম দিয়া এই সময়ে সাহায্য করিতে পারিলে, অনেক জমি পতিত থাকিয়া যাইত না। গত কল্য গোবর্দ্ধনের দিকের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম, এ দিকে জল অতি সামান্যই কমিয়াছে, কিন্তু তাহাতেই অনেক ক্ষেত্র জাগিয়াছে। মথুরার সেবাসমিতির লোকেরা তাঁহাদের গোবর্দ্ধনস্থ কেন্দ্র বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—শুনিলাম তাঁহাদের সেবকেরা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিন চার দিন পরে অন্য লোক আসিবে। তাঁহাদের সোঁক কেন্দ্র হইতে আগত একটী লোকের সহিত দেখা হইল, তাঁহার মুখে সোঁক এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের খবর জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, সকলেরই সর্দ্দি কাশ লাগিয়া আছে। অনেকের গাল গলা ফুলিয়াছে। জ্বর খুব বেশী না হইলেও এখনও আছে, নিউমোনিয়া সংযুক্ত জ্বরও অনেক! দারুণ শীত পড়িয়াছে, চারিদিকে জল থাকায় শীত আরও বেশী হইয়াছে। বেলা ১০॥ টার পূর্ব্বে কেহই আগুন ছাড়িয়া চলিতে পারে না। চাষীরা এই সময় আহারাদি করিয়া ক্ষেতে যায়, আর সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। গোবর্দ্ধনের Damper Hospitalএর চারিদিকে এখনও এক-মানুষভোর জল।

বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা ম্যানেজার, 'উদ্বোধন,' ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা —এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামিজীর মহাসমাধি।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামিজী যে সকল বন্ধুর সহিত মিসরে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে সহসা বিদায় লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, "তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যখন তিনি কাইরোর নিকটবর্ত্তী পিরামিডসমূহ, নারীমুখবিশিষ্ট সিংহমূর্ত্তিটী (the Sphinx) এবং অন্যান্য বিখ্যাত দৃশ্যগুলি দেখিতেছিলেন তখন বাস্তবিকই তিনি যেন জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি অভিজ্ঞতারূপ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতেছেন। ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ আর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীসকলকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

অন্যদিকে আবার তিনি তদ্দেশবাসিগণকে সর্ব্বদা 'নেটিভ' নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া এবং নিজেকে ঐ সময়ে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বরং বিদেশীয়দিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বরং এই হিসাবে তিনি যেন মিসর অপেক্ষা কনষ্ট্যান্টিনোপল দর্শন করিয়া অধিক প্রীত হইয়াছিলেন. কারণ তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি বার বার একজন বৃদ্ধ তুর্কীর কথা

বলিতেন, সে ব্যক্তির তথায় একটী হোটেল ছিল, এবং সে এই বিদেশী যাত্রীদলকে—যাহাদের মধ্যে একজন ভারত হইতে আগত—পয়সা না লইয়া খাওয়াইবার জন্য বিশেষ জেদ করিয়াছিল। সত্য সত্যই আধুনিক বিষয়বুদ্ধিবর্জ্জিত প্রাচ্যদেশীয়দিগের নিকট সকল ভ্রমণকারীই তীর্থযাত্রী, এবং সকল তীর্থযাত্রীই অতিথি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী শীতকালে তিনি ঢাকায় গমন করিলেন এবং অনেক দলবল লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামের একটী তীর্থে স্নান করিতে গেলেন। 'তাঁহার স্বাস্থ্য এই সময়ে কত দ্রুত ভগ্ন হইতেছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার খুব নিকটে থাকিতেন তাঁহারাই জানিতেন। আমরা দূরে ছিলাম বলিয়া কেহই সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি নাই ; ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি বেলুড়ে যাপন করিলেন—এবং 'বাল্যকালে বৃষ্টি পড়ার যেরূপ শব্দ শুনিতেন সেই শব্দ পুনরায় শুনিবার জন্য আশা করিতে লাগিলেন!' আবার যখন শীত আসিল তখন তিনি এত পীড়িত হইলেন যে, তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইল।

তথাপি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, এই দুইমাস তিনি আরও একটী তীর্থযাত্রা করিয়া আসিলেন। এবার তিনি প্রথমে বুদ্ধগয়া এবং তৎপরে বারাণসী দর্শন করেন। তাঁহার সকল ভ্রমণের উহাই উপযুক্ত অবসান হইয়াছিল। তাঁহার শেষ জন্মদিনের প্রাতঃকালে তিনি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিলেন ; তথাকার মোহন্তজীর আদরযত্নের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে, এবং পরে কাশীতেও তিনি এত পরিমাণে এবং স্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠাবান হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রীতি ও বিশ্বাস-ভাজন হইলেন যে, তিনি নিজেই লোকদের হৃদয় কতটা অধিকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এখন যেমন বুদ্ধগয়া তাঁহার শেষ তীর্থদর্শন হইল, তেমনি উহাই তিনি সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করিয়াছিলেন। আর উহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশী-

ধামেই একজনের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়াছিলেন, "যতদিন না আমি সমাজের উপর বজ্রের ন্যায় পড়িতেছি ততদিন আর এই স্থান দর্শন করিব না।"

স্বামিজীর কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর তাঁহার দূরদেশস্থিত বহু শিষ্য তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইলেন। যদিও তাঁহাকে পীড়িত দেখাইতেছিল, তথাপি ইঁহাদের মধ্যে কেহই সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তিম সময়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনও সাগরবক্ষে অর্দ্ধ-পৃথিবী অতিক্রম করিয়া লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে বিদায় গ্রহণাদি চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তাঁহার প্রথম কথোপকথন এই সম্বন্ধে হইল যে, যাঁহারা তাঁহার কাছে থাকেন তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিবার জন্য, তাঁহার নিজের কিয়ৎকালের জন্য সরিয়া থাকা আবশ্যক।

তিনি বলিলেন, "কত দেখা যায় যে, মানুষ দিবারাত্র তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে থাকিয়া তাহাদিগকে মাটী করিয়া ফেলে! একবার লোকগুলি তৈয়ার হইয়া যাইবার পর ইহা বিশেষ প্রয়োজন যে, তাহাদের নেতা তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবেন, কারণ তাঁহার অনুপস্থিতি ব্যতীত তাহারা নিজেদের বিকাশ সাধন করিতে পারিবে না!"

বিদেশীয়গণের সহিত যে সংস্পর্শ তাঁহার প্রৌঢ়দশায় অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহারই সর্ব্ব শেষেরটার ফলে তিনি সহসা ধর্ম্মে গার্হস্থ্য-জীবনে নিষ্ঠার উচ্চাদর্শসমূহের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বোপরি শুধু কথা ও কার্য্যে নহে, আন্তরিক ভাবে ও প্রাণপণে চিন্তাতেও, নিজেদের ব্রতগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন বলিয়া, সামাজিক জীবনের আদর্শসমূহ তাঁহাদের নিকট সচরাচর নিতান্ত অসার পদার্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। স্বামিজী সহসা দেখিলেন যে, যে জাতি বিবাহিত

জীবনের সম্বন্ধকে পবিত্র জ্ঞান করে না, সে জাতির মধ্যে কখনও নিষ্ঠাবান যাজককুল বা উচ্চদরের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় জন্মিবার আশা নাই।

যেখানে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কেবল সেইখানেই দাম্পত্যজীবনেতর পথগুলিতেও লোকে নিষ্ঠার সহিত চলিতে পারে। সামাজিক আদর্শকে পবিত্র জ্ঞান করিলেই, যাহা সমাজবন্ধনের ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেই সন্ন্যাসজীবনকে পবিত্র জ্ঞান করা সম্ভবপর হয়।

এই অনুভূতিই তৎপ্রচারিত দর্শনের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ। ইহা হইতেই মহামায়ার খেলার শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাস-জীবনকে সম্ভবপর করিবার জন্য সমগ্র সমাজ, তাহার উন্নতি-চেষ্টা ও তদ্বিষয়ে সিদ্ধি—এ সকলের প্রয়োজন। সনাতনধর্ম্মে নিষ্ঠাবান সাধুরও যেমন প্রয়োজন, নিষ্ঠাবান গৃহস্থেরও তেমনি প্রয়োজন। বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সন্ন্যাসব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা—এ দুইটাই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সমাজে উন্নতচরিত্র লোক না থাকিলে শক্তিশালী সন্ন্যাসিবৃন্দের উদ্ভব হইতে পারে না। গার্হস্থ্য ব্যতীত সন্ন্যাসজীবন হয় না, ঐহিক ব্যতীত পারমার্থিক জীবন হয় না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সবই এক, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও এতটুকু অঙ্গ-হানি হইতে দিলে চলিবে না, কারণ প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া সেই ভূমাই প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা তাঁহারই পুরাতন বাণী, একটা নূতন আকারে মাত্র। তিনি এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার আচার্য্যদেব যেমন পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ভাবাবেশ অপেক্ষা চরিত্র খাঁটী হওয়াই ভগবৎ সেবার পক্ষে অধিক উপযোগী। যে জিনিসটাকে রাখিবার ক্ষমতা নাই, তাহার ত্যাগে কি বাহাদুরী?

তাঁহার সম্মুখে নানা কার্য্য সর্ব্বদাই আসিয়া পড়িত; সেই সকল কার্য্যের খাতিরে স্বামিজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে একবার তাঁহার স্বাস্থ্য শোধরাইয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন, এমন কি, তিনি

কবিরাজী চিকিৎসা সুরু করাইলেন, যাহাতে এপ্রেল, মে ও জুন মাস ভোর তিনি এক বিন্দু ঠাণ্ডা জল পান করিতে পাইতেন না। ইহাতে তাঁহার শরীরের কতদূর উপকার হইয়াছিল, বলা যায় না কিন্তু ঐ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বল অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন।

জুন মাস শেষ হইলে কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দেহত্যাগের পূর্ব্ব বুধবারে তিনি সমীপস্থ একজনকে বলিয়াছিলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জাগিয়াছে, এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি।"

আর আমরা যদিও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনি অন্ততঃ তিন চারি বৎসরের পূর্ব্বে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তথাপি জানিলাম যে তাঁহার কথাগুলি সত্য! এই সময়ে জগতের খবরা-খবর শুনিয়া তিনি নামমাত্র উত্তর প্রদান করিতেন। সাময়িক কোন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা এখন অনর্থক হইয়া পড়িল। তিনি শান্ত ভাবে বলিতেন, "তোমার কথা ঠিক হইতে পারে কিন্তু আমি আর এ সকল ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলিয়াছি!"

একবার কাশ্মীরে একটী অসুখের পর আমি তাঁহাকে দুই খণ্ড পাথর উঠাইয়া লইয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, "যখনই মৃত্যু আমার সন্নিকট হয়, আমার সকল দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা এসব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈয়ার করিতে থাকি। তখন আমি এই রকম শক্ত হইয়া যাই—" তিনি দুই হাতে পাথর দুই-খানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—"কারণ আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।"

নিজের জীবনের ঘটনাসমূহ তিনি এত কম উল্লেখ করিতেন যে,

কথাগুলি আমরা কদাপি বিস্মৃত হই নাই। আবার সেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম কালেই তিনি অমরনাথ গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তথায় অমরনাথের নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। ইহাতে যেন এই কথাই নিশ্চয় বলিয়া জানা গিয়াছিল যে তাঁহাকে সহসা মৃত্যু আক্রমণ করিবে না এবং ইহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের "ও নিজেকে জান্‌তে পার্‌লে আর এক মুহূর্ত্তও দেহ রাখবে না" এই ভবিষ্যদ্বাণীর এত চমৎকার ঐক্য ছিল যে আমরা এ সম্বন্ধে সকল চিন্তা এককালে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। এমন কি, তাঁহার এই সময়ের নিজ মুখের গম্ভীর বহ্বর্থ বাক্যগুলিও ঐ কথা মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না।

এতদ্ভিন্ন, তাঁহার যৌবনের সেই অদ্ভুত নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের কথাও আমাদের মনে ছিল। আমরা ইহাও জানিতাম যে উক্ত সমাধি অন্তে তাঁহার আচার্য্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই তোমার আম, আমি উহা বাক্সে চাবি দিয়া রাখিলাম। তোমার কার্য্য শেষ হইলে আবার তুমি উহা খাইতে পাইবে!"

যে সাধু আমাকে এই গল্পটী বলিয়াছিলেন তিনি ঐসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি। ঐ সময় নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা নিশ্চিত জানিতে পারিব। কারণ তিনি আমাদিগকে বলিবেন যে, তিনি আবার তাঁহার আম খাইতে পাইয়াছেন।"

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে এখন এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, কত রকমের ঐ প্রত্যাশিত ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমরা উহা শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই।

তিনি সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা ও আসক্তিকে দূরে পরিহার করিলেও যেন একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাহা চিরকাল তাঁহার নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল, সেই জিনিসটী এখনও তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীসকল স্পর্শ করিতে পারিত।

দেহান্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব রবিবারে তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, এই সকল কার্য্যই চিরকাল আমার দুর্ব্বলতার স্থল! যখন আমি ভাবি যে, ঐগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়ি!"

ঐ সপ্তাহেরই বুধবারে,—সে দিন একাদশী—তিনি নিরম্বু উপবাস করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে নিজ হাতে প্রাতঃকালীন আহারীয় দ্রব্যসকল পরিবেশন করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জিনিষটী—কাঁটালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদা ভাত, এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করা দুধ—দিবার সময় তৎসম্বন্ধে কৌতুকসহকারে গল্প করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি নিজে হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন।

স্বভাবতঃই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন, "স্বামিজী এ সকল আমারই আপনার জন্য করা উচিত, অপনার আমার জন্য নহে!" কিন্তু তাঁহার উত্তর অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল—"ঈশা তাঁহার শিষ্যগণের পা ধুইয়া দিয়াছিলেন!"

তদুত্তরে শিষ্যের মুখে আসিতেছিল, 'কিন্তু সে ত শেষ সময়ে!' কিসে যেন কথাগুলিকে আটকাইয়া দিল—তাহা আর বলা হইল না। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানেও শেষ সময় সমাগত হইয়াছিল।

এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্ত্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না। পাছে তিনি অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ চিন্তান্বিত থাকিতাম, এবং কথাবার্ত্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি লঘু বিষয়সকলেই নিবদ্ধ রাখা হইত। তাঁহার পালিত পশুগণ, তাঁহার বাগান, নানাবিধ পরীক্ষা (experiments), পুস্তক, এবং দূরস্থিত বন্ধুবর্গ—এই সকলেরই প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমরা ঐ সময়ে একটী জ্যোতির্ম্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহারই ছায়া বা প্রতীক মাত্র বলিয়া বোধ হইত। তথাপি

কেহই অতশীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতে পারেন নাই—বিশেষতঃ সেই ৪ঠা জুলাই শুক্রবারে—কারণ সে দিন তাঁহাকে বহু বৎসর যাবৎ তিনি যেমন ছিলেন তদপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ঐ দিনটীকে বড় শুভ দিন বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

ঐ দিন তিনি অনেক ঘণ্টাকাল রীতিমত ধ্যান করিয়াছিলেন। তৎপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী সংস্কৃত ক্লাস করিয়াছিলেন। শেষে মঠের ফটক হইতে দূরবর্ত্তী বড় রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়াইয়াও আসিয়াছিলেন।

যখন তিনি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। তাঁহার আচার্য্যদেব প্রথম হইতেই যে মুহূর্ত্তের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সেই মুহূর্ত্ত এখন উপস্থিত হইয়াছিল। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল; তৎপরে সেই ধ্যানরূপ পক্ষে ভর করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া, যথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরম ধ্যানে চলিয়া গেল; শরীরটা ভাঁজ করা পোষাকের মত পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

বেদান্ত-প্রচার।

(ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু উপাখ্যান।)

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

১। স্বামীজি ও বেদান্তপ্রচার।

স্বামী বিবেকানন্দ যে নর-নারায়ণের সেবাধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট প্রচারক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত সেবা-শ্রমগুলির কল্যাণে, রামকৃষ্ণ মিশন অনুষ্ঠিত দুর্ভিক্ষ-জলপ্লাবনাদি কালে বিস্তৃত সেবাধর্ম্মের আয়োজনে সর্ব্বসাধারণে তাহা বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে একজন বিশিষ্ট স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং জাতীয় ভাবের প্রবল উদ্বোধক ছিলেন, তাহাও কতিপয় বর্ষ হইতে সাধারণে জানিয়াছে।

স্বামীজির প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি মুখ্যতঃ দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন বিশিষ্ট ত্যাগী শিষ্য ছিলেন এবং তদীয় গুরুর উপদেশরাজি নিজ জীবনে সাধনা দ্বারা সাধ্যমত উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্যে এবং নানাদেশে দীর্ঘ ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা সহায়ে উহাদের, ভিতর নিজের ছাঁচ দিয়া সমগ্র জগতে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্ম্ম ও স্বদেশহিতৈষিতার ভাব সর্ব্বসাধারণে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বুঝিতে হইবে, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের ভিতর যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপদেশের ঐ দুইটী গৌণ উপায় মাত্র। আজকাল নানাস্থানে সমাজসেবা, দেশের কল্যাণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় বহুল পরিমাণে আলোচিত হইতেছে এবং যাহাদের সমর্থনে স্বামীজির উপদেশসমূহ উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা-দের সকল স্থলে স্বামীজির উদ্দিষ্ট মূল লক্ষ্য যে আধ্যাত্মিক উন্নতি,

তাহার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি আছে কি না বলিতে পারি না। স্বামীজির ভাব ছিল—পতিত, দুঃস্থ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, রুগ্ন নরনারীকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে করিতে সর্ব্বভূতে নারায়ণ উপলব্ধি করিতে হইবে। বাহিরে শুধু একটা প্রকাণ্ড হাঁসপাতাল খাড়া করিলে স্বামীজির উদ্দিষ্ট সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না—দেখিতে হইবে, সেবকগণের চরিত্র সেবাদ্বারা উন্নত হইতেছে কি না, তাঁহাদের ক্রমশঃ অহংবোধ নাশ হইতেছে কি না, সেবার জন্য যে নিষ্ঠা, যে স্বার্থত্যাগ, যে আত্যন্তিকতা প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদিগকে মুক্তির উন্মুখ করিতেছে কি না। কর্ম্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যের পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন কি না। ক্রমে সেবকেরা ধ্যানধারণা-পরায়ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধকে পরিণত হইতেছেন কি না। নতুবা সেবা-ধর্ম্ম ব্যভিচারে ও হুজুগে এবং আন্তরিকতাশূন্য বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহিয়াছে।

স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য—উহাও এক প্রকারের সেবা। স্বদেশসেবকগণের চরম আদর্শ বিশ্বপ্রেমের দিকে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। স্বামীজি ঐ বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক ছিলেন, নতুবা তিনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা কখনও করিতেন না। এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে স্বদেশহিতৈষিতা পরবিদ্বেষে পরিণত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

যাহা হউক, অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে স্বামীজির অভিপ্রেত আর একটী কার্য্যের দিকে সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতে চাই। উহাও তৎকথিত মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের একটী গৌণ উপায় মাত্র। এবং এইগুলি ব্যতীতও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা হইতে উদ্ভাবিত মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনের বহু গৌণ উপায় তাঁহার বক্তৃতাসমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা এইটীর দিকেই সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতে চাই। তাহা এই—সর্ব্বসাধারণমধ্যে বেদান্তবিদ্যার বিস্তার।

বেদান্ত বলিতে উপনিষৎসমূহ বুঝাইয়া থাকে এবং স্বামীজিও ঐ অর্থেই বেদান্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই উপনিষদ্‌ই আমাদের সমুদয় দর্শনের, পুরাণ তন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং আমাদের সমাজপ্রচলিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মূলভিত্তি। বেদান্ত বলিতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে সচরাচর শাঙ্কর দর্শন বুঝাইয়া থাকে। ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াও সাধারণতঃ শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করা হয়। কিন্তু ব্যাসসূত্রের মূল ভিত্তি যে উপনিষদ্, তাহার দিকে কয়জনের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়? উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে যাইয়াও মুখ্যতঃ শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বিত হয়, মূল উপনিষদের দিকে বড় দৃষ্টি থাকে না।

আমরা শাঙ্কর ভাষ্যের নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু ভাষ্যের সহিত মূলকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিয়া রাখিবারই প্রতিবাদ করিতেছি। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। বেদান্তকে ভক্তিবিরোধী শুষ্কজ্ঞান-প্রধানরূপে মাত্র উপস্থাপিত করা হয়। সেই জন্যই স্বামীজি বলিতেন, ভাষ্যকারবিশেষের অনুসরণ না করিয়া মূল গ্রন্থের অক্ষরার্থ বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের দেশে শাস্ত্রগ্রন্থাদির ব্যাখ্যায় পণ্ডিতবর্গের ভাবার্থ দিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল। ভাবার্থের আবরণে নিজ নিজ রুচিসঙ্গত অথচ মূলবিরুদ্ধ কত বিষয় চলিয়া যায়, তাহার দিকে ভাবার্থকারগণের খেয়াল বড় থাকেনা। সেই জন্য স্বামীজি ভাবার্থের পরিবর্ত্তে অক্ষরার্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে, দেহত্যাগের দিনে আমায় শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা আনিয়া 'সুষুম্নঃ সূর্য্য-রশ্মিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র ও উহার মহীধরকৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিতে বলেন। আমি পাঠ শেষ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে মহীধরের ব্যাখ্যা আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোরা পংক্তির অর্থ লাগাবার বিশেষ চেষ্টা করবি।"

অনেকের ধারণা, উপনিষদ্ অতি কঠিন গ্রন্থ, উহার অর্থ ভাষ্য-সাহায্য ব্যতীত বুঝা অসম্ভব। ইহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও

সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক উপনিষদের অনেক স্থলের আক্ষরিক অনুবাদেই অর্থ বেশ বোধগম্য হয়। যে সকল স্থলে হয় না, সে সকল স্থলে ভাষ্যের দ্বারা কখনও কখনও বেশ সাহায্য হয়, কখনও কখনও চৈতন্যদেবের ভাষায় ভাষ্যমেঘে মূলার্থরূপ সূর্য্যকে আরও প্রচ্ছন্ন করে। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে স্বামীজি এই উপনিষৎ প্রচারার্থে কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইব; পরে কি উপায়ে ঐ গুলি প্রচারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে উপায়গুলি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের নির্দ্দেশ করিব এবং পরে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানের যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ সমুদয়টা নমুনাস্বরূপ দিয়া পাঠকবর্গকে মূল উপনিষদের সহিত কতকটা পরিচিত করিতে চেষ্টা করিব। অতঃপর উহার মধ্যে অস্পষ্ট অংশগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়া উক্ত উপাখ্যান হইতে কি কি বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিব। অবশেষে সংক্ষেপে আধুনিক জীবনে উক্ত উপদেশাবলির প্রয়োজনীয়তা দেখাইব।

২। বেদান্ত বিস্তার সম্বন্ধে স্বামীজির কয়েকটী কথা।

শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহ সর্ব্বসাধারণের ভিতর বিস্তার সম্বন্ধে স্বামীজি একস্থলে বলিতেছেন,—

"যে ধর্ম্মতত্ত্বগুলি আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা এখন অতি অল্প লোকের অধিকারে রহিয়াছে। ভারতের মঠ ও অরণ্যসমূহে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, সেইগুলিকে যে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের হস্ত হইতে, শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষারূপ গুপ্ত পেটিকা হইতে বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিতে হইবে। এক কথায় আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বসাধারণের বোধ্য করিতে চাই—আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের, প্রত্যেক ভারতবাসীর,

সে সংস্কৃত ভাষা জানুক, বা নাই জানুক, সকলের সম্পত্তি হউক।"

তিনি কলিকাতা-বক্তৃতায় বামাচারসমর্থক তন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

"তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ্, গীতা - পড়িতে দাও।"

মান্দ্রাজের এক বক্তৃতায় পুরাণের গল্প ছাড়িয়া উপনিষদুক্ত তেজস্বিতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন,—

"আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্প আমরা যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যাহাতে জগতে যত পুস্তকালয় আছে, তাহার অর্দ্ধেকেরও উপর পূর্ণ হইতে পারে। * *আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে।"

অন্যত্র,—

"এখন বীর্য্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্, সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শন শাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহস্যময় দুর্ব্বলতাজনক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ কর। উপনিষদ্রূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য-সকল অতি সহজবোধ্য। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহা তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে, ঐ সত্যসকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত কর।"

উপনিষদ্ যে ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার মতবাদ ও ভাবের ভিত্তিস্বরূপ তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

"বিশিষ্ট বিশ্লেষণ করিলে তোমরা দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সারভাগ ঐ সকল উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত, এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি, তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্ত্তমান। এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি

সব উপনিষদে রহিয়াছে। * প্রত্যেক উপনিষদে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায়, এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্ব্বভাবের খনিস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। * উপনিষদে ভয়ের ধর্ম্ম নাই। উপনিষদের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম—জ্ঞানের ধর্ম্ম। এই উপনিষৎসমূহই আমাদের শাস্ত্র। * আমি এই সকল উপনিষদেই বিশেষ ভাবে একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা, উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অপূর্ব্ব অদ্বৈতভাবের উচ্ছ্বাসে উহা সমাপ্ত হইয়াছে।"

উপনিষদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের নিজ নিজ মতানুযায়ী ভাব প্রবেশ করাইবার চেষ্টাকে নিন্দা করিয়া নিরপেক্ষভাবে উহার শব্দার্থের অনুসন্ধান বিষয়ে বলিতেছেন,—

"আর উপনিষদের শব্দার্থের বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়, কারণ আমি দেখিতে পাই, ইহার ভাষাই অপূর্ব্ব। শ্রেষ্ঠতম দর্শনরূপে ইহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, মানবজাতির মুক্তিপথপ্রদর্শক ধর্ম্মবিজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, ঔপনিষদিক্ সাহিত্যে যেমন মহান্ ভাবের অতি অপূর্ব্ব চিত্র আছে, জগতে আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। * উপনিষদে ভাষা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল, উহার ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, যেন উহা তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অর্দ্ধপথে গিয়াই ক্ষান্ত হইল, কেবল তোমাকে এক অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় বস্তু উদ্দেশে দেখাইয়া দিল, তথাপি তোমার সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। * জগতের আর কোথায় সমগ্রজগতের সমগ্র দার্শনিক ভাবের সম্পূর্ণতর চিত্র পাইবে? হিন্দু জাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সমগ্র কল্পনার সারাংশ যেরূপ অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথায় পাইবে? * উপনিষদের ভাষা, ভাব সকলেরই ভিতর কোন কুটিল ভাব নাই। উহার প্রত্যেক

কথাই তরবারিফলকের ন্যায় হাতুড়ির ঘায়ের মত সাক্ষাৎ ভাবে হৃদয়ে আঘাত করিয়া থাকে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরটীরই একটা জোর আছে, প্রত্যেকটীই তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া যায়। কোন ঘোরফের নাই, একটীও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই একটীও জটিল বাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর ক্রমাগত বিশেষণ দিয়া ভাবটীকে জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টী একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল—তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না। উপনিষদে এরূপ চেষ্টা আরম্ভ হয় নাই। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যাহারা তখনও তাহাদের জাতীয় তেজবীর্য্য একবিন্দুও হারায় নাই। "ইহার প্রতি পৃষ্ঠা আমাকে তেজবীর্য্যের কথা বলিয়া থাকে।"

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত হইল না।

৩। বেদান্ত প্রচারের উপায়সমূহ।

বাঙ্গালা দেশে উপনিষদের প্রচার সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন রায় হইতেই প্রথম সূত্রপাত হয়। তাহার পর দুই চারি জন ব্যক্তি কয়েকখানি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল দুই জন মাত্র সাহসী প্রকাশক বিস্তারিতভাবে সভাষ্য উপনিষদ্ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। দুই এক জন ব্যক্তি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিষদের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দুই জন লেখক মাত্র উপনিষদের তত্ত্বগুলি সরল বাঙ্গালা গদ্যে নিজ ভাষায় লিখিয়াছেন। কোন কোন সাময়িক পত্রেও উপনিষদের তত্ত্ব কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে, দুই একটী সভাসমিতিও এ বিষয়ে অল্প স্বল্প উদ্যোগ করিয়াছেন। কিন্তু যতদূর চেষ্টা হওয়া উচিত, এখনও পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই।

আমরা বলি, এই বিষয়ে আর একটু প্রণালীবদ্ধভাবে, আর একটু

দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণ যেমন গীতার মূল বা সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ বা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচার করিয়াছেন, উপনিষদ্ সম্বন্ধেও সেই নীতি অবলম্বন করুন। কলিকাতায় যেমন গীতা-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ উপনিষদ্-সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হউক। সুপণ্ডিত সুবক্তাগণ মূলের অনুসরণ ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ নিজেদের কল্পনা বেশী না মিশাইয়া সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় উপনিষদের ধারাবাহিক বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে দিতে থাকুন। আরও বেশী অশিক্ষিতদের জন্য সুকথকগণ উপনিষদের বিভিন্ন আখ্যায়িকাবলম্বনে কথকতার সৃষ্টি করুন এবং রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবতের কথকতার ন্যায় সর্ব্বত্র এই সকল কথা দেওয়া হইতে থাকুক। কথার ভিতর দোষ এই আসে যে, লোকের মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া অতিরিক্ত ভাবে মূল হইতে সরিয়া যাওয়া হয়—পুরাণাদির কথকতায়ও সেই দোষ প্রবেশ করিয়াছে। লোকরঞ্জন করিতে যাইয়া যাহাতে সেই দোষ বেশী প্রবেশ না করে, তদ্বিষয়ে কথকগণকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। জটিল দার্শনিক বিচার ছাড়িয়া দিয়া উপনিষদের স্থূল স্থূল উপদেশগুলি লইয়া বিভিন্নবয়স্ক বালকবালিকার উপযোগী বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হউক এবং সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে ঐগুলি নিয়মিত পাঠ্য-গ্রন্থরূপে গৃহীত ও অধ্যাপিত হউক। মাসিকপত্রের স্তম্ভ ভাবুকতা-প্রধান, নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত উচ্চ আদর্শশূন্য অসার উপন্যাস গল্পে পূর্ণ না হইয়া উপনিষৎতত্ত্ব প্রচারে নিয়োজিত হউক। এমন কি, রঙ্গালয়ে পর্য্যন্ত উপনিষদের আখ্যায়িকাবলম্বনে নাটক রচিত হইয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে অভিনীত হউক। চিত্রকলাকেও এই উপনিষৎ-প্রচারের সহায়ক করা যাইতে পারে। বৃহদারণ্যকের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ অবলম্বনে একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র জনৈক বন্ধুর গৃহে দেখিয়াছি। উৎকৃষ্ট চিত্রকরগণকে ভাবটী বুঝাইয়া বলিয়া দিলে তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা উপনিষদ্জ্ঞান বিস্তারের অনেক সহায়তা হইতে পারে।

এই প্রচারকার্য্যের জন্য প্রথমতঃ পণ্ডিতগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং ভাষ্যের সুবিস্তৃত দার্শনিক বিচার দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উপর ক্ষণেকের জন্য সমাহিত করিতে হইবে। মোট কথা, উপনিষদুক্ত সত্যগুলি প্রচারযোগ্য বলিয়া একবার দৃঢ় ধারণা হইলে তাহার জন্য যত প্রকার উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে, সমুদয়ই অবলম্বিত হইতে পারে।

ইহা সত্য যে, উপনিষদুক্ত সত্যসকল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে না পারিলে শুধু পঠনপাঠনে অনেক সময় বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া হৃদয়কে কলুষিত করিয়া আদর্শ হইতে বহু দূরে লইয়া যায়। তজ্জন্য ঐ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই মুখ্য। একথা খুব সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল উপনিষৎ পঠনপাঠনও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা যে সেই উপলব্ধির একটী বিশিষ্ট সাধন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। অনেকে সাধনভজনের অতি সীমাবদ্ধ অর্থ করিয়া পূজা মন্ত্রজপ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াকেই একমাত্র সাধন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থলে দেখা যায়, প্রত্যেক বিভিন্ন সাধনের সঙ্গে স্বাধ্যায়, প্রবচন অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়া পরিশেষে বিভিন্ন ঋষির মতে বিভিন্ন প্রকার সাধনপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে নাকমৌদ্গল্য ঋষির মতে একমাত্র স্বাধ্যায় প্রবচনরূপ সাধনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, উহাই একমাত্র তপস্যা। এবিষয়ে আমরা জনৈক উন্নত সাধকের নিকট শুনিয়াছি, উপনিষৎপাঠকালে তিনি শুধু উহার অর্থ বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু এক একটী বাক্য ও উহার তাৎপর্য্য লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিতেন তাহাতেই উহার গূঢ় রহস্যসমূহ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। শ্রুতিও বলিয়াছেন, উপনিষদ্বাক্য প্রথমে শ্রবণ, পরে বিচারপূর্ব্বক উহার চিন্তা বা মনন ও অবশেষে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অবশ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, সদ্‌গুরুর নিকট এই সকল তত্ত্ব

শ্রবণ করিতে হইবে—তবেই উত্তমরূপে জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকারী মহাপুরুষ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ সাক্ষাৎ বেদবাণী, ভগবদ্বাণী, ঋষিবাণী বা সিদ্ধবাক্য বলিয়া উপনিষৎসমূহের আলোচনা করিলেও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কতকটা সাহায্য করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা পাঠককে ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শ্বেতকেতু উপাখ্যানের সাধ্যমত আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ যাহা করিয়াছি, তাহাই উপহার দিব। কেবল তৎপূর্ব্বে স্বামীজি ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিব।

"ছান্দোগ্যাদি প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন, অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্‌টীতে (ছান্দোগ্য) কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্দ্ধাংশের উপর এখনও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি পাঠে একটা মহান্ লাভ হইয়া থাকে। সেই লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়।

"এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটী বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

"এই গ্রন্থের লেখকগণ কতকগুলি ঘটনা স্মরণ রাখিবার উপায়স্বরূপ যেন লিখিতেছেন—তাঁহাদের যেন ধারণা—এ সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুস্কিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে উল্লিখিত গল্পগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার

কারণ এই, ঐগুলি যাঁহাদিগের সময়ে লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত নাই—আর যা একটু আধটু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি তখন দেখিতে পাই, তাঁহারা উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

৪। ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতু উপাখ্যানের আক্ষরিক অনুবাদ।

শ্বেতকেতু অরুণের পৌত্র ছিলেন। তাঁহাকে পিতা বলিলেন, "শ্বেতকেতো, গুরুগৃহে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য কর। হে সৌম্য, আমাদের বংশে বেদপাঠ না করিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত পতিত ব্রাহ্মণ তুল্য হয় নাই।"

তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় গুরুগৃহে গিয়া চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক হইলে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া গর্ব্বিত, পণ্ডিতম্মন্য ও অবিনীত-স্বভাব হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে গর্ব্বিত, পণ্ডিতম্মন্য ও অবিনীতস্বভাব হইয়াছ, তুমি কি সেই উপদেশ, সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?

"যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অচিন্তিত চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয় ?"—"ভগবন্, এইরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?"

"হে সৌম্য, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়—বিকার বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নামমাত্র, মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।

"হে সৌম্য, যেমন একটী সুবর্ণপিণ্ডকে জানিলে সুবর্ণনির্ম্মিত সকল বস্তুকে জানা হয়—বিকার বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নামমাত্র, সুবর্ণ—ইহাই সত্য।

"হে সৌম্য, যেমন একটী নরুণের জ্ঞান হইলেই ইস্পাতনির্ম্মিত সকল পদার্থকে জানা হয়, বিকার বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নাম-মাত্র, ইস্পাত—ইহাই সত্য। হে সৌম্য, সেই উপদেশও এইরূপ।"

"নিশ্চিতই আমার সেই পূজনীয় গুরুগণ ইহা জানিতেন না।

যদি ইহা জানিতেন, তবে আমাকে কেন বলিলেন না? পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বলুন।"

পিতা বলিলেন,

"হে সৌম্য, আচ্ছা, তাহাই হউক।"

"হে সৌম্য, ইহা অগ্রে এক দ্বিতীয়রহিত অস্তিস্বরূপ মাত্রই ছিল। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, ইহা অগ্রে এক দ্বিতীয়রহিত নাস্তিস্বরূপ-মাত্রই ছিল। সেই নাস্তিস্বরূপ হইতে অস্তিস্বরূপ জন্মিয়াছে।

"কিন্তু হে সৌম্য, এরূপ কিরূপে হইতে পারে? নাস্তি হইতে অস্তিস্বরূপ জন্মাইবে কিরূপে? হে সৌম্য, ইহা পূর্ব্বে এক দ্বিতীয়-রহিত অস্তিস্বরূপই ছিল।

"তাহা আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া জন্মাই। তাহা তেজ সৃষ্টি করিল। সেই তেজ আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া জন্মাই—তাহা জল সৃজন করিল। সেইজন্য যেখানে কেহ শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, তেজ হইতেই সেই জল জন্মিয়া থাকে।

"সেই জল আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া জন্মাই। তাহা অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি করিল। সেই জন্যই যে কোন স্থানে বৃষ্টি হয়, সেখানেই প্রচুর অন্ন হয়—জল হইতে সেই আহার্য্য অন্ন জন্মিয়া থাকে।"

"সেই এই প্রাণিগণের তিন প্রকার বীজ আছে—অণ্ডজ, জীবজ (জরায়ুজ) ও উদ্ভিজ্জ।

"সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, আচ্ছা, আমি এই তিন দেবতার ভিতর জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকাশ করি।

"তাহাদের এক একটীকে ত্রিতয়াত্মক করি। (এই সংকল্প করিয়া) সেই এই দেবতা ঐ তিন দেবতার ভিতর এই জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকাশ করিলেন।

"তাহাদের এক একটীকে ত্রিতয়াত্মক করিয়াছিলেন। হে সৌম্য,

এই তিন দেবতা ত্রিতয়াত্মক ত্রিতয়াত্মক হইয়া যেরূপে এক একটী হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অবগত হও।"

"অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেল—বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"সূর্য্যের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। সূর্য্যের সূর্য্যত্ব চলিয়া গেল, বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"চন্দ্রের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। চন্দ্রের চন্দ্রত্ব চলিয়া গেল। বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্লরূপ, তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব চলিয়া গেল। বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"এই বিষয়টী জানিয়াই পূর্ব্বকালীন মহাবৈদিক মহাগৃহস্থগণ বলিয়াছিলেন, কেহ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অশ্রুত, অচিন্তিত ও অবিজ্ঞাত বিষয় কিছু বলিতে পারিবে না। এইগুলি (এই তিনটি—লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ) হইতেই তাঁহারা সমুদয় তত্ত্ব জানিয়াছিলেন।

"যেটী লোহিত বর্ণ, তাহা তেজের রূপ বলিয়া তাঁহারা জানিয়াছিলেন। যাহা শুক্লবর্ণ, তাহা জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা অন্নের (পৃথিবীর) রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন।

"যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়, তাহা এই দেবতাগুলির (তেজ,

জল ও পৃথিবীর) সমষ্টি বলিয়া জানিয়াছিলেন। হে সৌম্য, এই তিন দেবতা পুরুষের শরীরে যাইয়া এক একটী যেরূপে তিন তিন রূপ হয়, তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে জান।"

"অন্ন ভক্ষিত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে—তাহার যে স্থূলতম অংশ, তাহা বিষ্ঠা হয় ; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা মাংস হয় ; যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মন হয়।

"জল পীত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে,—তাহার যে স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয় ; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা রক্ত হয় ; যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা প্রাণ হয়।

"তেজ (তৈল ঘৃতাদি) ভক্ষিত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে তাহার যে স্থূলতম অংশ, তাহা অস্থি হয় ; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা মজ্জা হয় ; যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা বাক্য হয়।

"হে সৌম্য, মন অন্নবিকার প্রাণ জলবিকার ও বাক্য তেজোবিকার।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমাকে এই বিষয় বুঝাইয়া দিন।"

"আচ্ছা সৌম্য", পিতা বলিলেন।

"দধি মথিত হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উঠে, তাহা ঘৃত হয়।

"এইরূপই হে সৌম্য, অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ তাহা ঊর্দ্ধে উঠে, তাহা মন হয়।

"জল পীত হইলে, তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ, তাহা উপরে উঠে, তাহা প্রাণ হয়।

"তেজ (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি) ভক্ষিত হইলে, তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ, তাহা উপরে উঠে, তাহা বাক্য হয়।

"হে সৌম্য, মন নিশ্চিতই অন্নবিকার, প্রাণ নিশ্চিতই জলবিকার ও বাক্য নিশ্চিতই তেজোবিকার।"

"হে ভগবন্, আমাকে পুনরায় এই বিষয়ে উপদেশ করুন।" "আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, পুরুষ ষোড়শ অংশযুক্ত—পনর দিন খাইও না, যত ইচ্ছা জল পান কর, জলপান করিলে প্রাণ ত্যাগ হইবে না।"

তিনি পনর দিন খাইলেন না—তার পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন—"হে পিতঃ, কি বলিতে বলেন?" "হে সৌম্য, ঋক্, সাম, যজুর্মন্ত্র সকল বল।" তিনি বলিলেন, "পিতঃ, আমার কিছুই মনে পড়িতেছে না।"

তাঁহাকে বলিলেন, "হে সৌম্য, যেমন কাষ্ঠসমূহের দ্বারা উপচিত প্রবল অগ্নির খদ্যোতপ্রমাণ (জোনাকি পোকার মত ক্ষুদ্র) একখানা অঙ্গার পড়িয়া থাকিলে তদ্দ্বারা বহু বস্তু দগ্ধ করা যায় না, সেইরূপই হে সৌম্য, তোমার ষোড়শকলার এক কলা বাকি আছে, সুতরাং ইদানীং সেই একটা মাত্র কলার দ্বারা তোমার বেদের মন্ত্রগুলি মনে পড়িতেছে না। খাও—তবে আমার উপদেশ সব বিশেষরূপে জানিতে পারিবে"।

তিনি খাইলেন পরে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পিতা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাই বলিতে পারিলেন।

তাঁহাকে পিতা বলিলেন, "হে সৌম্য, যেমন বহু কাষ্ঠ দ্বারা উপচিত প্রবল অগ্নির খদ্যোতপ্রমাণ অঙ্গার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপর তৃণ দিলে অনেক অগ্নি হইয়া জ্বলিয়া উঠে তখন উহা দ্বারা অনেক বস্তুকে দগ্ধ করা যায়—

"হে সৌম্য, এইরূপ তোমার ষোড়শ কলার মধ্যে একটী কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল—তাহাতে অন্ন দেওয়াতে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহা দ্বারাই এখন বেদের মন্ত্র সকল স্মরণ করিতে পারিতেছ। হে সৌম্য, মন অন্নবিকার, প্রাণ জলবিকার ও বাক্য তেজোবিকার।"

এইরূপে শ্বেতকেতু পিতার উপদিষ্ট বিষয় বুঝিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিলেন।

অরুণের পুত্র উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "হে সৌম্য, আমার নিকট সুষুপ্তির তত্ত্ব অবগত হও। পুরুষ যে সময়ে (গাঢ়ভাবে সুষুপ্ত হইয়া) 'স্বপিতি' (গাঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়াছে)—এই নাম প্রাপ্ত হয়, তখন সে সতের সহিত মিলিত হয়,—'স্ব'তে (নিজেতে) 'অপীত' (গত) হয়—সেই তাঁহাকে 'স্বপিতি' বলা হয়, যেহেতু তিনি তখন 'স্ব'তে 'অপীত' হন। (স্ব+অপীত=স্বপিতি।)

"যেমন কোন সূত্রের দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ কোন পক্ষী চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যত্র আশ্রয়প্রাপ্ত না হইয়া সেই বন্ধন স্থানেই ফিরিয়া আসে, হে সৌম্য, এইরূপেই সেই মন নানাদিকে ঘুরিয়া অন্যত্র আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণকেই (পরমাত্মাকেই) আশ্রয় করে। হে সৌম্য, মনের বন্ধন-স্থান প্রাণ (পরমাত্মা)।

"হে সৌম্য, অশনা পিপাসার তত্ত্ব (অশনা—খাইবার ইচ্ছা—ক্ষুধা, পিপাসা—পানের ইচ্ছা—তৃষ্ণা) আমার নিকট অবগত হও। যখন পুরুষের 'আশিশিষতি' (খাইবার ইচ্ছা করিতেছে) এই নাম হয় জলই অশিত বস্তুকে লইয়া যায়। যেমন গোপালকে গো-নায় বলে, অশ্বসমূহের নেতাকে অশ্ব-নায় বলে, পুরুষদিগের নেতাকে পুরুষ-নায় বলে, সেই জলকে (খাদ্যদ্রব্যের নেতা বলিয়া) অশ-নায় বলে। হে সৌম্য, সেই স্থলে এই (দেহরূপ) অঙ্কুর বা কার্য্য রহিয়াছে—ইহার মূল বা বীজ কিছু নাই—এমত হইতে পারে না।

"অন্ন ব্যতীত তাহার মূল কি হইতে পারে? এইরূপ হে সৌম্য, অন্নরূপ অঙ্কুর বা কার্য্যের দ্বারা তাহার মূল বা বীজ জলের অন্বেষণ কর। হে সৌম্য, জলরূপ কার্য্য বা অঙ্কুর দ্বারা তাহার মূল বা বীজ তেজের অনুসন্ধান কর। তেজোরূপ কার্য্য বা অঙ্কুর দ্বারা, হে সৌম্য, তাহার মূল বা বীজ সতের অনুসন্ধান কর। হে সৌম্য, এই সমুদয় প্রাণীর মূল কারণ সৎ; সৎ উহাদের আশ্রয়, এবং সৎই উহাদের লয় স্থান।

"আর যখন পুরুষের 'পিপাসতি' (জলপান করিতে ইচ্ছা করিতেছে) এই নাম হয়, তখন তেজই সেই পানীয় জলকে লইয়া যায়

(শুষ্ক করিয়া ফেলে) ! যেমন গো নেতা, অশ্ব-নেতা ও পুরুষ নেতাকে যথাক্রমে গো-নায়, অশ্ব-নায় ও পুরুষ-নায় বলে, এইরূপই সেই তেজকে উদন্যা (উদ অর্থাৎ জলকে লইয়া যায় বা শুষ্ক করে) বলে। হে সৌম্য, এস্থলে এই যে অঙ্কুরস্বরূপ কার্য্য (শরীর) উৎপন্ন হইয়াছে, জানিও—ইহার মূল বা বীজ নাই, তাহা কখন হইতে পারে না।

"তাহার আর জল ব্যতীত কি মূল হইতে পারে? হে সৌম্য, জলরূপ অঙ্কুর বা কার্য্য দ্বারা তাঁহার মূল বা বীজ তেজের অনুসন্ধান কর হে সৌম্য, তেজোরূপ অঙ্কুর বা কার্য্য দ্বারা তাহার মূল সতের অনুসন্ধান কর। হে সৌম্য, এই সমুদয় প্রাণীর মূল সৎ, সৎই উহাদের আশ্রয়, উহাদের পরিণামে অবস্থিতি সতে। হে সৌম্য, এই তিন দেবতা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যেরূপে এক একটী ত্রিতয়াত্মক হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হে সৌম্য, এই পুরুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার বাক্য মনে লয় হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় তদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, আমায় এবিষয় পুনরায় উপদেশ করুন।"

"আচ্ছা, সৌম্য", —তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, মধুকরগণ যেমন মধু প্রস্তুত করে, নানাপ্রকার বৃক্ষের রস সংগ্রহ করিয়া সমুদয় রসকে একটী রসে পরিণত করে।

"সেই বিভিন্ন রসসমূহ যেমন সেই একত্বপ্রাপ্তাবস্থায় আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস—এরূপ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারে না, হে সৌম্য, এইরূপেই এই সমুদয় প্রাণী সতে মিলিত হইয়াও আমরা সতে মিলিত হইয়াছি, এইরূপ জানিতে পারে না।

"তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক, যে যাহা ছিল, সুষুপ্তি আদির অবসানেও তাহাই হয়।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয়ই এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"ভগবন্, পুনরায় আপনি আমাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য", তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, এই পূর্ব্বদিকস্থ নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিমদিকস্থ নদীসমূহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সমুদ্র হইতে সমুদ্রেই যায়, সমুদ্রই হয়, তাহারা যেমন তথায় আমি অমুক, আমি অমুক, তাহা বুঝিতে পারে না।

"এইরূপই হে সৌম্য, এই সকল প্রাণী সৎ হইতে আসিয়া, সৎ হইতে আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক, যাহা যাহা ছিল, তাহা হইতে আসিয়াও তাহাই থাকে।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয়ই এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্; পুনরায় আমায় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা", সৌম্য, তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, এই প্রকাণ্ড বৃক্ষটীর মূলে যদি কেহ আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়; যদি উহার মধ্যদেশে কেহ আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়; আর যদি কেহ উহার অগ্রদেশে (ডগায়) আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই উহা হইতে রস নিঃসৃত হয়। উহা জীবাত্মা দ্বারা পূর্ণ বলিয়া পুনঃ পুনঃ রস পান করিয়া আনন্দে অবস্থান করে।

"যদি জীব উহার একটী শাখাকে ত্যাগ করে, তবে সে শুষ্ক হয়, দ্বিতীয় শাখাকে জীব ত্যাগ করিলে পর তাহা শুষ্ক হয়, তৃতীয় শাখাকে ত্যাগ করিলে পর তাহা শুষ্ক হয়, সমুদয় শাখাকে যদি ত্যাগ করে, তবে সমুদয় শুষ্ক হয়।"

তিনি বলিলেন, "হে সৌম্য, এইরূপই জানিও—জীবশূন্য হইলেই এই দেহ মৃত হয়, জীব কখন মরে না।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় এই বিষয় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য", তিনি বলিলেন।

"ঐ বটবৃক্ষ হইতে তাহার ফল লইয়া আইস।"

"ভগবন্, এই আনিয়াছি।"

"উহা ভাঙ্গ।"

"ভাঙ্গিয়াছি, ভগবন্!"

"কি দেখিতেছ?"

"এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ, ভগবন্!"

"উহাদের মধ্যে একটী ভাঙ্গ দেখি, বৎস!"

"ভাঙ্গিয়াছি, ভগবন্!"

"কি দেখিতেছ?"

"কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, ভগবন্!"

তাহাকে বলিলেন,—

"হে সৌম্য, এই যে সেই অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তুকে দেখিতে পাইতেছ না, হে সৌম্য, এই সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যেই মহান্ বটবৃক্ষ রহিয়াছে—হে সৌম্য, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় এই তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"এই লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।"

সে তাহাই করিল। তাহাকে তিনি বলিলেন,—

"রাত্রে যে লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস।"

সে উহা খুঁজিয়া পাইল না।

"হে বৎস, উহা জলে বিলীন হইয়া আছে—এক পাশ হইতে একটু লইয়া খাইয়া দেখ—কিরূপ ?

"লবণাক্ত।"

"মাঝখান হইতে খাইয়া দেখ—কিরূপ ?"

"লবণাক্ত।"

"নীচের দিক্ হইতে একটু খাইয়া দেখ—কেমন ?"

"লবণাক্ত।"

"ইহা ফেলিয়া দিয়া আমার কাছে এস।"

সে তাহাই করিল—ঐ লবণ বরাবরই ছিল। তাহাকে বলিলেন, "হে সৌম্য, সৎকে এখানে দেখিতে পাইতেছ না—এইখানেই রহিয়াছে। সেই যে এই সূক্ষ্মবস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় এই বিষয় উপদেশ দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য" -তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, যেমন কোন লোককে গন্ধার দেশ হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আনয়ন করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন সেখানে পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, দক্ষিণমুখ বা পশ্চিমমুখ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে—আমাকে চোক বাঁধিয়া এখানে আনিয়াছে, চোক বাঁধিয়া এখানে ছাড়িয়া দিয়াছে।

"তাহার যেমন বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলে, গন্ধার এই দিকে—এই দিকে যাও। সে এই উপদেশ পাইয়া এবং উক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হইয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গন্ধারেই গিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপ তত্ত্ব-

জ্ঞান বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহার আচার্য্য আছে, সেই ব্যক্তিই তত্ত্ব জানিতে পারেন। তাঁহার ততদিনই বিলম্ব, যত দিন না দেহ-পাত হয়, তার পরই ব্রহ্মে মিলিত হন।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক—তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, আমাকে পুনরায় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তাহার জ্ঞাতিরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বলে, আমাকে চিনিতে পারিতেছ?—আমাকে চিনিতে পারিতেছ? যতক্ষণ না তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লয় হইতেছে, ততক্ষণ চিনিতে পারে।

"আর যখন তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লয় হয় তখন আর চিনিতে পারে না।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক—তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, লোকের হাত বাঁধিয়া লইয়া আসে—বলে—এ অপহরণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে ইহার জন্য কুঠার তপ্ত (গরম) কর। সে যদি সেই চৌর্য্যের কর্ত্তা হয়, তবে মিথ্যা কথা বলিয়া মিথ্যা দ্বারা আত্মাকে আবরণ করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে—সে পুড়িয়া যায়, তাহাকে মারিয়া ফেলে।

"আর সে যদি তাহা না করিয়া থাকে, তবে সে চুরি করে নাই বলিলে নিজে সত্যের আশ্রয়েই থাকে। সত্য দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে—সে দগ্ধ হয় না—তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

"যেমন সে সেই অবস্থায় দগ্ধ হয় না; সেইরূপ জ্ঞানীরও বন্ধন হয় না)। এই সমুদয়ই এতদাত্মক,—তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো তুমি সেই।"

তাঁহার এই উপদেশ বাক্যে বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন।

৫। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

এক্ষণে আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত তৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করিব, কারণ, পাঠকবর্গ দেখিবেন, এইটী শুধু পাঠ করিলে মোটামুটি একটা ভাব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সকল স্থলে ভাব স্পষ্ট নহে। অনেক স্থলে দৃষ্টান্তগুলি কি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝা যায় না, অর্থাৎ শ্বেতকেতুর মনে কি ভাবের উদয় হওয়ায় পিতা পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন, তাহা পারস্কার বুঝা যায় না। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল স্থলে শ্বেতকেতুর মনোভাব অনুমান করিয়া তাঁহার মনের সন্দেহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই তাৎপর্য্য প্রকাশে অনেক স্থলে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিব এবং স্থানে স্থানে নিজের সহজ বুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হইব।

প্রথমে যেরূপ ভাবে পিতা শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমুদয় উপনিষদের এক লক্ষ্য—এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা।

যদি বাস্তবিক এই জগতের উপাদান কারণ এক সৎস্বরূপ হয়, তবে সেই সতের জ্ঞান হইলেই সমুদয় জগতের জ্ঞান হইবে না কেন?

এই সৎ বস্তু যে সাংখ্যকল্পিত প্রকৃতি বা প্রধানের ন্যায় অচেতন বা জড় নহে, তাহা তিনি বহু হইবার আলোচনা করিলেন—এই আলোচনা হইতেই ভাষ্যকার অনুমান করিয়াছেন এবং ব্যাসসূত্রেও 'ঈক্ষতের্না-শব্দং', সূত্রে ইহা সূচিত হইয়াছে। তার পর যথাক্রমে তেজ, জল ও পৃথিবী তত্ত্বের সৃষ্টির কথা। সাধারণতঃ শাস্ত্রে আকাশ ও বায়ুকে লইয়া পঞ্চভূতের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে তিন ভূতের উল্লেখ কেন?

ইহার প্রধান উত্তর এই যে, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান কোন শ্রুতিরই অভিপ্রেত নহে—সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণার মূল লক্ষ্য এই—সৃষ্টি হইতে মানবমনকে আকৃষ্ট করিয়া স্রষ্টার অভিমুখীন করা দেখান যে, নামরূপে বহু হইলেও মূলতঃ সব এক পদার্থমাত্র। অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া উহারা যে তেজ, জল ও পৃথ্বী বই কিছুই নয়, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা। সুতরাং সমুদয়ই ঐ তিন তত্ত্বের পরিণাম জানিলেই আমরা যে সকল বস্তুর সহিত কোন কালে পরিচিত নহি, তাহাদেরও জ্ঞান স্বতঃই হইয়া গেল আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা রহিল না। সেই তিনটী তত্ত্ব হইতে কিরূপে বাহ্য ও অধ্যাত্ম সমুদয় বিষয়ের উৎপত্তি, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আবার প্রতিলোমপ্রণালীক্রমে দেহের কারণ অন্ন (পৃথিবী), পৃথিবীর কারণ জল, জলের কারণ তেজ ও তেজের কারণ সৎ—ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে এইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে মনকে জড়—জড়ের এক প্রকার সূক্ষ্ম পরিণাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কিরূপ যত্ন করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিয়া রাখি যে, স্বামীজি যেমন বলিয়াছেন,—

"বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তি সকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূল তত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই।"

বিস্তারিত বর্ণনার ভিতর হয়ত আধুনিক বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অনেক কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মূল তত্ত্বের হানি কিছুতেই হইতে পারে না। কিরূপে সৎ হইতে ক্রমে তেজ জল ও পৃথ্বীতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তগুলি হয়ত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার স্থূল কথা এই যে, সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলের উৎপত্তি এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে যাইয়া সূক্ষ্মতমে লয়। আর এক কথা, এই তিন বা পাঁচ ভূতের কথাও আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের

বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই বিভাগের কারণ আলোচনা যদি করা যায়, তবে এই বিভাগকে একবারে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের বিষয়জ্ঞান লাভের দ্বার পাঁচটী মাত্র—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, তেজ, রস ও গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে এবং আলোচনা করিলে ইহাও কতকটা বোধ হয় যে, এই প্রত্যেকটীতে যেন ক্রমান্বয়ে এক একটী করিয়া গুণ বাড়িতেছে। এই আভাস হইতে সুধী পাঠক ত্রিবৃৎকরণ বা পঞ্চীকরণ রহস্য কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়।

আর একটী কথা উপদেশের প্রথমেই আছে—মূল কারণ সৎ অর্থাৎ অস্তিস্বরূপ অথবা অসৎ অর্থাৎ নাস্তিস্বরূপ—ইহার বিচার। ভাষ্যকার এই বিচারকে শূন্যবাদ খণ্ডন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থলে দেখিতে পাই, অসৎই পূর্ব্বে ছিল, ইহা কথিত হইয়াছে। অবশ্য ভাষ্যকার সে স্থলে অসৎ অর্থে নামরূপে অনভিব্যক্ত এক বস্তুকেই বুঝাইয়াছেন। এবং সে স্থল দেখিলে তাহাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, জগৎকারণের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তাহা যে একটা কিছু এই দিকেই ঝোঁক দিতে ভালবাসিতেন, যেমন আমাদের আলোচ্য উপনিষদ্‌টীতে. আবার কেহ কেহ এই নামরূপে বিভক্ত জগৎটীকে সাধারণ দৃষ্টিতে 'সৎ' বা 'আছে' এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কারণাবস্থায় যে তাহার নামরূপ নাই,—এই তত্ত্বটীই 'অসৎ' বা 'নাই' এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে ভালবাসিতেন যেমন তৈত্তিরীয়ে। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রয়োজন বা খেয়াল অনুসারে এই সকল শ্রুতি-বাক্যকে নিজ নিজ মতের পোষকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গিয়া সৎকারণ-বাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা লইয়া নানা বৃথা শব্দাড়ম্বরবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র উহার মূল আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে বিযুক্ত হইলে এই সকল অনর্থপরম্পরার উৎপত্তি হয়।

দৃষ্টান্তগুলির আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, শিষ্য যে বিষয়-গুলির সহিত বিশেষ পরিচিত, সেইগুলি হইতে আচার্য্য অজ্ঞাত তত্ত্বসমূহের আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বপ্নরহিত নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থার সহিত সকলেই পরিচিত। ঐ সুষুপ্তি অবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইতেছেন, যেমন উক্ত অবস্থায় বিশেষ বিশেষ নামরূপ কিছু থাকে না, সতের সহিত মিলন হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে অথবা প্রলয়াবস্থায়ও সতের সহিত মিলন হওয়ায় তদ্রূপ নাম রূপ কিছু থাকে না। উক্ত মিলিতাবস্থা এবং মিলিতাবস্থা হইলেও জীব কেন তাহা বুঝিতে পারে না তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন রস মিলিয়া মধু হওয়া অথবা নদীসমূহের সাগরে মিলিত হওয়ার দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে। কিন্তু একটী আশঙ্কা এই, সুষুপ্তি বা প্রলয় হইলেই যদি সকলেই সেই সতের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে এত চেষ্টা করিয়া জ্ঞান লাভের সার্থকতা কি?—এইটী বুঝাইবার জন্য তপ্ত পরশু গ্রহণ দ্বারা কেহ বাস্তবিক চুরি করিয়াছে কি না—এই trial by ordeal পরীক্ষার দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে অনেক দেশে এই পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। ইহা কুসংস্কারই হউক আর ইহার মধ্যে কিছু সত্যই থাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ইহার দ্বারা দৃষ্টান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একটী কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য কোন বিষয় প্রমাণ করা—তজ্জন্য তাঁহারা দৃষ্টান্তে কোন দোষ দেখাইতে পারিলে দৃষ্টান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়টীও ভুল প্রমাণিত হইল, মনে করেন। কিন্তু দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য তাহা নহে। অন্য প্রমাণ—যথা যুক্তি বা অনুভূতি দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণসিদ্ধ বোধ হইলে অপরের মনে উহাকে কতকটা সম্ভব (Plausible) বলিয়া ধারণা করাইয়া দিবার জন্যই দৃষ্টান্তের অবতারণা।

বটবীজের ও লবণের দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও কোন বস্তুর (এখানে জগৎকারণ সূক্ষ্মতম সৎবস্তুর) অস্তিত্ব যে অসম্ভাবিত নহে, তাহাই দেখান ঐ দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য।

গন্ধারদেশ হইতে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় আনীত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তত্ত্বজ্ঞান-লাভে আচার্য্যোপদেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপনার্থ। যখন বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরম দেবতায় লীন হয়, তখনই মৃত্যু হয় বলা হইতেছে। মৃত্যুরূপ ঘটনার এইরূপ বর্ণনা যাহা মৃত্যুকালীন মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে দেখা যায় তাঁহারই উল্লেখ মাত্র। দেখা যায়, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমে কথা বন্ধ হয়, তখনও তাহার চিন্তা চলিতে থাকে, চিন্তাগতি রুদ্ধ হইলেও শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, শেষে শ্বাসপ্রশ্বাসগতি রুদ্ধ-প্রায় হইলেও দেহে উষ্মা থাকে। ক্রমে সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে থাকে—হৃদয়ের নিকট একটু গরম থাকে। শেষে তাহাও চলিয়া গেলে মৃত্যু হয়, তখন জীব কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া যায়, কোন পরম দেবতায় মিলিত হয়। বস্তুতঃ প্রাত্যহিক পরিদৃষ্ট ঘটনা সুষুপ্তি, সাময়িক-পরিদৃষ্ট ঘটনা মৃত্যু এবং অনুমিত জাগতিক প্রলয়—এ সকলগুলিই মানবের চরমাবস্থা তত্ত্বজ্ঞানে যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাবস্থা হইয়া নামরূপের একেবারে অভাব হয়, এই ভাবটার আভাস দিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। জীব ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিতে জীবের মৃত্যু হয় না, ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ জ্ঞান না হইতেছে, ততক্ষণ সুষুপ্তি, মরণ বা প্রলয়ে জীবভাব বিলুপ্ত হয় না।

আর একটী বিষয় পাঠক এই উপনিষদ্‌টীর আক্ষরিক অনুবাদের ভিতর লক্ষ্য করিবেন যে—ইহাতে এক একটী বাক্যের পুনরুক্তি আছে। পুনরুক্তি সাধারণতঃ দোষ বলিয়া কথিত হইলেও এবং আধুনিক ব্যস্ততার যুগে ইহা লোকের বিরক্তিকর হইলেও প্রাচীন সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থেই পুনরুক্তি অনেক পাওয়া যায়।' আমরা পূর্ব্বেই একস্থলে বলিয়াছি, উপনিষদ্ শুধু পাঠের জিনিষ নহে, ধ্যানের বস্তু। বার বার এক বিষয় বলিলে ধ্যানেরই সাহায্য হয় এবং শিক্ষার ইহাই প্রাচীন প্রথা। ধ্যান অর্থে এক বিষয়ে বার বার মনকে ধারণ করা—ইহাতে ভাসা ভাসা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের গভীরতাই হয়। বেদান্তের 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রে এই তত্ত্বেরই একটু ইঙ্গিত আছে।

সমুদয় গল্পটী হইতে মূল শিক্ষা যাহা পাওয়া যায় তাহার কতক কতক উল্লিখিত হইতেছে ঃ—

জগতের মূল কারণ সৎ—অসৎ নহে এবং উহা চেতন। ঐ মূল কারণকে জানিতে পারিলে সমুদয় জগৎকে জানা হইল। কারণ, ঐ মূল কারণই নামরূপে প্রবিভক্ত হইয়া তেজ জল পৃথিবী আদি রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই আবার সমুদয় প্রাণীর বাহ্য দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

সেই সৎ জীবাত্মারূপে সকল প্রাণীতে অনুপ্রবিষ্ট—এই কারণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ অভিন্ন। জগৎকে পরমার্থদৃষ্টিতে কারণের সহিত অভিন্ন ভাবে দেখিলে উহা সত্য, নতুবা সৎকে ছাড়িয়া জগতের অস্তিত্ব নামমাত্র—মিথ্যা।

গুরূপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

জগৎকারণ সৎবস্তু অতি সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হইলেও উহার অস্তিত্বের অপলাপ করা যায় না।

সুষুপ্তি মরণাদির আলোচনা করিয়া নামরূপের অতীত সৎবস্তুর আভাসের জ্ঞান লাভ করিতে হয়।

সুষুপ্তি আদির সহিত তত্ত্বজ্ঞানাবস্থার পার্থক্য—অজ্ঞান ও জ্ঞান—ইত্যাদি ইত্যাদি।

৬। ইহার বর্ত্তমান উপযোগিতা।

এক্ষণে এই উপাখ্যানে উপদিষ্ট উপদেশের আধুনিক জীবনে উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমেই বুঝা উচিত, প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের মূল প্রয়োজনের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তখনও লোকে নানা বিভিন্ন লৌকিক বিজ্ঞান আলোচনান্তে শেষে এমন এক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা জগতের মূল উপাদানভূত পদার্থের জ্ঞান হইয়া জ্ঞানপিপাসা সম্পূর্ণ হইত। এখনও শুধু লৌকিক বিদ্যার প্রবল আলোচনা হইয়া লোকের মন তৃপ্ত হইতেছে না, লোকে সকল জ্ঞানের সার জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছে। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে চিন্তাশীল

মনীষিগণ এখনও সেই কি জানিলে সব জানা যাইবে, এই মূল সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। কারণ, প্রাচীন কালের মত মানুষ সেই মানুষই আছে। মানুষের মনের উপাদান তখনকারই মত এখনও জ্ঞানশক্তি, ভাবশক্তি ও কর্ম্মশক্তি লইয়া গঠিত। তখনকার মত এখনও মানুষ কামক্রোধাদি স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংযম, শ্রদ্ধা, বিবেক-বৈরাগ্যাদি স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তিরদ্বন্দ্বে অহর্নিশ ব্যস্ত ও কবে উহার অবসান হইয়া নির্ম্মল শান্তিসুখের অধিকারী হইবে, তজ্জন্য চিন্তিত। দেশকালপাত্রভেদে সামান্য বাহ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক সেই একইরূপ রহিয়াছে। এই কারণে শুধু প্রাচীন—এই অজুহাতে কোন তত্ত্বালোচনা, কোন গম্ভীর বিষয়ই উপেক্ষিত হইবার নহে। বিদ্যা শিখিয়া শ্বেতকেতুর ন্যায় পণ্ডিতম্মন্য হইবার দৃষ্টান্ত আমরা এখন ঘরে ঘরে দেখিতেছি—উদ্দালকের ন্যায় জ্ঞানী সাধু পিতার বিরলতা হইলেও এখনও অত্যন্তাভাব হয় নাই।

একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়, শ্বেতকেতু এতবার তত্ত্বমসি মহাবাক্যের উপদেশ পাইয়া শেষে কি অবস্থাপন্ন হইলেন? উপনিষদে অতি সংক্ষেপে কেবল এইটুকু আছে যে, তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি কি শুধু বুদ্ধিগম্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র লাভ করিলেন, না, উপলব্ধির দ্বারা তাঁহার অপরোক্ষানুভূতিও হইল? বাস্তবিক কি তাঁহার জগৎকারণের সহিত সম্পূর্ণ অভেদজ্ঞান হইয়াছিল? তিনি কি এই উপদেশ লাভের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন বা সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন?

এসকল প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে উপনিষদের অন্যান্য উপাখ্যান ও উপদেশাদির আলোচনা করিয়া প্রতীত হয় যে, শ্বেতকেতু পিতার উপদেশে যে জ্ঞানলাভ তখন করিলেন, তাহা অনেকটা পরোক্ষজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনায় জীবন কাটাইয়া খুব বার্দ্ধক্যাবস্থায় হয়ত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। উপনিষদে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের

কথা যাজ্ঞবল্ক্যাদি দুই একটী দৃষ্টান্ত ব্যতীত ও স্থানে স্থানে উহার উপদেশ ব্যতীত বড় অধিক পাওয়া যায় না। তখনকার কালে বোধ হয় জীবনসংগ্রাম তত প্রবল ছিল না অথবা জ্ঞানচর্চ্চার দিকে আগ্রহ সাধারণতঃ এত অধিক ছিল যে, জনকাদির ন্যায় একচ্ছত্র রাজার কার্য্য করিয়াও অনেকেই তত্ত্বজ্ঞান চর্চ্চার সময় করিয়া লইতেন—এককথায় তখন বোধ হয় plain living and high thinking এর দিকে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাঁহারা খুব বেশী অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ অধিক বয়সে যাজ্ঞবল্ক্যের মত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চিত ভাবে আজীবন সাধন করা তখনও অসম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক, শ্বেতকেতু সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সবই আনুমানিক। আমরা যদি এই উপাখ্যানে যে সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছি, তাহাদের ধারণার চেষ্টা করি, আমরা কিরূপ লাভবান্ হইব? সমগ্র জগতে একত্ব ও অখণ্ডত্ব, কার্য্য কারণের অভিন্নতা, জগৎকারণের সহিত আমার ব্যক্তিগত আমির একত্ব প্রভৃতি তত্ত্বচিন্তা ও প্রণিধান এবং উপলব্ধির চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভিতর ক্রমে ঘৃণাবিদ্বেষের ভাব একেবারে দূর হইয়া ক্রমে বিশ্বজনীন প্রেমের সঞ্চার হইবে—সমুদয় জগৎকে আমরা প্রেমের চক্ষে দেখিব—সবই আমাদের দৃষ্টিতে প্রেমপূর্ণ হইয়া যাইবে। ভেদজ্ঞানই অপ্রেমের মূল—অভেদজ্ঞান প্রেমের প্রস্রবণ। আর নিজের ব্রহ্মাভিন্নত্ব জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে আমাদের ভিতর মহাশক্তি মহাতেজোবীর্য্যের সঞ্চার হইবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহার প্রয়োগে মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিবে, মানসিক রাজ্যে মহামনীষী ও ভৌতিক রাজ্যে একজন মহাশক্তিধর পুরুষ করিয়া তুলিবে। যাঁহারা এই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তির বিরোধের আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বলি—যদি সেই আশঙ্কাই হয়, তবে দ্বৈতবাদমতে ব্যাখ্যা করিয়া তৎ ও ত্বম্ পদটীর ৫মী, ৬ষ্ঠী, ৭মী প্রভৃতি যে কোন বিভক্তি দিয়া সমাস করিয়া (যথা, তৎ ত্বম্ অসি—৬ষ্ঠী তুমি তাহার) ব্যাখ্যা করিয়া সেই ভাবই

গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে সেই ভাবের উৎকর্ষ সাধন কর—শেষে দেখিও, প্রেমের পরাকাষ্ঠায় আর কোন ভেদ রাখিতে পার কি না।

জ্ঞানী বিচারমার্গ দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া যে শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হন, ভক্ত ভক্তিপথে প্রেমের পরাকাষ্ঠায় সেই অদ্বৈততত্ত্বে না পঁহুছিয়া থাকিতে পারেন্ না। আধুনিক যুগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক।"

চিন্তা করিলে এই এক উপাখ্যান হইতেই এমন মনোহর তত্ত্বাদির অবতারণা করা যাইতে পারে যে, তাহার শেষ হয় না। কিন্তু স্থান সংক্ষিপ্ত। অতএব কষ্টস্বীকার করিয়া যাঁহারা এই প্রবন্ধপাঠ করিবেন, তাঁহাদের একজনও অন্ততঃ তৎকালে মূল উপনিষদ্ গ্রন্থ অধ্যয়নে আগ্রহ ও উৎসাহান্বিত হইবেন, এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই স্থানেই বিরত হইলাম।

রূপ-কথা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।)

"তার পর ?—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্—ও কি ডাক্‌ছে, মা ?"

"রাত ডাক্‌ছে।"

"কাকে ডাক্‌ছে ?—কেন ডাক্‌ছে, মা ?"

"অন্ধকার গভীর নিস্থতি রাতে রাত এমনি ডাকে।"

"কাকে ডাকে ?"

"কাউকে না—আপন মনে। এখন ঘুমো।"

"ঘুম যে আস্‌ছে না।—ওকি! অমন করে উঠ্‌লি কেন? মা—আমি আর ঘুমুবো না। তুই গল্প বল—ঐ যে—সেই চারদিক অন্ধকার!—সেই গল্প!—উঃ ভয় করছে!—হাঁ, ভয় করলেই এমনি

তুই আমার গায় হাত বুলিয়ে দিবি ।—তারপর—সেই অন্ধকার !—ঘুম পাচ্ছে, মা ।"

"ঘুমোও বাপ ।"

"তুই গল্প বল্‌তে থাক—আমি ঘুমোতে ঘুমোতে শুনি ।"

"ওই নীহারিকামণ্ডল—"

" 'তারপর'—বল ।"

"তারপর—ওই নীহারিকামণ্ডল—"

" 'নীহারিকামণ্ডল' কি ?—অমন শক্ত শক্ত বলিস্ কেন ? আমার কাণের কাছে তোর মুখ রেখে 'পুটু পুটু' ক'রে বল্, আর আমি চোখ বুজে 'হুঁ হুঁ' ক'রে শুনি—বল্ ।"

"চারিদিক অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—যে দিকে চাই, অন্ধকার—অন্ধকার—আর কোন কথা নেই—আর কোনো কিছু নেই ।"

"তুই ?"

"আমিও নেই ।"

"কোথায় নেই ?—লুকিয়েছিস্ বুঝি ? অন্ধকারের মধ্যে ?—এযে অন্ধকার ! কিছুই যে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—কোথায় তুই ?"

"এই যে, এই যে আমি ।—তার পর—"

"হুঁ—তার পর ? আলো কই ? দেখ্‌তে পাচ্ছিনে তোকে—আলো ?"

"আলো !—সেই অন্ধকার আকাশের মাঝখানে হঠাৎ আলো হয়ে উঠ্‌ল ।"

"সত্যি সত্যি !—তাই তো ! আলো !—চাঁদ উঠেছে !"

"চাঁদ নেই, শুধুই আলো—শুধু মাঝখানে আলো ! চারিদিক তেমনি আঁধার—যেন কাল মিশমিশে চুল ।"

"মুখের চারধারে ?—দেখি মা !"

"দূর পাগলা ছেলে !"

"কি সুন্দর তোর মুখ, মা !—আঃ—তার পর ?"

"তারপর—সেই আলোর মাঝখানে ধীরে ধীরে ছায়ার

মতো হলো। ক্রমে সেই ছায়া এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী হয়ে উঠ্‌লো।"

"'জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী' কি? তার নাম? ওঃ—তোর নাম বুঝি!"

"হা—হা—হা!—দূর পাগলা ছেলে!—সেই হচ্ছেন মা।"

"মা! কার মা? তুই তো মা! আচ্ছা তার ছেলে কই?"

"এই যে এই যে—"

"আঃ—তারপর?"

"তারপর—সেই মা আপনার ছেলেকে কোলে করে আকাশের মাঝখানে উদিত হলেন।"

"তার পর?"

"তার পর—সে কি আদর! সে কি হাসি! সে কি আনন্দ!"

"উঃ—আমায় ছেড়ে দে।—তার পর?"

"তার পর—সেই মা তাঁর কোলের ছেলেকে ছেড়ে দিলে।"

"তুইও যে আমায় ছেড়ে দিচ্ছিস্—তারপর?"

"তার পর—ছেলে মায়ের আঁচল ধরে ধীরে ধীরে নীচে এসে নাবলো।"

"কোথায়?"

"আমরা যেখানে আছি—এই মাটীতে।"

"কি করতে? খেলা করতে? হা—হা—হা—কি মজা! কি খেলা?"

"এই ছাই ভস্ম—"

"ঘুম পাচ্ছে মা—আমিও খেলবো—কি খেলা?"

"এই দৌড়াদৌড়ি, হুটোপুটি, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও অভিমান—মায়ের সঙ্গে।"

"কি খেলা?—বল্ না?"

"কি দুষ্টু ছেলে!"

"বল না? আমি খেলব।—তার পর?"

"তার পর—ছেলে বায়না ধরলে—খেলবে। মা তখন কি করে।

লাল, নীল, সবুজ, কাল, হল্‌দে, শাদা—কয়েকটি লাড্ডু ছেলেকে দিলেন। ছেলে তাই পেয়ে মহাখুসী - লাড্ডু পেয়ে মার কথা ভুলেই গেল। মা আর কি করে! ছেলেকে ফেলে তো আর যেতে পারে না। হঠাৎ এক বুড়ী এসে বল্‌ল "

"ডাইনী বুড়ী?"

"না—না—ডাইনী না।"

"কাঠকুড়ুনী? -কাঠকুড়ুনী'। 'কাঠকুড়ুনী—কি মা'?—'গাছ-তলাতে গুড়ি গুড়ি—মাথায় ঝাপটা সোনের নুড়ি—সন্ধ্যাবেলা হাতে চুপড়ি ওগো, তুমি কাদের বুড়ী?' মা,মা, ঐ—ঐ—বুড়ী আস্‌ছে—"

"কোথায় আস্‌ছে রে?"

"তুই যে বল্‌লি? বুড়ী—বুড়ী কি কচ্ছিল?"

"বুড়ী দাঁড়িয়ে ছেলেটি লাড্ডু খেল্‌ছিল- তাই দেখ্‌ছিল। দেখে হেসে বল্‌লে - ও ছেলে! কোথায় এসেছ? কোথায় যাবে? এ অজানা অচেনা দেশ! ওমা, তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে!—তুমি কাদের ছেলে গা? আহা! যেন রাজপুত্তুরটি"—

"বুড়ী ত খুব ভাল মা?—তার পর?"

"তার পর—বুড়ী বল্লে, 'ওগো, কথা কও। আ--হা—হা, সন্ধ্যা হয়ে এল—এখন সব রাক্ষস, ভূত পেত্নীরা চড়া বেড়াতে আস্‌বে'।—"

"ভয় কচ্ছে—ভয় কচ্ছে, মা!"

"ভয় কিসের?—বুড়ী বল্‌লে, এস বাছা, এ রাজ্যে আর কেউ নেই—কেবল আমি আছি, আর আমার অন্ধের নড়ী—ছয়টি ছেলে আছে। তোমার এই লাড্ডু কয়টি তাদের দিও, দিলে তারা তোমায় পেয়ে ভারী খুসী হবে। তুমি বাড়ী এস, তোমারই বাড়ী—এস যাদু।"

"তারা বুঝি রাক্ষস!—কি হবে?"

"বুড়ী ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে চল্‌ল কত কথা বল্‌তে বল্‌তে —রাস্তা ধরে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে এল,

বুড়ী ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে কিছু দূর গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী—ভূতের মতো, চারদিকে খাড়া উঁচু দেয়াল। বাড়ীতে ঢুকে বুড়ী বল্লে, 'এই আমাদের বাড়ী।' কত অন্ধকার কোটা পার হয়ে তারা চল্‌ল—চ'লে একটা প্রকাণ্ড ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অন্ধকার সেই ঘরে বুড়ী ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে স'রে পড়লো।"

"কোথায়?"

"বেরিয়ে গেল—কিন্তু দরজা জান্‌লা বন্ধ। ছেলেটি সেই অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে একেবারে ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেল। ভয়ে একরকম হয়ে গিয়ে লাড্ডু ছুড়ে ফেল্‌লে। যাই ফেলা, অমনি শুন্‌লে, সেই ঘরের বাইরে হো হোঁ ক'রে একসঙ্গে কা'রা বিকট হাসি হাস্‌ছে। সেই শুনে ছেলেটি ভয়ে একটা চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।"

"আমায় ধরে থাক্ মা!—তার পর, তার পর?"

"এমন সময় সেই অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠ্‌লো। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ছেলেটিকে বুকের ভেতর তুলে নিয়ে চুমো খেলেন। মায়ের যত্নে ছেলের মূর্চ্ছা ক্রমে ভেঙ্গে গেল। যাই ভেঙ্গে যাওয়া অমনি দেখ্‌লে—সেই বুড়ী— অন্ধকার ঘর আবার তেমনি অন্ধকার! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরের সব দরজাগুলো একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে খুলে গেল, আর বিকট হো হোঁ হোঁ হো হো হো শব্দে কতকগুলি ছায়ার মতো মূর্ত্তি ঝড়ের মতো ঘরের ভেতর এসে পড়ল!—"

"ভূত?"

"না—বুড়ীর ছেলেগুলো।—ঢুকেই ছেলেটির চারদিকে ঘিরে ঘিরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার একবার হো হো করে ভয়ানক একটা হাসি হেসে একসঙ্গে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে লোফালুফি খেল্‌তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নাচ্‌তে লাগল, আর হো হো কর্‌তে লাগল। এমনি কিছুক্ষণ ক'রে ছেলেটিকে পাষাণের উপর ধুপ্ ক'রে ফেলে দিয়ে আবার হো হো করে হেসে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘর থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। ছেলেটি সেই আছাড়ে মা মা ব'লে কেঁদে উঠ্‌লো।"

"মা—মা! না—না—অন্য গল্প বল, এ গল্প নয়।"

"কেন? ভয় কিসের বাপ? এই যে তুই আমার বুকে আছিস্।"

"কই—কই—কই তোর বুকে আছি?"

"এই যে—এই যে।"

"হাঁ—এই তো তুই—মা, এই তো তোর বুক। কই তোর মুখ কই? দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—হাঁ। তার পর?"

"তার পর—ভোর হ'ল, সূর্য্য উঠ্‌লো, ঘরের ভেতর আলো এসে পড়ল। ছেলেটি চোখ চেয়ে মিট্‌ মিট্‌ ক'রে আলো দেখ্‌তে লাগল—"

"আর কচি কচি হাস্‌তে লাগল।—কি সুন্দর মা, আলোক!—এখন তো রাত!—কখন সূর্য্যি উঠবে মা? কখন ভোর হবে?—উঃ রাত দুপুর!—তার পর?"

"তার পর—বুড়ী এসে তার প্রকাণ্ড চুপড়ীটায় ছেলেটিকে তুলে—সোনের ঝুড়ী বুড়ী গুটি গুটি মেরে ভূতের মতো বাড়ীটার বাইরে এল। এসে ছেলেটিকে ছেড়ে দিলে।"

"তার পর?"

"তার পর—কিছু দিন পরে ছেলেটি বুড়ীকে বল্‌লে, 'বুড়ী তুই কে?' বুড়ী বল্‌লে, 'আমি বুড়ী।' ছেলেটি বল্‌লে, 'তুই বুড়ী, আর আমি?' বুড়ী বললে, 'তুই রাজপুত্তুর'। ছেলেটি চম্‌কে উঠে বল্‌লে 'রাজপুত্তুর! তবে আমার মা বাবা কোথায়?' বুড়ী বল্‌লে, 'সে অনেক দূর!'"

"তবু শুনি।"

"অনেক দূর! এই যে রাস্তা গিয়েছে, যেতে যেতে একটা প্রকাণ্ড বন, সে বন—উঃ কি ভয়ঙ্কর!—বনের পর একটা ধূধূ মাঠ, সেই মাঠের পর একটা নদী—উঃ তাতে কি তোর!—খড়গাছ পড়লে ছিঁড়ে দু খানা হয়ে যায়! সেই নদী পার হয়ে তবে তোমার মার কাছে যাওয়া যায়।"

"হাঁ, আমি মার কাছে যাব। আমায় তুই সেখানে দিয়ে আয়।"

"আর একটু বড় হও, তার পর যাবে।"

"না বুড়ী, আমায় এখনই দিয়ে আয়।"

"বুড়ী তখন ভয় দেখিয়ে বল্লে, 'মো, সে কি কথা! ও সব কি কথা।' বলেই বুড়ী কট্‌মটিয়ে ছেলেটির দিকে চাইলে, ছেলেটি ভয়ে একেবারে এতটুকুখানি হয়ে গেল। বুড়ীকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হ'ল না। মনে মনে 'মার কাছে যাব—মার কাছে যাব' ব'লে কাঁদতে লাগল। এমনি ক'রে সেই ভূতের মতো বাড়ীতে ডাইনীর মতো বুড়ীর কাছে ছেলেটি কিছু দিন রইল। রাজপুত্তুর আরও একটু বড় হইল। একদিন বুড়ী বল্‌ল, 'রাজপুত্তুর, তুমি রাজা হবে।' রাজপুত্তুর বল্‌ল, 'কোথাকার?' বুড়ী বল্লে, 'এ দেশের। আমার ছেলেরা তোমার পাত্তোর, মিত্তির, উজীর, নাজীর সেনাপতি হবে। তুমি তখন যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। বড় বড় নগর তৈরী কর্‌তে পারবে। দেশ বিদেশের ধন-দৌলত মণি মাণিক্যে তোমার রাজপুরী ভ'রে যাবে। তখন এক পরম সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। রাজকন্যার হাজার হাজার পরীর মতো দাসী থাক্‌বে। নাচ, গান, আমোদ আহ্লাদে মহাসুখে রাজত্ব কর্‌বে।' রাজপুত্তুর বুড়ীর কথা শুনে বল্লে, 'না—না—আমার রাজা হয়ে কাজ নেই, ধন-দৌলত মণি-মাণিক্যে কাজ নেই, রাজকন্যায় কাজ নেই, পরীর মতো দাসীতে কাজ নেই—আমি মার কাছে যেতে চাই।'

রাজপুত্তুরের 'না—না' শুনে বুড়ী প্রথমে কট্‌মটিয়ে উঠ্‌লো; তার পর একগাল হেসে বল্লে, 'পাগল! মা কোথা? একদিন ব'লেছিলুম বুঝি? আর সে যে মিথ্যে মিথ্যে বলেছি—তুমি ছোট ছিলে কিনা। ছোট ছেলেরা রূপ-কথা শুন্‌তে ভালবাসে কিনা—তাই রূপ-কথা বলেছি। এখন বড় সড় হয়েছ, বুদ্ধি সুদ্ধি হয়েছে, এখনো কি রূপ-কথা শুন্‌তে ভাল লাগে! পোড়া কপাল! সেই আষাঢ়ে গল্প সত্যি ভেবে বসে আছ। —মিথ্যা—মিথ্যা—ছেলেভুলনো মিথ্যা কথা—রূপ-কথা।'

'না বুড়ী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মিথ্যে কথা নয়। আমার মন যেমন কচ্ছে, মার কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে!'

'মা কে রে!—তাকে কি তুই দেখেছিস্?'

'দেখেছি, বুড়ী, দেখেছি—একদিন স্বপ্নে—ঐ যে দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।'

'স্বপ্নে!—হা—হা—হা—স্বপ্নে যত কি দেখা যায়, কখনো আকাশে উড়েছি, কখনো রাজা হয়েছি, কখনো বাঘে তাড়া কচ্ছে, কখনো ম'রে গেছি—কেমন, এ সব দেখ না?'

'দেখি।'

'তবে আর কি!'

'না—না—আমার মাকে দেখেছি। সে যদি স্বপ্ন হয়, তবে এই যে তোর বাড়ীতে আছি, এই যে সব দেখছি, তোকে দেখছি—আর এই যে তুই সব রাজা করবি না কি করাবি, বলছিস্—এও স্বপ্ন।—এতো—স্বপ্ন!—এই স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নই সত্য।'

বুড়ী তখন চোখ পাকিয়ে রাজপুত্তুরের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। তার পর মুখ হাসি হাসি ক'রে বল্লে, 'আহা, কি হবে। বাছার আমার অসুখ করেছে—স্বপ্নে পেয়েছে! একটা অষুধ—আজ রাত্রে শোবার আগে খেয়ে এখন আর কোনো উৎপাৎ থাক্‌বে না—বেশ ঘুম হবে। যদি বা কোন স্বপ্ন দেখ, যা সত্যি ঠিক্ ঠিক্ মিলে যাবে, এমন স্বপ্ন দেখ্‌বে।'

রাত হ'ল। বুড়ী কাঠের মতো শক্ত একটা পাত্তোরে খানিকটা অষুধ রাজপুত্তুরকে খাইয়ে দিলে। খেয়ে রাজপুত্তুর বললে, 'বুড়ী, আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে।'

বুড়ী হেসে বল্‌লে, 'ঐ তো অষুধের গুণ! খেলেই ঘুম পায়! সবটা খাও, যাদু!'

বুড়ীর কথায় রাজপুত্তুর সবটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল্‌লে। খেয়েই ঢুল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ঢুলে ঢুলে ঢলে পড়ল। বুড়ী তখন পাত্তোরটা পাষাণের মত মেঝেতে তিনবার হা—হা—হা—ক'রে ঠুকে হো—হো—

ক'রে হেসে উঠ্‌লো। সমস্ত ঘরটা হাসিতে যেন ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লো। হাসি শুনে বুড়ীর ছেলেগুলো ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে ঢুকলো। ঢুকে রাজপুত্তুরের চারধারে হাত ধরাধরি ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। খানিকক্ষণ নেচে চলে গেল। বুড়ী তখন ঘুমন্ত রাজপুত্তুরের শিয়রে বসে একদৃষ্টে রাজপুত্তুরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর বিড় বিড় করে কি বক্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ বিড় বিড় ক'রে তার পর গম্ভীরস্বরে বল্‌লে,

'রাজপুত্তুর!'

রাজপুত্তুর ঘুমের মধ্যেই উত্তর দিলে,

'হুঁ'

বুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে,

'বল দেখি, আমি কে?'

'তুই ডাইনী বুড়ী।'

'আমায় মা বল্‌, নইলে তোর নিষ্কৃতি নেই।'

'না—আমার মা এক মা, অন্য মা নেই।'

'ঠিক্‌—কিন্তু আমাকেও 'মা' না বল্‌লে, আমাকে তুষ্ট না কর্‌লে আমার হাত হ'তে কেউ এড়াতে পারে না।'

'না—তুই ডাইনী। ডাইনী ডাইনী, ডাইনী কি মা হয়?'

'না-ই বা হ'ল, হেলা ক'রে একবার মা বল্‌ না।'

'না—তুই আমায় কত কষ্ট দিচ্ছিস্‌—মার কাছে যেতে দিচ্ছিস্‌ নে।—এই তোর কাজ, তুই ডাইনী। তোর ইচ্ছে আমায় এমনি করে রাখিস্‌।'

'না—ইচ্ছে নয়? তবে এই আমার কাজ।'

'ইচ্ছে নয়; তবে করিস্‌ কেন?'

'মজা করবার জন্যে।'

'তুই রাক্ষসী!'

'আমি রাক্ষসী মা।'

'রাক্ষসী মা! সে কেমন মা?'

'যেমনই হোক, একবার বল না ?—বল, আমি আর তোর দুঃখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—মা বল !'

'বল্‌লুম।'

'বল্‌লি—খুসী হ'য়েছি—হা হা হা এখন আমার কাজ—শুধু দেখ্‌বি—আমি খুসী হয়েছি—দেখেই ছুটি—কিন্তু তখনও আমি তোকে বাঁধতে পিছু পিছু ছুটব—'

'তুই যা পারিস্‌, করিস্‌—তোকে আমার ভয় নেই—তুই যতই ভয় দেখাস্‌ না কেন।'

'হা—হা—হা—কি আনন্দ! ডাইনীকে সবাই ভয় করে—ভয় করে আর আমার বুকে বাজে !—রাজপুত্তুর !'

'কি ?'

'আমার সঙ্গে এস।—না—না—ঐ দেখ—ঐ দেখ—কি দেখ্‌ছ ?'

'আগুন—দাউ দাউ জ্বল্‌ছে। আগুনের শিখায় শিখায় কালো কালো ছায়ামূর্ত্তি—অসংখ্য—নাচ্‌ছে—উঃ কি ভয়ঙ্কর! ঐ আমায় ডাক্‌ছে—ভয় করছে। ডাইনী, ভয় করছে !'

'আবার দেখ।'

'এ কি ! কোথায় আগুন ? এ যে পরীর রাজ্য !—কি সুন্দর ! মণি মুক্তা পাথরের পুরা—কি সুন্দর ! কি জ্যোতিঃ।—কি সুন্দর থরে থরে ফুলের মালা—ফুলের তোড়া ঝিকি মিকি পাথরের উপরে ছড়ানো—থরে থরে সাজানো। পরীর মন্দির—কি সুন্দর।—ফুলে ফুলে নাচ্‌ছে—পরীরা হাত ধরাধরি ক'রে। নাচ্‌ছে—ঘুর্‌ ঘুর্‌ ঘুর্‌। সোনার আঁচল যেন হাজার পদ্মের পাপ্‌ড়ী—উড়্‌ছে—ফুর্‌ ফুর্‌ ফুর্‌। সবুজ—নীল—লাল—সোনালি—আলো—থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌ছে—উজ্জ্বল, আরো উজ্জ্বল হল। ঐ যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে থম্‌কে দাঁড়াল—এক সঙ্গে সবাই মাথা নীচু করলে।—ঐ যে আলোর পুরীর দরজা খুলে গেল—কে এ ? সুন্দর !—কে এ ?—পরীর রাণী !—এত সুন্দর ! ধীরে ধীরে ধীরে ঐ যে এসে দাঁড়াল। ও কি ! আমার মুখে এক-দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ! হাতে ফুলের মালা—আমার দিকে তুলে ধরেছে।'

'রাজপুত্র, এই রাজ্য—অনন্ত ঐশ্বর্য্য • অনন্ত সৌন্দর্য্য—অনন্ত সুখ—রাজা হবে? বল—না', বল।'

'কেন ডাইনী?'

'আমায় 'মা' বলেছ যে!'

'যদি না বল্‌তুম?'

'তবে এ সব তোমার হ'ত।'

"তুই ডাইনী!—ঐ দেখ, সে আমারি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে ও কি!—কি বল্‌ছে?—'পান কর'—মৃদু মৃদু হাসি—আবার সেই কথা,—'পান কর'—আমায় ডাক্‌ছে দুহাত বাড়িয়ে—'এস রাজপুত্তুর'—উঃ কি আশা, কি সুখ! আমার বুকের ভেতর সুখের শেল বিঁধছে—উঃ—এই তো স্বর্গ—পূর্ণ আশা, পূর্ণ সুখ—স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ—স্বর্গের রাজা আমি হব—আর আমার রাণী—"

'আমি হব। এস, এস রাজপুত্তুর!'

'তুমি কে?'

'এখনো জিজ্ঞেস্ কর্‌ছ?'

'হাঁ।'

'শোনবার কি দরকার?—সময় যায়—কে দেখ্‌বে—কার বিষ-দৃষ্টি পড়্‌বে—সব ভেঙ্গে যাবে! এস রাজপুত্তুর! পান কর!'

'ভেঙ্গে যাবে? তার পর?—ঐ যে ডাইনী মৃদু মৃদু হাস্‌ছে—ডাইনী কি বল্‌ছিস?'—কি?—'তার পর সেই আগুন—আগুনের অনন্ত শিখা—সে শিখায় ছায়া মূর্ত্তি কুৎসিৎ কালো—নাচ্‌বে—হাত-তালি দেবে—কিন্তু শব্দ হবে না। আর তুমি রাজপুত্তুর, সে আগুনের মাঝখানে শবের মত শুয়ে'—'ডাইনী, সে কোথায় গেল? স্বর্গের

'তার মনের কথা ধরা পড়েছে। তাই গেল?'

'কোথায় গেল?'

'যেখান হ'তে আস্‌তে দেখেছিলে।'

'সে তো আগুন! ঐ—ঐ—উঃ কি আগুন!—ছুটে আস্‌ছে—

আমার দিকে সহস্র ফণা তুলে আসছে !—কোথা যাব ?—কোথা যাব ?—মা—মা !—'

মুখের কথা মুখে থাকতেই রাজপুত্তুরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রি কখন প্রভাত হয়েছে—সূর্য্য উঠেছে। রাজপুত্তুর ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠে পড়্‌ল—তখনো বুক কাঁপছে ! দেখ্‌লে রাতের সেই ডাইনীর অষুধের পাত্র খালি পড়ে আছে। ভয়ে তার প্রাণ শিউরে উঠ্‌লো। রাজপুত্তুর এক নিঃশ্বাসে সে ঘর হতে বাহির হল। বাহির হয়ে কোঠার পর কোঠা পার হ'য়ে দেয়ালের বাইরে এসে পড়্‌ল। মনে হ'ল সেই নদীর তীর। তার ওপারে মা আছে। রাজপুত্তুর ছুট্‌লো সেই রাস্তা ধ'রে। কিছু দূর দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়্‌ল। তবু ছুট্‌তে লাগ্‌ল। ভোর হ'তে আরম্ভ ক'রে দুপুর হ'ল। তখন দেখ্‌লে সামনে একটা প্রকাণ্ড বন। বনের ভেতর ঘোর কুট্টি অন্ধকার। বাঘ ভালুকের ডাক।

"ঐ ঐ মা, কি যেন ডাক্‌ছে !—ভয় কচ্ছে।"

"ভয় কি বাপ !—তার পর সেই বনের মধ্যে ঢুকে তো রাজপুত্তুর একেবারে কেমন হ'য়ে গেল। একবার ভাব্‌লে—ফিরে যাই—এ বনের চেয়ে ডাইনী ভাল। এমন সময় শুন্‌লে বনের বাইরে—হা রে রে রে শব্দ। ধর্‌ ধর্‌—পালাল—পালাল—গাছের আড়াল হ'তে উঁকি মেরে রাজপুত্তুর দেখ্‌ল, ডাইনী বুড়ী তার ছেলেগুলো নিয়ে আসছে। ভাব্‌লে ফিরে যাই—এ বনের চেয়ে ডাইনী ভাল। এমন সময় আবার শুন্‌লে বনের বাইরে হা রে রে রে শব্দ। ধর্‌ ধর্‌—পালাল—পালাল। গাছের আড়াল হ'তে উঁকি মেরে রাজপুত্তুর দেখ্‌ল, ডাইনী বুড়ী তার ছেলেগুলো নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে। বুড়ী বল্‌লে, 'ঐ—ঐ—ঐ বনে ছোঁড়া ঢুকেছে—শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর এগিয়ে যা।' এই না শুনে রাজপুত্তুর বনের আরো ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌লো। কাঁটায় সমস্ত শরীর ছিঁড়ে গেল, গাছের গুঁড়ি মাথায় লেগে মাথা কেটে দর্‌ দর্‌ ক'রে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল, কতবার হোঁচোট্‌ খেয়ে প'ড়ে গেল। একবার একটা অজাগর সাপের গায় পা পড়্‌ল, 'ওমা !' বলে লাফ

দিয়ে সাপটা ডিঙ্গিয়ে গেল।"

"তুই আমায় ধরে থাক, মা! ভয় করছে!"

"ভয় কি।—এমনি দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাজপুত্তুর বনের বাইরে এসে পড়ল। একটা ধূ ধূ মাঠ। রাজপুত্তুর মাঠের উপুর দিয়ে আরো জোরে ছুট্‌লো। ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাঠের মাঝখানে এসে একেবারে ব'সে পড়্‌ল। তেষ্টায় ছাতি ফাটে ফাটে—'জল, জল' ব'লে চীৎকার করে উঠ্‌লো।"

"মা, মা, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। তেষ্টা পেয়েছে—জল খাব।"

"এই সময় শুন্‌লে—কিছু দূরে পেছনে সেই তারা ছুটে আস্‌ছে—হৈ হৈ—ধর্‌ ধর্‌ শব্দে। রাজপুত্তুর জল টল ভুলে গেল, পিপাসা কোথায় পালাল। কিছুদূর যাচ্ছে আর পেছন ফিরে দেখ্‌ছে—কদ্দুর এল। ডাকাতেরা কাছে এসে পড়েছে! এমন সময় দেখলে দূরে আয়নার মতো চক চকে একটি নদী। দেখেই রাজপুত্তুর 'ঐ ঐ' ব'লে আরো ছুটে চল্‌ল। ডাকাতেরা যেন একেবারে কাছে এসে পড়েছে, রাজপুত্তুর আরো ছুটে চল্‌ল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে নদীর একেবারে কাছে এসে পড়্‌ল আর একটু আর একটু—কিন্তু ডাকাতেরা তাকে ধরে ধরে। আর এক পা হলেই নদী—রাজপুত্তুর 'মা মা' ব'লে জ'লে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। ডাকাতদের লাঠির আঘাত লাগ্‌তে না লাগ্‌তে রাজপুত্তুর ঝাঁপ দিল। তখন রাজপুত্তুরের আর জ্ঞান নাই। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখ্‌লে—"কি দেখ্‌লে?"

"দেখ্‌লে?—সেই মাকে—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে।"

"হাঁ—যেন ঘুম ভেঙ্গে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে—দেখ্‌লে, মা যেন ঠিক তেমনি করে তাকে কোলে করে বসে আছে।"

"এই যেমন তুই আমায় কোলে করে বসে আছিস্, আর রূপ-কথা বল্‌ছিস—না?"

"হুঁঃ"

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার এম. এ, এল, এম, এস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে সকল স্বপ্ন সফল হইয়াছে সেই সকল স্বপ্ন সম্বন্ধে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি (Psychical Research Society) বা মনস্তত্ত্ব গবেষণা সভা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন। ক্যামব্রিজের প্রফেসর সিজউইক, আমেরিকার হার্ভাডের প্রফেসর উইলিয়ম জেমস এবং ফ্রান্সে মুসো রবত ও মারিটেন এইরূপ স্বপ্ন লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইঁহারাও উক্ত সোসাইটির পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমাদের ও দেশের সাহিত্যিক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় স্বপ্রণোদিত হইয়া ঐরূপ স্বপ্ন সকল সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধ মধ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।*

স্বপ্নাবস্থায় আমাদের স্মৃতিশক্তি অধিকতর প্রখর হয় এবং অতীতের স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় অনেক বিষয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, কিন্তু এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে কোন মনোযোগ দিই না বলিয়া তাহারা স্মৃতিপটে কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় না বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ ঘটনার অনেকগুলি আমাদের স্মৃতিপটে চিহ্ন রাখিয়া যায়। যদিও এই সব ঘটনার জ্ঞান সাধারণতঃ আমাদের জাগ্রৎ মনের বাহিরে থাকে, তথাপি স্বপ্নে কখন কখন স্মৃতিশক্তি

---

* সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির কার্য্য বিবরণীর ১৫ সংখ্যায় সফল স্বপ্নের কথা অনেক আছে।

অসাধারণরূপে প্রখরতা লাভ করিয়া, এই সব ঘটনা আমাদের মন-মধ্যে জাগাইয়া দেয়। কোন কোন পণ্ডিত সফল স্বপ্ন সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অনেক সফল স্বপ্ন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাই যথার্থ বলিয়া আমাদেরও মনে হয়। স্বপ্নে স্মৃতিশক্তি কিরূপ প্রখরতা লাভ করে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এবারক্রম্বি Abercrombie) ৭ বৎসর বয়সের সময় বাইবেলের একটি পদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইটি স্মরণ করিবার জন্য কয়েকদিন উপর্যুপরি ক্রমাগতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। বহুদিন পরে প্রৌঢ়বয়সে একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, জেরিমিয়া (Jeremiah) পুস্তকের যে অধ্যায়ে সেই পদটি আছে, তাহা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে খোলা রহিয়াছে; স্বপ্নে সেই পদটি পাঠ করিতে সক্ষম হইলেন।*

স্বপ্নে স্মৃতিশক্তির এইরূপ অসাধারণ প্রখরতা লাভের সূত্র ধরিয়া কিরূপে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সফল স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন তাহাও দ্রষ্টব্য।

উক্ত মনস্তত্ত্ব গবেষণা সভার—প্রকাশিত একটি স্বপ্ন বিবরণী এবং তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—

একজন জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিশর দেশ (Egypt) হইতে কতকগুলি শিলালিপি উদ্ধার করেন। যে সব শিলালিপি প্রায় সম্পূর্ণ ছিল, তাহাদের তিনি পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যেগুলি ভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও সেগুলির মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না। এমন সময় একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে, পুরাকালে ঐখানে মিশরের এক দেবমন্দির ছিল; তিনি (বৃদ্ধ লোকটি) ঐ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যে ভগ্ন শিলালিপি পাইয়াছেন সেগুলি ঐ মন্দিরের দরজার উপরস্থিত

* Enquiries concerning the Intellectual powers.

প্রস্তরের ভগ্নাংশ। এই প্রস্তরের বিভিন্ন অংশে বর্ণের তারতম্য আছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভগ্ন শিলালিপিগুলি এক প্রস্তরের অংশ নহে বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। কিন্তু তিনি যদি প্রস্তরখণ্ডগুলি ভাল করিয়া দেখেন, তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ডগুলির মধ্য দিয়া একটি ভিন্ন বর্ণের শিরার মতন সূক্ষ্ম দাগ দেখিতে পাইবেন, যাহাতে বুঝা যায় যে প্রস্তরখণ্ডগুলি একই প্রস্তরের বিভিন্ন অংশ মাত্র। তিনি যদি এই শিলালিপির খণ্ডগুলি একই প্রস্তরের অংশ বিবেচনা করিয়া ভগ্ন খণ্ড-গুলিকে একত্র সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাঁহার পাঠোদ্ধার হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই স্বপ্নদৃষ্ট বৃদ্ধের এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মনস্তত্ত্ব গবেষণাসভার পত্রিকায় (Journel of the Phychical Research Society) যে লেখক এই স্বপ্নবৃত্তান্তটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তিনি ইহা এইরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন—প্রত্নতত্ত্ববিৎ যদিও তাঁহার সাধারণ জ্ঞানদ্বারা স্পষ্টভাবে ঐ রেখাটির অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই, তথাপি ঐ প্রস্তরখণ্ডের ভিতর যে সূক্ষ্ম শিরার মতন দাগ আছে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তাহা অনুভব করিয়াছিল। এই তত্ত্বটি তাঁহার সাধারণ জ্ঞানের অজ্ঞাত থাকিলেও তাঁহার অজ্ঞাত মন তাহা সংগ্রহ করিয়াছিল এবং এই তত্ত্বটি ধরিয়া অজ্ঞান মন স্থির করিতে পারিয়াছিল যে বিভিন্ন ভগ্ন শিলাখণ্ডগুলি একই প্রস্তরের অংশ। একাগ্র চিন্তার ফলে অজ্ঞাত মন স্বপ্নের ভিতর দিয়া সাধারণ মনকে এই কথা বলিয়া দিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল।

এবারক্রম্বি (Abercrombie) একটি স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি ব্যাঙ্কের কেরাণী ব্যাঙ্কের হিসাব মিলাইতে গিয়া হিসাবের সঙ্গে ছয় পাউণ্ডের অমিল দেখিয়া বিশেষ মুস্কিলে পড়িল। সমস্ত দিন সে হিসাবে ভুলের কারণ স্মরণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল। রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল যে, এক "তোৎলা" লোক

আসিয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিবার জন্য বিশেষ জিদ করিতেছে। সেই লোকটিকে বিদায় করিয়া দিবার জন্যই যেন ব্যাঙ্কের কেরাণী তাহাকে সেই ছয় পাউণ্ড তৎক্ষণাৎ দিয়া ফেলিল।

টাকার জন্য কড়া তাগাদায় সে সময় সে অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল, এই জন্য হিসাবের খাতায় খরচের কথা লিখিতে পারে নাই—টাকা দেওয়ার কথাও ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বপ্ন দর্শনে তাহার সে ভুল ভাঙ্গিল।

মরি (Maury) একটি স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—এক ভদ্রলোক বাল্যকালে মণ্টব্রাইসন (Monthrison) সহরে শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন, ২০ বৎসর পরে ঐ সহর পুনঃ দর্শন করিবার ইচ্ছা করেন। যে দিন ঐ সহর দর্শন করিতে যাত্রা করিবেন, সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যেন মণ্টব্রাইসন সহরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই ভদ্রলোকটি আগন্তুকের পিতার পুরাতন বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং নিজের নামোল্লেখ করিলেন।

তৎপরদিন সহরে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নে যেরূপ সহরের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ দৃশ্য দেখিলেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আপনাকে তাঁহার পিতার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন। গ্রন্থকার এই স্বপ্নটি যাত্রার উত্তেজনায় পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে নিষ্পন্ন এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* ইহার একটি প্রধান কারণ এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্বপ্নে পিতার বন্ধুকে যেরূপ যুবক দেখা গিয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহাকে তিনি অনেক বৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন।

মাকারিও নিম্নলিখিত স্বপ্নবিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক জনের পুত্র তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে একখণ্ড

* Maury– Annales Medico-psychologiques 1861.

জমী প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জমীখণ্ড তাহার পিতা মূল্য দিয়া কিনিয়া ছিলেন, এ কথা সে তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছিল। কিন্তু এই জমীর দলিল তাহার পিতা কোথায় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। পরে এই জমী লইয়া একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, যাহাতে এই দলিলখানি আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিলে, জমীর উপর তাহার অধিকার বিলোপের সম্ভাবনা। মোকর্দ্দমার শেষ দিন, অর্থাৎ যে দিন সেই দলিল আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাকে মোকর্দ্দমায় হারিতে হইবে, তাহারই পূর্ব্বরাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল যে ঐ দলিলখানি একজন বৃদ্ধ উকিল, যিনি কার্য্য হইতে, অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে। ভূম্যধিকারীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে বাস্তবিকই ঐ উকিলের নিকট হইতে সেই দলিলখানি প্রাপ্ত হইলেন, এবং মোকর্দ্দমায় জয় লাভ করিলেন। গ্রন্থকার এই স্বপ্নটি বাল্যকালের পূর্ব্ব-স্মৃতির উদ্ধারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের সংগৃহীত সত্য স্বপ্নের বিবরণগুলির দুই একটি বোধ হয় ঐ ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাঁহার লিখিত বিবরণী এই—"একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা† লিখিতেছেন যে—প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে আমাদের একটি ওয়াচ্ ঘড়ীছিল। সেটি অল্প দিনের মধ্যে দুই তিনবার ভাঙ্গিয়া যায়। তজ্জন্য সেটিকে খুব সাবধানে দম দেওয়া ও ব্যবহার করা হইত। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, ঘড়ীটিতে দম দিতেছি আর এক প্রকার শব্দ করিয়া ঘড়ীটি ভাঙ্গিয়া গেল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দম দিতে গিয়া আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় খুব সাবধানে দম দিতে ছিলাম; কিন্তু হঠাৎ ঠিকসেই রকম শব্দ করিয়া সত্য সত্যই ঘড়িটা ভাঙ্গিয়া গেল।"

যখন ঘড়ীর স্প্রিং (spring) পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হওয়ার দরুণ

---

* Macario—*Gazette Medicale de Paris* 1867.

† শ্রীমতী অন্নদা ঘোষজায়া, ভুকানগাঁও।

উহা পরিবর্ত্তন করা হয়, তখন যে ঘড়ীতে দম দেয় তাহার অনুভূতির কিন্তু পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, কিন্তু এই অনুভূতি এত সামান্য এবং অস্পষ্ট যে তাহা আমাদের জাগ্রৎ মনের গোচর হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি এই অনুভূতি যে কখন কখন অজ্ঞাত মনের গোচরে না আসিতে পারে এমন নহে। হয়ত ঘড়ীটির স্প্রিং ভাঙ্গিবার পূর্ব্বের অবস্থার মত অবস্থা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বদিনের দম দিবার সময়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা মহিলাটির অজ্ঞাত মনের গোচরে আসিয়াছিল। অজ্ঞাত মনের এই জ্ঞানটিই স্বপ্নের সৃজন করিয়া দিয়াছিল, এবং বাস্তবিক ঘটনাতেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশশধর বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত আর একটি মহিলার স্বপ্ন বিবরণী এইরূপ—"তাঁহার গৃহপালিত হাঁসগুলির ডিম হইত না। তিনি সে জন্য অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার হাঁস ডিম পাড়িয়াছে। যথার্থই পর দিবস হইতে হাঁসগুলি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।"

অন্যান্য পক্ষীদের মতন ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে হাঁসেরও স্বরের এবং অন্যান্য ব্যবহারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। মহিলাটি যদিও জাগ্রৎ মনের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন গুলি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তথাপি সম্ভবতঃ অজ্ঞাত মনদ্বারা এই পরিবর্ত্তনগুলির কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলব্ধিই তাঁহার স্বপ্নের সৃজন করিয়াছিল। এবং বাস্তব উপলব্ধি বলিয়া বাস্তব জগতেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

শশধর বাবু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ে একটি স্বপ্ন এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"যখন আমি শোণবর্ষায় মহারাজ ৺হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের অধীনে কার্য্য করিতাম, তখন মানসী ষ্টেসন হইতে শোণবর্ষা যাইবার পথে একটি স্থান দেখিয়া তাহা আমার পূর্ব্বাপরিচিত বোধ হইল, অথচ আমি তৎপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে কোন দিনই যাই নাই। সেই স্থানটিতে আমার যান নামাইয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতেছিল; আমি

যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্থানটি বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার নিকট উহা পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর ভাবিতে ভাবিতে আমার বেশ মনে পড়িল যে ঠিক এক বৎসর কি দশমাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি এই পথে যাইতেছি। স্বপ্নের অন্যান্য ঘটনার সহিত বর্ত্তমান গমনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু এই স্থানটি দিয়া যাইতেছিলাম এবং এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহা আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল এবং ইহাও মনে পড়িল যে আমার স্বপ্নে সেখানে একটি দেবীমন্দির দেখিয়াছিলাম। এই কথা মনে হইবামাত্র আমার বাহকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার নিকটে কোন দেবী মন্দির আছে কিনা। তদুত্তরে তাহারা অদূরস্থিত একটি আম্রকুঞ্জ দেখাইয়া বলিল যে সেখানে "মাই কাতানি কি স্থান" অর্থাৎ কাত্যায়নী দেবীর মন্দির আছে। ইহা জানিয়া আমি এক বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে আমি এই দেবী স্থানের বিষয় কিছুই অবগত ছিলাম না।"

কোন কোন নূতন দৃশ্য কিম্বা নূতন লোক দেখিয়া মনে হয় যে এই নূতন দৃশ্য কিম্বা লোক একবারে প্রথম দেখা হইতেছে এরূপ নহে, পূর্ব্ব হইতেই যেন তাহাদিগকে কোথাও না কোথাও দেখা আছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় এইরূপ নূতন দৃশ্য পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখা গিয়াছে মনে হইয়া যেন পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে এইরূপ বিশ্বাস মনের ভ্রম।

কিন্তু যথার্থই যে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য এবং মনুষ্য পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখা গিয়া থাকে তাহারও প্রমাণ আছে।

লিবাল্ট (Liebault) এইরূপ একটি স্বপ্নের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণটি এই। একটি স্ত্রীলোক স্বপ্নে

দেখেন যে তিনি যেন পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যাইতেছেন; তখন একটি অপরিচিত লোক তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সেই পুরুষটির নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার নাম অলরি (Olory)। স্বপ্নে স্ত্রীলোকটি পুরুষটির চেহারা এরূপ স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছিল যে সেই চেহারাটি তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে একটি পুরুষ ঐ স্ত্রীলোকটির গৃহে প্রবেশ করে, তাহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারেন। তখন স্ত্রীলোকটি পুরুষকে প্রশ্ন করেন যে আপনার নাম কি অলরি (Olory), তাহাতে পুরুষটি নিজের ঐ নাম বলিয়া স্বীকার করেন। স্ত্রীলোকটি যদি পুরুষটিকে ঐরূপ ভাবে নাম না জিজ্ঞাসা করিয়া পুরুষটিকে আত্মপরিচয় দিতে দিতেন এবং নিজের ধারণার সহিত মিলাইয়া তাহার সত্যানুভূতি করিতেন তাহা হইলে এই ব্যাপারটি নাম শ্রবণ করিবার পর তাহার ভ্রম বিশ্বাস হইয়াছে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া উড়াইয়া দিতেন কিন্তু স্ত্রীলোকটি প্রথমেই পুরুষটির নাম বলিতে পারিয়াছিল বলিয়া লিবাল্ট (Liebault) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে ঐ পুরুষটি স্ত্রীলোকের বাটীর কয়েক মাইল দূরে বাস করিত। তাহাতে লিবাল্ট সিদ্ধান্ত করেন যে হয়ত ঐ স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে রাস্তায় কিম্বা অন্য কোনখানে মনোযোগ না দিয়া শুধু চক্ষুর দৃষ্টিতে দেখিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহাকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে, সেই শব্দটি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সবগুলি হয়ত তাহার জাগ্রৎ মনে কোনও স্মৃতি চিহ্ন রাখে নাই, কিন্তু তবুও তাহার অজ্ঞাত মনে অস্পষ্ট দাগ রাখিয়াছিল যাহা হইতে ঐ স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছে।*

লিবল্টের এরূপ সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক নহে। তবে অনেক স্বপ্ন বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে স্বপ্নে কখন কখন

* Liebault—Dee Sommeel et des etats analogues 1866.

যথার্থই প্রাগ্‌দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বপ্নে যে দেবী মন্দিরের কথা আছে তাহা মনের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতেরা বলিবেন যে দেবী মন্দিরের কথা হয়ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাহারও নিকট শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য এই স্বপ্নটি লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এইটি একটি প্রাগ্‌দর্শনের স্বপ্ন।

অনেক সময় নূতন দৃশ্য পুরাতন বলিয়া বোধ হয় তাহার কতকগুলি পুনর্জ্জন্মবাদ সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় কিনা তাহাও একটি অনুসন্ধানের বিষয়।

এবারক্রম্বি একটি আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধার সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় এই স্বপ্ন ঘটনাটি অজ্ঞাত মনের দূরদৃষ্টিসূচক স্বপ্ন—ঘটনাটি এইরূপ।

একজন ভদ্র লোককে কার্য্য গতিকে নিজের বাড়ী হইতে কতক দূরে অন্য একটি বাড়ীতে গিয়া রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই বাড়ীতে গিয়া তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে তাঁহার সন্তানগুলিকে বাহির করিয়াছেন। কিন্তু গোলমালে তাঁহার ছোট ছেলেটিকে বাটি হইতে বাহির করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া স্বপ্ন-দর্শনকারী যেন নিজে প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশু সন্তানটিকে উদ্ধার করিলেন।

স্বপ্নদর্শনকারী এই স্বপ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিজের গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিলেন যে যথার্থই তাঁহার গৃহে আগুন লাগিয়াছে এবং গোলমালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার শিশু সন্তানটিকে বাহির করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহার শিশু সন্তানটিকে প্রজ্জলিত গৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার এই ঘটনা এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—হয়ত স্বপ্নদর্শনকারী পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন যে, তাঁহার ভৃত্য অগ্নি সম্বন্ধে ভয়ানক অসাবধান। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে তাঁহার স্ত্রী অল্প বিপদেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান। হয়ত অজ্ঞাতসারে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রী সকল সন্তানগুলিকে সাবধান করিতে পারিবেন না। এই সব ধারণা হয়ত তাঁহার মনে ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই সকল ভাব তাঁহার মনে উপরোক্ত স্বপ্নটি স্বজন করিয়াছিল। আবার তাঁহার ধারণাগুলি সত্য ছিল বলিয়া সেই সময়ে বাস্তব জগতেও সেই ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। এইরূপে স্বপ্নদর্শনকারীর দৃষ্টস্বপ্ন সত্য হইয়াছিল।

একজন পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা একেবারে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে কতকগুলি কষ্ট কল্পনা আছে বলিয়া বোধ হয়, পাঠকগণকে তাহা বেশী বুঝাইতে হইবে না। স্বপ্নদর্শনকারীর অজ্ঞাত মন প্রাগ্‌দর্শন বা দূরদৃষ্টির শক্তি দ্বারা যথার্থই প্রজ্জলিত গৃহের ব্যাপার অবগত হইয়াছিল এবং শিশু সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য সন্নিকট ভবিষ্যৎটাকে স্বপ্নের দ্বারা স্বপ্নদর্শনকারীর জ্ঞান গোচর করিয়া দিয়াছিল, ইহাই সহজ ব্যাখ্যা বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২১শে মাঘ, ১৩২৪, ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ষষ্ঠপঞ্চাষৎ জন্মতিথি পূজা ও তদোপলক্ষে উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জন্মতিথি রবিবারে পড়ায়, উক্ত তিথিপূজা ও উৎসব ভিন্ন ভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠিত না হইয়া একই দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

উৎসব-দিবসে স্বামীজির শয়নগৃহ এবং সমাধিমন্দির অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। স্বামীজির সন্ন্যাসীবেশী তৈলচিত্রখানি লতাগুল্ম ও পুষ্পাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়া মঠ প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল। আলেখ্যটীকে দেখিলেই মনে হইতেছিল স্বামীজি যেন স্বশরীরে আগমন করিয়া ভক্তগণের ভক্ত্যাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন। ঐ স্থানেই বৈষ্ণবচরণবাবাজি কর্ত্তৃক পদাবলী ও ব্যাট্‌রা কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মাতৃনামামৃত গীত হওয়ায় স্থানটীকে আরও প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিল।

এ বৎসর প্রায় ছয় সাত হাজার ভক্তের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে যুবাভক্তের সংখ্যাই অধিক। অন্যূনাধিক চার হাজার ভক্ত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বৎসর দরিদ্র নারায়ণের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, বৃন্দাবন, কনখল, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি অন্যান্য কেন্দ্রেও স্বামীজির জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানেও ভক্তগণ কর্ত্তৃক জন্মোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

আগামী ৩রা চৈত্র, সন ১৩২৪ সাল, ইং ১৭ই মার্চ্চ, ১৯১৮, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্র্যশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে মহোৎসব হইবে। ভক্তগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ সাহায্য-কল্পে আমরা পুনঃ পুনঃ সাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি। কিন্তু এপর্য্যন্ত আশানুরূপ সাহায্য আমরা পাই নাই। যাঁহারা ভারত-বর্ষের মঙ্গলকামী, যাঁহারা আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিকল্পে চিন্তান্বিত তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত—স্ত্রীজাতির উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করিতে না পারিলে তাঁহাদের বর্ত্তমান আশা কখনও বাস্তবতায় পরিণত হইবে না। সেই জন্য আমরা উন্নতমনা ও উদারচেতা দেশসেবিগণের নিকট উক্ত অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। ইহাতে তাঁহারা শুধু স্ত্রীজাতিরই কল্যাণ কেন পরোক্ষে সমগ্র দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনই করিবেন।

বিবেকানন্দপুরস্ত্রীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের বাটি নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান স্বীকার।

ডাঃ বি, এম, বসু বর্ম্মা
শ্রীমতী নীহারিকা দেবী, শিমলা
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী
শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার দত্ত, ঢাকা
,, নরেশচন্দ্র ঘোষ ১
,, কান্তি চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ৫০৲
,, কামাখ্যানাথ মিত্র, দৌলতপুর ১৲
শ্রীমতী ধুম বাই, এক বান্ধী—
১ম দফে ২৫৲ ২য় দফে ৩৫৲, বোম্বাই ৬০৲
শ্রীযুত হরিচরণ বসু ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র, বোম্বাই ৫০১৲
,, বরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ভ্রাতাগণ, কলিকাতা ৫০১৲
শ্রীমতী মৃণালিনী দাস, ৫৲
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ কুমার, এলাহাবাদ ১০৲
অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, রুড়কি ২৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর ২০৲
,, চুনিলাল ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা
,, যতীন্দ্রনাথ সোম, ,,
,, জগন্নাথ দাস, ,, ১৲
ডাঃ জগৎপতি রায়, ,, ১৲
শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর দাস, ,, ৪৲
,, বিশ্বনাথ ঘোষাল
,, এল, কে, বসু, বসরা
,, কামিনীকুমার দাস, চট্টগ্রাম
মিঃ, ই, জে, নিউটন, ডানেডিন, নিউজিলেণ্ড ২৮৲
মিঃ এম নরসিমান্, মান্দ্রাজ ২॥০
,, এম রামস্বামী, বাঙ্গালোর ২॥০
,, এস, এন, দয়াপতি শর্ম্মা ১॥০
জনৈক বন্ধু ১৲
শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বসু, বাসরা

শ্রীমতী কাদম্বিনী দত্ত, কলিকাতা ২৲
ঐ আত্মীয় ,, ২৲
শ্রীযুত চারুচন্দ্র দে ,, ২৲
শ্রীমান লালুর মা ,, ২৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী ঘোষ, রাউংভোগ
শ্রীযুত নিত্যানন্দ সুর, রেঙ্গুন
,, হরিমোহন রায় উকিল, আরামবাগ
মিঃ কে কেশবরাম মূর্ত্তি, কোকনদ ১০৲
শ্রীযুত তারকনাথ নন্দী, কলিকাতা
মেসার্স পাল ব্রেণ্ডস্ এণ্ডকোং, কলিকাতা ৫
লেফটেনেণ্ট শৌরেন্দ্রমোহন পাঠকের মাতার স্মৃত্যর্থে, সাঙ্গোর ১৫৲০
শ্রীযুত নিত্যানন্দ বসু, কলিকাতা ৫৲
শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস, প্রথমদফা ৩০০৲
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, কলিকাতা ১০৲
কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ ৫৲
শ্রীযুত ভোলানাথ দাস ১৲
,, বসন্তলাল সাউ, শিবলাল সাউ ৩৫
ডাঃ সরসীলাল সরকার ৫০
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোকামা ৩৲
,, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সিলেট ২৲
,, বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা ১০৲
জনৈক বন্ধু ১০৲
ঐ মাঃ স্বামী পূর্ণানন্দ ১০৲
শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র পাইক, কাঁথী ২৲
,, সি, এল, শীল, সাবরেজীষ্টার কাঁথী
,, কুঞ্জবিহারী দে, ঐ
খুচরা সংগ্রহ মাঃ সুবোধকৃষ্ণ বসু ৮৷০
শ্রীযুত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, কাঁথী ৪৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ পাইন, আসাম ৪৲
,, বলদেও সিং, দেরাডুন ৫৲
,, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, মানভূম ২৲
ডাঃ জে, এন, বিশ্বাস, মন্দালয় ৫৲
শ্রীযুত ভগবান রাম ঘোষ, কলিকাতা ৫৲
,, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি, ২য় দফা ১৫৲
,, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১ম দফা
,, রাইমোহন মজুমদার, কাগমারী
,, টি, এম, রায়, খড়্গপড়
রাম লালজী গুরুজী, ইন্দোর

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ডিসেম্বর মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত নভেম্বর মাসের ১৬ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ২৫ জনকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; ৩ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, এবং ৬ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৬৪৫ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪৩৫ নূতন এবং ২২১০ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

উক্ত মাসে ৫ জন রোগীকে তাহাদের বাটীতে যাইয়া ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা এবং কাহাকে কাহাকেও পথ্য দিয়া সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আয়—চাঁদা হিসাবে ৯১৲; এক কালিন দান ৪৩৶০; খুচরা সংগ্রহ ৩৲ এবং সুদ হিসাবে ৯৵; মোট ১৪৬৵৶ টাকা। বিল্ডিং ফণ্ডএর আয় সুদ হিসাবে ৩২॥০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের ব্যয় ১৩৮৸৶০ এবং বিল্ডিং ফণ্ডএর ব্যয় ২৪২॥৶৫।

আলেয়ারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল প্লাবনে মথুরা জেলার বহু গ্রাম ভাসাইয়া দিয়াছে, ঐ সকল গ্রামবাসিদের সাহায্যের জন্য দুটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, একটী রাধাকুণ্ডে এবং অপরটী বর্ষাণায়। এই দুটী কেন্দ্রে ডিসেম্বর ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১৪৫৪ জনকে ঔষধ, এবং উহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও পথ্য এবং বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে, ৭৫ জনকে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল। অর্থাভাবে আমরা বর্ষাণার কেন্দ্র উঠাইয়া দিয়াছি, রাধাকুণ্ডের আস পাসের গ্রামসমূহে রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত কেন্দ্র হইতেই সকল গ্রামে গিয়া ঔষধাদি দিয়া আসা হইতেছে। সকলের অতি সামান্য সামান্য সাহায্যে যদি আর একটী মাস উক্ত সেবা-কেন্দ্রটী রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে উক্ত মাসের মধ্যেই জল কমিয়া যাইবে, এবং সকলে সুস্থ হইলে গম প্রভৃতির চাষ করিয়া লইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

(স্বামী সারদানন্দ)

(৩)

আশ্বিন অতীত হইয়া কার্ত্তিক এবং শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল তাহা দিন দিন নষ্ট হওয়ায় ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়াও আশানুরূপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্য ঐরূপ হইতেছে, শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই বোধ হয় ঐ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।

দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্ব্বক কালীপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখে ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া তিনি শ্যাম-পুকুরের বাটিতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। কিন্তু পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন

হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্ব্ব দিবসে কয়েক-জন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, 'পূজার উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।' তাহারা তাঁহার ঐ কথায় আনন্দিত হইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন পূজার আয়োজন সম্বন্ধে অন্য কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয় লইয়া নানা জল্পনা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পূজা, ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচার হইবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়া হইবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং ফলমূল মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্দ্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্য দিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সন্নি-কটে পূর্ব্বদিকের কতকটা স্থান মার্জ্জনা করিয়া সংগৃহীত দ্রব্য সকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অদ্যও সেই-রূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ৺জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাং-সায় উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং পূজোপকরণ সকল তাহারা

এখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে পূর্ব্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ দীপসকল প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা কিছুই না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকলেই তখন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনার বিশ্বাস' বলিয়া—ঠাকুর কখন কখন নির্দ্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকেও এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্য ভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের ৺কালীপূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল অহেতুক ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?—নিশ্চয় তাহাই। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং তিনি কি করিতেছেন

তাহা ভক্তগণের জানিবার পূর্ব্বে সম্মুখস্থ পুষ্প-চন্দন গ্রহণপূর্ব্বক জয় মা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে সহসা শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধি মগ্ন হইলেন! তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল! এত অল্প-কালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারম্বার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা দেখিল ঠাকুরের স্থলে কোথা হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুল চন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্ব্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ ঐরূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফল মূল মিষ্টান্নাদি পদার্থ সকল তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐসকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের উল্লাসে ৺দেবীর মহিমা কীর্ত্তন ও নাম-গুণ-গানে অতিবাহিত করিল।

ঐরূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিল তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরুক হইয়া রহিয়াছে এবং দুঃখ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও

বরাভয়যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া তাহাদিগে' জীবন সর্ব্বথা দেবরক্ষিত, এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

উপসংহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর).

(সিষ্টার নিবেদিতা)

১৯০২ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় শিষ্য ঐ উৎসব করিবার জন্য কটকের সন্নিকটস্থ খণ্ডগিরিতে সমবেত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকাল. আমরা একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের চারিধারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপাশে গুহা ও ক্ষোদিত প্রস্তরবিশিষ্ট পাহাড়গুলি উঠিয়াছে, আর চারিধারে সুপ্ত অরণ্যানী মারুতহিল্লোলে অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে খৃষ্ট-জন্মদিনের পূর্ব্ববর্ত্তী নিশা যেরূপে যাপিত হইত, আমরাও সেইরূপে উহা যাপন করিব স্থির করিয়াছিলাম। সাধুদিগের মধ্যে একজনের হাতে একগাছি লম্বা বাঁকানমাথা মেষ তাড়াইবার মত ছড়ি ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে একখানি সেণ্ট লিউক প্রণীত ঈশা-জীবনী ছিল—তাহা হইতে দেবদূতগণের আবির্ভাব এবং পাশ্চাত্য জগতের প্রথম স্তুতিগান* পাঠ ও মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে।

* ঈশ্বরের নাম সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক, এবং পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করুক!"—দেবদূতগণের গীতি।

কিন্তু আমরা গল্পটী পড়িতে পড়িতে মাতিয়া গেলাম ; খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বরজনীর বর্ণনাতেই পাঠ শেষ হইল না ; আপনা হইতেই একের পর একটী করিয়া ঘটনা পড়া হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশই আলোচিত হইল, তৎপরে মৃত্যু এবং সর্ব্বশেষে পুনরুত্থান। আমরা গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে আসিলাম এবং এক একটী করিয়া ঘটনা পড়া হইতে লাগিল।

কিন্তু গল্পটী আমাদের কার্ণে এমন শুনাইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। যাহার বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জলতা ও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দৃষ্টে তাহার সত্যাসত্যতা বিচার করা হইবে, এমন একটা সন তারিখযুক্ত এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আইন সঙ্গত দলিলের পরিবর্ত্তে, উহা এখন, এক ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর একটী ব্যাপারের কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের ন্যায় শুনাইতে লাগিল। পুনরুত্থানের বর্ণনাটী আর আমাদের নিকট কোন একটী ঘটনার বিবরণের ন্যায় ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইল না। উহা চিরকালের জন্য একটী আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনারূপে স্থান লাভ করিল—যাঁহার ঐ অনুভব হইয়াছিল তিনি উহাকে ভাষায় নিবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলে সফলকাম হন নাই, এই মাত্র। সমগ্র অধ্যায়টী অসম্পূর্ণ এবং আঁচে ইসারায় বলা এইরূপ বোধ হইতে লাগিল—যেন এক ব্যক্তি আগ্রহের সহিত শুধু পাঠকের নয়, কতকটা স্বয়ং লেখকেরও বিশ্বাস উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কারণ, আমরাও কি ঐরূপ এক পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হই নাই—যাহা পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে ? আমাদের আচার্য্যদেব স্বয়ং যাহা স্পষ্ট ভাষায় এবং জানিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা সহসা আমাদের মনে পড়িল এবং তাহার অর্থও তখনি বুঝিতে পারিলাম—"জীবনে আমি অনেকবার পরলোকগত আত্মা সকলকে পুনরায় এজগতে আসিতে দেখি-

য়াছি; এবং একবার যে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শন করিলাম, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরসপ্তাহে!"

আমরা প্রত্যক্ষভাবে শুধু শিষ্যগণের স্বস্বরূপপ্রাপ্ত প্রভুকে (ঈশাকে) আর একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই অনুভব করিলাম না, সেই অবতারপুরুষের স্বীয় বিরহকাতর শিষ্যগণকে সান্ত্বনা দিবার ও আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য পুনরাগমনের বহুগুণে প্রগাঢ়তর কামনারও চাক্ষুষ পরিচয় পাইলাম।

বাইবেলে লিখিত আছে—"পথিপার্শ্বে তিনি যতক্ষণ আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ আমরা প্রাণের ভিতরে একটা উৎকট আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। আমাদের আচার্য্যদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক সপ্তাহে আমরাও কি ঐরূপ ক্ষণিক অপূর্ব্ব অনুভূতির অজস্র প্রমাণ পাই নাই?—তখন ত আমরা প্রায় বিশ্বাসই করিয়াছিলাম যে, তিনি সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বাইবেলে আরও বর্ণিত আছে—"রুটী প্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার সময় তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।"—ঠিক কথা। কখনও একটু আভাস, কখনও একটী কথা, কখনও একটী মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী মধুর অনুভূতি, অথবা সহসা মনের ভিতরে জ্ঞানালোকের স্পষ্ট প্রকাশ—আমাদের ঐ প্রথম কয়েক সপ্তাহে এই সকলের কোন একটী নানা সময়ে উপস্থিত হইবামাত্র অমনি হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠিত, মনে হইত, ঐ বুঝি তিনি রহিয়াছেন, এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত সংশয় ও নিশ্চয়তা, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত।

সে রাত্রিতে খণ্ডগিরিতে আমরা পুনরুত্থানের বর্ণনার সেই অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়া গেলাম, যেগুলি বোধ হয় যেন অপরাপর ব্যক্তি গল্পটীকে অবিকল, অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পরে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই পুরাতনের উপর নূতন চূণকাম করা বিবরণের প্রাচীনতর অংশটুকুর বিষয়েই আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতেছিলাম,—সেই সাদাসিধা প্রাচীন বিবরণ, যাহাতে পুনঃ পুনঃ

চকিতের ন্যায় প্রভুর দর্শন ও অদর্শনজনিত হর্ষবিষাদের করুণ ছবি রহিয়াছে, যাহাতে দেখিতে পাই, কতবার একাদশ শিষ্য একত্র হইয়া চুপে চুপে আপনাদের মধ্যে "দেখ দেখ! সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হইয়াছেন" এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এবং পরিশেষে সকলে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ লাভান্তে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতে লাগিল যে, ঐ প্রাচীনতর কাহিনীতে আদৌ ঈশার স্থূলদেহের পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে শুধু সহসা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভু ও শিষ্যগণের ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন, জ্ঞান ও প্রেমের বিবৃদ্ধি, প্রার্থনাকালে ক্ষণিক তন্ময়তা প্রাপ্তি, এই সকল ব্যাপার। প্রভু তখন জ্যোতির্ম্ময় স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং অতি অন্তরতম সূক্ষ্ম এক আকাশে বিরাজ করিতেছেন; আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বদ্ধ থাকায় সে ভূমির কথা ধারণাই করিতে পারি না।

আবার সেগুলি এত স্থূল ব্যাপার ছিল না যে, সকলে সমভাবে এই অর্দ্ধশ্রুত অর্দ্ধদৃষ্ট ক্ষণিক আভাসগুলি ধরিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে মোটেই ধরিতে পারেন নাই। এমন কি যাঁহারা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের নিকটও ঐগুলি সন্দেহস্থল ছিল, যাহার সম্বন্ধে আগ্রহসহকারে আলোচনা করিতে হয়, এবং সমস্ত অংশগুলি একত্র করিয়া যাহা বুঝিতে ও সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়। খৃষ্টের অতি অন্তরঙ্গ এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ হয়ত উহা আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। তথাপি সেই রাত্রে খণ্ডগিরির সেই সকল গুহা ও অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া খৃষ্টানদিগের এই পুনরুত্থানকাহিনী পড়িতে পড়িতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহার মধ্য দিয়া একটী সত্য সূত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে; বিশ্বাস হইল যে, কোথাও কোন এক সময়ে একজন মানব সত্য সত্যই এই ক্ষণিক উপলব্ধিগুলি করিয়া তাহার যে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই অনুধাবন

করিতে চেষ্টা করিতেছি। এইরূপই আমরা বিশ্বাস করিলাম, এই-রূপই অনুভব করিলাম, কারণ অতীব ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ঐরূপ একটী অনুভূতি ঐরূপই এক সময়ে আমাদেরও হইয়াছিল।

ঈশ্বর করুন যেন আমাদের আচার্য্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও আমাদিগকে যাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট শুধু একটা স্মরণীয় বস্তু না হইয়া চিরকাল জ্বলন্ত জাগ্রৎভাবে সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

(সমাপ্ত)

টলষ্টয়ের আদর্শ

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)*

পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টানধর্ম্ম নামে যাহা পরিচিত, তাহা খৃষ্ট প্রচারিত ধর্ম্ম নহে,—এই কথা শুনিলে বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু রুষদেশীয় বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী টলষ্টয় ইহা বলিয়াছেন, এবং খৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে কি তাহা স্বয়ং আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন। এই মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

যিনি যীশুখৃষ্টের মত অনুসারে চলিবেন তিনি যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, তিনি অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান অনুমোদন করিতে পারিবেন না, ইহাই টলষ্টয়ের মত। বলা বাহুল্য, এই মত গৃহীত হইলে পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রীয় জীবন আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

* এই প্রবন্ধে Tolstoi তাঁহার প্রণীত 'My Religion' নামক পুস্তকে যে মত বিবৃত করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

কিন্তু টলষ্টয় তাহাতে ক্ষতি হইবে এরূপ বিবেচনা করেন না। তিনি কোনও দিক দিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একটা বড় জিনিষ বলিয়া স্বীকার করেন না। তথাকথিত সভ্যতা এবং উন্নতির সন্ধানে মানুষ প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অনর্থক প্রাণপাত করিতেছে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

যীশু স্পষ্ট বলিয়াছেন, "কাহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না", "অপরকে বিচার করিতে পারিবে না।" তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্মের ধর্ম্ম-যাজকগণ এই সকল বচনের সরল অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, হত্যা করা অন্যায়, কিন্তু সম্রাটের আদেশে যুদ্ধে শত্রু নিপাত করা এবং অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়া অন্যায় নয়; অন্যের দোষ দেখা ভাল নয়, কিন্তু বিচারালয়ে অপরাধীর দোষ অবশ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। টলষ্টয় বলেন, এই সকল "কিন্তু"র কোনও অবসর নাই। যীশুখৃষ্টের সে প্রকার অভিপ্রায় ছিল না। থাকিলে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতেন। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সরলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতাকে বজায় রাখিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে হইবে - এই রকম মনের ভাবটাই যত অনর্থের মূল।

যীশুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি কোনও সন্দেহ হইতে পারে? তিনি বলিয়াছেন, "যে তোমার দক্ষিণ গালে আঘাত করে, তাহাকে তোমার বাম গাল ফিরাইয়া দাও", "যে তোমার গায়ের জামা কাড়িয়া লইবে, তাহাকে তোমার গায়ের চাদরও ছাড়িয়া দাও", "তোমার শত্রুকে ভালবাসিও"। এই সকল কথা কি যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই? ধর্ম্মযাজকগণ বলেন, "এ সকল কথা অতি মহৎ, অতি সুন্দর; এই সব মনে কল্পনা করিলে হৃদয় উন্নত হয়;—কিন্তু কার্য্যে আচরণ করিবার কথা নহে।"

অর্থাৎ, কথায় এক কার্য্যে আর। ইহাকে কি ভণ্ডামি বলা যায় না? যীশু কি কবিতা রচনা করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? সুন্দর কথার মালা গাঁথাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল?—না

তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, কি ভাবে জীবন যাপন করা উচিত—সরল, সহজ ভাষায় বুঝাইয়াছিলেন, যে ভাষা মৎস্যব্যবসায়িগণ এবং তাবৎ দরিদ্র নিরক্ষর জনসাধারণ বুঝিতে পারে, যাহারা অলঙ্কার, ভাবরাজ্য—এ সকলের ধার ধারে না। এবং তাহাদিগকে বাক্যে বুঝাইয়া যীশু কি স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়া ক্রুশের উপর প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করেন নাই? টলষ্টয় বলেন, হে ধর্ম্মযাজকগণ, তোমরা স্পষ্ট করিয়া বল যীশুর উপদেশ তোমরা পালন করিবে না; কিন্তু যীশুর উপদেশের বিকৃত ব্যাখ্যা করিও না; তোমাদের কথাতে কত সরল হৃদয় ব্যক্তি প্রতারিত হইতেছে। তাহাদিগকে প্রতারণা করা মহাপাপ। তাহারা যথার্থই যীশুর মত অনুসারে চলিতে চাহে, এবং তোমাদের বিকৃত ব্যাখ্যা না শুনিলে বোধ হয় যীশুর সরল উপদেশ সহজভাবে বুঝিয়া তদনুযায়ী কাজ করিত।

যুদ্ধ, বিচারালয় এই সকল বিষয়েই যীশুর সাধারণ উপদেশ খাটাইতে হইবে—"অন্যায়কে বাধা দিও না।"* শত্রু তোমার দেশ আক্রমণ করিয়াছে—সে অন্যায় করিতেছে; কিন্তু যীশু বলিতেছেন তুমি তাহাকে বাধা দিবে না। তিনি শুধু অন্যায় যুদ্ধ নিষেধ করেন নাই। কোনও যুদ্ধই করিতে পারিবে না। দস্যু তোমার বা তোমার প্রতিবেশীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল, যে বাধা দিতে গিয়াছিল তাহাকে হত্যা করিয়া গেল। যীশু বলিতেছেন, তুমি তাহাকে দণ্ড দিও না, কারণ, অন্যায়কে বাধা দিতে পারিবে না।

স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, তাহা হইলে ত দেশ অরাজক হইবে। দুর্দ্দান্তজাতি সকল নিরীহ জাতিদিগকে পদদলিত করিবে। সমাজে পরস্বাপহারী দস্যু তস্করেরা প্রভুত্ব করিবে। খৃষ্টানধর্ম্মযাজকগণের তাহাই মনে হইয়াছিল। তাই তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "না ধর্ম্মযুদ্ধ ও বিচারালয় নিষেধ করা যীশুর অভিপ্রায় ছিল না।" কিন্তু যীশু স্বয়ং যাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা কি বলিয়াছেন শোনা যাউক।

* "Resist not evil."

জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন,

"যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার বিচার করে, সে ভগবানের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, (কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন, তুমি কাহারও বিচার করিতে পারিবে না), এবং ভগবানের নির্দেশের বিচার করে। তুমি যদি সেই নির্দেশ বিচার কর, তাহা হইলে তুমি (নির্দেশবর্ত্তী) ভৃত্য হইলে না, তুমি বিচারক হইলে। নির্দেশ দিবার সেই এক-জনই আছেন, তিনি রক্ষাও করিতে পারেন, তিনি বিনাশ করিতেও পারেন। তুমি কে, যে অপরকে বিচার করিবে?"

এখানে আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় হইতে পারে না। জেম্‌স্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন বিচারালয়ে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া অন্যায়, কারণ উহা ভগবানের নির্দেশের বিরুদ্ধ! এবং নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ধর্ম্মযাজকগণ যীশুর আদেশ ও উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিতে পারেন, জেম্‌স্‌ তদপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কথাটা এই, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর কি না? ভগবান্ যে সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার ইচ্ছা যে মঙ্গলময়, ইহা স্বীকার কর কি না? ঐ যে দস্যুগণ তোমার গৃহ লুণ্ঠন করিতেছে, ভগবান্ ইচ্ছা করিলে কি তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেন না? তাহা যখন করিতে-ছেন না, তখন বুঝিতে হইবে লুণ্ঠন করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তবে তুমি কেন দল বাঁধিয়া লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? ভগবানের ত্রুটি তুমি সংশোধন করিবার আস্পর্দ্ধা রাখ! তুমি তাহা হইলে ভগবানের আজ্ঞাধীন ভৃত্য নহ। তুমি একজন ঈশ্বরবিদ্বেষী। টলষ্টয় এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

যে যীশুর আদেশ অনুসারে চলিবে দস্যু বা অত্যাচারকারী তাহার কি করিবে? তাহার অর্থ কাড়িয়া লইবে? লউক্। যীশু বলিয়াছেন, অর্থ থাকিলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন, দরিদ্রের পক্ষে সে পথ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহার সঞ্চয় কাড়িয়া লইবে? লউক। যীশু বলিয়াছেন, কল্যকার চিন্তা করিও না। যিনি অরণ্যের পক্ষি-

দিগকে খাদ্য দিয়াছেন, যিনি অযত্নসম্ভূত কুমুদফুলকে সোলেমন অপেক্ষা সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছেন, তিনি তোমার আহার দিবেন, তোমার বস্ত্র দিবেন। ঐশ্বর্য্যে ত সুখ নাই। দীনহীন হইয়া ভগবানের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া মানবের সেবা করিতে পারিলেই ত সুখ। এইরূপ দীনহীনভাবে যাহারা জীবন যাপন করিবে, পরের সেবা করাই যাহাদের কার্য্য, তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেও যাহারা ক্রোধ না করিয়া সকল অন্যায় সহ্য করিবে—অত্যাচারীর হৃদয় যতদূরই নির্দ্দয় হোক না কেন, সে ঈদৃশ লোকদিগকে অকারণে হত্যা করিবে না, তাহাদিগকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবে না। লোকে পশুদিগকেও খাইতে দেয়, আর এই সকল সেবাপরায়ণ লোকদিগকে খাইতে দিবে না? তাহাদের আচরণ দেখিয়া অত্যাচারীর হৃদয় কোমল হইবে। অত্যাচার করিতে আর তাহাদের স্পৃহা হইবে না। এইভাবে জগতে ভগবানের রাজ্য আসিবে।

টলষ্টয়ের আদর্শ অনুসারে পৃথিবী বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকা উচিত নহে। তিনি বলেন রাজ্যের গঠন, রাজকর্ম্মচারির নিয়োগ, আইন, আদালত, জেল, পুলিস, এ সকলই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানব প্রচলিত করিয়াছে। সামাজিক গঠনেরও আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্র এরূপ বিভাগ থাকিবে না। কল কারখানা তুলিয়া দিতে হইবে। বড় বড় নগরে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। বর্ত্তমান সভ্য জীবনটাই একটা ভুল। ইহাতে ধনী বা দরিদ্র কেহই সুখী হয় না। এইরূপ জীবন যাপনের ফলে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাহারও মনে শান্তি থাকে না। বর্ত্তমান সভ্যসমাজে যিনি বড়লোক বলিয়া পরিচিত তিনি যদি তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়া দীন কৃষকের জীবন যাপন করেন তাহা হইলে তিনি বেশী সুখী হইবেন। সুখ মনে করিয়া যাহার জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক সুখ নহে। তাঁহার সম্পূর্ণ বুঝিবার ভুল।

বুঝিবার দোষে অসংখ্য লোক সভ্যতার করাল কবলে পড়িয়া বিনষ্ট হইতেছে—ইহাই টলষ্টয়ের মত।

সৌখীন পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত অট্টালিকা, মূল্যবান্ অলঙ্কার, দাস দাসী, গাড়ী ঘোড়া এ সকলে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। এ সকলে তোমার প্রকৃত সুখ হয় না। ইহারা যথার্থ সভ্যজীবনের অঙ্গ নহে। মানব কিসে প্রকৃত সুখী হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুক। টলষ্টয় সাংসারিক সুখের নিম্নলিখিত তালিকা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, নগরবাসী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির তাহা অধিগম্য নহে, পল্লীগ্রামের কুটিরবাসী এই সকল বিষয়ে সমধিক সৌভাগ্যশালী।

প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতে হইলে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। উন্মুক্ত আকাশ, বিশুদ্ধ বায়ু, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ, শ্যামল তরুলতা, পশু পক্ষী সকলের সান্নিধ্য—এ সকলই প্রকৃত সুখের কারণ। সভ্যতার অত্যাচারে এই সকল অনায়াসলভ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ নগরে গিয়া নিরাপদে জীবন যাপন করে। সেখানে কল কারখানার কর্কশ শব্দ, গাড়ীর ঘর্ঘর ধ্বনি, কামানের গর্জ্জন, এই সব শুনিতে পায় এবং দূষিত বায়ু সেবন করে।

তাহার পর, কায়িক পরিশ্রম এবং রুচি অনুসারী মানসিক পরিশ্রম উভয়েই প্রকৃত সুখের কারণ। সভ্য জীব প্রথমটা বর্জ্জন করে—ফলে ক্ষুধামান্দ্য অনিদ্রা প্রভৃতিতে তাহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়; এবং অপ্রীতিকর ও অত্যাধিক মানসিক পরিশ্রম করে—ফলে তাহার স্বভাব রুক্ষ হইয়া যায়, সহজেই বিরক্ত হয়, জীবন অশান্তিপূর্ণ হয়। ব্যাঙ্কার, উকীল, রাজকর্ম্মচারী, কেহই নিজ কার্য্যে সন্তুষ্ট নহে।

তৃতীয়তঃ, নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবার—ইহারা সুখের কারণ। কিন্তু সভ্যসমাজে যাহার যত প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছে নিজের পরিবারবর্গ হইতে তাহাকে তত বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। শিশুদের সাহচর্য্যে আনন্দ লাভ করিবার প্রবৃত্তি ও সময় তাহাদের নাই। অশিক্ষিত দাস দাসীর উপর সন্তান পালনের ভার অর্পণ করিয়া তাহারা

এক ভগবদ্দত্ত প্রকৃত সুখ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করে এবং সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করে না।

সমাজে সকল লোকের সহিত অবাধে মিলিয়া জীবন যাপন করা সুখের কারণ। কিন্তু সভ্যসমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সাধারণ মানবের সহিত মিশিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। যে সমানপদস্থ নহে, তাহার সহিত হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে মর্য্যাদাহানি হইবে এই ধারণাতে তাহারা সশঙ্কিত। যাহার পদ যত উচ্চ, তাহার সমানপদস্থ ব্যক্তি তত কম। সকলে যেন কৃত্রিম কারাগার রচনা করিয়া বসিয়া আছে। যে যত বড় লোক তাহার কারাগার তত সঙ্কীর্ণ। যে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক—তাহার প্রায় নির্জ্জন কারাবাস।

সর্ব্বশেষে সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ এক সুখের কারণ। কিন্তু নগর-বাসী ধনীদের অপেক্ষা পল্লীবাসী কৃষকদের শরীর যথেষ্ট ভাল থাকে।

প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত টলষ্টয়ের আরও মতভেদ আছে। টলষ্টয় বলেন দাম্পত্য বন্ধন কোন কারণেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ তিনি divorce প্রথার বিরোধী। ভবিষ্যতে একদিন সকল মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় জাগিয়া উঠিবে এবং ঈশ্বরের বিচার অনুসারে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে—ইহা তিনি মানিতেন না। আত্মার অমরত্ব বলিতে তিনি বুঝিতেন ব্যক্তিগত জীবনের সার্ব্ব-জনীন জীবনে বিলীন হওয়া। ভগবানের নিদেশ অনুসারে জীবন যাপন করিয়া যে তাহার ব্যক্তিগত জীবন এইভাবে সার্ব্বজনীন জীবনে বিলীন করিতে পারে সেই অমর হইল। নচেৎ যে ইহজীবন স্বার্থ এবং সুখানুসন্ধানে অতিবাহিত করে, মৃত্যুর সহিত সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

আমরা এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পৃথিবীতে অন্যায় আছে। সে অন্যায় উচ্ছেদ করিবার উপায় কি? জগৎ বলে, তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ কর। যীশুখৃষ্ট বলেন, বলপ্রয়োগ অন্যায়, এবং বল প্রয়োগ দ্বারা অন্যায়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে না; কিছুকাল

চাপা থাকিতে পারে, কিন্তু অনুকূল অবস্থা হইলে অন্যায় পুনরায় জাগিয়া উঠিবে। অন্যায়কে নিঃশেষ করিবার একমাত্র উপায় প্রেম। যে তোমার অনিষ্ট করিবে, তাহাকে ভালবাস, দেখিবে ক্রমশঃ তাহার অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইবে। এই ভাবে অন্যায়ের যে উচ্ছেদ হইবে তাহার আর পুনরুত্থান হইবে না।

আমাদের দেশে গান্ধি এই আদর্শ প্রচার করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযান করিয়াছিলেন তাহাকে Passive Resistance এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। গান্ধি তাহার নাম দিয়াছেন Soul force। তিনি বলেন আত্মা যখন জড়দেহ হইতে বড় জিনিষ, তখন আত্মার বল জড়দেহের বল অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী হইবে। পাশবিক বল দ্বারা কেহ আত্মাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত জীবনেও গান্ধি সকল প্রকার বিলাস সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া টলষ্টয়ের প্রচারিত উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বিবেকানন্দ স্মরণে।

(শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম এ, পি-এইচ ডি, পি আর এস)

বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যখন মহৎ ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন নানা দিক হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বিচিত্র মহিমা আমাদের মানসপটে আজ মুদ্রিত হইয়া যাইবে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশাল ও বিরাট, সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অতলস্পর্শ। কখনও সেখানে হাস্য কৌতুকের চঞ্চল লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনও তাহা নির্ম্মল উষায় বালার্ক কিরণদীপ্ত সমুদ্রের মত ক্রীড়ামত্ত বালকের স্বচ্ছ ও সরল হর্ষে পরিপূর্ণ, কখনও তাঁহার

অধ্যাত্মজীবনের শান্তি ও গম্ভীরতা অতল, সমুদ্র অপেক্ষাও নির্ব্বিকল্প ও গম্ভীর, আবার কখন বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের মত তাঁহার আত্মা অসীম উদ্বেগপূর্ণ অসীম ব্যথায় প্রপীড়িত, অনাদি ক্রন্দনে বিমূঢ়,—আর ইহাও ঠিক সমুদ্রের মত তাঁহার বিরাট আত্মা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে জুড়িয়া দিয়া—অর্থ ও পণ্যের বিনিময় নহে, শক্তি ও ত্যাগের, বিচার ও ভক্তির, কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিশ্বের যুগধর্ম্মোপযোগী এক অদ্ভুত বিনিময়ের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়াছে;·আর সর্ব্বাপেক্ষা এইটাই ঠিক দিবসের বা রজনীর, জাগরণের বা স্বপ্নের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছা ও উদ্বেগ ভারত-সমুদ্র-তরঙ্গের মত একটির পর একটি আপনি উঠিয়া দেশের মলিনতা ও কলঙ্ক ধুইয়া দিতে চাহিয়াছে, পারে নাই, আবার উঠিয়া শুষ্ক বেলাভূমি বা মরু কান্তারে আছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই ক্লান্তিহীন নিরুদ্যমহীন হইতে যাওয়া এরূপ কাতর হইয়া নিজের অন্তরের শক্তি ও লীলার মধ্যে ফিরিয়া আসা ইহার আদিও নাই অবসানও নাই—"সাগর-লহরী সমানা"। এইটাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্ত্তমান ভারতের আসল ভাবিবার ও সাধন করিবার দিক"। আমি তাঁহার অতলস্পর্শ ব্যক্তিত্বের যেটা একবারে বাহিরের দিক—তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার অধ্যাত্মজীবন নহে,—তাঁহার বাহিরের কর্ম্মের যতটুকু অংশ দেশের কর্ম্মজীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, শুধু এইটুকুর কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

এই সংস্পর্শের কথা আলোচনা করিতে গেলেই আমরা তাঁহাকে যুগপ্রবর্ত্তকরূপে পাই। "পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাস সুলভ দুর্ব্বলতার" যুগে যখনি তিনি "চিকাগোর ধর্ম্মসভায় হিন্দুর বেদান্তবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমান যুগধর্ম্মোপযোগী পরিণামবাদের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন তখন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের মহিমা-প্রচার হয় নাই—সেটা বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার বাণী-প্রচার হইল। কারণ—

বেদান্তবাদ ভারতের শুধু দর্শন নহে, বেদান্তবাদ যে ভারতের কর্ম্ম। ভারতের সমাজ গঠন, ভারতের সামাজিক রীতি নীতি,

ভারতের আচার অনুষ্ঠান, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে ভারতীয় সভ্যতার অধিকারভেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও সমবায়, ত্যাগ ও শক্তির, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ম্ম ও মুক্তির যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ভারত-গঠনের যন্ত্র, আশ্রয় ও আধার হইল—এই বেদান্তবাদ। হিন্দুর মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসার-বিমুখীনতার প্রশ্রয় দিয়া দুর্ব্বলতার নামান্তর মাত্র হইয়াছে তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বৈরাগ্য যে শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে শক্তের ভূষণ, অক্ষমের নহে। হিন্দুর বেদান্তবাদ যেখানে অধ্যাত্ম-জীবনের রসসঞ্চারে অভিভূত ও আবদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ সেই বেদান্তবাদকে কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করিয়া সফল করিয়া তুলিতে আমন্ত্রণ দিলেন। সে আমন্ত্রণ, সে আহ্বান গীতার সেই অমর আহ্বানের মত, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং, ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"—দেশের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, ও স্বীয় স্বরূপজ্ঞানের ও প্রত্যক্ষানুভূতির জ্বলন্ত বিশ্বাসে তাহা পাঞ্চজন্যের আহ্বানের মত শুনাইয়াছিল।

যুগশক্তি বাস্তবিকই মহাপুরুষের এই আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাসন নাই, শিক্ষা নাই, সমাজব্যবস্থা নাই, আমাদের সভ্যতা পরমুখাপেক্ষী হইয়া একবারে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেছিল। বাহির হইতে বণিকের তুলাদণ্ড ও রাজার শাসনদণ্ড হইতে জড়বাদ আপনার গুরুভারে ও প্রভুর খেতাবে গর্ব্বিত ও স্ফীত হইয়া দেশের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম ও বিলাসিতা দেশের চিরন্তন সংযম ও বৈরাগ্যের ভিত্তিকে নষ্ট করিতে উদ্যত। ভারতীয় সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবার, গ্রাম্য সমাজ, নানা সামাজিক সম্বন্ধসমূহ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। সমাজ যখন খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর তখন সত্য সত্যই

একটা বন্ধনীশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই বন্ধনীশক্তি।

পূর্ব্বে দুই জন তাঁহার অগ্রে সমাজ বন্ধনের রজ্জু লইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন ও ভূদেব। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আমরা দুইজনকে তেমন নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। এক জন রহিয়া গেলেন শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আর এক জন শুধু সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, যুগধর্ম্মনির্দ্দেষ্টারূপে, যুগপ্রবর্ত্তকরূপে।

কেমন করিয়া তাঁহার বেদান্তবাদ সমাজকে স্বৈরাচার ও খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিল তাহা বলিতে হইবে না। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাকে ভাল করিয়া জান, অনুভব কর, সমাজের সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহারা আহার ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতেছে, তুমিই রাজারূপে ঐশ্বর্য্য বিভব ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই দীনহীন ভিখারীর বেশে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে দয়া ও প্রেম যাচিতেছ। সমাজ যে তোমারই শরীর। তোমার সুখ দুঃখ অনুভব যে অন্যের, নিখিল প্রাণীর, জগতের সুখ দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া। সমাজের মঙ্গল না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই। সভ্যতার মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি নাই। তিনি আরও বলিলেন, তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট শরীর। তুমি দরিদ্রনারায়ণ দুঃখীনারায়ণ, আতুরনারায়ণের সেবা কর, সেই সেবাতেই তোমার ভিতর যে পূর্ণ অথচ ক্রমবিকাশমান, বিশ্বব্যাপক অথচ জীগিষু আত্মাটি আছে তাহার তৃপ্তি হইবে। সভ্যতার চঞ্চল জীবনে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান যে অপরিসীম শক্তি অথবা ভোগ প্রদান করিতে পারে তাহাতে চরম তৃপ্তি নাই। বৈরাগ্যেই পরম আনন্দ ও বল, সম্ভোগে অতৃপ্তি, অবসাদ ও ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার এই বজ্রগম্ভীর সতর্কবাণী।

বিবেকানন্দ প্রচারিত দর্শন আজ হিন্দু সভ্যতার স্বধর্ম্ম রক্ষার

সহায় হইয়াছে। তাঁহার সেবামন্ত্র আজ নূতন ভারতকে বিচিত্র-ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন ত্যাগ, ও কর্ম্মের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। নূতন সেবাধর্ম্ম যে শুধু সমাজকে খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, লোকহিত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা এক অভিনব ভাবুকতার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়া চলিয়াছে। নূতন ভারতের কর্ম্মের যজ্ঞশালায় তিনিই প্রধান ঋত্বিক। আমাদের এই যজ্ঞের প্রিয়তম ঋত্বিকের পূজা আমার ভারতের নবীন কর্ম্মোপাসনার দ্বারা।

স্বামিজী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সমাজসংস্কার চাহিয়াছিলেন। সমাজকে তিনি কম বিদ্রূপ করেন নাই, কম তীব্র কষাঘাত করেন নাই। সকলের মূলে তাঁহার হিন্দুসভ্যতার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশবাসীর প্রতি অসীম প্রীতি। তাই তিনি যখন তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহা সন্ন্যাসীর স্নেহাশীর্ব্বাদ-রূপে লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণ যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে তাহার তিনি প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যে বিবাহ-কর্ম্মকে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া সমাজে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষার তিনি সংস্কার চাহিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচার তিনি চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন সার্ব্বজনীন; হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ও অধিকারভেদ হইতে তিনি যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, দ্বন্দ্ব ও ভেদজ্ঞাপক, কাহারও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তৃতির বিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তরুণ সন্ন্যাসীর আশা দুর্নিবার, বাসনা অসীম ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও ভোগের আড়ম্বরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গৈরিক-বসনধারী যষ্টিমাত্র সম্বল শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য-সন্ন্যাসী সিদ্ধগুরুর গুরুদায়িত্ব

বরণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য জগতের নিষ্ঠা, প্রেম, সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হইয়া তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে এক অভিনব মন্ত্রে দীক্ষা দিবার ভার লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার দায়িত্ব আরও গুরুতর, কর্ত্তব্য আরও কঠিন হইয়াছিল। তিনি লোকসমূহের যুগ-পরম্পরাসঞ্চিত হলাহল পান করিয়া, বিশ্বসংসারের আর্ত্তি-দুঃখ-ভাবনাদায়ের জটাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া, ললাটে গুরুর আশী-র্ব্বাদের চিরনবীন শশীতিলক ধারণ করিয়া আপনাকে সেই জীবন-মরণজয়ী বৈরাগীর মত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে যেখানে কৃষক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত, তাহার উদ্বেগ ও বেদনা, ভীতি ও নৈরাশ্য তিনি বরণ করিয়াছিলেন, যেখানে মাঝিমাল্লা উজান গঙ্গায় নৌকার দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছে—মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না—তাহার বিশ্বাস ও বল আপনার করিয়া তিনি তাঁহাদের বৈঠা লইয়াছিলেন। কলিকাতার রাস্তায় কুলী যেখানে গুরুভার মোট বহিতে না পারিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপনার দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়াছে, তাহার অদৃষ্টকে তিনি খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন। অসংখ্য, জনপূর্ণ কোলাহলমুখরিত রাজনগরীর উন্মত্তপ্রায় জন-স্রোতের দ্রুতপদসঞ্চার তাহার শিরায় শিরায় কল কল্লোলিনী সুর-তরঙ্গিণী সঞ্চার করিত। জন-সমূহ মনের শক্তি ও উদ্বেগ পূতগঙ্গা-বারির মত বিন্দু বিন্দু এমনি পান করিয়া, সকল লোকের উদ্বেগ আপনার বিরাট বক্ষে এমনি ধারণ করিয়া, তিনি আপনার হৃদয় শান্ত ও শীতল করিতেন।' তাহার পর সেই আনন্দ ও শান্তিধারায় জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম, কুপ্রথাদুষ্ট সমাজ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসমাজ, পরমুখাপেক্ষী দেশবাসী, বিরোধী যুগশক্তির মধ্যে বাংলার পিঞ্জরাবদ্ধ রাজব্যাঘ্রের বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহার ভাগ্যে বিধাতাপুরুষ লিখিয়াছিলেন। বাস্তব ও তাঁহার আদর্শের বিরোধ যে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতে-ছিলেন না, তাই যখন তাঁহার শক্তি ও সাধনার চরম অবস্থা, যখন

তাঁহার অবসন্ন দেহ তাঁহার আত্মার অসীম উদ্বেগের উত্তাপ সহ্য করিতে একবারে অপারগ না হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিধাতপুরুষ তাঁহাকে সেই দেহ হইতে আপনার বিরাট শক্তির ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যদি না পারি, আমার কাজ করিবার জন্য অন্য কেহ নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন,—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

আমার সমানধর্ম্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন—কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের tragedy টুকু, তাঁহার চিত্তের রুদ্ধ আবেগ, তাঁহার হৃদয়ের অনাহত সঙ্গীত, তাঁহার মর্ম্মের অকথিত বাণীই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে ও আঘাত দেয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা আজ বিষম অগ্নিপরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বিবেকানন্দের বৈরাগ্যবাণী আজও শুনে নাই। আমাদের সভ্যতারও সংস্কার হয় নাই। "সেই পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা", যাহার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত জীবন ধরিয়া অসীম অধ্যবসায়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আজও যায় নাই। আমরা মনশ্চক্ষে দেখিতেছি একটা নূতন ভারত—যেখানে লোকে একমন, সমান্তঃকরণ-বিশিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছে, সকলেই আশিষ্ট, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী, জ্ঞানে ও কর্ম্মে, ধর্ম্মানুশীলনে ও বিদ্যাচর্চ্চায়, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সতেজ স্বাধীন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে—সে জীবনে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি কেমন এক সুরে বাঁধা, ইন্দ্রিয়ভোগ কেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত, সেখানে সমাজের প্রত্যেক বিভাগ পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত, পুরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্ম্ম-নির্দ্দেষ্টা, যজমান শিক্ষিত ও অধ্যবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণ, বণিক সাহসিক ও উৎসাহী, কৃষকশিল্পী শ্রমজীবী শিক্ষিত

ও শ্রমকুশল, শ্রমজীবিগণ আপনারাই আপনাদের কারখানার পরিচালনের ভার লইয়াছে, সেখানে হাট হইতে, বাজার হইতে, মুদীর দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ হইতে, মুচী মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে নূতন ব্যক্তিত্বের অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাদের আশা আছে, ভরসা আছে, শিক্ষা আছে, সুবিধা আছে। নারী সেখানে বিদুষী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমাজকে আপনার স্বজনগৃহরূপে পালন করিতেছেন—এই জীবন যখন ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে তখনই বিবেকানন্দের হৃদয়ের অনাগত গীত ও রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হইয়া অসংখ্য নর নারীর হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাহাদের জ্ঞানে ও কর্ম্মে উদ্দাম ভাবে জাগিয়া উঠিবে।

সেই জাগরণের দিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত, সহজ, অবাধ ও স্বাধীন জীবন দেখিব। কারণ তিনি যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহার সফলতা অপেক্ষা ব্যর্থতাই আমাদের নিকট অধিক শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার সেই অধীরতা—"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা, ঢালিব করুণাধারা, জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা"—ইহা তাঁহার তৃপ্তি ও আনন্দ অপেক্ষা আমাদের সাধনার শ্রেষ্ঠতর ধন।

যে দিন সে জাগরণ আসিবে, সে দিন নূতন যুগের নূতন যুগশক্তির উপযোগী কর্ত্তব্য আমরা সম্পাদন করিব—সমাজে, শিক্ষায়, বিদ্যানুশীলনে, রাষ্ট্রশিল্পে, সাহিত্যে আমরা জাতীয় প্রাণধারাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার নূতন ভাবে সকলই গঠন করিয়া তুলিব। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আরও নূতন নূতন জটিল ও দুরূহ সমস্যা উঠিয়াছে। বৈষয়িক সমস্যা, শ্রমজীবিসমস্যা, সমাজ ও রাষ্ট্রসংগঠন সমস্যা, অন্তর্জ্জাতীয় সমস্যা, শান্তি সমস্যা নূতন ভাবে হিন্দু সভ্যতাকে বুঝিতে হইবে ও সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যেই হউক, যুদ্ধাবসানে হউক,—হিন্দু সভ্যতা যদি এখন বাঁচিয়া থাকে তবে ইহা সে করিবেই—কারণ প্রতিক্রিয়াই যে জীবনের চিহ্ন।

সে দিন হিন্দু সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে পরিব্রাজক আবার বাহির হইবেন একটা আত্মঘাতী সভ্যতার হস্ত হইতে শাণিত তরবার কাড়িয়া লইবার জন্য। তিনি হিংসাপ্রপীড়িত পাশ্চাত্য জগৎকে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিবেন, মা হিংস। কাহাকে হিংসা করিতেছ, মারিতেছ, কাটিতেছ,—তোমাকেই ত। আপনাকে কেহ কখনও হিংসা করে না। বিজ্ঞান সভ্যতার শত্রু হইয়াছে। বিজ্ঞান-কাল-সর্পের বিষদন্ত তিনি উৎপাটন করিয়া তাহাকে দিয়া শিব ও সুন্দরের লজ্জা নিবারণ করাইবেন, সত্যের অলঙ্কাররূপে সাজাইবেন। বিজ্ঞান বলিতেছে, হিংসার ভিতর দিয়া জীবের উন্নতি। পরিব্রাজক বলিবেন, জীবের পক্ষে যাহা সত্য, মানুষের পক্ষে তাহা মিথ্যা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতেছে; পরিব্রাজক বলিবেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সমাজ-দেহের অকল্যাণ। জাতিগণ ভূমি ও অর্থলোভে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পরিব্রাজক বলিবেন, জাতির নিকট সাহিত্য, আর্ট, অধ্যাত্ম-সাধনাই আসল সম্পদ্; তাহাই সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির। তাহাদের পুষ্টিবিধানে একের স্বার্থসাধন নহে, সকলের কল্যাণবিধান। বিভিন্ন জাতিসমুদয় নারায়ণের বিরাট আত্মা। প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট সাধনায় ঐ বিরাট ক্রমবিকাশমান আত্মার এক একটি স্বতন্ত্র ভাব ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত, এবং তাহার নিরোধে সেই বিরাট আত্মার হিংসা ও অবমাননা। সে দিন পরিব্রাজক পাশ্চাত্যের সর্ব্বজাতিসভায় অহিংসা, মৈত্রী ও সখ্যের মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিবেন, জাতিতে জাতিতে সখ্যবন্ধনে ও পরস্পরের কল্যাণসাধনে সেই অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাসের প্রীতিসাধন।

রোমীয় সভ্যতার বিজয়ের মোহ, যাহা অতীতের কত শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে, বর্ত্তমান সভ্যতার হিংস্র ও পরশ্রীকাতর জাতীয়তা, যাহা ভগবানের শান্তিরাজ্যে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের আয়োজন করিয়াছে, তাহার এতকাল পরে একান্ত বিনাশ সাধন হইবে। হিন্দুর এই জগদ্বিজয়ের নেতা হইবে গীতার,

নেপোলিয়ন নহে, তাহার উপকরণ হইবে সেনাবল নহে, তাহার নেতা ও উপকরণ হইবে পরিব্রাজক ও বৈরাগী এবং তাঁহাদের অলক্ষ্যে বুদ্ধ, অশোক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের অশরীরী আত্মা চঞ্চল হইয়া আপনাদের শান্তিনিবাস ত্যাগ করিয়া, বিশ্বজগতের অসংখ্য লৌহবর্ত্ম ও বাণিজ্য পথে পরিব্রাজকের অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের বিপুল বিশ্বযজ্ঞের স্বস্তিবাচন করিবেন।

সেদিন বেলুড় মঠের নিভৃত কোঠায় তীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতটে কুললক্ষ্মীগণ স্তবগান করিতে করিতে নির্নিমেষ-নেত্রে প্রাতঃসূর্য্যকে বরণ করিবে, হরিনামগানমত্ত বৈরাগী সেদিন গৃহে গৃহে অধিকতর সময় যাপন করিবে, আগতশ্রী পল্লীগ্রামের কৃষি-শিল্পবিদ্যালয়ে, শ্রমজীবিগণের স্বচালিত কর্ম্মশালায়, আমাদের নৈশবিদ্যালয়সমূহে সেদিন অফুরন্ত উৎসব। সেদিন মায়াবতী ও নৈনীতালের গিরিনিতম্ব নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া অভ্যস্ত পথিকের দৃষ্টি হরণ করিবে, হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে নক্ষত্রখচিত রাত্রি মনকে আরও উদাস ও ব্যাকুল করিবে, কাশীতলবাহিনী গঙ্গা আরও দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হইবে, মাদ্রাজ বন্দরে সমুদ্রতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে তাহাদের হর্ষ জ্ঞাপন করিবে,—আর অনন্ত শস্য-শ্যামলা, সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাংলাদেশের সে রূপের কথা কি বলিব! আপনারা কি সে রূপ দেখিতেছেন? সে জাগরণ কি আসিয়াছে? বিবেকানন্দ কি আসিয়াছেন? আপনারা অনুভব করিতেছেন, আপনারা বলুন।

সেই জীবনই ধন্য যাহা বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে, যাহা অতীত হয় না, এবং যাহা বর্ত্তমান ও অতীতের সমস্ত সঞ্চিত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া নূতন ভাব ও রূপ গ্রহণ করিতে করিতে চির অগ্রসর।*

* বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক স্মৃতিসভায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার।)

(৩)

স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে আমাদের মন যেন কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। বাহ্যস্তরের মানসিক ক্রিয়া সকলই আমরা জাগ্রৎকালে জানিতে পারি; কিন্তু নিম্নস্তরে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহা আমাদের জাগ্রৎকালে অনুভূত জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারি না; তথাপি ঐ স্তরের (Subconscious) ক্রিয়া সকলই আমাদের বাহ্য জ্ঞানগোচর মানসিক ক্রিয়া সকলকে প্রধানতঃ নিয়মিত করিয়া থাকে। সাধক গাহিয়াছেন,—

'ঘুমাইলে যে জেগে থাকে সে তোমার গুরু বটে—আছে সে দেহের মধ্যে, ধ্যান কর তায় অকপটে'—এই গীতি দ্বারা তিনি কি মনের ঐ অজ্ঞাত স্তরের প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

ডাক্তার ফ্রুড (Freud) মনের ঐ নিম্নস্তরের ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কামনাসমূহ কেবল যে আমাদের মনের বাহ্য স্তরে থাকে এমত নহে, কিন্তু নিম্নস্তরও উহাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়; তবে ঐ বিষয় আমরা সাধারণতঃ জাগ্রৎ অবস্থায় উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার অনেক অপ্রীতিকর বিষয় আমরা নিজের নিকট প্রকাশ হইতে দিই না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ—উহারই নাম আত্মবঞ্চনা। ঐ আত্মবঞ্চনারূপ বিনাশের পথে মানব কি প্রকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তাহা গীতাকার এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

২য় অধ্যায়—৬২, ৬৩।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মা আমায় ঘুরাবি কত ;
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের হাটে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি মা তোর অভয় পদ ॥

মনস্তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত সত্যই উহার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। আমাদের মনের চক্ষে কাম বা কামনার ঠুলি রহিয়াছে বলিয়াই আমরা ভবের হাটে ঘুরিতেছি, অথচ আপনাকে চক্ষুষ্মান বলিয়া মনে করিতেছি। মনের নিম্নস্তরে অবস্থিত সংস্কারগুলিকে যখন আমরা ধরিতে পারিয়া দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইব তখনই আর আমাদিগকে সংস্কারসমূহের ঠুলিদ্বারা চালিত হইতে হইবে না।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামকাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে মনের নিম্নস্তরের বাসনাসমূহকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। মনের নিম্নস্তরকে কামনাশূন্য বা হীন সংস্কার-রহিত করিতে না পারিলে সাধক পূর্ণ সংযমে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং ঐ বিষয় যে করিতে পারা যায় তাহা তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা—

নিদ্রার সময়েও কাঞ্চনস্পর্শমাত্র তাঁহার হস্ত সঙ্কুচিত ও অবশ হইয়া যাইত। ব্যাধি আরোগ্য হওয়া অথবা অন্য কোন হীন কামনার সিদ্ধির জন্য তাঁহার পদধূলি লইলে তিনি পদতলে বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। মনের অন্তরতম স্তর হইতে হীন কামনা-সমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার নিদ্রাদি

সময়েও দেহ ঐ ভাবে স্বতঃ নিয়ন্ত্রিত হইত—উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

মনের নিম্ন বা অন্তরতমস্তরসমূহে কামকাঞ্চনাসক্তির মূল নিহিত থাকায় উহা আমাদের জাগ্রৎ মনের প্রবৃত্তি সকলের পরিচালক হইয়া রহিয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে; তথাপি উহা যে অপর অসাধারণ বিভূতি সকলের আধার, তাহা স্বপ্নাবস্থার প্রত্যক্ষ সকলের দ্বারা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়।

স্বপ্নে কখন কখন নূতন রকমের মানসিক ক্রিয়ার প্রকাশ দেখা যায়। ইহাকে clairvoyance অথবা স্বপ্নের দূরবর্ত্তী পদার্থ দেখিবার শক্তি বলা যাইতে পারে। ইহাতে স্বপ্ন দর্শনকারী দূরের ঘটনার ঠিক অনুরূপ দর্শন করেন, অথবা ভবিষ্যতের ঘটনার স্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস অপেক্ষা দূরের ঘটনার অনুরূপ দর্শনই অধিক সময় হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে স্বপ্নের সংজ্ঞা অনুসারে ভবিষ্যৎ ঘটনা বুঝিয়া লইবার প্রথাও প্রচলিত আছে। যেমন আমাদের দেশে স্বপ্নে সর্পদংশন বংশবৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া প্রবাদ আছে। দৈবক্রমে কখন কখন ঐরূপ হইয়াও থাকে। কিন্তু সকল স্বপ্নই যে কোন না কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রকাশ করে, ঐ বিষয় বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও প্রমাণিত হয় নাই।*

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি স্বপ্নে কিরূপে অজ্ঞাত মনের লুপ্ত স্মৃতি এবং জাগ্রৎ মনেরও অস্পষ্ট অনুভূতি-

---

* আমাদের দেশে 'কাকচরিত্র' পুস্তকের মত স্বপ্নব্যাখ্যা করিবার জন্য কতকগুলি পুস্তক আছে। এগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত নহে। পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ কাকচরিত্রের মতন স্বপ্নব্যাখ্যা-পুস্তক অনেক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজীতে Dreams,—Scientific and Practical Interpretations—by G. H. Muller বলিয়া একখানি পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও এই পুস্তকের নাম স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে, তথাপি বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহার মূল্য কাকচরিত্রের মত।

সমূহের পুনরুদ্ধার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াগিয়াছেন—

"অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম, প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ঐ কথা অন্যপ্রকারে এইভাবে বলা যাইতে পারে,—মানবের ভিতর যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনও জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে পারিত না।"

মনের যে অংশ আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া রহিয়াছে এবং স্বপ্ন দ্বারা যাহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় আমরা ঐরূপে মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি তাহা কি পূর্ব্বোক্ত এই সুপ্তব্রহ্মেরই ক্ষমতা? মনের নিজের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা ঐ অজ্ঞাত অংশ স্বপ্নকালে তথ্য আবিষ্কার করিয়া জাগ্রৎ মনকে জানাইয়া দিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে. নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল।

মারকয়েস দে কণ্ডারসে (Marquess de Conderect) একজন প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তিনি ২২বৎসর বয়সের সময় জটিল অঙ্কশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি যখন অঙ্কশাস্ত্রের কোন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিতেন না, তখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন; স্বপ্নে তাঁহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইত, এবং তিনি জাগিলে উক্ত সমাধান তাঁহার স্মরণ থাকিত। লেখকের নিজ জীবনেরও একটি ঘটনা স্মরণ আছে যাহাতে তিনি জ্যামিতির একটি কঠিন সমস্যা নিদ্রিত অবস্থায় সমাধান করিয়া ছিলেন। কেবানিস্ (Cabanis) জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল কূট রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিতেন না, নিদ্রিত অবস্থায় সেই সকলের মীমাংসা হইয়া যাইত।

একজন আইনব্যবসায়ী একটি জটিল মকদ্দমার কাগজপত্র পড়িয়া উহার মর্ম্মোদ্ধার ও তাঁহার মক্কেলের স্বপক্ষের হেতুগুলি

সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সেই মকদ্দমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী রাত্রে লক্ষ্য করেন যে, তাঁহার স্বামী হঠাৎ রাত্রে উঠিয়া কতকগুলি কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐরূপ কতকক্ষণ লিখিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার মকদ্দমার বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যেন স্বপ্নে এই বিষয়ের অতিসুন্দর মীমাংসা করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী গতরাত্রের লিখিত কাগজগুলি বাহির করিয়া দিলেন। স্বামী স্বহস্তলিখিত এই মকদ্দমা সম্বন্ধে এরূপ সুযুক্তিপূর্ণ মীমাংসা করা রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

টারটিনি (Tarteni) বলিয়া একজন সঙ্গীতজ্ঞ 'শয়তানের রাগিণী' (Devil's Sonata) বলিয়া একটি নূতন রাগিণী পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে সংযোজিত করিয়াছেন। এই রাগিণী আবিষ্কারের ইতিহাস এইরূপ। তিনি একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি যেন আপনাকে শয়তানের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ Faust (ফষ্টের) গল্পের মতন তাঁহার শয়তানের সহিত সর্ত্ত হইল যে, কিছুদিনের জন্য শয়তান তাঁহার দাসস্বরূপ হইয়া আজ্ঞা পালন করিবে, পরে ঐ কার্য্যের মূল্যস্বরূপে শয়তান তাঁহার আত্মার অধিকারী হইবে। পরে তিনি তাঁহার নিজের বেহালা শয়তানকে দিয়া তাহাকে একটি গৎ বাজাইতে অনুরোধ করেন। শয়তানের বাদ্য এরূপ অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুন্দর হইল যে টারটিনি জাগিয়া উঠিয়া লাফাইয়া নিজের বেহালা হস্তে লইলেন। শয়তানের নিকট শুনা সুর তাঁহার কানে তখনও ঝঙ্কার দিতেছিল। যে সুর স্বপ্নে শুনিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজের বেহালায় আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাহা শুনিয়াছিলেন, ঠিক তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তবে যতটা পারিয়াছিলেন তাহা 'শয়তানের রাগিণী' বলিয়া পাশ্চাত্যের সঙ্গীত-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সাহিত্যও স্বপ্নলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আর এল ষ্টিভেন্‌সন্ (R. L. Stevenson) স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য লইয়াই গল্প লিখিতেন। তিনি একটি গল্পের বিষয় স্থির করিয়া লইয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতেন। স্বপ্নে তাঁহার গল্পের নায়ক নায়িকা প্রভৃতি যেন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া গল্পের অভিনয় করিত। তিনি প্রত্যহ স্বপ্নে যাহা দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। একদিনের স্বপ্নে সমস্ত গল্পটি ফুরাইত না। পূর্ব্বরাত্রে যাহা স্বপ্ন দেখিতেন পরের রাত্রের স্বপ্ন তাহার পরের ঘটনা হইতে আরম্ভ হইত। এইরূপে গল্প চলিত। জেমস্ পেন, (James Payne) যিনি একজন বিখ্যাত লেখক, তিনি একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন, ষ্টিভেন্‌সন্ (Stevenson) নিজের স্বপ্নলব্ধ অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (Dr. Jekyll and Mr Hyde) লিখিয়াছেন।

ডাক্তার ফ্রুড কবিত্বের একটি চমৎকার কৌতূহলপ্রদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবিত্ব আমাদের বাহ্য বা জাগ্রৎ মনের ব্যাপার নহে, যে মনের দ্বারা আমরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, ইহা সেই অজ্ঞাত মন হইতে উদ্ভূত। এই জন্য কবিতার ভাব অনেক স্থলে স্বপ্নময়। স্বপ্ন যেমন ভাবগুলিকে অনেকস্থলে চিত্রাকারে অঙ্কিত করিয়া যায়, কবিতাতেও ভাবসমূহ সেইরূপ চিত্রের আকারে অঙ্কিত হয়। স্বপ্নের ভাবের ন্যায় কবিতার ভাবও অনেক স্থলে সহজ বোধ্য হয় না, তথাপি তাহা আমাদের সেই অজ্ঞাত মনের নিম্নস্তরের তন্ত্রীতে এমনভাবে প্রতিঘাত করে যে আমরা তাহার সকল অর্থ সম্যক্ নির্দ্দেশ ও প্রকাশ করিতে না পারিলেও উহার ভাব বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, একজন উচ্চকার্য্যে ব্রতীর মনের গভীর স্তরে এই ভাব রহিয়াছে যে, তিনি কখনও লোক প্রতিষ্ঠা চাহিবেন না, হয়ত তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি মানগাছের গোড়ায় ছাই ঢালিতেছেন, কিন্তু এই স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন হইতেও

পারে যে বহুদিন পূর্ব্বে, তিনি "মানের গোড়ায় না দিলে ছাই, মান কি মিলে কথার ছলে", এই সঙ্গীতের ঐ চরণটি শুনিয়াছিলেন।

কবিতাতেও কবির মনের অনেক গূঢ় ভাব তাহার নিজের অজ্ঞাতে চিত্রাকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "সোনার তরী" কবিতাটির আমরা উল্লেখ করিতে পারি। এইরূপ কবিতার অর্থ স্পষ্ট নহে বলিয়া কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্পষ্টার্থ কবিতা অপেক্ষা এই শ্রেণীর কবিতা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। তিনি, "সোনার তরী" কবিতার সমালোচনা উপলক্ষে এই শ্রেণীর কবিতাকে অর্থহীন কবিতা বলিয়া বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি ফ্রয়েডের কথা সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় স্বপ্নের মত কবিতার অন্তর্নিহিত গূঢ়ভাব এবং ইঙ্গিতই যেন কবিতাকে অধিকতর প্রাণময় করিয়া তুলে। দৃশ্যহিসাবে 'সোনার তরীর' চিত্র এইরূপ, "চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত ক্ষেত্রের মধ্যে কেহ তাঁহার বহুদিনের পরিশ্রমে যে ধান্যগুচ্ছ ফলবতী হইয়া সুপক্ক হইয়াছে সেই রাশি রাশি ধান্য কর্ত্তন করিয়া স্তূপ করিতেছেন;—তিনি সোনার তরীতে তাঁহার সেই ধান্য অথবা স্বকৃত কর্ম্মফল রাশি তুলিয়া দিলেন কিন্তু ঐ তরীতে তাঁহার নিজের স্থান হইল না, তিনি রিক্ত হস্তে নদী তীরে একাকী পড়িয়া রহিলেন।" এই চিত্রে কবির অন্তরের গূঢ় আত্মসমর্পণের ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে, "চির জীবনের সকল ফল সোনার তরীতে তুলিয়া দিব, কিন্তু নিজে সে তরীতে স্থান জুড়িয়া রহিব না। কর্ম্মফল জগৎকে দান করিব, কিন্তু প্রতিষ্ঠা হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিব" এই গূঢ় ভাবটি এইরূপে চিত্রাকারে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের সহজ বোধ্য না হইলেও আলোকরশ্মি যেমন ইথারে স্পন্দন উৎপাদন করে, তেমনি কবির ঐভাব আমাদের ভাব-রাজ্যে একটি অনুভূতির কম্পন উৎপাদন করে, ভাব ভাবকে স্পর্শ দ্বারা সজাগ করিয়া তুলে সুতরাং অর্থ স্পষ্ট না বুঝিলেও মনে

হয় যেন কবিতার সুরের সহিত আমাদের মনের সুরটিও মিলিয়া যাইতেছে।

কবিতার সহিত স্বপ্নের অপর এক মিল, দ্ব্যর্থবোধক বাক্যে। যেমন "মানের গোড়ায় না দিলে ছাই, মান কি মিলে কথার ছলে" এখানে এক 'মান' শব্দটিই দ্ব্যর্থবোধক হইয়া কবিতাকে প্রাণময় করিয়াছে। অর্থের হিসাবেও গোল নাই, মান গাছের গোড়ায় ছাই দিলে মান গাছ যথার্থই বৃদ্ধি পায়, সম্মান তুচ্ছ করিলে রাশি রাশি সম্মান আপনা হইতে আসিয়া জুটে, ইহাও সত্য। আবার দ্ব্যর্থবোধক "মান" শব্দটি কবিতায় এইরূপ ভাবে গ্রথিত করায় ভাবটি যেরূপ সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহা অনেক কথাতেও সেইরূপ বুঝান যাইত না। এখানে কবিতার সহিত স্বপ্নের আর একটি মিল উল্লেখ করা যায়, সেটি অল্প কথায় ভাবকে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা। ফ্রুড বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ঐরূপ চিত্র সহায়ে ভাব প্রকাশ কেবল কবিতাতে নহে, সাধারণ হাস্য কৌতুকেও যে রস থাকে তাহাতেও লক্ষিত হয়। পরিহাসে অনেক সময়ে একটি সামান্য শব্দের ভিতর অনেক অর্থ থাকে। ফ্রুড বলেন এই পরিহাসরসও আমাদের সাধারণ মনোজগতের নহে, ইহা স্বপ্নরাজ্যের মনের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অতএব রূপকে, দ্ব্যর্থযুক্ত বাক্যে, অথবা সঙ্ক্ষিপ্তের মধ্যে বহুলার্থের যাহাতে প্রকাশ সেইরূপ রসিকতা সমুদয়ে তাঁহার মতে স্বপ্ন-রাজ্যের ছাপ মারা রহিয়াছে। একজন অপরের ভাবকে একটি ভাবময় চিত্র গঠন করিয়া পরিহাসচ্ছলে আঘাত করিল, সেও আবার সেইরূপেই তাহার পাল্টা জবাব দিল। এইরূপ ভাব-রাজ্যের চিত্রে বস্তুতন্ত্রতা থাকে না, তথাপি উহাতে স্বপ্নরাজ্যের ব্যাপারের ন্যায় পরস্পরের ভাবের উপর ঘাত প্রতিঘাত হয়। একজন বন্ধুকে রসিকতা করিয়া বলিতে চায় যে "তুমি ছুটী লইয়া বেশ মদ খাইয়া কাটাইতেছ।" সে তাহার বন্ধুকে লিখিল তোমার Alco-holidays কেমন কাটিতেছে?" Alcohol এবং holidays এই

দুইটি কথা মিলাইয়া (Alcoholidays) একটি নূতন সংক্ষিপ্ত কথা সৃষ্টি করিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল, এখানে এইটিই রসিকতার প্রাণ। ফ্রেড দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বাক্যসমূহের ঐরূপ অপূর্ব্ব জমাটবাঁধা (condensation) স্বপ্নরাজ্যের অনুকরণে হইয়া থাকে। ফ্রেড পাশ্চাত্য দেশ-প্রচলিত রসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রসিকতা বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশ-প্রচলিত রসিকতার মধ্যে খুঁজিলেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সেকালের রসিকতার দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, এইটিতে দ্ব্যর্থ সহায়ে ভাবের দ্বারা ভাব প্রতিহত হইতেছে বুঝা যায়।

একজন ব্রাহ্মণ পথে যাইতে যাইতে একটি শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন। তিনি একটু অধিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং নিজেকে বিজ্ঞ বলিয়া জানেন। অতএব এই মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গ যদি কোন নীচজাতির স্থাপিত হয় তবে তাঁহার মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রণাম করা উচিত নয়, অথচ শিবপ্রণাম করাও শাস্ত্রাদেশ। অতএব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন ঐ সময় আর একজন ব্রাহ্মণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বোধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কিম্ অয়ম্ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভূঃ ?

এই শম্ভু কি স্বয়ম্ভূ ? অর্থাৎ অন্যের দ্বারা স্থাপিত না মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন ?

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"নায়ম্ স্বয়ম্ভূঃ কিন্তু শম্ভুঃ"

ইনি স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু শিব।

তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মণ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"স্বয়ং ভূ ভবতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কিম্ স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুঃ ন উচ্যতে।" আপনা হইতে হইয়াছেন এইরূপ ব্যুৎপত্তি ভাবিয়া কি শম্ভুকে স্বয়ম্ভূ বলা যায় না ?

ইহাতে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,

"গচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ অপি গো।"

চলিয়া বেড়াইতে পারেন, যদি এই ব্যুৎপত্তি ধরা যায় তাহা হইলে আপনিও গরু।

এখানে এই রসিকতায় ভাবের দ্বারা ভাবকে আঘাত করা হইতেছে। প্রথম ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যাভিমানে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যুৎপত্তি অর্থ ধরিয়া আপনিও গরু এই রসিকতা দ্বারা আঘাত করিলেন। অথচ এখানে গচ্ছতি হইতে গো শব্দের উৎপত্তি ইহাও শব্দশাস্ত্রসঙ্গতই বটে।

শব্দের মারপেঁচে এইরূপ এককে বিভিন্নরূপে দেখানো যাইতে পারে। স্বপ্নে সেটি চিত্রের হিসাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যেমন wall streetকে দ্বিতীয় প্রবন্ধে কুমারী দেয়াল দেখিয়াছিল, ইহাতে শব্দের অর্থের সহিত ভাবের অর্থ যে দেয়াল তাহা হইতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশ্চর্য্য সঙ্গতি দেখা যায়। সেইরূপ এখানে "গচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ অপি গো" এই শব্দার্থের সঙ্গতির সহিত ভাবের অর্থ শিব প্রণাম করিতে গিয়া যে এইরূপ বাছাবাছি করে সে গরু ভিন্ন আর কি ? এই ভাবার্থেরও সঙ্গতি রহিয়াছে। এইরূপ শব্দার্থের সহিত ভাবার্থের সুস্পষ্ট মিল, কবিতায় পরিহাসে ও স্বপ্নে দেখা যায়।

কবিতার সহিত স্বপ্নের আর একটি মিল আছে। চিত্রাকারে নাটকীয় দৃশ্যের ঘটনাবলীর ন্যায় যে সকল ভাব আকার ধারণ করিয়া স্বপ্নে আমাদের মনোরাজ্যে পরিস্ফুট হয়, সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার অস্তিত্ব যেমন সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, কবিতাতেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে কবির অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞান বা মায়া।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

যে জন্য আমরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিরূপ মহান্ দুঃখাদি ভোগ করি, কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পরে নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে থাকি, নিজেরা মহান্ হইলেও নিজকে অতি ক্ষুদ্র মনে করি, যাহার নিবারণে আমাদের সকল দুঃখের নিবারণ হয়, যাহার অপসারণে সকল আবরণ অপসারিত হয়, যাহার নিবৃত্তিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহাই অজ্ঞান। স্বস্বরূপ আত্মা কালত্রয় কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন হইলেও এবং সেই আত্মস্বরূপ প্রকৃত বস্তু হইলেও যে কারণে উহাকে আমরা প্রকৃত বস্তুরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না এবং আত্মা নির্ব্বিকার, নিরবয়ব হইলেও যে জন্য উহাকে বিকারী সাবয়ব বলিয়া মনে করি, তাহাকে অজ্ঞান বলে।

যে অজ্ঞান নির্ব্বিকার, নিরবয়ব, কালত্রয় কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে যেন বিকারী, সাবয়ব ও কালত্রয় কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন বোধ করাইতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহা সৎ না অসৎ?

অজ্ঞান সৎ নহে, কারণ জ্ঞানোদয়ে ইহা থাকে না এবং উহা শশবিষাণের ন্যায় অসৎও নহে; যেহেতু ঐ অজ্ঞানই 'ব্রহ্ম যেন অবস্তু' এইরূপ বোধের কারণ। যাহা অসৎ তাহা কখনও কারণ হইতে পারে না সুতরাং অজ্ঞান সৎও নহে অসৎও নহে অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা কি অভাব পদার্থ?

উহা অভাব পদার্থ নহে; কারণ শ্রুতিতে আছে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" অর্থাৎ অজ্ঞান অজ, এক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। শ্রুতিতে দেখা যায় যে কোনও কোনও মহাপুরুষ এই অজ্ঞানকে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ-

নিগূঢ়া"। মায়ার কার্য্য দ্বারাও মায়া যে অভাব পদার্থ নহে ইহা অনুমান করা যায়।

এই অজ্ঞান যদি অভাব পদার্থ না হয় তাহা হইলে ইহার নিবৃত্তির উপায় কি?

এই অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা ইহার নিবৃত্তি করা যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

আমাদের অজ্ঞতা আমরা অনেকসময়ে উপলব্ধি করিয়া থাকি, ইহাই অজ্ঞান যে অভাব পদার্থ নহে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুষুপ্তি অবস্থা তাহার একটি বিশেষ উদাহরণস্থল। সুষুপ্তিকালে যে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম, ইহা জাগ্রৎ হইবার পর বেশ অনুভব করিয়া থাকি।

মায়া ত্রিগুণাত্মক ও ভাবরূপ হইলেও 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপ বলিয়া স্থূল পদার্থের ন্যায় দেখাইতে পারা যায় না সুতরাং মায়া 'যৎকিঞ্চিৎ' এইরূপ বলা হয়।

"জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" ইহাও বলা যায় না। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান এইরূপ ভাবে কথাটির অর্থ করিয়া থাকি বটে কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বস্তুতঃ কখনও জ্ঞানের অভাব হয় না; শাস্ত্রে চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, বুদ্ধিবৃত্তিকেও কেহ কেহ জ্ঞান বলে, আবার কেহ কেহ জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অজ্ঞান এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে কোন্ প্রকার জ্ঞানের অভাব? তদুত্তরে বলা যায়, প্রথমোক্ত জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যই জ্ঞান, উহা নিত্য, সুতরাং সে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, উহা স্বয়ং জড় এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যব্যাপ্ত হইয়াই বস্তু প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত বস্তু প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে তখন উহা জড়। কিন্তু চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া লোকে তাহাকে

জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন জড় তখন উহা জ্ঞান নহে। সুতরাং অজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিরূপে উল্লিখিত জ্ঞানের অভাবও নহে। জ্ঞান নামক আত্মগুণের একেবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ, যখনই "আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" বলিবে তখনই তোমার জ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে। সে সময়ে অন্য প্রকার জ্ঞান না থাকিলেও অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার অনুভব যে জ্ঞান দ্বারা হইয়াছিল সেই জ্ঞান ছিল সুতরাং তৃতীয় প্রকার আত্মগুণরূপ জ্ঞানের অভাবও সম্ভবপর হইল না। অতএব অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবরূপী নহে উহা যৎকিঞ্চিৎ।

ব্রহ্মের শক্তি মায়া—জগৎকারণ সম্বস্ত যে ব্রহ্ম তাহা হইতে পৃথক্ সত্তা রহিত যে পরমাত্মশক্তি তাহাই মায়া। যেমন দাহ আদি কার্য্য দেখিয়া অগ্নির শক্তি অনুমান করা যায় তদ্রূপ জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মের মায়া শক্তি অনুমান করা যায়। কারণ, কার্য্য ব্যতিরেকে যখন কোন বস্তুর শক্তি বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মের শক্তি মায়া হইলেও এবং তাহার পৃথক্ সত্তা না থাকিলেও ব্রহ্মের স্বরূপ মায়া এইরূপ বলা যায় না। যেরূপ অগ্নির দাহিকাশক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না কিন্তু অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ সেইরূপ ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি মায়া অভেদ।

ব্রহ্ম ও মায়া যদি অভেদ হয়, তাহা হইলে মায়ার নাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরও নাশ হইতে পারে ?

অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ হইলেও যেমন মণিমন্ত্রাদির দ্বারা অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ব্যবধান হইলে পর তখন সেই অগ্নির দাহিকাশক্তির অভাব হইলেও অগ্নির অস্তিত্ব থাকে তেমনি মায়ার নাশ হইলেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে।

মায়া স্বতন্ত্রা ও অস্বতন্ত্রা—মায়া চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং মায়াকে স্বতন্ত্র বলা যায় না। চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়ার প্রকাশ হয় না বলিয়া মায়া অস্বতন্ত্রা। আবার অসঙ্গ চৈতন্যকে যেন সসঙ্গ করে বলিয়া অর্থাৎ পটকে আশ্রয় করিয়া রং যেমন নানা-

প্রকার লোহিত, পীত চিত্রের সৃষ্টি করে সেইরূপ অসঙ্গ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়া আকাশাদি বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে বলিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায়।

মায়া ঐন্দ্রজালিক শক্তি—মায়ার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং উহার কার্য্য বিচার করিতে যাইয়া উহাকে এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তি ব্যতিরেকে অন্য আখ্যা দিতে পারা যায় না। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বটবৃক্ষের সৃষ্টি হইল! কি প্রকারেই বা এই বিশাল বটবৃক্ষের স্থিতি সেই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সম্ভবপর হইল। মায়ার এই সকল কার্য্যকে অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কি বলা যায়। অতএব মায়া এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তি।

মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী—অসঙ্গ নির্গুণ ব্রহ্মকে বিকার না করিয়াই কিরূপে মায়া এই জগৎ রচনা করিল? মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সুতরাং ব্রহ্মের বিকার না করিয়াই সে গিরি, নদী, বন কত কি সৃষ্টি করিয়া থাকে। মায়া চমৎকারা, তাহার পক্ষে সবই সম্ভবপর? যেমন জলের দ্রবত্ব, প্রস্তরের কঠিনত্ব, বায়ুর স্পন্দনত্ব, আকাশের শব্দত্ব ও অগ্নির দাহকত্ব শক্তি, সেইরূপ মায়ার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি।

মায়া ব্রহ্মের এক পাদে স্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাহিতেন "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে"। মায়া চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে মায়া ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে স্থিত। ব্রহ্মের শক্তি যদি মায়া হয় তাহা হইলে তাঁহার একাংশে ঐ শক্তি আছে ও অন্যাংশে নাই, এইরূপ সম্ভাবনা কি প্রকারে হইবে? উহা সম্ভবপর। যেমন মৃত্তিকাতে ঘটত্ব শক্তি আছে বটে কিন্তু উহা সকল রকম মৃত্তিকাতে নাই, কেবল মাত্র নরম মৃত্তিকাতেই আছে। ঐরূপ এই মায়া শক্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মের এক পাদে আছে, আর অপর তিন পাদ মায়াতীত।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান—বাস্তবিক পক্ষে মায়া এক হইলেও সমষ্টিভাবেই ইহাকে এক বলা হয় কিন্তু ব্যষ্টিভাবে ইহা অনেক

এইরূপ ব্যবহার হয়। যেমন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" এস্থলে "মায়াভিঃ" এই বাক্যে বহুবচন ব্যবহার হইয়াছে। মায়া এক হইলেও এস্থলে ব্যষ্টি মায়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তজ্জন্য বহুবচন হইয়াছে। যেমন 'বন' এই কথা বলিলে আমরা বহু বৃক্ষের সমষ্টি বুঝি, যেমন বহু নদী কূপ তড়াগাদির সমষ্টিকে এক জলাশয় বলি, সেইরূপ অন্তঃকরণ ও উপাধিভেদে নানারূপে প্রতীয়মান জীবগত অজ্ঞান সমুদয়ের সমষ্টিকে এক মায়া বলা হইয়াছে। যেমন বনের ব্যষ্টি এক একটি বৃক্ষ তেমনি সেই এক অজ্ঞানের ব্যষ্টি প্রত্যেক জীবগত অজ্ঞান।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞানে ভেদ—জীবগত নিকৃষ্ট অন্তঃকরণ-উপাধি-যুক্ত বলিয়া ঐ অজ্ঞান ব্যষ্টি ও মলিন সত্ত্বপ্রধান, এবং রাগাদিদোষশূন্য সকল প্রপঞ্চের মূল সমষ্টিঅজ্ঞান উৎকৃষ্ট উপাধিযুক্ত বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই ত্রিগুণ-ময়ী। তন্মধ্যে সমষ্টি মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি মায়া মলিন সত্ত্ব-প্রধান। রজঃ ও তমোগুণ কর্তৃক সত্ত্বগুণটি মলিনীকৃত বলিয়া এবং ব্যষ্টি অজ্ঞান তমঃপ্রধান বলিয়া উহাকে মলিন সত্ত্বপ্রধান বলে এবং সমষ্টি অজ্ঞান সত্ত্বগুণপ্রধান অর্থাৎ তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য আছে সেই হেতু উহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান বলা হইল।

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি—অজ্ঞানের দুইপ্রকার শক্তি আছে আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণের অর্থ অপ্রকাশ রাখা ও বিক্ষেপের অর্থ অন্য প্রকার দেখান। সূর্য্যমণ্ডল অতি সুবিস্তীর্ণ হইলেও যেমন এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ কেবল মাত্র চক্ষু আচ্ছাদন করিলে সাধারণ ব্যক্তি মনে করে যে সেই সুবিস্তীর্ণ সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইয়াছে, সেইরূপ অবিবেকী পুরুষের জ্ঞান মাত্রকে যাহা আচ্ছাদিত করিয়াছে তাহা অনাদি অনন্ত অসঙ্গ ব্রহ্মকেও অপ্রকাশ করিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক আচ্ছাদিত করে নাই। যে শক্তি এই ব্রহ্মের উপরোক্তভাবে আচ্ছাদকরূপে কার্য্য করে উহাই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। শক্তি এই অর্থে বলা হইতেছে যে নিত্যমুক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অপ্রকাশ রাখিতে সমর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের এক পাদে

মাত্র মায়া অবস্থিত, সুতরাং অজ্ঞান তাঁহার একপাদে থাকিয়া অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে না কিন্তু সামান্য ব্যক্তির অল্প জ্ঞান মাত্রকে আচ্ছাদন করে এবং তজ্জন্যই সাধারণ ব্যক্তি স্বস্বরূপ অজ্ঞাত থাকে। ইহাই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। উহা যেমন রজ্জুর স্বরূপ অজ্ঞাত থাকায় তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, যেমন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ অকর্ত্তা যে স্বস্বরূপ আত্মা তাহা অজ্ঞাত থাকায় সেই আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী ও দুঃখী ইত্যাদি মনে করে। অজ্ঞান অবিবেকী পুরুষের জ্ঞানকে আচ্ছাদন করায় সে তাহার অকর্ত্তা, অভোক্তা স্বস্বরূপ জানিতে পারে না এবং সে ভ্রমবশতঃ আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদি কল্পনা করে।

অজ্ঞানের যে শক্তি সেই নিত্য মুক্ত আত্মাকে অনিত্য, বদ্ধ বলিয়া বোধ করায় অর্থাৎ যাহা যা নহে তাহাকে সেইরূপ দেখায়, যেমন রজ্জুকে সর্প দেখায়, তাহাকে উহার বিক্ষেপ শক্তি বলে। যুক্তির দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দেখান হইল; এক্ষণে অনুভব প্রমাণ দ্বারা উহা স্থির করা যায় কিনা দেখা যাউক। যদ্যপি কোনও জ্ঞানী পুরুষ কোন অবিবেকী পুরুষকে কূটস্থচৈতন্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে সে অবশ্যই বলিয়া থাকে যে কূটস্থচৈতন্য কি তাহা আমি জানি না। নিজে নিত্যমুক্ত কূটস্থচৈতন্য হইলেও তাহার নিকট উহা প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সে সেই কূটস্থচৈতন্যের অপ্রকাশ অনুভব করে সুতরাং উহার কারণ অজ্ঞানের ঐ আবরণ শক্তি। কাহারও কাহারও মনে এইরূপ তর্কও উপস্থিত হইতে পারে যে আলোক ও অন্ধকার যেরূপ একত্র সম্ভবপর নয় সেইরূপ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ কূটস্থ-চৈতন্যের অজ্ঞানও অসম্ভব; সুতরাং অজ্ঞানের আবরণ শক্তিও সম্ভব-পর নহে কিন্তু ঐরূপ আবরণ শক্তির যখন অনুভব হইতেছে তখন আর তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না এবং নিজের অনুভবেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ অসম্ভব। কারণ তর্কের সমাপ্তি নাই অর্থাৎ একজন তর্ক দ্বারা এক প্রকার

সিদ্ধান্ত করিল, অপর একজন তদপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহা খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যদিও তর্কদ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় হয় না তথাপি নিজের অনুভবের অনুকূল তর্ক আলোচনা করা উচিত কিন্তু কুতর্ক করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে তত্ত্ব নিশ্চয় হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিষ্টই হয়। বিক্ষেপ শক্তির প্রমাণ অনুভব, কারণ প্রতি কার্য্যে প্রতিক্ষণে আমরা নিজেকে কর্ত্তা, সগুণ ও বদ্ধ এইরূপ অনুভব করিতেছি।

এই অনির্ব্বচনীয়, চমৎকার, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, একটা কিছু, ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে অজ্ঞান, উহাই সেই নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, আনন্দময় চৈতন্যকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বয়ের দ্বারা নানাভাবে দেখাইতেছে। সুতরাং এই অজ্ঞানের নিবারণ করিতে পারিলেই সেই স্বয়ম্প্রকাশ স্বস্বরূপ আত্মা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন –

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাসিতমাত্মনঃ।
তেষাং আদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "চিদানন্দ আছেই;—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ"। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর কোনও দুঃখ থাকে না— "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। তখন সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং সকল কর্ম্মের অবসান হয়।

বাণী-আহ্বান।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।)

আসিছে সারদা আবার বঙ্গে,
তুষার ইন্দু-বরণী।
হিমের প্রতাপ নাহি এবে আর,
শোভা সম্পদে ভরা চারি ধার,
ফাল্গুনের নব কনক রৌদ্রে,
হাসিছে বিবশা ধরণী।
বহিছে মন্দ মলয় সমীর,
আম্র-মুকুল-গন্ধ-অধীর
মাধবী-কুঞ্জে ধাইছে ভৃঙ্গ,
মুখরিত করি অরণী।

শ্বেতভুজে, তব বোধন মন্ত্রে,
ধ্বনিত আজ এ বঙ্গ।
বিহগ তুলিয়া সপ্তমে তান,
করিছে তোমার বন্দনা গান,
সেজেছে বনানী কুসুম ভূষণে,
পুলক শিথিল অঙ্গ।
গগনে নীলিমা আজি ঘনতর,
নব তৃণদলে ঢাকা প্রান্তর,
যাচিছে বকুল-প্রসুন-পুঞ্জ
অলস সমীর সঙ্গ।

অলক্তক নব অরুণ রাগে
চরণ সরোজ রক্ত,

পঙ্কজে ঘিরি লুব্ধ ভ্রমর,
গুঞ্জরে যথা তৃষ্ণা-কাতর,
ওই দুটি তব চরণে, তন্বি,
গুঞ্জরে শত ভক্ত।
বীণা হতে উঠে ঝঙ্কার তান,
কতই মূর্চ্ছনা কতই গান
পূরিছে নিখিল ভকত প্রাণ
করিয়ে চরণাসক্ত।
শুভ্রকমলে সমাসীনা তুমি,
শুভ্র তোমার বর্ণ।
নীল মেঘ সম আঁখি পল্লবে,
কজ্জল লেখা অনুপম শোভে,
স্তনমূলে দোলে মুক্তার মালা,
কর্ণিকা শোভিতকর্ণ।
হস্তেতে বীণা পুস্তক আর,
পৃষ্ঠেতে কৃষ্ণ কুণ্ডল ভার,
রাজে প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ কিবা
জড়িত মুকুতা স্বর্ণ।
রুষ্টা কমলা— তোমার প্রসাদে
পুষ্ট যে জন মহীতে,
বিহীন বিত্ত অতি দীন হীন,
অনশনে তার কেটে যায় দিন,
সে যেন এসেছে জনসঙ্ঘের,
ধিক্কার-শত সহিতে।
ভ্রূক্ষেপ তবু নাহি তাহে তার,
নাহি লয় খোঁজ মণি মুক্তার,
সে চাহে কেবলি প্রসাদ তোমার,
শ্রদ্ধায় শিরে বহিতে।

জননি, তোমার বীণার তন্ত্রী,
আবার বাজাও হর্ষে,
সুপ্ত পরাণ-উঠুক শিহরি,
গভীর ছন্দে দাও দিক ভরি,
নাচিয়া উঠুক আবার বঙ্গ
তব পদরেণু স্পর্শে।

কাব্য গণিত দর্শন আর,
বিজ্ঞান গীত কলা সুকুমার,
সকল মানবের অন্তরে যেন,
অমৃতের ধারা বর্ষে।

কল্যাণি, তব চরণ কমলে,
শীর্ষ নোয়ায়ে বন্দি।

বর্ষে বর্ষে এমনি করিয়া,
শুষ্ক হৃদয় দাও মা ভরিয়া,
মুছাও অশ্রু কর-পল্লবে,
ভকত-হৃদয় নন্দি।

হাসুক বঙ্গ হাসিত যেমন,
জ্ঞানালোকে হোক পূর্ণিত মন,
থা'ক তোমা পানে লক্ষ পরাণ,
অমৃতের অনুসন্ধি।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

Did the Hindus do any injury to any nation? What little good they could do, they did for the world. They taught it science, philosophy, religion, and civilised the savage hordes of the earth.

—Vivekananda.

ভারত জগতের আদি শিক্ষাগুরু ইহা প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন। পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার অভ্যুদয়ে এই সত্য দিন দিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং আমরা অপদার্থ' এ ঘুমের ঘোরও কাটিতেছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া মনে হয় এ যেন ঠিক "ঠাকুরমার ঝুলির" রূপকথার আলোচনা করিতেছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি সত্ত্বেও নিগমনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয় যাহারা নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করে তাহারা অপরদেশে ভাষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিস্তার করিল কি করিয়া? যাহাদের গ্রামের বাহিরে গেলে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হয় তাহারা মেক্সিকো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (Alexendria) পর্য্যন্ত স্বদেশীয়-সভ্যতা প্রচার করিল কি করিয়া? যাহা হউক স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন বুক দুর্ দুর্ করে ইহাও অনেকটা সেই প্রকারের। যাহারা স্বজাতির ধর্ম্ম, বেশভূষা, ভাষা, আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—যদিও সে ত্যাগের মূল ব্যভিচার, সে অনুকরণের পরিণাম মৃত্যু—তাহারা হয়ত উক্ত সত্য মানিবে না—তাহারা হয়ত বলিয়া বসিবে, "যে সকল ভারতবাসী ইংরাজের ন্যায় শ্বেতচর্ম্ম ও ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ অনেক স্থলেই জীবন-সংগ্রামের হাত এড়াইয়া জেতার প্রাপ্যের টুক্‌রোটাক্‌রা পাইয়া থাকেন। অনুকরণ যত সম্পূর্ণ হইবে, ভারতবাসী জেতা ও বিজিতের মধ্যে জীবন-

সংগ্রামের হাত ততই এড়াইতে সক্ষম হইবে। আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ভাষা, নাম, ধর্ম্ম এবং সর্ব্বাগ্রে চর্ম্ম, এই সকলে যিনি ইংরাজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবন-সংগ্রামের অতীত হইয়া সংসারের সুখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * * জীবন-সংগ্রামে যে কোন উপায়ে বাঁচা দরকার। বাঁচিতে গেলেই দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ আবশ্যক"। এ মীমাংসার মর্ম্ম অবধারণ করিতে আমরা একেবারেই অসমর্থ। আমরা বুঝি অনুকরণ মানে আত্মহত্যা। ইহাতে আত্মশক্তির মূলোচ্ছেদই হয়, বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে কোন একটী জাতির মধ্যে সমস্ত সত্য ও উচ্চাদর্শগুলি নিহিত নাই। সেইজন্য জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে অপরাপর জাতিসকলের গুণগুলিও গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনুকরণ করিলে গুণ গ্রহণ করা হয় না। উহাদিগকে স্বায়ত্তীভূত করিয়া লইয়া একেবারে নিজেদের করিয়া লইয়া সমাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। ঐরূপ করিতে পারিলে শুধু সমকক্ষত্ব কেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়। টুক্‌রোটাক্‌রা লোভী অনুকরণেচ্ছুগণ যদি ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ মৌলিকতাপ্রিয় ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের বিশাল হৃদয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজ্যে অপরের গুণ-গ্রহণেও সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহাদের এই স্বায়ত্তীভূত করিবার গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা এক-সময়ে সমগ্র জগতের সম্মুখে জ্ঞান-বর্ত্তিকা ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান প্রদান যে শুধু উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেই চলিতেছে তাহা নয়। যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার বহুপূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও ভারতবাসীর সহিত তাৎকালীন সভ্যসমাজের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। এই আদান প্রদানের ধারা এবং ঐ ধারায় ভারতবর্ষের স্থান নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গর্গ সংহিতায় গর্গঋষি যবনদের জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন,

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্ দ্বিজঃ॥

এতদ্ব্যতীত গার্গ্যের সহিতও যে যবনদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে। যবনদিগের সাহায্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ২৩ অধ্যায়, ১—৫)। যাঁহারা প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে গ্রীকেরাই এই জ্যোতিষজ্ঞ যবন। অস্মদ্দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে এতদ্ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৃহৎ সংহিতা, পুলিশ সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত ও মণিথ নামে গ্রন্থ ও ঐ নামধের গ্রীক গ্রন্থকারের নাম; দিন গণনারম্ভ প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটী নগরের নাম ; বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতায় ছত্রিশটি গ্রীক শব্দের সন্নিবেশ, যথা, ক্রিয়, তাসুরি, জিতুম, হেলি, হিয়, কোন, হোরা, কেন্দ্র, দ্রেক্কাণ, লিপ্তা, অনফা, সুনফা ইত্যাদি ; বাদরায়ণ কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ একখানি জাতকে আপোক্লিম, পনফর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রীক শব্দের বিদ্যমানতা ; বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের প্রসঙ্গ-হীনতা পরন্তু বরাহমিহির কৃত একখানি গ্রন্থের নামের অর্দ্ধাংশে গ্রীক ভাষা থাকায় এবং একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রের নামে গ্রীক হোরা শব্দের প্রয়োগ এবং উক্ত শাস্ত্রে গ্রহ ও রাশি সমুদয়ের গ্রীকনাম ব্যবহার; গ্রহগণের সংস্কৃত নামের সহিত গ্রীকনাম ব্যবহার এবং রাশিগণের গ্রীক নাম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা এই সকল কারণে গ্রীকেরা যে লিখিয়া গিয়াছেন হিন্দুরা তাহাদের শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ও উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা উহা শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।*

* (Kern's Preface to Brihat Samhita of Varahamihir pp. 28, 29, 48, 51, 54 Webers History of Indian literature.)

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ছিল না। বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ছিল (বেদ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল ইহার প্রমাণ)। পরে গ্রীক যবনদের সহিত আদানপ্রদানে ইহার সমধিক পুষ্টি সাধিত হয়; এবং তাহারই ফলে এদেশে আর্য্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, পৃথিবী গোলাকার, উহা মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করায় দিবা রাত্র হয় এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি আছে। এই সকল তত্ত্বের আজ কাল আরও উন্নতি করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

চতুর্থশতাব্দীর প্রারম্ভে উসিবিয়াস (Eusebius) তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন "ভারতবাসী ও ব্যাকট্রিয়াবাসিগণের মধ্যে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন"।* ম্যাক্সমূলার ইহার প্রতিবাদে লিখিতেছেন, "ব্যাকট্রিয়ায় যে ব্রাহ্মণ দলের কথা লিখিত হইয়াছে, উহাতে বৌদ্ধগণকেই বুঝাইতেছে, কারণ, গোঁড়া ব্রাহ্মণগণের নিজেদের দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাওয়া স্বভাবই ছিল না এবং বৌদ্ধগণকেও ব্রাহ্মণের পদবীসমূহ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিতে দেখা যায়।" ধম্মপদ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকৃত ব্রাহ্মণকে খুব উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন বৌদ্ধ কি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? কিন্তু রেভারেণ্ড জন মরেস (Morres) তাঁহার গ্রন্থে† উসিবিয়াসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্লেটো ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য ছিলেন এবং সক্রেটীস একজন ভারতবাসীর নিকট হইতে 'যদি আধ্যাত্মিক সত্য না জানা যায় তাহা হইলে জাগতিক সত্যের কিছুই জানা যায় না' এই

* Prep. Ev, vii, 10.

† Notes on the 1st dialogue on the "Conversion of learned and philosophic Hindus".

সত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। উসিবিয়াসের এই উক্তির আলোচনা করিতে যাইয়া ম্যাক্সমূলার নিজেই লিখিয়াছেন, 'উসিবিয়াস, এরিষ্টক্লিস লিখিত প্লেটো দর্শন হইতে দেখাইয়াছেন, এরিষ্টটল শিষ্য এরিষ্টোজেনিস বলিতেছেন, এক জন ভারতীয় দার্শনিক এথেন্সে আসেন এবং তাঁহার সহিত সক্রেটীসের কথাবার্তা হয়। উক্ত কথাবার্তার সময় সক্রেটীস বলেন মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই তাঁহার দর্শন, তাহাতে ভারতীয় দার্শনিকটি হাসিয়া উত্তর দেন, আধ্যাত্মিক সত্য জানিতে না পারিলে আধিভৌতিক সত্য জানা যায় না। প্রত্যুত্তরটী এরূপ ভারতবর্ষীয় ভাবাপন্ন যে, উহাই ভারতবর্ষের দার্শনিকের এথেন্স-আগমন ব্যাপারটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়া দেয়।*

ভৃগুকচ্ছ (Broach) নিবাসীর এথেন্সে অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি উপাখ্যান হইতে এবং ম্যাক্সমূলারেরই স্বীয় মন্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া এমন কি সুদূর গ্রীসদেশে পর্য্যন্ত গমন করিতেন—এরূপ ক্ষেত্রে উসিবিয়াস কথিত ব্যাকটি্রয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ছিলেন কি ব্রাহ্মণ ছিলেন পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করিবেন। তবে ব্রাহ্মণেরা যেমন এই সকল দেশে যাতায়াত করিতেন, বৌদ্ধেরাও পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ঐ সকল দেশে

---

* "Euseibius (Prep. Ev., xi, 3) quotes a work on Platonic philosophy by Aristocles, who states there on the authority of Aristoxenes, a pupil of Aristotle, that an Indian philosopher came to Athens, and had a discussion with Socrates. There is nothing in this to excite our suspicion, and what makes the statement of Aristoxenes more plausible in the observation itself which this Indian philosopher is said to have made to Socrates. For when Socrates had told him that his philosophy consisted in inquiries about the life of man, the Indian philosopher is said to have smiled and to have replied that no one could understand things human who did not understand things divine. Now this is a remark so thoroughly Indian that it leaves on my mind the impression of being possibly genuine."—(Theosophy or Psychological Religious Lecture).

যথেষ্ট বিস্তার করেন। এ সকল বিষয় Essene এবং Theraputicদের প্রসঙ্গে লিখিত হইবে। উসিবিয়াস কথিত ভারতীয় দার্শনিকেরা যে বৌদ্ধ নয় তাহার প্রমাণ সক্রেটীস, প্লেটো, বুদ্ধ এবং অশোকের তারিখগুলি। সক্রেটীস খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭০ ও প্লেটো ৪২৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; আর শ্রীবুদ্ধ প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

অতএব এত অল্প সময়ের মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রচারকেরা গ্রীস পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নহে।

সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের পূর্ব্বে যে কোনও বৌদ্ধ গান্ধার কিম্বা বহ্লিক' (Balkh) দেশ পার হইয়াছিলেন ইহা বোধ হয় না। অশোক ২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজা হন। অতএব বৌদ্ধগণ উহার পরে ঐ সকল দেশে অভিযান আরম্ভ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা, প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যব্যপদেশে ঐ সকল দেশে গমনাগমন করিতেন ইহাই প্রমাণিত হয়।

সক্রেটীস ও প্লেটোর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পিথাগোরাস, তাঁহারা সমসাময়িক ডিমক্রিটাস এবং পরবর্ত্তী এরিষ্টটলও পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে হিন্দু দর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রীকদর্শন পাঠের সময় মনে হয় যে ভারতীয় দর্শনই একটু অদল বদল করিয়া বিভিন্ন ভাষায় পড়িতেছি। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে বরাবর একটি প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল যে থেল্‌স্, এম্‌পিডোক্লিস্, এনেক্সেগোরাস ডিমোক্রিটাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন গ্রীকদর্শনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু দর্শনের সহিত ঐ দর্শনের সাদৃশ্য স্থানগুলির উল্লেখ করা যাউক, তাহা হইলে বিষয়টি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে;—

ইলিয়েটিক্সদের মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক, বহুত্বের সত্যতা নাই, সৎ এবং চিৎ একই—এই সকল মতবাদ উপনিষদেও আছে।

এম্পিডোক্লিসের মতে অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি হ[illegible]তে

পারে না এবং যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না—ইহা ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের মূল।

ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ, তাঁহার পূর্ব্বদেশে যাওয়ার প্রবাদ অথবা চ্যাল্ডিয়ান পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি হইতে অনুমিত হয় যে ইহা অস্মদ্দেশীয় কনাদদর্শনের (বৈশেষিক) প্রতিধ্বনি মাত্র।

পিথাগোরাসের পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ,(এপুলিয়াস বলেন যে তিনি ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করেন) এবং তাঁহার মতবাদের অন্তর্গত জন্মান্তরবাদ, সাংখ্যদর্শন (Philosophy of Numbers), পঞ্চভূতবাদ, সুলভ সূত্র ও জ্যামিতির সূত্র, ভাব (Mistical Speculation), পরকায় প্রবেশ (Metempsychosis), সঙ্ঘের নিয়মাবলী ও হিন্দু আশ্রমের নিয়মাবলী, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রভৃতি বিষয় তদ্দেশীয় লোকদের নিকট তিনিই প্রথমে প্রচার করায় মনে হয় অন্ততঃ তিনি ঐ সকল তত্ত্বের সহিত পরিচিত ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

সক্রেটীস ও প্লেটোর prototype, architype, Ideal or Essence (শব্দ ব্রহ্ম), transcendentalism (পরোক্ষানুভূতি), Tansmigration of Soul (পুনর্জন্মবাদ), ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষা হইতে এবং পূর্ব্বদেশ-ভ্রমণ হইত পুষ্টি লাভ করে।

এরিষ্টটলের ভূততত্ত্ব, এবং তাঁহার ছাত্র আলেকজাণ্ডারকে নাগাসন্ন্যাসীদের (the Indian Gymnosophists) সহিত দেখা করিবার জন্য আদেশ এবং এসিয়ামাইনরে হারমিসের পালিত কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহুকাল অবস্থান হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তিনি ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। হিন্দুদিগের (গৌতম ন্যায়ের) অবয়বীবাক্য (Syllogism) পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা (১) প্রতিজ্ঞা (proposition), (২) হেতু কিম্বা অপদেশ (reason), উদাহরণ কিম্বা নিদর্শন (instance) (৪) উপনয়ন (application of the reason) (৫) নিগমন (conclusion)।

হিন্দুদিগের ত্র্যবয়বী বাক্যের প্রথম কিম্বা শেষ দুই অংশ যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এরিষ্টটলের সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রণালীতে পরিণত হয়। তারিখের তুলনা করিয়া বোধ হয় হিন্দুরা প্রথম ন্যায় শাস্ত্র আবিষ্কার করেন পরে গ্রীকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মায়ার্স সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন, এম্পিডোক্লিস ও এরিষ্টটল ভূততত্ত্ব নিজেরা স্বয়ং উপপাদন না করিয়া যে অপর কোন জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তদ্ সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা দেয় যে জগত-সৃষ্টির মূলে চারিটী তত্ত্ব ব্যতীত ব্যোম নামক আর একটী তত্ত্ব আছে, উহার সহিত এরিষ্টটলের ওর্ভপিয়ার (o'vpia) সহিত মিল আছে।*

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকেরা হয় ভারতবর্ষে আসিয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর না হয় পারস্য, চ্যালডিয়া, এসিয়ামাইনর, মিসরে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল সেখান হইতে গ্রীস দেশীয় দার্শনিকেরা শিক্ষা করিয়া যাইতেন। দ্বিতীয় মতটী সত্য হইতে পারে। ঐ সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে ইহাদের সকলেরই সভ্যতার মূলে ভারতবর্ষ। যেমন ভূগর্ভে স্তর আছে জগতের ইতিহাসেরও তেমনি স্তর আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা একটির পর একটি করিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব মুকুট উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর কান্তি ধারণ করিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ওপাশ্চাত্যের মিলনে শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইয়াছে। এই মিলন জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ-কর। কোনও ইংরাজ রাজনৈতিক কখনও কল্পনা করেন নাই যে তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিবেন। কোন ভারতবাসীও কখন

* Myer's History of Chemistry.

কল্পনা করেন নাই যে ইংরাজ বণিকেরাই তাঁহাদের ভাগ্যলিপির লেখক হইবেন। ট্রোজেন যুদ্ধে অলক্ষিতে যেমন দেবতারা যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদেরই জয় পরাজয়ে গ্রীক ও ট্রোজেনদের ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তন হইত তেমনি এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহা-সম্মিলনেও কোন্ অলক্ষিত মহাশক্তি ক্রীড়া করিতেছেন যাঁহার ভ্রূভঙ্গে আজ ইংরাজ ভারতের রাজা? এই মহাসম্মিলনে আমাদের জড়তা এবং কুসংস্কার যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে আবার এ দেশের বেদান্ত, এদেশের উচ্চ চিন্তা সকল ইউরোপের মনীষী ও দার্শনিকের মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। গ্রীস ও ভারতীয় সভ্যতার আলোকে একবার যেমন সমগ্র জগৎ হাসিয়া উঠিয়াছিল এবারও তেমনি ভারত ও ইউরোপীয় সভ্যতায় জগৎ পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

(ক্রমশঃ)

সৎকথা।

ধর্ম্ম সকলের হয় না, কেন না কেউ গুরুর আজ্ঞাধীন থেকে তাঁর উপদেশ পালন করে জীবন যাপন কর্‌তে চায়না। সকলেই স্বাধীন হতে চায়, অধীন হতে চায় না।

* * * *

আপন খেয়ালে চল্‌লে মানুষ বিগড়ে যায়; ভগবানের বা সাধু সজ্জনের নির্দেশ মত চল্‌লে মানুষ বেঁচে যায়।

* * * *

ভগবান্ বল্‌ছেন বিষয় বাসনা ছাড়্‌লে আমাকে পাবে—বিষয় পেতে হলে আমাকে পাবে না, দুইই এক সঙ্গে পাবে না।

এজগতে সুখ নাই, সব মিথ্যা ; একমাত্র ভগবানই সার, এ সব কথা কি সকলে বুঝ্তে পারে ; ভগবানের বিশেষ দয়া না হলে এ সকল কথা ধরা যায় না।

*　　*　　*　　*

জীব কর্ম্ম কর্তে বাধ্য। সৎকাজ কর্লে নিজেরও কল্যাণ পরেরও কল্যাণ। আর অসৎ কাজ কর্লে নিজের এবং অপরের সকলের অকল্যাণ।

*　　*　　*　　*

ভগবান্ লাভ করবার জন্য কজন লেখাপড়া শেখে! যে শেখে সেই ভাগ্যবান্। লেখাপড়া শিখে ধন মান হবে এই জন্যই চেষ্টা—একেই বলে অর্থকারী বিদ্যা ; তাতে উন্নতি হয় না।

*　　*　　*　　*

আমি অমুক, আমি খুব বড়লোক এই ভাব থেকেই মনে হিংসা জেগে উঠে। কিন্তু আমার অপেক্ষা অনেক বড়লোক আছেন, আমি অতি সামান্য আমি যা কর্ছি সে সমস্তই ভগবানের কৃপায়, এইরূপ বিচার কর্লে হিংসা দ্বেষ ক্রমে ক্রমে চলে যায়।

*　　*　　*　　*

"গুরু এবং ইষ্ট এক"। এই একই আবার লীলাতে বহু—ইনিই ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি জীব ও জগৎ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সব রূপই ইষ্টের। অজ্ঞানবশতঃ ভেদবুদ্ধি আসে বটে তজ্জন্য গুরু এবং বেদান্তবাক্যে খুব বিশ্বাস রেখে সাধন ভজন ও বিচার কর্তে হয়। গুরু এবং ইষ্টে খুব নিষ্ঠা চাই। ক্রমে ক্রমে সব অভেদ উপলব্ধি হবে। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে আছেন।

*　　*　　*　　*

ভগবান্ জীবকে শক্তি দিয়াছেন। যে ঐ শক্তি সৎদিকে নিয়ে যায় সে সৎ হয়, আর যে ঐ শক্তিকে অসৎদিকে নিয়ে যায় সে অসৎ হয়।

বুড়ো মনে করে যে চিরকালই আমি ঐরূপ থাক্‌ব, যুবক মনে করে

যে সেও চিরকাল ঐরূপই থাক্‌বে কখনও বুড়ো হবে না। কিন্তু মৃত্যু যে ঘাড়ে চেপে আছে, কাল হাঁ করে আছে, বুঝ্‌তে পারে না। এরই নাম মায়া।

* * * *

হে জীব সত্যকে ভালবাসবার চেষ্টা কর, সত্য উপলব্ধি কর্‌বার চেষ্টা কর। ভগবান্ সত্যস্বরূপ—সেখানে মিথ্যা হিংসা যেতে পারে না—সেখানে কোন ভেল নাই।

* * * *

বুদ্ধদেব ইচ্ছা কর্‌লে মরাছেলে বাঁচাতে পারেন, এই বিশ্বাস করে একজন স্ত্রীলোক তাঁর মরা ছেলে নিয়ে এসে বুদ্ধদেবকে বাঁচিয়ে দিতে বল্‌লেন। বুদ্ধদেব ঐ কথা শুনে বল্‌লেন—তোমাকে এক কাজ কর্‌তে হবে। যার বাড়ীতে কেউ মরে নি তার বাড়ী থেকে একমুটো চাল নিয়ে এসো। সেই চাল আন্‌লে তোমার ছেলেকে বাঁচাব। স্ত্রীলোকটী ঐস্থলে অনেকের বাড়ীতে গেল এবং সকলেই বল্‌লে আমার অমুক মরেছে। এইরূপে অনেক বাড়ী ঘুরে এসে বুদ্ধদেবকে বল্‌লে, এইরূপ বাড়ীর চাল পেলাম না। তখন বুদ্ধদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার ছেলেই শুধু মারা যায় নি, সকলের ঘরেই এইরূপ। তখন ঐ স্ত্রীলোকটী বুঝ্‌তে পার্‌লে এবং বুদ্ধদেবের শিষ্যা হয়ে গেল।

* * * *

নিজের দুঃখ যেমন বোঝ, অপরের দুঃখও তেমনি বোঝ। মানুষ অপরের দুঃখ বোঝে না বলেই কষ্ট পায়। আর অপরের দুঃখ বুঝে সেটা দূর কর্‌বার চেষ্টা কর; ভগবান্ তোমাকে যতটুকু শক্তি দিয়েছেন, সেই অনুপাতেই চেষ্টা কর। বুদ্ধদেবের জীবের জন্য প্রাণ কেঁদেছিল, সেইজন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন। তুমি কি তা পার্‌বে? তবে যতটা পার, তার মধ্যে যেন জুয়াচুরি না থাকে। এইরূপে জীবসেবা কর্‌তে কর্‌তে বুঝ্‌তে পার্‌বে, ভগবান্ কে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্র্যশীতীতম জন্মোৎসব।

বিগত ৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল, ইং ১৪ই মার্চ, ১৯১৮ খৃঃ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা ও ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ তদুপলক্ষে মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তিথিপূজার দিন অহর্নিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের, অন্যান্য অবতারগণের ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ও ভক্তগণের ভজনে উক্ত দিবস মঠবাটী একটী অধ্যাত্মভাবে ভরপুর হইয়াছিল। ঐ দিন প্রায় ৪।৫ শত ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিনে তাঁহারা যে আনন্দ ও শান্তির আস্বাদ করিতেছেন ঐ আনন্দ ও শান্তির ধারা সমগ্র জগৎ প্লাবিত করুক, ইহাই তাঁহাদের সকলের আন্তরিক কামনা। ভক্তহৃদয়ের এ ব্যাকুল প্রার্থনা কখনই বিফল হইবার নহে।

পরবর্ত্তী রবিবার বিরাট উৎসবের দিন। সে দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, স্বামিজীর সমাধিমন্দির নানাবিধ পুষ্প ও লতা পাতা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মঠবাড়ী নানারূপ পতাকা দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, উহারা যেন যে বিরাট আনন্দোৎসব হইবে তাহারাই সূচনা করিয়া দিতেছে। মঠপ্রাঙ্গণে ও দক্ষিণের বিস্তৃত প্রান্তরের উপর ছোট বড় নানাপ্রকারের চন্দ্রাতপ স্থাপিত হওয়ায় মঠের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রান্তরের উত্তরদিকে একটী মণ্ডপমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বৃহৎ আলেখ্য বিচিত্র ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখায় সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও মেসার্স হোরমিলার কোম্পানী ষ্টীমারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সকাল ৭॥০ টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীর ষ্টীমার কলিকাতা ও মঠের মধ্যে

যাতায়াত করায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতেই জনসঙ্ঘের সমাগম হইতে আরম্ভ হয়। ষ্টীমারে, নৌকায়, গাড়ীতে, হাঁটা পথে ও রেলে প্রায় ৩০।৩৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

অন্যূন ৮।১০ হাজার ভক্ত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাস্তবিকই সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বেলুড় মঠ যেন জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মানাপমান জ্ঞান নাই, জাতিত্বের গৌরব নাই, পদমর্য্যাদার অভিমান আক্রোষ অথবা অর্থের গর্ব্বিত বক্রদৃষ্টি নাই—আছে উদারতা, মৈত্রী সমদর্শন—আছে আচণ্ডালে শিবজ্ঞান, অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে প্রসাদ জ্ঞান। সম্মুখে স্তূপীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন,—পার্শ্বে সহস্র সহস্র নারায়ণ সেবা, আর মধ্যে মধ্যে ভক্তহৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসজ্ঞাপক ভগবানের নামে জয়ধ্বনি—সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে। আর এই বিরাট দৃশ্য, যে মহাপুরুষের আচণ্ডালপ্রবাহিত গভীর প্রেম, অনন্ত সহানুভূতি, অসীম উদারতা, এবং বালসুলভ সরলতা ও নিরভিমানিতার কণামাত্র বিকাশ, তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

ঐ প্রসাদবিতরণ কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবকগণের নম্রতা, পরিশ্রম ও কার্য্যপটুতা দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা প্রসাদ গ্রহণ স্থলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্যও তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র তাঁবু হইতে প্রসাদ বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সুব্যবস্থার জন্য সকলেই উক্ত দিবসের বিরাট ভোগের কিছু না কিছু অংশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল।

উৎসবের আর একটা প্রধান অনুষ্ঠান শ্রীভগবানের নাম গান। তাহাও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন ভক্তসম্প্রদায়সমূহের সহযোগীতায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলেখ্য সম্মুখে সুগায়ক বৈষ্ণব চরণ কর্ত্তৃক পদাবলী গীত হওয়ায় স্থানটীকে আনন্দময় করিয়া ভক্তগণের প্রাণ দ্রবীভূত করিয়া দিতেছিল। আবার মঠপ্রাঙ্গণে

আন্দুল ও বাঁ্যাটরা কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুর কণ্ঠে মাতৃনাম গীত হওয়ায় সে স্থানে যে অপূর্ব্ব ভাবোৎস প্রবাহিত হইতেছিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বাউল ও তরজা গান, মান্দ্রাজী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভজন গান, দক্ষিণারঞ্জন বাবুর "কনসার্ট প্রভৃতিও উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল।

জনসঙ্ঘের সেবার জন্য আহিরীটোলা নিবাসী সতীশ বাবুর উদ্যোগে তৃষ্ণাতুরকে সরবৎ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং "বসুমতীর" স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তামাক সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সেবা সার্থক হইয়াছে। তাঁহারা যে কত লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের এই সেবাভাব সকলের প্রাণে ঐভাব জাগরিত করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় একটু অসুবিধা হইলেও বাজী পোড়ানর পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

প্রতি বৎসর নূতন নূতন শতশত ব্যক্তির আগমন এবং ক্রম বর্দ্ধমান জনসঙ্ঘের সমাগম দেখিলে মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ ভাব নিজেই প্রচার করিতেছেন নাহা না হইলে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটন করা মানবের সাধ্যাতীত।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। সাধু ভোজন, সংকীর্ত্তন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিন্দীভাষায় শ্রীশ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ উক্ত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৭ই মার্চ্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র শর্ম্মণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

দেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত গান, ভজন ও সাধু ভক্তেরও সেবা করা হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ১৭ই মার্চ্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভজন, দরিদ্র নারায়ণ গণকে প্রসাদ দান, হরিকথা—নৌকা চরিত এবং পুদুকোটের দেওয়ান পেসকার শ্রীযুক্ত বি, ডি কামেশ্বর আয়ার এম, এ মহাশয় কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনী ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

কিষণপুর (দেরাদুন), শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভজন গান, প্রসাদ বিতরণ ব্যতীত তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটী সভা আহূত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর প্রভৃতি মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে ও সলপ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে উক্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দাতব্য ঔষধালয়ের ইং ১৯১৭ সালের সাম্বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইং ১৯১৬ সাল অপেক্ষা ১৯১৭ সালে রোগীর সংখ্যা প্রায় শত করা ৫০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৬ সালের ১০,৪৭০ খানির স্থলে আলোচ্যবর্ষে ১৫,১৬১ খানি ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র দান

করা হইয়াছিল। রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসর রোগীর সংখ্যা ৪,৩৭২ জন হইয়াছিল তন্মধ্যে হিন্দু ৩১৩২ এবং মুসলমান ১২৪০।

ঔষধ দান ব্যতীত কয়েকজনকে পথ্য দিতে হইয়াছিল এবং যাহারা মঠে আসিতে অক্ষম তাহাদের বাড়ীতে যাইয়াও চিকিৎসা করা হইয়াছে।

উক্ত ঔষধালয় হইতে শুধু যে বেলুড় গ্রামেরই জনসাধারণ ঔষধ গ্রহণ করেন তাহা নহে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ হইতেও এমন কি গঙ্গার অপর তীরস্থ গ্রাম সকল হইতে ঔষধ লইতে আসেন।

মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং সম্বৎসর বিনামূল্যে ঔষধ দান করায় রোগিগণকে সেবা করা সম্ভব হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মেসার্স বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস, মেসার্স ডি গুপ্ত এণ্ড কোং, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, বাবু হরিদাস মল্লিক, ডাক্তার কে, সি বসু, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বাবু শশীভূষণ ঘোষ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু পঞ্চানন ঘোষ এবং সতীশ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়গণ মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণও অর্থ সাহায্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন,—শ্রী এ, আর কুমারগুরু, বাঙ্গালোর ৩৲; শ্রীচারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ১৲; শ্রীরাজেন্দ্র কুমার দত্ত, চিত্রকোট ১৲; শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় কাশীপুর ২০৲; শ্রীগৌরীকান্ত বিশ্বাস, পুনা ২০৲; কাপ্তেন এস, ডি, আয়ার, আই এম এস, বম্বে ১০০৲; ডাঃ শ্রী বি, এম, বসু, ইনানঘাট, ৫৲; শ্রীশশীভূষণ বসাক, কলিকাতা ২০৲; শ্রী এম, এস দোড়াপাসাপপা, সিমোগা, ৫৲; শ্রী বি, কে, দত্ত, ২৲। বালি মিউনিসিপালিটিও মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ঔষধালয়টীকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট এবং সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত উক্ত সেবা কার্য্য চালান অসম্ভব। অতএব যাঁহার যাহা ক্ষমতা তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে। (১) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ

মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, (২) প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সভা অহূত হয়। মান্যবর বর্দ্ধমানাধিপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মঙ্গলাচরণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে সোসইটীর সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, সোসাইটীর বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। সাধারণ-সভা আহূত করিয়া বেদান্তাদি আলোচনা, দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য দান, ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যের প্রসারতার সহিত সোসাইটীর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। সভাপতি মহাশয় তৎপরে তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গলাভাষায় স্বামীজির গুণানুকীর্ত্তনের পর বলেন, এই সোসাইটী স্বামীজির স্মৃতিরক্ষার্থ স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজি তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী জগতে প্রচার করেন অতএব সোসাইটীও যদি প্রচারক পাঠাইয়া ঐ প্রচার কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলেই ঠিক ঠিক স্বামীজির স্মৃতিরক্ষা করা হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বামীজির উক্তি সকলের উল্লেখ করিয়া স্বামীজির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাপ্রাণতার নির্দ্দেশ করেন এবং ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা জগত বিজয় করিবে স্বামীজির এই বাণীর উল্লেখ করিয়া উপস্থিত জন সাধারণকে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে যত্নবান হইতে বলেন। ডাঃ প্রভুদয়াল শাস্ত্রী মহাশয় স্বামীজি যুক্তি ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুভূতির মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজির সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিবার পর মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেই সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় প্রায় ৩।৪ হাজার জন সমাগম হইয়াছিল, ইনিষ্টিটিউটের প্রশস্ত হলটীতে আর একজনেরও দাঁড়াইবার স্থান ছিল না।

এ বৎসরের সভায় সকলেই আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ফেব্রুয়ারী মাসের যে সংক্ষিপ্তবিবরণী আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে জানা যায় যে গত জানুয়ারী মাসের ৮জন ব্যতীত, আলোচ্যমাসে আরও ১৬জনকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২ জন আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ১ জন দেহত্যাগ করিয়াছেন ১ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং ১০ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

১৮৫৪ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে ৩৫৭ জন নূতন এবং ১৪৯৭ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

ঐ মাসে ২ জন রোগীকে তাহাদের নিজ বাটীতে যাইয়া ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৪৮৷৷০ ; এক কালীন দান ৫৩৲ মোট ১০১৷৷০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের ব্যয় ২০৬৻৫ এবং বিল্ডিং ফণ্ড এর ব্যয় ২২৻১০।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ, ৩রা চৈত্র, ১৩২৫, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাম্বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার এডিসানাল মেজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জি, ই, লেম্বোরণ উক্ত সভার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

আরামবাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব কল্পে একটী সভা আহূত হয়। স্থানীয় বহুলোক উক্ত সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত অনেকে

শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তৎপ্রচারিত আদর্শসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত দিবস নগরসংকীর্ত্তনাদিও হইয়াছিল।

লাবান (শিলং) সনাতন ধর্ম্মসভার উদ্যোগে তথায় ৩রা চৈত্র, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পাদিত হয়। কীর্ত্তন, পূজা, প্রসাদ বিতরণ পাঠ ভজনাদি উক্ত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

মথুরাজেলার সাহায্য-কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জল শুকাইয়া যাওয়ায় ব্যাধির প্রকোপও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর বম্বের দানশীল টায়েরজী এণ্ড সন্স ৭৫০ খানি কম্বল বান্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিবার জন্য দেওয়ায়, উক্ত কেন্দ্র দুইটী পুনরায় অস্থায়ীভাবে খুলিতে হইয়াছে।

সুখের বিষয় জলপ্লাবিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এ বৎসর প্রচুর গম জন্মিয়াছে।

শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব কল্পে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানত্রয় মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ১১ই মার্চ্চ সেবাসমিতির সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্ব জেলা জজ্ মিঃ এইচ, সি, লিড্ডেল মহোদয় গ্রহণ করেন। ১৪ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজা ও ১৭ই সাধারণ উৎসব সম্পাদিত হয়। উৎসব দিবসে কুষ্ঠাশ্রমবাসিগণকে ও দরিদ্র নারায়ণ গণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(স্বামী সারদানন্দ)

(৪)

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও দেব-ভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্ব্বোক্তরূপে কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ পর্ব্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা যখন তখন তাঁহাতে ঐরূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার অবসর লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদিগের দেব-মানব বলিয়া বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ঐ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলির ন্যায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও ভক্তগণের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে, এবং পরে, তাহাদিগের নিকটে শুনিয়া অপর সকলের প্রাণে পূর্ব্বোক্ত ফলের উদয় করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের ঐ বিষয় বোধগম্য হইবে—

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। ঐরূপ হইবার তাঁহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল।

প্রথম তাঁহারা বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারে তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত যে কতকটা একদেশী এবং অতিমাত্রায় বাহ্যাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন, বাহ্যচিহ্নমাত্র ধারণে পরাঙ্মুখ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না—ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাবসম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—ধন, মান, আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্য মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে। পুণ্যকীর্ত্তি ৺কৃষ্ণরাম বসু যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারাও আপনাদিগকে সমধিক মহিমান্বিত জ্ঞান করিতেন। ঐ বংশমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্ম্মলাভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণকেও তথায় লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের অভিমান যে সুতরাং বিষম প্রতিহত হইবে, একথা বলা বাহুল্য। অতএব ঐকার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল।

সৎ উপায় অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অহঙ্কৃত মানবকে অসদুপায় গ্রহণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কালনার ভগবানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রেমের আতিশয্য কীর্ত্তন করিয়া এবং আপনাদিগের বংশগৌরবের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন তাঁহারা বলরামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কখন কখন তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। অবশ্য অপরের

নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই যে তাঁহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশূন্য, সদাচারবিরহিত, খাদ্যাখাদ্যবিচারবিহীন, কণ্ঠী তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হইবে। যাহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় ৺নিমাইচরণ ও ৺হরিবল্লভ বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে লাগিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয়া ও ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময় নির্ম্মম হইয়া নানা হাঙ্গামা না করিলে চলে না দেখিয়া তিনি নিজ বিষয় সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়স্বরূপে যাহা পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরও ঐ সকল কর্ম্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা এক সময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর অন্ন ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন ও পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্য্যেই তাঁহার তখন দিন কাটিত, এবং ঐরূপে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল সেই সকলের সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পূতসঙ্গে তাঁহার জীবন কিরূপে দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ের আভাষ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি।

প্রথমা কন্যার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ

একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোন প্রকারে শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধু-দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্ণমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছু-দিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্ব্বে তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পাছে হরিবল্লভ বসু তাঁহাকে উক্ত বাটি খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাই বসু বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্ব্বক ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গে বঞ্চিত করেন এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।

অন্তরের চিন্তা সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা করে। বল-রামেরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন প্রায় তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাঁহার উভয় ভ্রাতাই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ বসু তাঁহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কয়েক দিন অবস্থান করিবেন, এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। অন্যায় কিছুই করেন নাই বলিয়া বলরামের অন্তরাত্মা উহাতে ক্ষুব্ধ না হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যায় এই ভয়ে তিনি অবসন্ন হইলেন। অনন্তর অশেষ চিন্তার পরে স্থির করিলেন ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত

করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্লভ বাবুও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় এইরূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যে ভাবে যাতায়াত করিতেন প্রকাশ্যভাবে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ। হরিবল্লভ বসু কলিকাতায় আসিবার দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন তাহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষ ভাবে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাহার বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্নপূর্ব্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "সে লোক কেমন? তাহাকে (হরিবল্লভ বসুকে) একদিন এখানে আনিতে পার?" বলরাম বলিলেন, "লোক খুব ভাল, মশায়! বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে, দোষের মধ্যে, বড় লোকের যাহা অনেক সময় হইয়া থাকে, একটু 'কান পাতলা'—এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একটা ঠাওরাইয়াছে। এখানে আসি বলিয়াই আমার উপরে অসন্তোষ, অতএব আমি বলিলে এখানে আসিবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "তবে থাক, তোমার বলিয়া কাজ নাই; একবার গিরিশকে ডাক দেখি।"

গিরিশচন্দ্র আসিয়া সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, 'হরিবল্লভ ও আমি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলেই আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি, অতএব এই কাজ আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, অদ্যই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।'

পরদিন অপরাহ্ণে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচন্দ্র হরিবল্লভ বাবুকে

সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিবার মানসে বলিলেন, 'ইনি আমার বাল্যবন্ধু, কটকের সরকারী উকীল হরিবল্লভ বসু, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।' ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইত, আবার মনে ভয়ও হইত যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়! (গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ত নয়, (হরিবল্লভ বসুকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্যায় সরল! (গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে অমন চক্ষু কখন হয় না! (হরিবল্লভ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) হাঁ গো, ভয় করা দূরে থাকুক তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে।" হরিবল্লভ বাবু প্রণাম ও পদধূলী গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, 'সেটা আপনার কৃপা।'

গিরিশচন্দ্র এইবার বলিলেন, 'যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উঁহার ত ভক্তিমান হইবারই কথা; ৺ কৃষ্ণরাম বসুর ভক্তি তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার কীর্ত্তিতে দেশ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিমান হইবেন না ত হইবে কাহারা।'

ঐরূপে ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ উঠিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি ও ঐকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা ঐ বিষয়ে নানা কথা উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। অনন্তর অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাদিগের এক জনকে একটি ভজন সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মর্ম্ম হরিবল্লভ বাবুকে মৃদুস্বরে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, দুই তিন জন যুবক ভক্তেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি ও মর্ম্মস্পর্শী বাণীতে এককালে মুগ্ধ হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নয়নদ্বয়ে প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গত

হইবার পরে হরিবল্লভ বাবু সে দিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাইতাম, আগন্তুক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিলে, অথবা কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং ঐরূপ করিবার পরমুহূর্ত্ত হইতে তাহারা তাঁহার কথা মানিয়া লইতে থাকিত! অবশ্য যাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইত তাহাদিগের সম্বন্ধেই তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবস আমাদিগের নিকট ঐ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। 'অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি—এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দ্দেশ করিয়া) ইহার ভিতরে যে রহিয়াছে তাহাকে স্পর্শ মাত্র তাহার দিব্যশক্তিপ্রভাবে তাহাদিগের ঐ ভাব আর মাথা উঁচু করিতে পারে না। সর্প যেমন ফণা ধরিবার কালে ওষধিস্পৃষ্ট হইয়া মাথা নিচু করে, তাহাদিগের অন্তরের অহঙ্কারের অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। ঐ জন্যই কথা কহিতে কহিতে কৌশলে তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকি।'

হরিবল্লভ বাবুকে ঐদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া সশ্রদ্ধ হৃদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বলরাম ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অন্যায় করিতেছেন এইরূপ ভাব তাঁহার ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে এখন হইতে আর কখনও দেখা দেয় নাই।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যে কোন বাস্তুকেই গ্রহণ করুক না কেন, অথবা আমাদের মন যে কোন বিষয় কল্পনা করুক না কেন, সর্ব্বত্রই আমরা দুইটী শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই—একটী অপরটীর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ জটিল ঘটনা-রাজি ও আমাদের অনুভূত মানসিক ভাবপরম্পরার অবিশ্রান্ত লীলা-বিলাস সংঘটন করিতেছে। বহির্জগতে এই বিপরীত শক্তিদ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অথবা কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তিরূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদ্বেষ ও শুভাশুভরূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা কতকগুলি জিনিষকে আমাদের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া থাকি, কতক-গুলিকে আবার আমাদের নিকট টানিয়া লই। আমরা কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হই, আবার কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমাদের জীবনে এমন অনেকবার হইয়া থাকে যে, কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না অথচ কোন কোন লোকের প্রতি যেন আমাদের মন টানিতেছে, আবার অন্য অনেক সময়ে যেন কোন কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে পলাইতে ইচ্ছা করে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা সকলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। আর এই শক্তির কার্য্যক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের প্রভাব ততই তীব্র ও পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। ধর্ম্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তর এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। অতি গভীর ভালবাসা—মানুষ কোনও কালে যাহার আস্বাদ পাইয়াছে—তাহা ধর্ম্ম হইতেই আসিয়াছে, এবং ঘোরতম পৈশাচিক বিদ্বেষের ভাব, যাহা মানব হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছে—তাহারও উদ্ভব ধর্ম্ম হইতে। জগৎ

কোনও কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্ম্মরাজ্যের লোকদিগের মুখ হইতেই বাহির হইয়াছে এবং জগৎ কোন কালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্ম্ম-রাজ্যের লোকদের মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোনও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্য্যপ্রণালী যত সূক্ষ্ম, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই অদ্ভুত। ধর্ম্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা করে নাই—আবার ধর্ম্মপ্রেরণায় মানুষ যত চিকিৎসালয়, আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আর কিছুতেই তাহা হয় নাই। মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে—শুধু মানবজাতির জন্য নহে, নিকৃষ্টতম প্রাণিগণের জন্য পর্য্যন্তও—যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্ম্মপ্রেরণায় মানুষ যত নিষ্ঠুর হয় এমন আর কিছুতেই নহে, আবার ধর্ম্ম প্রেরণায় মানুষ যত কোমল হয় এমন কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির সংঘর্ষোত্থিত এই দ্বন্দ্ব কোলাহল, এই বিবাদ বিসম্বাদ, এই হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন বজ্রগম্ভীর বাণী উত্থিত হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া জগতে শান্তি ও মিলনের বার্ত্তা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে—যেন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত ইহার বজ্রগম্ভীর আহ্বান মানবজাতিকে শুনিতে বাধ্য করাইয়াছে। জগতে কি কখনও এই সমন্বয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে?

ধর্ম্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনসূত্র কি কখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব? বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের সমস্যা লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যাপূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; ইহা যে কতদূর কঠিন তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবনসংগ্রা-মের ভীষণতা দূর করা—মানবমনে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে তাহা মন্দীভূত করা, মানুষ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া

দেখিতে পায়। এক্ষণে জীবনের যাহা বাহ্য স্থূল এবং বহিরংশমাত্র সেই বহির্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করাই এত যদি কঠিন হয়, তবে মানুষের অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিন। আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতে হইবে। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক বাক্যে পরিণত হইয়াছে মাত্র। আমরা সেগুলি তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ইহা না করিয়াই পারি না। যে সকল মহাপুরুষ প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে এই মহান্ তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই শব্দগুলির সৃষ্টি করেন। তখন অনেকেই ইহাদের অর্থ বুঝিত। পরে, অজ্ঞ লোকেরা এই সমস্ত কথা লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে ধর্ম্ম জিনিষটাকে কেবলমাত্র কথার মারপেঁচ করিয়া দাঁড় করাইয়াছে—উহা যে জীবনে পরিণত করিবার জিনিষ তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা "পৈত্রিক ধর্ম্ম" "জাতীয় ধর্ম্ম" "দেশীয় ধর্ম্ম" ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়াছে। শেষে, কোন ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াটা স্বদেশহিতৈষিতার একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর স্বদেশহিতৈষিতা সদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন-ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম্ম সমন্বয়সমস্যার আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ আছে—আমি অবশ্য প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপরিচিত ধর্ম্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ, দার্শনিক ভাগ—যাহাতে সেই ধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব অর্থাৎ উহার মূলতত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তল্লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ, পৌরাণিক ভাগ—উহা স্থূলদৃষ্টান্ত দ্বারা দার্শনিক ভাগের বিবৃতিস্বরূপ। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষসমূহের জীবনের উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষসকলের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থূলভাবে বিবৃত

হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক ভাগ—উহা ধর্ম্মের আরও স্থূলভাগ—উহাতে পূজাপদ্ধতি, আচারানুষ্ঠান, বিবিধ শারীরিক অঙ্গ-বিন্যাস, পুষ্প, ধূপধূনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম এই সকল লইয়া গঠিত। আপনারা দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্ম্মের এই তিনটী বিভাগ আছে। কোন ধর্ম্ম হয়ত দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম্ম অপরটীর উপর। এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক বিভাগের কথা ধরা যাউক। সার্ব্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কিনা? এখনও পর্য্যন্ত ত হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া সেইগুলিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবল মাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু সেই ধর্ম্মাবলম্বী মনে করে যে, যে সেই সেই মতে বিশ্বাস না করে, সে কোন ভয়ানক স্থানে গমন করিবে। কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারী পর্য্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুষ্টামি করিয়া করে তাহা নহে,—গোঁড়ামি নামক মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাধি-বিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট—মানবজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অকপট কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলের ন্যায় সম্পূর্ণ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। এই গোঁড়ামি একটী ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম দুষ্টামীবুদ্ধি আছে, সব এই গোঁড়ামী দ্বারা জাগিয়া উঠে। ইহার দ্বারা ক্রোধ জাগ্রত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

বিভিন্ন ধর্ম্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য বা ঐক্য আছে?—এমন কি কোন সার্ব্বভৌমিক পৌরাণিকতত্ত্ব আছে, যাহাকে সকল ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই না। সকল ধর্ম্মেরই নিজ নিজ পুরাণ আছে—কিন্তু প্রত্যেকেই বলে, "আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি কেবল উপকথা মাত্র নহে।" এই বিষয়টী উদাহরণ-সহায়ে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমার উদ্দেশ্য—মদুক্ত বিষয়টী দৃষ্টান্তদ্বারা বিবৃত করা মাত্র—কোন ধর্ম্মের সমালোচনা করা নহে।

খৃষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পৌরাণিক গল্পমাত্র নহে। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস করেন। খৃষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—উহা পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র। ইহুদিগণ মনে করেন, যদি একটী বাক্স বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বে দুইটী দেবদূতের মূর্ত্তি স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ গুহাতিগুহ্য পবিত্রতম স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে—উহা জিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। কিন্তু মূর্ত্তিটী যদি কোন সুন্দর নর বা নারীর আকারে গঠিত হয় তাহা হইলে তাহারা বলে, "উহা একটা বীভৎস পুতুলমাত্র—উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল!" পৌরাণিকভাবেত এই আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, "আমাদের অবতার এই এই অত্যাশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলেন," অপর সকলে বলিবে—"ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র" কিন্তু তখনই তাহারা বলিবে যে, তাহাদের নিজেদের অবতার ইহাপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবী করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি এই সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের সূক্ষ্ম পার্থক্যটীকে ধরিতে পারিয়াছেন। এই প্রকারের গল্পগুলি—তাহা যে ধর্ম্মের হউক না কেন—প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক, কখন কখন হয়ত উহাদের মধ্যে একটু আধটু ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে।

তৎপরে আনুষ্ঠানিক ভাগ। সম্প্রদায়বিশেষের হয়ত কোন বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাঁহারা উহাকেই যথার্থ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন, পক্ষান্তরে অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান-গুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যদি এক সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকারের প্রতীকোপাসনা করেন, তবে অপর সম্প্রদায় বলিয়া বসেন "ওঃ, কি ভয়ঙ্কর!" একটা সাধারণ প্রতীকের কথা ধরা যাউক। লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ন বটে

কিন্তু ক্রমশঃ উহার ঐদিকটা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা ঈশ্বরের স্রষ্টা ভাবটীর প্রতীকরূপে গৃহীত হইতেছে। যে সকল জাতি উহাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কখনও উহাকে পুংচিহ্ন-রূপে চিন্তা করে না।—উহাও অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় একটী প্রতীক—বাস্ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের একজন লোক উহাতে পুংচিহ্ন ব্যতীত অপর কিছু দেখিতে পায় না। সুতরাং সে উহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়ত তখন এমন কিছু করিতেছে, যাহা তথাকথিত লিঙ্গোপাসকদের চক্ষে অতি বীভৎস ঠেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিঙ্গোপাসনা ও স্যাক্রামেণ্ট (Sacrament) নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিশেষের কথা ধরা যাউক। খৃষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি কুৎসিত এবং হিন্দুগণের নিকট খৃষ্টানদের Sacrament বীভৎস বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যে, কোন মানুষের সদ্‌গুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ ও রক্তপান করা পৈশাচিক নৃশংসতা মাত্র। কোন কোন বন্যজাতিও এইরূপ করিয়া থাকে। যদি কোন লোক খুব সাহসী হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে; কারণ তাহারা মনে করে, ইহাদ্বারা তাহারা সেই ব্যক্তির সাহস ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করিবে। স্যার জন লাবকের ন্যায় ভক্তিমান্ খৃষ্টানও একথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে বন্যজাতিদের এই ধারণা হইতেই খৃষ্টান অনুষ্ঠানটীর উদ্ভব। অন্যান্য খৃষ্টানেরা অবশ্য উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না এবং উহা দ্বারা যে ঐরূপ ভাবের একটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও উহাদের মাথায় আসে না। উহা একটী পবিত্র জিনিসের প্রতীক—এইটুকু মাত্র তাহারা জানিতে চায়। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই যাহা সকল ধর্ম্মমতই স্বীকার করে ও গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলে ধর্ম্মমত সকলে সার্ব্বভৌমিকত্ব কোথায়? সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক্ তাহা কি।

আমরা সকলেই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা শুনিতে পাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিরূপ উৎসাহী তাহাও দেখিয়া থাকি। আমার একটী পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মদ্যপান অতি মন্দকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই ভাই ছিল, তাহারা এক রাত্রে লুকাইয়া মদ খাইবার ইচ্ছা করিল। পার্শ্বের ঘরেই তাহাদের খুড়া নিদ্রা যাইতেছিলেন—তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। এই কারণে মদ খাইবার পূর্ব্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"আমাদের খুব চুপিচুপি কাজ সারিতে হইবে, নতুবা খুড়া জাগিয়া উঠিবে।" তাহারা মদ খাইতে খাইতে বারম্বার 'চুপ চুপ খুড়ো জাগ্‌বে' এই কথা বলিয়া পরস্পরকে থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল! এই গোলমালে খুড়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তিনি ঘরে ঢুকিয়া সমস্তই দেখিতে পাইলেন। আমরা ঠিক এই মাতালদের মত চীৎকার করি— সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব! আমরা সকলেই সমান, অতএব এস আমরা একটা দল করি? কিন্তু যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি সাম্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছ এবং তখনই আর সাম্য বলিয়া কোন জিনিষ রহিল না। মুসলমানগণ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব করে; কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নহে, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না—তাহার গলা কাটা যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। খ্রীষ্টানগণ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে কিন্তু যে খৃষ্টান নহে তাহার জন্য অনন্ত নরক বন্দোবস্ত।

এইরূপে আমরা 'সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব' ও সাম্যের অনুসন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই ভাবের কথা শুনিবে, তখনই আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হইবে, কারণ এই সকল কথাবার্ত্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোরতর স্বার্থপরতা লুকাইয়া থাকে। কথায় বলে, "যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।" সেইরূপ যাহারা প্রকৃত কর্ম্মী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অনুভব করে, তাহারা মুখে লম্বা চওড়া করে না, ভ্রাতৃভাব প্রচারের জন্য দল-

গঠন করে না, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের গতিবিধি তাহাদের সারা জীবনটার উপর লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে তাঁহাদের অন্তর সত্য সত্যই মানবজাতির প্রতি প্রেমে পূর্ণ, তাহারা সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার ব্যথী, তাহারা কথায় না কহিয়া কার্য্যে দেখায়—আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে। সারা দুনিয়ায় লম্বাচওড়া কথার মাত্রা এত বেশী যে দুনিয়া ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা চাই কথা কম হইয়া যথার্থ কাজ কিছু অধিক হউক।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সার্ব্বভৌমিক ভাব খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন; তথাপি আমরা জানি উহা বর্ত্তমান। আমরা সকলেই মানুষ কিন্তু আমরা কি সকলে সমান? কথনই নহে। কে বলে আমরা সমান? কেবল বাতুলেই একথা বলিতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের শক্তি আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপরাপেক্ষা বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে ঢের বেশী। যদি আমরা সকলে সমানই হই, তবে এই অসামঞ্জস্য কেন? কে এই অসামঞ্জস্য করিয়াছে?—আমরা নিজেরাই উহা করিয়াছি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। তথাপি আমরা জানি যে এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিয়া থাকে। আমরা সকলেই মানুষ বটে—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ কতকগুলি স্ত্রীলোক। কেহ কৃষ্ণকায় কেহ শ্বেতকায়—কিন্তু সকলেই মানুষ—সকলেই এক মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মুখের চেহারা নানারকমের। আমি দুইটী ঠিক এক রকমের মুখ দেখি না; তথাপি আমরা সকলেই এক মানুষ। মনুষ্যত্বরূপ সাধারণ বস্তুটী কোথায়? আমি কোন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম কিন্তু তাহাদের সকলের মুখে মনুষ্যত্বরূপ একটী ভাব আছে যেটী সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান। যখন আমি উহাকে

ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাই, যখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা দেখিতে না পাইতে পারি; কিন্তু যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ এই সাধারণভাবই সেই বস্তু। প্রথমে এই মানবত্বরূপ সামান্যজ্ঞান হওয়ার পরে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধেও এই কথা। ইহা ঈশ্বররূপে পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" আমি এই সমুদয় মণিগণের ভিতর সূত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি—এই এক একটী মণিকে এক একটী ধর্ম্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায়বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ মণিগুলি এইরূপ এক একটী ধর্ম্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই সকলের মধ্যে বর্ত্তমান। তবে অধিকাংশ লোকেই এতৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক্। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্তু যখন আমি অমুক তখন আমি তোমা হইতে পৃথক্। পুরুষ হিসাবে তুমি স্ত্রী হইতে বিভিন্ন কিন্তু মানুষ হিসাবে তুমি ও স্ত্রী এক। মানুষ হিসাবে তুমি জীবজন্তু হইতে পৃথক্ কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেই সমান; এবং সত্তাহিসাবে তুমি বিরাট্ বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট্ সত্তাই ভগবান্—তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম-একত্ব। তাঁহাতে আমরা সকলেই এক। কিন্তু ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বহির্দ্দেশে প্রকাশিত আমাদের প্রতি কার্য্যকলাপে ও চেষ্টার মধ্যে এই ভেদ সদাই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম মানে যদি ইহাই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতে পারে না—এমন

সময় কখন হইবে না যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে। আবার, যদি আমরা আশা করি যে, সমস্ত জগত একই পৌরাণিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহাও অসম্ভব; তাহাও কখন হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ ব্যাপার কোন কালে কখন হইতেই পারে না; যদি কখনও হয় তবে সৃষ্টি লোপ পাইবে, কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূলভিত্তি। কে আমাদিগকে আকৃতি-বিশিষ্ট করিয়াছে?—বৈষম্য। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমান পরিমাণ ও সম্পূর্ণভাবে বিকিরণ-প্রবণতাই উত্তাপের ধর্ম্ম; মনে করুন, এই ঘরের সমুদয় উত্তাপটী সেই ভাবে বিকীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে কার্য্যতঃ উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য? সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে তখনই কেবল চরম-সাম্য আসিতে পারে। অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নহে, এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নহে। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। যাদুঘরে অবস্থিত (museum) ইজিপ্টদেশীয় 'মামিদের' (mummies) মত আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, পরস্পরের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকিব—আমাদের মনে কোন ভাবই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যভাব আমাদের উন্নতির প্রাণ—আমাদের যাবতীয় ভাবের প্রসূতি। এই বৈচিত্র্য সর্ব্বদাই থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শিখগুরু।

নানক।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

শিখ-ধর্ম্ম-নেতাদিগের বৃত্তান্ত ভারতেতিহাসের এক অপূর্ব্ব কাহিনী। এই সকল গুরুদিগের জীবন শিখজাতি ও শিখসমাজের উন্নতি অবনতির সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিজড়িত রহিয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ইঁহাদিগের সহিত পরিচিত আছেন; সাধারণতঃ, প্রথম-গুরু নানক ও গোবিন্দসিংহের কথাই আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর আটজন ধর্ম্মনেতাদিগের কার্য্যাবলীর সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত না হইলে আমরা শিখজাতির ধর্ম্মেতিহাস সম্পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব না। আমরা পাঠককে স্বল্পপরিসরে শিখগুরুদিগের একটী সংলগ্ন বিবরণী প্রদানে মনস্থ করিয়াছি।

শিখ-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানকের নাম চিরবিশ্রুত। তিনি খৃষ্টাব্দের ১৪৬৮ বর্ষে পাঠান-সম্রাট বল্লাল লোদীর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের পিতা কুল্লু লাহোরের নিকটবর্ত্তী তিলওয়ান্দী গ্রামে বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ছত্রি ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল ধর্ম্মাবতারেরই জন্মবিবরণের সহিত কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে। এ স্থলেও উক্ত নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। কথিত আছে, কুল্লুর বিবাহের পর অনেকদিন কাটিয়া গেল কিন্তু সন্ততিলাভের কোন আশা না দেখিয়া অবশেষে ব্যথিতচিত্তে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে একদিবস মধ্যাহ্নে কুল্লুর পর্ণকুটীরে একজন ফকির উপস্থিত হইল। অতিথিকে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্ত বিগলিত হইল। কোনরূপ প্রসঙ্গের পূর্ব্বেই কুটীরে যে সকল ফলমূল সঞ্চিত ছিল কুল্লু

তাহাই পথিককে প্রদান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর কুল্লু তাঁহার চিরপোষিত মনঃকষ্টের কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিলে ফকির প্রস্থানসময়ে বলিয়া গেল—"আহারান্তে যাহা কিছু রহিল তোমার স্ত্রীকে ভোজন করিতে বলিও, তাহা হইলেই তিনি অবিলম্বে একটী সুসন্তান প্রসব করিবেন। এই পুত্র ভবিষ্যজীবনে অত্যন্ত উন্নত ও মহৎ হইয়া তোমার মুখোজ্জল করিবে, সন্দেহ নাই।" এই ফকির কে এবং কোথা হইতে তাহার আগমন এ বিষয় কুল্লু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—উহা যেন প্রহেলিকা হইয়া রহিল।

উক্ত আদেশমত কার্য্য সম্পন্ন করিলে কুল্লু বহুদিনের ঈপ্সিত ফললাভে ধন্য হইলেন। তাঁহার স্ত্রী নিজ পিত্রালয় মারি নামক গ্রামে গমন করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন। ভবিষ্যতে এই পুত্রই নানক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে মনোভিলাষ কার্য্যে পরিণত দেখিয়া কুল্লু তিলওয়ান্দী গ্রামে ফিরিয়া গৃহস্থাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি ব্যবসায় লিপ্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। নানক বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। চার বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্থানীয় একটী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষক মহাশয় এই ক্ষুদ্র বালকের অদ্ভুত মেধা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি একজন নির্গুণ ঈশ্বরবাদী ছিলেন। কথিত আছে, একদিন তিনি উক্ত মতবাদের যাথার্থ্য ও সত্যতা নানককে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন; শিক্ষকের সকল যুক্তি ও গবেষণা শ্রবণ করিয়া বালক নানক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়! ভগবান্ যে সত্য সত্যই আছেন তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি?' বাল-কণ্ঠোত্থিত এরূপ প্রশ্ন শ্রবণে শিক্ষক চমকিত হইলেন! তৎপরে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে, পারিলেন উক্ত শিশুই সন্ন্যাসীদত্ত পুত্র। ঐ শিক্ষক পরজীবনে ফকিরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বাল্যাবধি নানক সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধান্বিত

ছিলেন; ইহার ফলে অনেক সময়ে তাঁহাকে পিতার নিকট হইতে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। একসময়ে কুল্লু পুত্রকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে লবণ-ব্যবসায়ের জন্য পাঠান। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অর্থাগমের উপায় অনেকটা সুগম হইতে পারে। পথিমধ্যে নানক দেখিলেন—কয়েক-জন ফকির দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পথশ্রমে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং নানক জানিতে পারিলেন তাঁহাদের তিন দিন আহার হয় নাই। নানকের একান্ত ইচ্ছা—তাঁহাদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্রালোচনা করেন, কিন্তু যাঁহারা তিন দিবস অনাহারী তাঁহাদিগের আর বাক্যালাপের শক্তি কোথা হইতে আসিবে? এরূপ অবস্থায় তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার নিকট যে অর্থ আছে তদ্দ্বারা সাধুসেবা করিয়া ধন্য হইবেন। তদীয় সহচর বলসাধুর মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'শুভ ও সৎকর্ম্মে বিলম্ব একান্ত দোষাবহ।' এইরূপে উৎসাহিত হইয়া নানক আনন্দচিত্তে সমুদয় অর্থ সাধু-সেবায় খরচ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার লবণব্যবসায় হইল না! এই ঘটনায় তদীয় পিতার অসন্তোষ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কথিত আছে, "সাধুসেবার দ্বারা যে ধন অর্জ্জন করিয়াছি তাহা অন্য কোন ব্যবসায় দ্বারা অর্জ্জন করা অসম্ভব"—এই বলিয়া নানক পিতাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন।

বিষয়কর্ম্মে পুত্রের অনাস্থা দেখিয়া কুল্লু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; নানক বাল্যকাল হইতে জাগতিক ভোগবিলাস ও সুখদুঃখকে অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কিছুদিন পরে পিতা সুলতানপুর নামক গ্রামে একখানি দোকান খুলিয়া উহার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু পরে দেখিলেন, উক্ত ব্যবসায় হইতে কোনরূপ লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইতেছে। নানক সাধুসেবা পূর্ব্ববৎ চালাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পিতা ব্যথিতচিত্তে উক্ত ব্যবসায় উঠাইয়া

দিলেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কুল্লু অবিলম্বে পুত্রের বিবাহ দিলেন। তিনি জানিতেন যে,ফকির ও সাধুদিগের প্রতি অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হওয়ার প্রধান কারণ। বিবাহবন্ধনে পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া কুল্লু ভাবিয়াছিলেন, উহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইবে। কিন্তু কালক্রমে উক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং বিবাহ করিলেও তিনি সাধু ও ফকিরদিগের সহিতই অধিক সময় যাপন করিতেন। এবং নানকও বুঝিলেন যে, ক্রমে তাঁহার বন্ধন বাড়িতেছে ; উহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অচিরে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যবিহারে সন্ন্যাসীজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নানকের সংসার-জীবনের অবসান হইল। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্তকালে তিনি বালকমাত্র ছিলেন। একাদশ বয়ঃক্রম হইতেই তাঁহার নবজীবন আরম্ভ হইল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্যান্য সাধুদিগের সহিত তর্কবিচারাদিতে স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রবল তিতিক্ষা ও অসাধারণ মেধায় মুগ্ধ হইয়া পরে অনেকেই তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে মুরদানা নামক এক মুসলমান যুবকের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় নানক এই যুবকের সুমিষ্ট বাদ্য উপভোগ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বুধ ও লেনা নামক শিষ্যদ্বয়ও বিখ্যাত। বুধ নানকের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন—তিনি একটী ঘটনা হইতে নানকের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টুঙ্গ নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক প্রান্তরে একদা বুধ গাভী চরাইতেছিল। তখন দ্বিপ্রহর, নানক ঐস্থান দিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় অপরিচিত বুধের নিকট বারিপানের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া বুধ বলিল, 'মহাশয়! নিকটে কোনস্থানে ত জল নাই, সুতরাং আমাকে বহু-দূর গমন করিতে হইবে, তবে আপনি যদি আমার গাভীগুলি রক্ষণের

ভার লন, তাহা হইলে আমি শীঘ্র আপনাকে জল আনিয়া দিব। এ স্থানের সন্নিকটেই একটী পুষ্করিণী আছে কিন্তু এখন তাহাতে জল নাই।' ইহা শুনিয়া নানক বলিলেন, 'যে পুষ্করিণীর কথা তুমি বলিতেছ—তাহাতে যথেষ্ট জল আছে, তুমি লইয়া আইস।' এ উক্তির সত্যতায় বুধের বিশ্বাস হইল না; তাহাতে নানক বলিলেন—'ঐস্থানে স্বয়ং যাইলেই সত্য মিথ্যার প্রমাণ পাইবে।' বুধ তৎক্ষণাৎ জল আনিতে ছুটিল। শুষ্ক, জলহীন পুষ্করিণী স্বচ্ছ জলপূর্ণ দর্শনে বুধের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। প্রাতঃকালে ঐস্থান দিয়া যাইবার সময় সে জলের চিহ্নমাত্র দেখিতে পায় নাই। এই ঘটনা হইতেই বুধ স্পষ্ট বুঝিল নানক সাধারণ ব্যক্তি নহেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। নানকের সমসাময়িক বলিয়া পরবর্ত্তী শিখগুরু অর্জ্জুন ও হরগোবিন্দ তাঁহাকে অতীব সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বুধ সানন্দে ঐ পুষ্করিণী দেখাইয়া দিয়াছিল। তখন হইতে ঐ পুষ্করিণীটীকে সকলেই পবিত্র বলিয়া মনে করিত।

লেনার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, পুণ্যতীর্থ জ্বালামুখী অভিমুখে যাত্রা করিবার পথে নানকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া অবিলম্বে লেনা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

অতঃপর আমরা নানক-প্রচারিত ধর্ম্মমত ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মনে রাখিতে হইবে যে, নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামির স্থান ছিল না। সে সময়ে হিন্দু সমাজে জাতিবিচার প্রচলিত, সুতরাং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সমাজকর্ত্তৃক একপ্রকার পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত হইত। ইহাদিগকে নানাবিধ অভাব অভিযোগের মধ্যে সামান্যভাবে কালাতিপাত করিতে হইত। নানক বাস্তবিকই ইহাদিগের দুঃখকষ্টে সমবেদনাশীল ছিলেন, ইহাদিগের শোচনীয় অবস্থার প্রতি তিনি কখনও ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন

নাই"। সুতরাং তৎপ্রচারিত ধর্ম্মে ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে স্থানদান করা হইয়াছিল। তিনি নিজ শিষ্যনির্ব্বাচনে কোনরূপ জাতিবিচার মানিয়া চলেন নাই, বরং নীচজাতি হইতেই অধিক সংখ্যক শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তদীয় শিষ্যসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে অপর একটী বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল—উহা মুসলমানদিগের অত্যাচার ও সঙ্কীর্ণতা। সে সময়ে মুসলমান ভারতের অধীশ্বর, সুতরাং মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে প্রবল প্রতাপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নানক আপনার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফলস্বরূপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চিরদিনের বিদ্বেষ ও অসদ্ভাবের পরিবর্ত্তে একতা বা সাম্য আনয়নে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়া সকলের পূজ্য ও মাননীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও বাণীতে হিন্দুর প্রতিমাপূজার প্রতি শ্লেষ ও তৎসহ মুসলমানের সঙ্কীর্ণতার প্রতি কটাক্ষ উভয়ই দেখিতে পাই। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে আমরা এক কথায় নির্গুণ ঈশ্বরবাদ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। তিনি নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে বলিতেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী এবং প্রবল পরাক্রমশালী। ভগবান মানবের প্রত্যেক কর্ম্মের সহিত পরিচিত, মানবগণের গভীরতম অনুভূতি পর্য্যন্তও তাঁহার নিকট অজ্ঞেয় নহে। তিনি দেশকালের অতীত—অবিনশ্বর, নিত্য মুক্ত। মানবের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই তাঁহার দান। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাঁহার ধ্বংস নাই। জগতের প্রতি অণুপরমাণু জগদীশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। একদা নানক পশ্চিম দিকে পা করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে এক মোল্লা আসিয়া বলিল—"এ ব্যক্তি একান্ত অবিশ্বাসী, ইহার এত স্পর্দ্ধা যে ভগবানের বাসস্থান মক্কার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করে!" ইহা শুনিয়া নানক উত্তর করিলেন—"ভগবান কোথায় অবিদ্যমান তাহা আমাকে বলিয়া দিতে পার?"

এই উক্তি হইতে আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত স্পষ্টই অনুমান করিতে পারি। এইরূপে সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরের সত্বা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়া এবং মানবের প্রতি তিনি কিরূপ করুণাপরবশ, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া নানক জাগতিক ধনজনসম্পদ তৃণাদপি তুচ্ছ বিবেচনা করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু অর্থ ছিল সমুদয়ই তিনি বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কোন মানবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে সকলের মধ্যেই শ্রীভগবানের সত্বা বিদ্যমান।

যাঁহারা বলেন যে ভগবদাজ্ঞার অবহেলাবশতঃই আদিমানব স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, নানক তাঁহাদিগের মত সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেন, নিষ্পাপ ও সৎ হইতে হইবে, সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ভগবান্ মানবের প্রত্যেক কর্ম্মের গুণাগুণ বিচার করিতেছেন—ইহাতেই সমগ্র সুখ নিহিত নতুবা ঐরূপ চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।

তিনি পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার মতে সাধু ও সৎব্যক্তি-গণই মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিবে। যাহারা ভগবদ্‌নাম-মাহাত্ম্যে আস্থাহীন অথচ যাহারা অসৎজীবন অতিবাহিত করে না এরূপ মানব-দিগকে মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যাহারা পাপজীবন যাপন করে তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মনুষ্য জন্মের পরিবর্ত্তে নীচ প্রাণীজন্ম লইতে হইবে। কোন কোন শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে, নানক তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন,—ঈশ্বর মানুষের হাতেই তাহার স্বর্গ কিংবা নরকগমনের ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ এতদুভয়ের নির্ব্বাচনে কতকটা স্বাধীন।

নানক অধিকাংশ সময় ভগবদ্‌পূজা ও আরাধনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল। উহার বিবরণ আমরা বহু পুস্তকে দেখিতে পাই। একদা নানক এক অত্যাশ্চর্য্য আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন।

"ওয়া গুরুজী!" "ওয়া গুরুজী" ধ্বনিতে নভঃস্থল বিদীর্ণ হইল। এই অদ্ভুত স্বর তাঁহাকে বারংবার আহ্বান করাতে তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঐ স্বর বলিল—'হে নানক! তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, কলিতে তুমি আমার নাম ও মহিমা প্রচার কর।' ইহা শুনিয়া করজোড়ে নানক উত্তর করিলেন—"হে ভগবন্! আমি অতি দীনহীন, আপনার অপূর্ব্ব নাম প্রচারে আমার শক্তি নাই, আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি এরূপ কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেছি না।" উত্তর আসিল, "আজি হইতে আমি তোমার সহিত সর্ব্বদা বসবাস করিব, তোমার কোন আশঙ্কা নাই—আমি তোমার পরম সহায়, তুমি নির্ভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। আমি তোমার গুরুরূপে বিদ্যমান। বৈরাগী যেরূপ সর্ব্বদা রামনাম উচ্চারণ করিতে থাকে, সন্ন্যাসী যেরূপ 'ওঁ নারায়ণ' বলে, সেইরূপ তুমি তোমার শিষ্যদিগকে 'গুরী' 'গুরী' এই নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দাও। আমি স্বয়ং তোমার শিষ্যদিগের রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগের অনিষ্টসাধনে কোন ব্যক্তি সমর্থ নহে। তুমি শিষ্যসহ ধর্ম্মশালায় বসবাস করিবে, তাহাদিগের সকলের সংসার-ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং অনুক্ষণ উহাদিগের সাধনে তৎপর থাকিতে হইবে। প্রথম—ভগবদ্নামে অচলা ভক্তি, দ্বিতীয়—সর্ব্বজীবে দয়া এবং তৃতীয়—ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা। ঐ মন্ত্রত্রয়ই সাফল্যের মূলস্বরূপ। হে নানক! তোমাতে ঐশী শক্তির পূর্ণ প্রকাশ বিদ্যমান, কলির পাপাপহরণে তুমিই উপযুক্ত।" সেই অদ্ভুত স্বর অনন্তে মিশাইবার পূর্ব্বে আবার বলিল—"ওয়া গুরু"! "ধন্য নানক! তুমি ধন্য!"

এইরূপে ভগবদ্শক্তির দ্যোতনায় হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া গুরু নানক প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। যে শক্তি তাঁহাকে ঐ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল উহার অভূতপূর্ব্ব মহিমা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন; এবং তদীয় প্রচারকার্য্যে তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা পাইয়া

থাকি। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত এবং সিন্ধুপ্রদেশের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তিনি মক্কাতেও গমন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অপূর্ব্ব বাণীর সত্যতা ও মহিমা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তদীয় শিষ্যসংখ্যা তৎকারণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি নিজ সম্প্রদায়ে গোহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন; তিনি গাভীকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং শিষ্যগণও যাহাতে উক্ত গর্হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে মহম্মদের পরবর্ত্তী অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি মহম্মদকে সম্মান করিতেন সন্দেহ নাই কিন্তু মহম্মদের গোহত্যা ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রভৃতি কোন মতে সমর্থন করিতেন না।

নানক আপনার দীর্ঘজীবন প্রচারকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারে কোন বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, সামান্য একটী বটবৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তিনি শিষ্যদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাত্মনয়ন খুলিয়া গিয়াছিল। অনুভূতিজাত উচ্ছ্বাস ও আবেগ যেমন ছিল তাঁহার তদ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষাও ছিল। তিনি ভজন করিবার জন্য ভগবদুদ্দেশ্যে কতকগুলি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—এইগুলি শিষ্যসহ প্রায়ই পাঠ করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রচারকার্য্যের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন; এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য ফকিরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি হিন্দু যোগী অতীব ক্রুদ্ধ হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় অসাধারণ শক্তির প্রভাবে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প ইত্যাদি প্রাণীরূপ ধারণ করিয়া নানকের ভয়োৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে লাগিল এবং অন্য একজন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নভস্তল হইতে তারকারাশি উৎপাটন করিয়া ক্ষুদ্র

প্রলয় আনয়নে নানকের তথাকথিত গর্হিতকর্ম্মের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু নানক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাকে কোন অলৌকিক শক্তি প্রকাশে অনুরোধ করিল। উহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"আমার কোন অালৌকিক ক্ষমতা নাই। আমি একজন সামান্য ধর্ম্মনেতা। সত্যপ্রচারই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।" এই উক্তি হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে তিনি কখনও আপনাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থে নানকজীবনের সহিত অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এস্থলে একটীর উল্লেখ করিব। নানকের জীবন যে পবিত্র এবং অমূল্য তাহা যেন প্রকৃতি দেবীও জানিতেন—তৎসম্বন্ধে বর্ণিত আছে—শিশু নানক ক্ষেত্রে গরু চরাইতে গিয়া যখন দ্বিপ্রহরে অতীব ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন পাছে তাহার মুখমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে সেই জন্য স্বয়ং সর্পরাজ ফণা বিস্তার করিয়া থাকিতেন।

অতঃপর আমরা নানক-প্রণীত প্রধান শিখধর্ম্মগ্রন্থগুলির বিষয় কিছু বলিব। প্রথম গ্রন্থের নাম "প্রাণ সাঙ্কলী"। ইহা শিখধর্ম্মাবলম্বীদিগের জীবন সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছিল—ইহাতে কতকগুলি নিয়মাদি উল্লিখিত আছে। উহা নানকের পরজীবনে রচিত প্রধান পুস্তক "গ্রন্থের" প্রথমভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই "প্রাণ সাঙ্কলী" গ্রন্থ নানকের পূর্ব্বজীবনের রচনা। এই কার্য্যে তিনি জনৈক রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাজা সর্ব্বপ্রথমে নানককে তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"আমি ফকির, আমার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই।" নানকের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া এই নৃপতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নানক-প্রণীত ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থ" শিখধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচালনার জন্য রচিত হইয়াছিল। নানক দেখিলেন, তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ

বাড়িয়া উঠিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের জীবনযাপন প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তৎসংক্রান্ত প্রত্যেক আবশ্যকীয় আদেশ লিপিবদ্ধ করিবার একান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকে নানক প্রচারিত ধর্ম্মমতের সকল তথ্য নিহিত আছে। শিখধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখেন। কিন্তু কালক্রমে এই "গ্রন্থ" আবার দুইভাগে ভাগ হইয়া গেল—প্রথম ভাগের নামকরণ হইল "আদিগ্রন্থ" অর্থাৎ যাহা নানক ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকজন গুরু দ্বারা রচিত দ্বিতীয় ভাগ—দশম নেতা গুরু গোবিন্দ রচিত পুস্তক। ইহার নাম—"দশম বাদশাকী গ্রন্থ"। এই দুই বিভিন্ন ভাগের মধ্যে মতের পার্থক্য অনেক। এমন কি আমরা ইহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ পুস্তক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

নানক-প্রচারিত শিখধর্ম্ম প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে করুণা বা দয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আপন শিষ্যদিগকে জাগতিক ঐশ্বর্য্যের আপাতরম্য সৌন্দর্য্যকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে থাকিয়া শান্ত পবিত্র ও সাধুজীবন অতিবাহিত করিতে হইত। সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা উত্তেজনাপূর্ণ ও চাঞ্চল্যময় জীবন-যাপন নানকের মনোভিলাষ ছিল না। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে শিখজাতিকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল।

শিখজাতি কালক্রমে নানক প্রচারিত ধর্ম্ম অর্থাৎ আদি গ্রন্থে যাহা আমরা পাইয়া থাকি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল; নানকের দীক্ষামন্ত্র গুরু গোবিন্দের পর শিখসমাজ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এই আমূল পরিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হইয়াছিল তাহা আমরা পরবর্ত্তী গুরুদিগের জীবনেতিহাস আলোচনা করিবার কালে পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। নানকের শেষজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জীবনের শেষভাগ নানক রাভি নদীর তীরে কাটাইয়াছিলেন। ঐস্থানে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া থাকিতেন। তিনি দুইটী

পুত্র রাখিয়া যান। প্রথমটীর নাম লক্ষীদাস, দ্বিতীয় শ্রীচাঁদ। লক্ষ্মীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি জীবিত আছেন। শ্রীচাদ বিবাহাদি করেন নাই—ফকির হইয়াছিলেন—ইঁহার শিষ্যেরা উদাসী ফকির নামে বিখ্যাত।

অপর মতে নানকের কোন পুত্রাদি হয় নাই। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, নানকের লাল্লু নামে এক পিতৃব্য ছিলেন। তিনি নানককে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। পিতৃব্যপুত্র লক্ষ্মীদাসের সহিত নানকের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ও প্রীতি ছিল। নানক বলিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—উভয়েই এক ছিলেন। এই লক্ষ্মীদাসের পুত্রাদিই নানকপুত্র নামে পরিচিত ছিল।

এই ভাবে দীর্ঘকাল শ্রীভগবানের নাম ও তাঁহার মহিমা প্রচার-কল্পে রত থাকিয়া গুরু নানক একসপ্ততিবর্ষ ধরাধামে অবস্থান করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ১৫৩৯ বর্ষে নরকলেবর পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। রাভি নদীর উপকূলে কুলানুর নামক গ্রামের সন্নিকটে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই স্থান অদ্যাপি 'কীর্ত্তিপুর' নামে বিখ্যাত হইয়া পুণ্যপীঠরূপে বিরাজ করিতেছে। শত শত তীর্থযাত্রী এস্থান ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের নরজন্ম সার্থক বিবেচনা করিয়া থাকে।

স্বপ্নতত্ত্ব।

দূরদর্শন-শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত।

(ডক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার।)

(৪)

মানবের সকল প্রকার মানসিক অনুভব বা ক্রিয়া কেবল যে দেহ-যন্ত্রের সহায়ে এবং উহার মধ্য দিয়া হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক ক্রিয়া ও অনুভবের সহিত অবিচ্ছেদ্য পৃথক্, পৃথক্ দৈহিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। উহাকে আমরা ঐ ক্রিয়ার দৈহিক প্রতিচ্ছবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। দেখা যায়, দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ক্রিয়ারও পরিবর্ত্তন হয় এবং পূর্ব্বোক্ত দৈহিক প্রতিচ্ছবি বা পরিবর্ত্তন স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কেই প্রধানতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ জন্য মস্তিষ্ককেই ঐ ক্রিয়া-সমূহ উৎপাদনের একমাত্র যন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের যাবতীয় মানসিক ক্রিয়া ও অনুভব মস্তিষ্কের কোষ-সমূহের উত্তেজনা এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিণতি হইতেই উপস্থিত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি প্রবৃত্তিমূলক দেহীর স্থূল মনোভাব-সমূহের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতের সত্যতা কতকাংশে অস্বীকার করিতে না পারিলেও তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেকগুলি মনোভাবের বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐ মত বাধ্য হইয়া অস্বীকার করিতে হয়। হিন্দু দার্শনিকগণের মতে মৃত্যুর পরেও মানবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং ঐ অবস্থাতেও সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম জড়োপাদানে গঠিত তাহার মনের লোপ হয় না—কেবল জীবৎ-কালের ন্যায় স্থূল দেহযন্ত্রের ভিতর দিয়া না হইয়া তাহার মনের ক্রিয়া সকল তখন তাহার সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হিন্দু দার্শনিকগণ ঐরূপে জন্ম জরা মৃত্যুর অধীন জীবের স্থূল দেহের অভ্য-

স্বন্ধে একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা নাশিত সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, এ কথা বলিতে হইবে না।

স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত মানবমনের কতকগুলি প্রত্যক্ষ (Phenomena) প্রাচ্য দার্শনিকগণের পূর্ব্বোক্ত মত অনেকাংশে সত্য বলিয়া সমর্থন করে, এ কথা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। বাস্তবিক সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির-অগোচর মৃত্যুর পারের অবস্থা ও অনুভব সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা জীবৎকালেই কখন কখন এমন সকল মানসিক ক্রিয়ার সম্মুখীন হই যে, তাহাদিগকে মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও বিকৃতি-পরিণতি কিছুতেই বলা চলে না। পাশ্চাত্যের জড়বাদ অবলম্বনে ঐরূপ ঘটনা সকলের কোনরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্বপ্নাবস্থায় দূরস্থিত বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধী ঘটনা দর্শন-বিষয়ক যে কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি তৎসম্বন্ধে আমরা এখানে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উক্ত দূরদর্শন বা clairvoyance রূপ ব্যাপারটি প্রফেসর ক্রুকস্ প্রমুখ (Professor Crookes) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অন্য সকল মানসিক ক্রিয়া ও অনুভবের ন্যায় জড়বাদ অবলম্বনে মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পন-প্রসূত বলিয়া brain wave theory দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত—একজনের চিন্তা আর এক জনের মনে বিনা তারে প্রচরণশীল তড়িৎবার্ত্তার (wireless telegraphy) ন্যায় সংক্রমিত হয়। বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে উত্তেজিত মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ বিভাগস্থ কোষ সকলের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরে বিভিন্ন চিন্তাতরঙ্গের উদয় হইয়া থাকে। আবার (ether) বা যে পদার্থ অবলম্বনে আলোকরশ্মি এবং তড়িতকম্পন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসৃত হয়—জগতের অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের মস্তিষ্কের কোষগুলির চতুষ্পার্শ্বেও যে ইথার রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক-কোষ-সকলের কম্পন ঐ ইথার সহায়ে সংক্রমিত হইয়া অন্য এক ব্যক্তির

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অনুরূপ কম্পনের উদয় করিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি ? সুতরাং বুঝা যাইতেছে, দূরদর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারে চিন্তাবিশেষ-প্রেরণকারীর মস্তিষ্কের কোষসকলের কম্পন ইথার সহায়ে চালিত হইয়া যাহার নিকট চিন্তা প্রেরিত হইতেছে তাহার মস্তিষ্কস্থ কোষ-সকলে আঘাত ও সমসমান কম্পন উৎপাদনপূর্ব্বক তাহার মনে অনুরূপ চিন্তা উপস্থিত করিয়া থাকে। ক্রুকস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষি-গণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাদিগের সংগৃহীত ঘটনাবলীর মধ্যে এক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ দূরদৃষ্টি সম্বন্ধী যে সকল প্রত্যক্ষ ইংলণ্ড এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকলের আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের অধিকাংশগুলিতেই দূরে অবস্থিত আত্মীয়-বর্গের নিকটে নিজ সংবাদপ্রেরণকারী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে অচৈতন্য অবস্থায় পতিত থাকিবার কালেই ঐরূপ করিতেছেন। ঐরূপ প্রত্যক্ষ-সকল আমাদিগের দেশেও বিরল নহে। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় তৎকৃত 'ভাষা ও আদিরস এবং পরবশতা' নামক গ্রন্থে যে উনত্রিশটি সফলীকৃত স্বপ্নবিবরণ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে নয়টি ঐরূপ দূরদর্শন-শ্রবণাদিমূলক। নিম্নে উদ্ধৃত ঐ কয়টি পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সংগৃহীত ঘটনাবলীর ন্যায়।

(১) রংপুর জেলার পুলিস অফিসের হেড ক্লার্ক শ্রীমান রজনীকান্ত মৈত্রেয় তাহার পিতৃবিয়োগ সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিল ; এবং পরে সেই স্বপ্ন সত্য বলিয়া জানা গিয়াছিল।

(২) রাজসাহী জেলার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ঘটক স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা ভিজা গায়ে, ভিজা কাপড়ে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার আর্দ্র কেশ এবং আর্দ্রবস্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে ; এবং তিনি শীতে পীড়িত হইয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিবার পর মোহিনীমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতা

স্বপ্নদৃষ্ট সময়েই নৌকা ডুবিয়া গোয়ালন্দের নিকট নদী মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন; এবং তখনই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(৩) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, জেলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন মেটুয়ানী গ্রামে বাস করেন। এই ব্যক্তি অল্পদিন হইল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পৌত্রী আসিয়া বলিতেছে, "দাদা, তুমি আমাকে আনিলে না; আমি একাই আসিলাম।" পৌত্রী নিকটবর্ত্তী কানুসোনা গ্রামে বাস করিত। এই স্বপ্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভাত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দর্শন করেন। পরে বেলা ৯।১০ টার সময় সংবাদ পাইলেন যে ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সময়ে তাঁহার পৌত্রীর মৃত্যু হয়।

(৪) গত ২০শে শ্রাবণ (১৩১৩) জেলা রাজসাহী, ষ্টেশন বড়াইগ্রামের অধীন নগরগ্রাম-নিবাসী জানকীনাথ রক্ষিত রামপুর-বোয়ালিয়াতে শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বগ্রামবাসী একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "আপনি এখানে কি করিতেছেন? আপনার কন্যা বাঁচে না।" কন্যা ইন্দুপ্রভা তখন নগরগ্রামে তাঁহার নিজ বাটীতে ছিল। রক্ষিত মহাশয় এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হন। তারপর দিন বেলা ২ টার সময় টেলিগ্রামে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার কন্যা অত্যন্ত কাতর। ঐ টেলিগ্রাম প্রাতে ১০॥০ টার সময় নগরের নিকটবর্ত্তী চাটমোহর আফিসে করা হইয়াছিল। এই স্বপ্নটির সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবেন যে, তৃতীয় ব্যক্তি কন্যার কাতর সংবাদ বলিয়াছিল, কন্যা স্বয়ং বলে নাই এবং কন্যা মৃত্যুমুখেও পতিত হয় নাই।

(৫) ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামে শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক বাস করেন। তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। ৭।৮ মাস হইল বাওয়ালিতে একদিন প্রায় শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার ঠাকুরমাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইতেছে, এবং তিনি কাঁদিতেছেন। ঠাকুরমা তৎকালে ভবানীপুরে চিকিৎসা করাইতেছিলেন। ঐ স্বপ্ন দেখিবার পরদিবস একব্যক্তি আদক মহাশয়কে বলিল, "তোমার

ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন।" তাঁহার ঠাকুমার প্রকৃতই সেই রাত্রে মৃত্যু হইয়াছিল।

(৬) রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার মাতুলানী বিধবা হইয়াছেন। মাতুলের স্বাস্থ্য সে সময় ভাল ছিল, তাঁহার মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না। পরে দেবেন্দ্রবাবু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যে রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই সময়েই তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছিল।

(৭) বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রের নাম যামিনীকান্ত ও পুত্রবধূর নাম কুমুদিনী ছিল। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যামিনী তাঁহার স্ত্রীকে নিজ বাড়ী ঢাকা জেলাস্থ কোরহাটী গ্রামে আনিলেন। তখন ঐ গ্রামে ওলাউঠা হইতেছিল। কুমুদিনী স্বীয় পতিকে বলিলেন যে, তাঁহাকে "এ সময় আনা হইল, পাছে কি হয়।" এই কথায় বোধ হয় যে কুমুদিনী ওলাউঠার ভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন। ইহার দুই তিন দিন পর যামিনী কলিকাতা আসিলেন; তথায় অল্পদিন থাকিবার পর ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রভাত হইবার সময় (তখন ৫টা বাজিয়াছিল) যামিনী স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার স্ত্রীর তলপেটে ব্যথা, হাতে খিঁচুনি (cramp) হইতেছে, এবং তিনি বারম্বার জল খাইতে চাহিতেছেন। যামিনীর তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বীয় পত্নীর ওলাউঠা হওয়া বিবেচনা করিলেন। স্বপ্নে তিনি কয়েকটী আত্মীয়স্বজনকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; এবং কুমুদিনীকেও শয়নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে (১৬ই অগ্রহায়ণ) তিনি সেই স্বপ্নের কথা আত্মীয়গণকে বলিয়া সেই দিনই বাড়ী রওনা হইলেন; এবং সেই দিনই রাত্রি ৮।৯ টার সময় বাড়ী পৌঁছিলেন। তখন দেখেন যে, সত্যই তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্বরাত্রি দুই তিন ঘটিকার সময়, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখিবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা হইয়াছিল। যামিনী স্বপ্নে

যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এবং যে ব্যক্তিদিগকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাইলেন। শেষ রাত্রি (১৬ই অগ্রহায়ণ) প্রায় প্রভাতের সময় কুমুদিনীর মৃত্যু হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিম্নলিখিত স্বপ্ন দুইটী শশধর বাবুর পুস্তকে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন—

(৮) আমার খুল্লতাত ৺রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের আবাস বাটীতে পীড়িত ছিলেন। আমি সে সময়ে হাজারিবাগ কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য করিতাম। একদিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, খুল্লতাত মহাশয়কে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিতেছি—দেহ অসাড়; প্রাতঃকালেই আমি উঠিয়া সেই তারিখটি ও আনুমানিক সময়টি লিখিয়া রাখিলাম। তাহার কয়েকদিন পরেই বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, খুল্লতাত মহাশয় ঠিক সেই তারিখেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৯) আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমাদের তৃতীয়া মাসীমাতা ঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন তিনি সেই ঘটনার বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, একদিন প্রভাতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে মাসীমা হরিনামের মালা হাতে করিয়া শীর্ণদেহে তাঁহার নিকট বলিতেছেন, "ত্রৈলোক্যনাথ, তোরা খুব সংকীর্ত্তন কর।" দাদা-মহাশয় তৎপর দিবসই বাটী হইতে পত্র পাইলেন যে, ঠিক সেই দিন এবং ঠিক সেই সময়েই মাসীমাতা ঠাকুরাণী দিব্যধামে প্রস্থান করেন।

দূরদর্শন সম্বন্ধী ঐরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ত্তমান লেখকও স্বয়ং সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে; ঐগুলিও এখানে সন্নিবেশিত হইল।

(১০ একজন ব্যারিষ্টার তাঁহার কলিকাতার বাসাবাড়ীতে জ্বর-বিকাররোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার স্ত্রী ও শিশু পুত্র ঐ সময়ে তাঁহার শ্বশুরালয় উলুবেড়িয়াতে ছিল। বিকারাবস্থায় তিনি সহসা বলিতে

লাগিলেন, "একি! আমার ছেলের মুখে রক্ত কেন?" রোগীর নিকটস্থ সকলেই তখন মনে করিল, উহা বিকারের খেয়ালপ্রসূত প্রলাপ বাক্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল, তাঁহার উলুবেড়িয়াস্থ শ্বশুরালয়ে ঐ কালে এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যাহা কোনরূপ অচিন্ত্য উপায়ে দর্শন করিয়াই তাঁহার মুখে ঐরূপ বাক্য নির্গত হইয়াছিল। তাঁহার চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু তাহার সঙ্গীদের সহিত খেলা করিতে করিতে সহসা শূন্যের দিকে চাহিয়া ঐ সময়ে বলিয়াছিল, "একি! আমার বাবা এখানে কেন?" ঐ কথা বলিয়াই সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া যায় এবং একটি ইষ্টকের উপর পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাটিয়া তাহার মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল।

(১১) নিম্নলিখিত বিবরণটি আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত ৺দ্বারিকা নাথ সরকার রায়বাহাদুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। ইনি নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান সুশীল কুমার আমাদের পরমারাধ্যা পিতা-মহী ঠাকুরাণীর নিকটে থাকিয়া লালিত পালিত হইত। ১০।১১ বৎসরের সময় সুশীলের মৃত্যু হয়। তখন সে ফরিদপুর জিলার রামদিয়া গ্রামে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসভবনে পিতামহী ঠাকুরাণীর সহিত অবস্থান করিতেছিল। সুশীলের মৃত্যুর দিনে আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় উচ্চপদস্থ কোন সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত নদীয়া জেলার মফঃস্বলে কোন স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে গমনপূর্ব্বক তাম্বু খাটাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার পুত্র সুশীল মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে এবং তাঁহার মৃতা পত্নী বহুপূর্ব্বে পরলোকগত তাঁহার দুইটি সন্তানকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে নিজ সমীপে লইয়া যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর প্রভাত হইবামাত্র তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে সাহেবের নিকটে স্বপ্নঘটনার উল্লেখ করিয়া ছুটি চাহিলেন। সাহেবও দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছুটি দিলেন এবং সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, স্বপ্নের ঘটনা কখন

সত্য হয় না; পত্নী ও পুত্রগণের প্রতি ভালবাসা হইতেই তিনি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। উত্তরে জেঠামহাশয় সাহেবকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ জীবিত থাকিলে এতদিনে যত বড় হইত স্বপ্নে তিনি তাহাদিগকে তত বড় দেখিয়াছেন। এবং কোনরূপ সুস্পষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলেও তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছে. যথার্থই তিনি তাঁহার পরলোকগত পত্নী এবং পুত্র দুইটিকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার কণিষ্ঠ সন্তানটি সত্য সত্যই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। অনন্তর তারযোগে সংবাদ আনয়নপূর্ব্বক তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, সত্যই সুশীল কুমারের ঐ রাত্রে মৃত্যু হইয়াছিল।

(১২) জেঠাইমাতার মৃত্যুর সময়েও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় স্বপ্নে ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। জেঠাইমা ঐ সময়ে তাঁহার পিত্রালয় দুর্ল্লভ পুর গ্রামে সূতিকা রোগে ভুগিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ঐকালে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষম পীড়িতা এইরূপ সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে আসিবার জন্য কেহ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া ডাকিতে আসিতেছে। সংবাদ পাইলেই তিনি ঐ সময়ে পীড়িত দরিদ্রদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান এবং সময়ে সময়ে হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। কোন দরিদ্রার পীড়া হইয়াছে অনুমান করিয়া তিনি যেন তৎক্ষণাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির সহিত নৌকা-রোহণে রোগীকে দেখিতে যাইলেন এবং কোন এক স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, এক শীর্ণকায়া রমণী উদারাময়, জ্বর ও পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া ছুটফট্ করিতেছে। ঐরূপ দেখিবার পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনন্তর প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবামাত্র শুনিলেন, দুর্ল্লভপুর হইতে তাঁহাকে লইতে লোক আসিয়াছে। তিনি বলিতেন, তথায় পৌঁছিয়া তিনি পত্নীকে ঠিক স্বপ্নদৃষ্টা রমণীর ন্যায় উদরাময়, জ্বর ও পেটের বেদনায় আর্ত্ত দেখিয়াছিলেন।

(১৩) আমাদের পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া পিতামহী ঠাকুরাণী "আমার

জীবন"* আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সমসাময়িক কালের উজ্জ্বল চিত্র-সহ নিজ জীবনের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি নিজ জীবনের জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাকালে দূরদৃষ্টি শক্তির পরিচায়ক যে কয়েকটি ঘটনা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমরা উহা হইতে সংক্ষেপে এখানে প্রদান করিতেছি। আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত ৺প্যারিলাল সরকার মহাশয় বহরমপুর কলেজে পঠ-দ্দশায় মৃত্যু মুখে পতিত হইবার কালে আমাদের পিতামহী ঠাকুরাণী রামদিয়া গ্রাম হইতে ঐ ঘটনা স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়াছিলেন।

(১৪) নিম্নলিখিত স্বপ্ন বিবরণটি ৺অঘোরনাথ ভাদুড়ী ডাক্তার মহাশয় তাঁহার পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন। "একদা তিনি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক রোগীর বাটী হইতে একটি লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিল। এবং তিনি ঐ লোকটির দ্বারা আনীত গাড়ীতে সেই রোগীকে দেখিতে যাইলেন। গাড়ী কিয়দ্দূর গমন করিলে রাস্তা হইতে অন্য একজন লোক ডাকিয়া বলিল কাহার গাড়ী যায়, ডাক্তার বাবুর সঙ্গের লোকটি উত্তর দিল, হাঁ। রাস্তায় দণ্ডায়মান লোকটি ঐ কথা শুনিয়া বলিল আর যাইতে হইবে না, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃদেব ভাদুড়ী মহাশয় ঐরূপ স্বপ্ন দেখিবার পরে জাগিয়া ঐ বিষয় আমার জননীকে গল্প করিতেছেন এমন সময়ে বাহিরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় দেখিলেন, স্বপ্নে দৃষ্ট-ব্যক্তির ন্যায় এক ব্যক্তি কোন এক রোগীর বাড়ী হইতে সত্য সত্যই তাঁহাকে লইতে আসিতেছে। অনন্তর বাহিরে আসিয়া তিনি ঐ ব্যক্তিকে নিজ স্বপ্ন বিবরণ বলিয়া তাহার সহিত যাওয়া নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বারম্বার বুঝাইতে লাগিলেন। আগন্তুক লোকটি কিন্তু তাঁহার ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিশেষ উপরোধ করাতে

* পুস্তকখানি ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ 'ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং কোং' পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

তাঁহাকে অগত্যা তাহার সঙ্গে গাড়ী চড়িয়া যাইতে হইল এবং ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার অনুরূপভাবে রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।"

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিগণের ঐরূপে দূরে চিন্তা প্রেরণাদি কার্য্যকুশলতা এবং তাহাদিগের আত্মীয়বর্গের ঐ বিষয়ে জ্ঞানলাভসম্বন্ধী স্বপ্নবৃত্তান্তের বিবরণ আমাদের দেশ হইতেই অনেকগুলি সংগৃহীত হইল। ঐ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বিদেশী বিবরণও অপর্য্যাপ্ত বিদ্যমান। পাঠকের তুলনায়-আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া উহাদিগের দুই চারিটি মাত্র নিম্নে প্রদান করা গেল।

(১৫) পুরাকালের বিখ্যাত ল্যাটিন কবি পেট্রার্ক (Petrarch) তাঁহার প্রিয়তম পত্নী লরা (Laura) ইহধাম পরিত্যাগ করিবার পর সেই রজনীতেই পুনরায় তাহাকে স্বপ্নে সন্দর্শন করেন এবং ঐ ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বিখ্যাত কবিতা মৃত্যুর জয় (Triumph of Death) লিখিয়া যান—একথা প্রসিদ্ধ আছে।

(১৬) বিখ্যাত লেখক Cicero তাঁহার একখানি পুস্তকে দুইজন আরকেডিয়ান (Arcadians) ভ্রমণকারীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অদ্ভুত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনে একত্র ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থলে পৌঁছিয়া কোন কারণে একজন একটি সরাইএ এবং অন্য ব্যক্তি একটি ভদ্র লোকের বাটীতে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি ভদ্র লোকের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ঐ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হইয়া যেন তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে উহাকে মিথ্যা দুঃস্বপ্ন জ্ঞানে মন হইতে তাড়াইয়া তিনি পুনরায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, সেবারেও তিনি স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি যেন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, দুষ্টেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহের উপর একখানি জীর্ণ গোশকট ও জমীর সার চাপা দিয়া অমুক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে ; আসিতে বিলম্ব করিলে তাহারা উহা অন্যত্র সরাইয়া ফেলিবে। ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার

বন্ধুর মৃত দেহ ঐরূপ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছিল। সিসিরো উক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, দেবতারা যাঁহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে স্বপ্ন সহায়ে ঐরূপ অনেক জটিলরহস্য জানাইয়া দেন।

(১৭) ইতিপূর্ব্বে আমরা একজন ব্যারিষ্টারের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার অল্পবয়স্ক শিশুসন্তানকে দেখা দিবার কথা পাঠককে বলিয়াছি। ক্যামাইল ফ্লামেরিওন নামক একজন ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ লিখিত একখানি পুস্তকে* ঠিক ঐরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একটি বালক খেলা করিতে করিতে ভীত হইয়া সহসা মা মা বলিয়া ডাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, সে এই মাত্র তাহার মাকে দেখিয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, তাহার মাতা ঐ স্থান হইতে বহুদূরে ঠিক সেই সময়ে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে ছিলেন।*

(১৮) সিপাহিযুদ্ধের সময় একজন কাপ্তেনের স্ত্রী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী বুকে হস্ত দিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখে দারুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। উহা দেখিয়া উক্ত রমণীর স্থির প্রত্যয় হইল তাঁহার স্বামী হত হইয়াছেন। ১৪ই নভেম্বর তারিখে তিনি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। উহার কয়েকদিন পরে যুদ্ধের অফিস War Office হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইল যে ঐ কাপ্তেন ১৫ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রমণীর স্বপ্নের তারিখের সহিত যুদ্ধের অফিস হইতে প্রকাশিত কাপ্তেনের মৃত্যুর তারিখ বিভিন্ন হওয়ায়, পরে ঐবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক জানা গিয়াছিল যুদ্ধের অফিসেরই ঐবিষয় প্রকাশে ভ্রম হইয়াছে।

ভারত ও তদেতর দেশসমূহে সংগ্রহপূর্ব্বক দূরদর্শন শ্রবণাদি বিষয়ে যে সকল বিবরণ প্রদান করা হইল তাহা হইতে আমরা

* "The Unknown, by Camille Flammarion—published by Harper & Brothers. (Page 124.)

ইতিপূর্ব্বে যে কথা পাঠককে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই প্রতীয়মান হয়; যে—মরণোন্মুখ বা সদ্যোমৃতগণের উৎকট চিন্তা সকল যেন আকার ধারণপূর্ব্বক অপরের বোধগম্য হয়। ঐরূপ হইবার কারণ ও প্রণালী সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান, ইথার নামক সূক্ষ্ম পদার্থসহায়ে মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পনের প্রসার ও অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কে আঘাতপূর্ব্বক অনুরূপ চিন্তা ও চিত্রপরম্পরার উদয় করিবার ক্ষমতারূপ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন—তাহাও আমরা পাঠকের গোচরে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত করিয়াছি। কোন কোন জড়বাদী পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা অসঙ্গত বোধে ঐরূপ ঘটনা সকলের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন—অশরীরী আত্মাসকল ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত আমাদিগের ন্যায় স্থূল ইন্দ্রিয় ও বাগ্‌যন্ত্রাদির ব্যবহার করিতে কখনই সমর্থ নহেন। কারণ, তাহাদের স্থূল শরীর নাই। সেইহেতু তাহাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পন অন্য মস্তিষ্কের অনুভূতিগম্য কখনই হইতে পারে না। সুতরাং, ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত তাহাদের আমাদিগের অপরিচিত কোন প্রকার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় থাকাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় এবং আমরা যে তাহাদিগের মনের চিন্তা বা ভাববিশেষ দূরদৃষ্টি ঘটিত স্বপ্নসহায়ে কখন কখন বুঝিতে সমর্থ হই তাহাতে আমাদের অভ্যন্তরেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অজ্ঞাত ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব—স্পষ্ট অনুমতি হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ঐ বিষয়টি বিশেষরূপে বুঝা যাইতে পারে।

জন্মগ্রহণকাল হইতে মানবশিশুর মুখের ভিতর দুধের দাঁত ও স্থায়ী দাঁত উভয় প্রকার দন্তের বীজই নিহিত থাকে। কিন্তু এমন কোন শরীর ব্যবচ্ছেদকের অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা যায়, যিনি শিশু পরে সদন্ত হইবে, একথা একেবারেই জ্ঞাত নহেন, তাহা হইলে তিনি দন্তবিহীন উক্ত শিশুর মাড়ী ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক উহার ভিতর দন্তের বীজ আবিষ্কার করিলেও উহার সার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। সেইরূপ মৃত্যুর পরের অবস্থা আমরা কিছুই জানিনা বলিয়া দূরদৃষ্টি-সূচক স্বপ্ন সকলের সার্থকতা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। তত্রাচ ঐরূপ দূরদৃষ্টিঘটিত স্বপ্নসকলের অস্তিত্ব হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয়,

মানবের মধ্যে এমন একটি ইন্দ্রিয় বীজভাবে নিহিত রহিয়াছে যাহা মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালে বিকাশলাভপূর্ব্বক তাহার তাৎকালিক অবস্থার কার্য্যসাধনের উপযোগী হইয়া থাকে।

সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, শেষোক্ত মীমাংসা যে পূর্ব্বোক্ত মস্তিষ্ককোষ-কম্পন-সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক ভাল তাহা বলিতে হইবে না! মস্তিষ্কের কোষসকলের কম্পন হইতে ইথারের (ether) মধ্যে কম্পনসৃষ্ট হইয়া, অন্য মস্তিষ্কে অনুরূপ কম্পন উৎপাদনপূর্ব্বক সংবাদ বহন করিবার সিদ্ধান্ত যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর আগমনে মানবমস্তিষ্কের কোষ সকল যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখনই অধিকাংশ ঐরূপ সংবাদ প্রেরিত হইত না। উপসংহারে বক্তব্য, দূরদর্শনশ্রবণাদি-মূলক স্বপ্ন বিবরণসকলের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঈদৃশ জটিল ও রহস্যময় সত্য ঘটনাসমূহের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, জড়বাদাবলম্বনে ঐ বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রায় ভিত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা পাঠককে উহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দীনের প্রার্থনা।

(স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ)

এ আর্ত্তের চির ক্রন্দন
এ দীনের শত বন্ধন
আজি ঘুচাও হে প্রভু ঘুচাও হে
এ হতাশের শত লাঞ্ছনা
এ অনাথের চির গঞ্জনা
আজি দূরে লহ, সব ভুলাও হে।

এ বৃশ্চিক শত দংশন
এ দাবানল সম বেদন
সবি ঘুচায়ে দাও জীবন

পুণ্য পরশ আশে তোমার
অনুখন অনুমগন
কর, দেব হে নিরঞ্জন।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

"In speaking of the Sages of India, my mind goes back to those periods of which history has no record, and tradition tries in vain to bring the secrets out of the gloom of the past.

"Like the gentle dew that falls unseen and unheard, and yet brings into blossom the fairest of roses, so has been the contribution of India to the thought of the world. Silent unperceived, yet omnipotent in its effect, it has revolutionised the thought of the world, yet no body knows when it did so".

— *Vivekananda.*

ভারতীয় ও গ্রীকদার্শনিকগণের মতবাদের ঐক্য আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখিয়াছি। গ্রীকদার্শনিকগণ দ্বারা উপনীত বিশ্বকারণ, বিশ্ব-সৃজন, প্রলয়, অদৃষ্ট, জড়ের নিত্যতা ও উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, পরমাণুবাদ, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বর জীব ও জগতের কারণ, জীবের

পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি, গৌতম ও 'এরিষ্টটলের মতের সাদৃশ্য, লিউক্রিশিয়সের 'অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না' এই মতটির সাংখ্য মতের সহিত ঐক্য, ইলিয়েটিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরই জগৎ ও জগৎই ঈশ্বর এই বেদান্ত মত, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, জীবের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আপন আপন অজ্ঞান ও অধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পশু পক্ষী, মৎস্যাদিযোনি ভ্রমণ, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী, দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দেবস্বরূপত্ব প্রাপ্তি, গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, আমিষ ভক্ষণে অশ্রদ্ধা, বৃথা মাংস ভোজনের অবৈধ্যত্ব, শিষ্যদের প্রতি বৃক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আঘাত প্রতিষেধ, ওসেলস নামক গ্রীকপণ্ডিতের ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি বেদোক্ত বিশ্বের বিভাগ দেখিয়া উইলসনের ভাষায় বলিতে হয় যে হিন্দুদিগের গ্রীকদিগের নিকট হইতে কোন দার্শনিক আদর্শবিশেষ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব বলা যাইতে পারে বরং গ্রীকদিগের হিন্দুদিগের নিকট হইতে ঐ সকল আদর্শ গ্রহণ অনেকটা সম্ভবপর।

কোলব্রুকও বলিয়াছেন, "এই বিষয়ে হিন্দুগণ ছাত্রের পরিবর্ত্তে শিক্ষকেরই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন"।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, গ্রীকেরা ঐ সকল মতবাদ মিশর এবং কালদে (Chaldaea) বা বাবিলি হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন গ্রীকদার্শনিকদের শিক্ষালাভের জন্য পূর্ব্বদেশে আগমনের কথা যাহা শুনা যায় তাহা এই কালদে ও মিশরে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও গ্রীক শিক্ষা যে ভারতীয় শিক্ষার অনুকরণ মাত্র তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। কারণ, মিশর এবং কালদের ইতিহাস আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তদ্দেশীয় সভ্যতা ও শিক্ষা ভারতীয় জ্ঞানরাশির কলামাত্র অনুকরণের ফলস্বরূপ। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ও দেশ বিদেশ ভ্রমণের ফলে কত যে ইতিবৃত্তের সত্যসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার ফলে পৃথিবীর সমগ্র জাতি ধীরে ধীরে যেন একতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া

পড়িতেছে—মানবের আদিপুরুষেরা একই দেশে বাস করিতেন, একই ভাষা বলিতেন এবং একই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এই সত্য বিধাতা এতদিন ভূগর্ভে, পর্ব্বত গাত্রে, শিলাফলকে ও প্রস্তর ভবনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগকে ঐ সকল বিষয় জানিতে উৎসুক দেখিয়া যেন তিনি সময় বুঝিয়া ঐ অসংখ্য রত্নমালার সুদৃঢ় পেটিকা আজ মানব সমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছেন। উক্ত কারণে বিশ্বপ্রেমমূলক যে ভাবসমূহ জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহা দেখিয়া আজ মানব বিস্মিত। বর্ণ ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মানব পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে করিতেছে যেন 'ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি, ইহাকে আমি খুব জানি, ইনি আমার খুব আপনার।' অতঃপর আমরা মিশর যে ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিল না তাহা পণ্ডিতগণের উক্তি ও গবেষণার উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যখন মিশরের সহিত ফরাসির যুদ্ধ বাধে তখন একদল ভারতীয় সিপাহী লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নীল (Nile) নদীর ধারে যায়। সেখানে দেনদেরার (Dendera) মন্দিরে আথরের (Athor) প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী দেখিয়া সিপাহীরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।* মিশর-বাসী ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে গাভীপূজার সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক ফরাসী পণ্ডিত এবং ইংরাজ ঐতিহাসিক স্থির করেন মিশর এবং ভারতের আদিপুরুষেরা এক স্থানেই বাস করিতেন এবং তাহাদের সভ্যতার উৎপত্তিস্থান এক। কিন্তু ডাক্তার ফারগুসন ইজিপ্টের স্থাপত্য নিদর্শনের পার্শ্বে ভারতীয় কিঞ্চিৎ আধুনিক অজান্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থাপত্য নিদর্শন ধরিয়া শেষোক্তটি অত্যন্ত আধুনিক, অতি পুরাতন মিশরীয় স্থপতিবিদ্যার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে না বলিয়াছেন। এবং আরও বলিয়াছেন, ভারতে বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্ত্তী যুগের স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন ছাড়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। উক্ত কারণে তিনি বলেন, ভারতে

* Ruins of Sacred and Historical Land.

স্থপতি-বিদ্যার অনুশীলন মিশরের বহু পরে আরম্ভ হয়। তিনি উহা বলিতে পারেন কিন্তু জগতের ইতিহাসের এই সত্য এই পৃষ্ঠায় না থাক অপর পৃষ্ঠায় আছে এবং তাঁহার জানা উচিত বৌদ্ধযুগের যে অদ্ভুত স্থপতিবিদ্যা তাহা এক দিনের অনুশীলনের ফলে হয় নাই। স্থপতিবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন যে ঋগ্বেদের সময় হইতেই ছিল তাহারও প্রমাণ উহার বহু পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়- যেমন লৌহ নগর (৭ম, ৩, ৭; ৭ম, ১৫, ১৪ ; ৭ম, ৯১, ১ ইত্যাদি), শত প্রস্তর নির্ম্মিত নগর (৭ম, ৩০, ২০), সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ (২য়, ৪১, ৫ ; ৫ম, ৬২, ৬ ইত্যাদি)। ইহা হইতেই বেশ বোধগম্য হয় যে স্থপতি-বিদ্যার অনুশীলন যে ভারতে কেবল বৌদ্ধযুগে বা তৎপরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছিল তাহা নহে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও ইহার অনুশীলন হইত। কিন্তু কালের করাল্ প্রকোপে অদ্য তাহার নিদর্শন নাই। আর ভূগর্ভ খননকার্য্য অন্যান্য দেশে যেমন দৃঢ়তার সহিত চলিয়াছিল সেরূপ এদেশে হয় নাই। এদেশের প্রত্নতত্ত্বের গতি—অত্যন্ত পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া—অতি মন্থর, কারণ এদেশের অধিবাসী অত্যন্ত গরীব। পুরাণোক্ত স্থানগুলিতে যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে তথা হইতে বহু সত্য বাহির হইতে পারে ইহা ধ্রুব সত্য ঐ সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও সমসাময়িক মিশর না হয় ভারত অপেক্ষা স্থপতিবিদ্যায় অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহা হইলেও গাভী পূজারূপ আদর্শ সকলের বিনিময় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা কিরূপে নিরাকৃত হয় তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

কারল্ হেকেল (Karl Heckel) বলেন ইজিপ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যতই আলোচনা করিতেছেন ততই তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে নানা যোনি-ভ্রমণ (Metemphychosis) প্রভৃতি মত-বাদ, অসিরিস শিক্ষা (Osiris teachings) হইতে মিশরবাসীরা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুমতবাদ ; তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিল।

অতঃপর আমরা কতকগুলি ভৌগলিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বার্লিনের বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Egyptologist) ডাক্তার আডল্ফ আরম্যান (Dr. Adolf Erman) বলেন যে মিশরবাসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, একটি এসিয়া অপরটি নীল নদীর উচ্চতর তটভূমি।* হিরেন (Heeren) অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে মিশর এবং ভারতবাসী নানা জাতির কপালের (Skull) সাদৃশ্য অতি নিকট। তিনি আরও বলেন, মিশরের অতি দূর ক্ষীণতম প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, পাণ্ট (Punt) দেবতাদিগের আদি নিবাস। "পাণ্ট হইতে আমেণ (Amen), হোরাস (Horus) এবং হাথরের (Hathor) নেতৃত্বে দেবতারা নীল নদীর ধারে আগমন করেন। লোহিত সাগরের (Red Sea) জলরাশি পাণ্ট পর্য্যন্ত যে সকল তটভূমি ধৌত করে তাহাকে দেবভূমি (Yaneter) বলা হয়। * * * এই কথা বলিয়া ইনি স্থির করিয়াছেন পাণ্ট সোমালিল্যাণ্ড (Somaliland) হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানে যাহাকে লোহিতসাগর (Red Sea) বলে হিন্দুরা তাহাকে শঙ্খোদধি বলিতেন এবং লোহিত সাগর বা অরুণোদধি বলিতেন আরবসাগরকে (Arabian Sea) †।

"স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লিখিত আছে, কুটিলকেশগণ ভারত হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। ইঁহারা পুরাকালে কপিলাশ্রমের সন্নিকটে সাগর সঙ্গমে (অথবা আধুনিক বঙ্গদেশে) বাস করিতেন। যজ্ঞপূত অশ্বের অনুসন্ধানে কপিলের আশ্রমে গমনকালে কুটিলকেশ-গণ সগরের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল এবং সগরবংশ ধ্বংসের পর তাহারা শঙ্খদ্বীপে যাইয়া বাস করে। তথায় দেবনহুষের (Dionysus) সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও কালীতট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা শঙ্খদ্বীপের অন্তর্ভাগে (Somaliland) পলায়ন করে, এবং তথায় বাস করিতে থাকে। এই দেবনহুষই Dionysus ও কুটিল কেশগণই Gaituli জাতি। Africa শঙ্খদ্বীপ ও Nile-ই কালী নদী।

*Historians History of the World.

† প্রবাসী—ভাদ্র ১৩২২—নীল নদীর উৎপত্তিস্থানের হিন্দুমানচিত্র দেখুন।

ইহার প্রমাণ মিশরীয় কবি Nounus (412 A. D. author of the Dionysiaca—History of Bacchacs or Dionysus) ও বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত Philostratus। Philostratus (190 A. D.) তাঁহার ভারত ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণপ্রধান যাস্কের (Iarchas) নিকট শ্রবণ করেন, They resided formerly in the country under the dominion of a king named Ganges (গাঙ্গেয়); during whose reign the gods took particular care of them.........but having slain their King, they were considered by other Indians as defiled and abominable... ....Their soverign, a son of the River Ganges (গাঙ্গেয়) was near ten cubits high and a most majestic personage, that ever appeared in the form of man: under him they left India and migrated to Sanchadwip."*†

হিন্দুর ভূগোল লইয়া কেহ আলোচনা করেন না। পুরাণের মধ্যে হিন্দু সভ্যতার কত গুপ্ত রহস্য যে লুকাইত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা নিজেরা চেষ্টা না করিলেও বিদেশীয় পণ্ডিত-দের চেষ্টায় এবং নানা দেশীয় পরিব্রাজকদের ডাইরী হইতে বহু সত্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। ভিনিষের বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলো (Marco Polo) স্থল ও জলপথে প্রায় সমগ্র আসিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি সমগ্র ভারতকে দুইভাগে

* তাহারা (কুটিলকেশগণ) রাজা গাঙ্গেয়র রাজত্বে বাস করিত। গাঙ্গেয়র রাজত্বকালে দেবতাগণ তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন। * * * কিন্তু তাহারা নিজেদের রাজাকে হত্যা করার জন্য অন্যান্য ভারতবাসী তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং পাপী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহাদের রাজা গাঙ্গেয় পুত্র দীর্ঘে প্রায় ১০ দশ হস্ত পরিমিত ছিলেন এবং তাহার ন্যায় সুপুরুষ এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি আর কখনও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। তাঁহারই অধিনায়কত্বে তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শঙ্খদ্বীপে গমনপূর্ব্বক বসবাস করে।

† (ভারতবর্ষ—বৈশাখ—১৩২৪—৭১৩ পৃঃ)।

বিভক্ত করেন; বৃহৎ ভারত (Greater India) ও ক্ষুদ্র ভারত (Lesser India)। খাস ভারতকেই ইনি বৃহৎ ভারত বলিয়াছেন এবং ভারতের বহির্দ্দেশ সকলকে তিনি ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দিয়াছেন। হাবসিদেশকে (Abyssinia) মধ্য ভারত বলিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে বোধ হয় যে ভারতবর্ষ বলিতে মাদাগাসকার (Madagascar) হইতে বলী, সুমাত্র দ্বীপ," এবং উত্তর পশ্চিমে চিনের ইডনান প্রদেশও ইহার অন্তর্গত ছিল। মার্কোপোলো যে ভারত বহির্দ্দেশ সকলকে ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দিয়াছেন তাহার কারণ বোধ হয় উহারা বাণিজ্য, দর্শন-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অধীন ছিল।

নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে মিশরদেশ যে পুরকালে ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। "তৎপরে পুরাণ হইতে নীল নদীর নিম্নোক্ত প্রকার বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে। পবিত্রসলিলা কালী বা কৃষ্ণা নদী (অথবা নীলা) অমর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমর হ্রদ অজগর ও শীতান্ত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী শর্ম্মস্থান নামক দেশে অবস্থিত। অজগর ও শীতান্ত সোমগিরি নামক পর্ব্বতের অংশ। সোমগিরির চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানকে চন্দ্রস্থান (Moon land) আধুনিক Somaliland বলে। কৃষ্ণানদী বর্ব্বর দেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া তপস্যারণ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তৎপরে কুশদ্বীপস্থ মিশ্রদেশের মধ্য দিয়া শঙ্খঅব্দি বা শঙ্খসাগরে পতিত হইতেছে। হিন্দু ভৌগোলিকের মতে পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু নামক দুই প্রধান বিভাগ—সুমেরু বর্ত্তমান সমরকন্দ। ইহা আবার নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বিভক্ত। পুরাতন ভূগোলে দেশের বিবরণের মধ্যে নদী, হ্রদ, পর্ব্বতাদির নাম এবং জলবায়ু ও ফল ফুল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কথা লিখিত আছে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া উইলফোর্ড বলেন নানা প্রকার প্রমাণ ও পুরাণোক্ত বিবরণের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "কুশদ্বীপ" নীল নদীর মোহানা এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বসীমা হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার

হিন্দুরা যে স্থানকে কুশদ্বীপের প্রান্তভাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া উইলফোর্ড বর্ত্তমান আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়াই সেই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে পুরাণোক্ত এই বর্ণনা যে প্রকৃত নীল নদীরই তাহা প্রমাণের সাহায্যে দেখান যাইতেছে।—

১। কালী বা কৃষ্ণা এবং নীল নদী একই ; কারণ শৈবরত্নাকর নামক গ্রন্থের একটি গল্পে বর্ব্বর দেশ ও অর্ব্বস্থান (আরব) প্রভৃতির সহিত নীলা নদীর নামোল্লেখ আছে। কালী বা কৃষ্ণা বর্ব্বরদেশ ও মিশ্রদেশ দিয়া প্রবাহিতা। সুতরাং কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী।

২। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে "মিশ্র" ইজিপ্টেরই বহু পুরাতন নাম। মিশ্রদেশের প্রস্তুত মিষ্টান্নের নাম মিশ্রী বা মিছরী, এবং মিশ্র দেশের আধুনিক নাম মিশর। ইজিপ্ট দেশের লেখমালা হইতে জানিতে পারা যায় যে ঐ দেশেরই এক সম্প্রদায় লোক বর্ব্বর নামে অভিহিত হইত। সেই দেশকে এখনো বর্ব্বর বলে। "কুশ" আবিসিনিয়ার প্রাচীন নাম। সুতরাং বর্ত্তমান ভূগোলের ইজিপ্ট দিয়া প্রবাহিতা নীল নদী পুরাতন ভূগোলের মিশ্র বা বর্ব্বর দেশ দিয়া প্রবাহিতা কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণের দ্বারা উইলফোর্ডের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

৩। পুরাণ ঐ সকল দেশের লোককে "কুটিলকেশ", "শ্যামমুখ" বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ আকৃতির লোকেই এখনও ঐ দেশে বাস করে। আবিসিনিয়ার লোকেরা পরবর্ত্তীকালে হাবসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃঃ স্পিক (Speak) নীলনদীর উৎপত্তি স্থান পুনরাবিষ্কার করেন। স্পিকের আবিষ্কার বিবরণ হইতেই আমরা উইলফোর্ডের কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র হিন্দুরাই যে নীলনদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন স্পিকের কথায় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

৪। নীল নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া

শঙ্খসাগরসঙ্গম (Mediterranean Sea) পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে, উইলফোর্ড নিজ প্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীল নদীর ও তন্নিকটস্থ দেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নদীর এই বিস্তৃত বিবরণ ও মানচিত্রখানি ১৮৬০ খৃঃ স্পিকের নিজের নিকট ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন নীল নদী ও সোমগিরির (Mountains of the Moon) মানচিত্র সম্বলিত একটি প্রবন্ধ আমি কর্ণেল রিগবির নিকট প্রাপ্ত হই। হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট উইলফোর্ড এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই নীল নদীর উৎপত্তি স্থানকে অমর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা নামক উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ আজও অমর নামে অভিহিত হয়।

উইলফোর্ডের বিবরণ অনুসারে স্পিক সোমগিরির (আধুনিক ইংরাজী নাম Mountains of the Moon) নিকট উপস্থিত হইয়া একটি হ্রদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নীল নদী ঐ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্পিক ঐ অমর হ্রদ আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঐ হ্রদের নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ হ্রদ এখন নূতন আবিষ্কারকের প্রদত্ত আধুনিক নামেই সমধিক পরিচিত হইতেছে। ঐ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থান কিন্তু আজিও হিন্দুদের প্রদত্ত অমর নামেই অভিহিত হয়। তথাকার আধিবাসীবৃন্দ আজও সোমগিরিকে দেশীয় ভাষায় সোমগিরি নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।" *

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে লিঙ্গ উপাসনা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে বদ্ধ ছিল না। এখনকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে অসীরিস নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস ও তদীয়-ভার্য্যা আইসীস দেবীর

* প্রবাসী—ভাদ্র ১৩২২।

সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আইসীস দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহার কর্ত্তা, অসীরিস সেইরূপ প্রাণ সংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয়, অসীরিস দেবের এপিস্ নামক বৃষও তাঁহার অংশ স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে বেকস দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটি বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটির নাম এপিস। শিব ও অসীরিস উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল অসীরিস দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশর দেশের অসীরিস দেবের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তিতে শিব পরিহিত ব্যাঘ্র-চর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় (উইলকিনসের "ইজিপ্টের প্রচীন অধিবাসী" নামক ইতিহাসের ৩৩ সংখ্যক ছবি)। অসীরিসের একটি প্রিয় বৃক্ষ ছিল তাহার পত্র শিবপ্রিয় বিল্বপত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশীধাম মহাদেবের যেমন প্রধান তীর্থ, মেম্ফিস (Memphis) নগর সেইরূপ অসীরিস দেবের মাহাত্ম্যভুমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলি দ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠ স্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিব বিশেষেরও মূর্ত্তি কৃষ্ণ বর্ণ। মিশরদেশের স্থানে স্থানে "তও" এইরূপ একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এই দেশীয় যোনিলিঙ্গের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের সৃজনীশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশরদেশীয় ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা অসীরিস দেবের লিঙ্গ পূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।"*

* Plutarch's Isisis and Isis.

'গ্রীসদেশেও লিঙ্গ উপাসনার খুব প্রচলন ছিল। পথে পথে মন্দিরে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, খুব উৎসবও চলিত-'ফেলিফেরিয়া নামক বেকস দেবের একটি মহোৎসবও প্রচলিত ছিল। *

রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়।†

মিশরদেশীয় সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টানেরা লিঙ্গমূর্ত্তির ন্যায় পূর্ব্ববর্ণিত "তও" ধারণ করিতেন। খৃষ্টানদের বহু সমাধিমন্দিরে সেই "তও" মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।‡

মূর তাঁহার 'ওরিয়্যাণ্টল ফ্রাগ্মেণ্ট' নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম-স্বীকৃত দেশসমূহের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন পূজাপদ্ধতির যে শেষাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—উহাকে ফেলিক, লিঙ্গাইক বা আওনিক যিনি যে নামই দিন না কেন—তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং বিশদ আলোচনা করা অতি প্রয়োজন। আমি কোন উপাদান বিশেষ হইতে—যাহার আমি উল্লেখ করিতে চাহি না—ঐরূপ একটি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি। উহাতে আমার নিজস্ব মন্তব্যগুলিতে ঐ উপাসনা পদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের পূজার সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

হর গৌরীর উপাসনা শুধু এখানে আবদ্ধ ছিল না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় স্কন্দনাভিয়াবাসী জিৎ জাতির মধ্যে শৈবীরাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। আর্থ (পৃথিবী) ও ঈশীশ ইহাদিগের আরাধ্য দেবতা। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে নরবলি দানের প্রথা প্রচলিত ছিল; আরাধ্যদেবী পৃথিবীর সম্মুখে নরবলি দান করা হইত। ঈশা শব্দে গৌরী এবং ঈশ শব্দে শিব বুঝায়; সুতরাং ঈশীশ শব্দে হরগৌরী বুঝায়। আমরা যেমন হরগৌরীর পূজা করি, জিৎ জাতিরাও

* (G. A. St. John's History of the manners and customs of ancient Greece Vol. I. P. 411.)

† (Tod's Rajasthan Vol. I. P. 599.)

‡ Wilkinson's History of the ancient inhabitants of Egypt Vol. II. P. 283.)

সেইরূপ ভক্তি সহকারে ঈশীশের আরাধনা করে। আর্য্যের রথের বাহান 'একটি গাভী, শৈবীগণের ধর্ম্ম গ্রন্থে এ কথারও উল্লেখ আছে। হিন্দু শাস্ত্রে গোশব্দে পৃথিবী বা পৃথিবীর প্রতিমূর্ত্তি বুঝায়। সময়ে সময়ে নানা কারণে পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিতেন, পুরাণে ইহাও বর্ণিত আছে। * * * হিন্দুর দেব সেনানী কার্ত্তিকেয়র ন্যায় শক সেনানী বা রণদেবও ষড়ানন বলিয়া অভিহিত হয়। (রাজস্থান—রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত, বসুমতী এডিসন—পৃঃ ৩, ৪)।

এই হরগৌরী উপাসনা ভারতের একেবারে নিজস্ব। কি করিয়া ঐ উপাসনা জগতে ছড়াইয়া পড়ে তাহা অপর প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা।

(ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় পঠিত।)

শিক্ষা শব্দের সাধারণ অর্থ জানা, কিন্তু যে কোনরূপ জানা বা যাহা কিছু জানাকে শিক্ষা বলা যায় না। শিশু কাল হইতে মানুষ জগতের প্রতিবস্তুর সহিত পরিচিত হইতে চায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে কত কি জানে, কিন্তু তা বলিয়া সকলকে শিক্ষিত বলা চলে না। শিক্ষার আর এক অর্থ লিখিতে বা পড়িতে জানা—আমারা বলি অমুক দেশে শতকরা এতজন শিক্ষিত। ইংরাজীতে literate শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের 'নিরক্ষর' শব্দ উহার বিরুদ্ধার্থক। কিন্তু শিক্ষাকে শুধু এইরূপ অর্থেও গ্রহণ করা যায় না—শিক্ষা কথাটি আমাদের মনে অনেক অধিক ভাব জাগাইয়া দেয়।

স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে জগতের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বিবিধ ধারণায় উপস্থিত হইয়াছে ও বিশেষ বিশেষ ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। যাহারা সেই সকল চিন্তা ও ভাবের সহিত পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ তত্তৎ-যুগের ও তত্তৎদেশের শিক্ষিত লোক বলিয়া স্বীকার করা হয়। কাল ও দেশভেদে ধর্ম্মভাব, জ্ঞানচর্চ্চা বা ঐহিকতা প্রবল হইয়া উঠে এবং জগৎ সম্বন্ধে লোকের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান কালে মানব দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির যে সমস্ত রহস্য ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামস্যাসমূহ সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, যাহারা তাহাদের সহিত অল্প বা অধিক পরিচিত তাহাদিগকেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত লোক বলা হইয়া থাকে। শিক্ষিত শব্দের এই অর্থের সহিত শিক্ষার সাধারণ অর্থের অর্থাৎ লেখাপড়া জানার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কারণ, গ্রন্থাদির মধ্য দিয়াই বিভিন্ন স্থানের মনীষিগণের চিন্তা ও ভাবের আলোক সাধারণের উপর আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানের জ্ঞান অতীতে-রই জ্ঞান সাপেক্ষ। আর মানবের অতীত অভিজ্ঞতা গ্রন্থমধ্যে যেরূপ সন্নিবদ্ধ অন্য কোথাও সেরূপ নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থসমূহ মানব-জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ।

শিক্ষিতের সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণায় উপস্থিত হইয়াই সম্ভবতঃ Lord Brougham বলিয়াছেন, "An educated man is he who knows something of everything and everything of something." যিনি সকল বিষয়েরই সাধারণ জ্ঞান এবং কতকগুলি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই শিক্ষিত। কিন্তু এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইলেও শিক্ষা শব্দের সম্পূর্ণ গৌরব রক্ষা হয় না। অপরাপর বহুশব্দের ন্যায় 'শিক্ষা' ও বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা কতকগুলি তথ্য অবগত হইলে এবং কতকগুলি ভাব পোষণ করিলে শিক্ষার সার্থকতা হয় না। কিন্তু শিক্ষার সহিত জীবন গঠনের ভাবটিও গ্রহণ করা

উচিত। যতদিন মানুষ উচ্চচিন্তার আলোকে জগৎ সম্বন্ধে একটি নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী খুঁজিয়া না পায় এবং মহৎ ভাবধারা তাহার হৃদয় অনুপ্রাণিত ও তাহার কার্য্য পরিচালিত না হয় ততদিন তাহাকে ঠিক শিক্ষিত বলিতে মন কুণ্ঠিত হয়। কারণ জীবন গঠনেই জ্ঞানের যথার্থ পরিচয়।

অতএব শিক্ষা শব্দে একদিকে যেমন বাহ্যজ্ঞান লাভ বুঝায় অপরদিকে তেমনি উহার সহায়ে মানসিক শক্তির উৎকর্ষ বিধান ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবসমূহের বিকাশ সাধন বুঝায়। ইংরাজী Education এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়। E— out ; ducere to lead, to draw, to bring forth what is within অর্থাৎ অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন। আবার দেহ ও মনের এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে অধিকাংশ স্থলেই একটিকে ছাড়িয়া আর একটি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী জীবন গঠনে যেমন শিক্ষার পরিণতি, তেমনি উক্ত জ্ঞান লাভের অধিকারী বা উপযুক্ত হইবার চেষ্টায় শিক্ষার আরম্ভ। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" অবশ্য এখানে পরাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তথাপি বিদ্যার্থী মাত্রেরই যে শ্রদ্ধা আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই মহাসত্যটি খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। তাই আজ শ্রদ্ধাভাববশতঃ কত যুবক দুর্গম সারস্বত তীর্থ গমনের উচ্চাভিলাষী হইয়াও সংশয়াবর্ত্তে পড়িয়া জ্ঞানালোকের দিকে অগ্রসর হইতেছি মনে করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনা করিতেছে। ঐ শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করিয়াই Lord Tennyson তাঁহার "In Memorium" কবিতায় লিখিয়াছেন,

"Let Knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell."

কবিবর reverence শব্দ ঈশ্বর বিশ্বাস অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা শব্দে শুধু গুরুভক্তি কেন সত্যনিষ্ঠা এবং অস্তিক্য বুদ্ধিও বুঝাইয়া থাকে। গুরুবেঁদান্তবাক্যেষু 'বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা—বেদান্তসারঃ। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শ্রদ্ধা আপন পূর্ব্বতন গৌরব হারাইয়াছে। Reverence বা শ্রদ্ধা আজ স্বীয় সরল স্বাভাবিকতা বর্জ্জিত হইয়া discipline এর কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত! প্রাচীনকালের শিক্ষাক্ষেত্র শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ সরসতায় পূর্ণ—আধুনিক বিদ্যালয় discipline এর কর্কশতায় ত্রস্থ। বস্তুতঃ এই দুইটি শব্দের পার্থক্যই আমাদের মনে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা রাজ্যের দুই বিভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত করে।

শ্রদ্ধা মানব হৃদয় হইতে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া মহতের মহিমা অনুভব করিয়া আপনাকে ছোট করিতেই গৌরব বোধ করে; অপরটি শাসনের কঠোরতা দ্বারা অবাধ্যকে শিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্পর্দ্ধানুভব করে।

প্রাচীনকালে শ্রদ্ধার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহার অভাব শিক্ষাবিভাগকে যেরূপ বিড়ম্বিত করিতেছে তাহাতে এ সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে শ্রদ্ধা আত্মসম্মানের রূপান্তর। যাহার আত্মসম্মান বোধ নাই সে কি করিয়া পরের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? আমরা যে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ—তাহার কারণ আমাদের মনের ভাব এই যে আমরা উহা দ্বারা নিজকে ছোট করিয়া ফেলি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। জ্ঞানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন দ্বারা আমাদের মধ্যে জ্ঞানের মহিমাবোধের যে শক্তি আছে তাহারই পরিচয় দেওয়া হয়। কাজেই উহা দ্বারা প্রকারান্তরে নিজেরই গৌরব রক্ষা করা হয়। আবার মহতের সম্মান দ্বারা শুধু যে নিজের অন্তর্নিহিত মহত্ব প্রকাশ পায় তাহা নয়, অধিকন্তু অপরের মহিমা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আপন মহত্ব বিকাশের সুবিধা ঘটে। অতএব শ্রদ্ধা দ্বারা কাহারও গৌরবের হানি হয় না, পরন্তু আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা ও আত্মোৎকর্ষ সাধন হয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে যিনি যত অগ্রসর তিনি তত অধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কথায় বলে, গুণীই গুণীর আদর বোঝে। অতএব আত্মসম্মানবোধই শ্রদ্ধার বীজ। শিক্ষার্থীর প্রাণে উহা জাগ্রত করিয়া দেওয়াই শিক্ষকের প্রধানকর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর শিক্ষককে ছাত্রের নিকট শ্রদ্ধা যাচ্ঞা করিয়া কৃতার্থ হইতে হইবে না, বরঞ্চ ছাত্রই তাঁহাকে উহা দিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে। বর্ত্তমানে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আত্ম-

সম্মানের অভাবই সমস্ত অনর্থের মূল। শিক্ষক ছাত্রের সংঘর্ষ, তথা কথিত শিক্ষিতের আবির্ভাব, 'শিক্ষাকার্য্যে' লোকের অনাস্থা প্রভৃতি উহারই ফল। এখন আত্মসম্মানের পরিবর্ত্তে অভিমান এবং শ্রদ্ধার স্থলে সংশয় শিক্ষারাজ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বত্র disobedience, insubordination এর বিভীষিকা এবং অপর পক্ষে নিয়মের কঠোর বাঁধন।

এখন শিক্ষাকার্য্যকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

১। ভাষা শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয় সংযম আত্মসম্মানের উন্মেষ ও শ্রদ্ধার উদয়।

২। মানব-জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং রুচি ও অধিকারভেদে বিষয়বিশেষের সম্যক্ জ্ঞান লাভ।

৩। লব্ধজ্ঞানের সহায়তায় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ এবং সদ্ভাব-সমূহের উৎকর্ষসাধন।

৪। উচ্চতম আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়া তদনুসারে জীবন গঠন।

কিন্তু মানুষ শক্তি ও স্বভাব অনুসারে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ভাবে জীবন গঠন করিয়া থাকে। তবে কি জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই? যদি না থাকে তবে শিক্ষাও লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও চরিত্র জীবন গঠনের অপরিহার্য্য উপাদান বটে, কিন্তু উহারা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে শিক্ষার লক্ষ্য কি?

মানব ভূমিষ্ঠ হইয়াই দেখিতে পায়, সে এক অজ্ঞাত অপরিচিত রাজ্যে উপস্থিত। বস্তুমাত্রই যেন কি এক অজ্ঞানতার আবরণ পড়িয়া তাহার নিকট আসে। শুধু দর্শনে তৃপ্ত না হইয়া সে বিবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাদের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ধীরে ধীরে এই অজ্ঞানান্ধকার অপসৃত হইতে থাকে। কিন্তু যতই সে আলোক পায় ততই অধিক লাভের জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। এইরূপে উৎকণ্ঠার তৃপ্তি হইতে না হইতেই সে দেখিতে পায় জীবন অবসান প্রায়—কাল রজনী সমাগত। তখনও তাহার হৃদয় "Light! More Light!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে।

অতএব দেখা যায় মানব অন্তরে এক অদম্য অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা বর্ত্তমান। ইহারই প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি এক দিকে অন্তরীক্ষের মহাশূন্যতার দিকে ছুটিয়াছে, অপর দিকে ভূগর্ভের ঘনান্ধকার ভেদ

করিতে চলিয়াছে। এক দিকে জড় জগতের বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ এবং নব নব মতবাদের সৃষ্টি, অপর দিকে জীবজগতের স্বভাব ও গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ এবং জীবনসমস্যার অনন্ত অভিনব সমাধান। শুধু বাহ্য জগতের কেন, মানুষ আপন অন্তরেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনায় নিমগ্ন। এইরূপে জগতে ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রসায়ন মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি কত বিদ্যা, কত বিজ্ঞান, কত তত্ত্বেরই যে উদ্ভব হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এখন মানবের এই জ্ঞান-পিপাসার মূল কি? কেহ কেহ বলেন প্রকৃতির যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া উহাকে মানবের আয়ত্তাধীন করতঃ যথাসম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করা ইহার উদ্দেশ্য। একথা আংশিক সত্য হইলেও যাহারা এই ফলাভিসন্ধিকেই সর্ব্ব-জিজ্ঞাসার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহারা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণায় উপস্থিত হইতে পারে নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা মানবঅন্তরের স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণামাত্র। বিশ্বতত্ত্ব, প্রকৃতির কোমল কঠোর মূর্ত্তি, প্রাণিরাজ্যের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সংসারের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন— জন্ম, মৃত্যু, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি সর্ব্বদাই মানবমনে এক দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতেছে। এই জগৎ রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানব-অন্তরের অতি নিভৃত কোণে এক আকুল ক্রন্দনের সুর যেন নিয়তই বাজিতেছে। সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এমন কিছু জানিতে চায় যাহা সমস্ত পরিবর্ত্তনের অতীত—যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না।

"যেন জ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং তৎ ত্বং বিজিজ্ঞাসস্য—" ইহাই জীবন সমস্যার শেষ কথা।

ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানুষ চিরকালই এক চরম সত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ঋষিমুখ উচ্চারিত "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"র ন্যায় Platoর *Idea*, Virgilএর *Spiritus*, Hegelএর *Absolute*, Shelleyর *Impersonal Love*, Wordsworthএর *Soul of all the worlds*; আধুনিক বিজ্ঞানের *Prineiple of Life* বহুর মধ্য দিয়া একেরই সংবাদ বহন করিয়া আনে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকের ধারণা অনন্ত মনের অংশরূপী মানব-মন শিক্ষাপ্রভাবে সেই অনন্তজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়! এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচ্য মত স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত উক্তিটিতে

পাওয়া যায়। "Education is the manifestation of the perfection already in man." কিন্তু স্বামিজী এখানে চরম বিকাশের ফলস্বরূপ যে পূর্ণত্বকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকে তাহারা যেন নিশ্চেষ্ট জড়ভাব বলিয়াই মনে করেন। তাহাদের মতে মানবমন চিরকালই অনন্ত জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবে;—অনন্তের শেষ কিরূপে সম্ভব? কিন্তু স্বামীজি এখানে পূর্ণেরই পূর্ণত্ব লাভ বুঝাইয়াছেন।

এই অখণ্ডৈকত্বের উপলব্ধি এই ব্রহ্মানুভূতিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে ইহার অনুশীলনকে "পরাবিদ্যা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে তবে "অপরা বিদ্যা" আলোচনার আবশ্যক কি?—না থাকিলেও আছে। যেহেতু বিষয়াকৃষ্ট মানব ইহা ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারে না। তাই ঐহিক বিদ্যার মধ্য দিয়া মানবকে চরম সত্যের আভাষ প্রদানপূর্ব্বক তদুপলব্ধির জন্য পরা বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। জগতের বিবিধ বিষয় আলোচনা করিয়াও যে মানুষ এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানময় প্রেমময় সত্তার সন্ধান পাইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নয়।

নব বর্ষ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

নববর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বশুভদাতাকে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করি, সাধনা আবার নব বৎসরে নব উদ্বোধনে উদ্বোধিতা হউন। দিনের পুনরাবৃত্তি, বৎসরের পুনরাবৃত্তি, জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তনে জীবনের পুনরাবৃত্তি,—একই ইষ্টমন্ত্র বার বার উচ্চারণ, একই সত্য নব নব স্বরূপে বারবার উপলব্ধি,—একই জীবন বার বার নব নব তপস্যা-মাধুর্য্যে উপভোগের উপায় স্বরূপ হউক।

উদ্বোধন কেন প্রচারিত হইল, কি ইহার লক্ষ্য, তাহাও একবার নব বৎসরে নূতন করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই। পূর্ব্ব কালে প্রথা ছিল, যখন কোন জয়কামী বীর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে গমন করিতেন, পুরোহিত অথবা গুরুজন তাঁহার ললাটে জয়তিলক অঙ্কিত করিয়া দিতেন। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" "উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হও," এই বাণী উদ্বোধনের ললাটভূষণ জয়তিলক।

স্বামী বিবেকানন্দ এই জয়তিলক তাহার ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। 'প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব যে কি' অনন্ত কাল এই প্রশ্ন চলিয়া আসিতেছে, অনন্ত কাল এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া আসিতেছে। জগৎ বৈচিত্র্য পূর্ণ, এই বিচিত্র জগতের এই শ্রেষ্ঠত্বই মধ্যবিন্দু অথবা কেন্দ্র। বহু, এই শ্রেষ্ঠত্বে, একে পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতি মাত্রের জাতীয়ত্ব, কর্ম্মী মাত্রেরই কর্ম্ম-সাধনা, সেবকের সেবা, দাতার দান, বীরের বীর্য্য, সাধকের নিষ্ঠা বহুপথে বহুভাবে বহু-ধারায় সেই এক শ্রেষ্ঠত্বের বিকর্ষণে ও আকর্ষণে ব্যাপ্ত ও কেন্দ্রীভূত। ইতিহাস বহু শতাব্দীর মানব জীবনেতিহাস তাহারাই সাক্ষ্য স্বরূপ পত্রাঙ্কে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, যুগান্তরের নূতনত্বে তাহা নব নব ভাবে প্রবুদ্ধ, নব আলোকে উদ্ভাষিত। সেই বহু বিচিত্র শ্রেষ্ঠত্ব-সাধনাকে সমন্বয়ের প্রেমসূত্রে একত্রে গ্রথিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নবযুগের কণ্ঠে মনুষ্যত্বের বৈজয়ন্তী-মালা প্রদান করিয়াছেন, উদ্বোধন এই বিজয়োৎসবে ভেরী ঘোষক দূত স্বরূপ।

মানব মহিমা তিনি কি উজ্জ্বল ভাবে নিজে অনুভব করিয়াছেন ও অপরকে তাঁহার অনুভূতির দ্বারা অনুভব করাইয়াছেন তাহা যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই জানেন। তথাপি তিনি সন্ন্যাসের আদর্শ, যে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কোন প্রয়োজন বোধেই সে আদর্শ বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করিতে চাহেন নাই, ইহাতে সন্ন্যাস গ্রহণই তাঁহার আদর্শ ছিল আমরা যদি এইরূপ বুঝি তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। প্রকৃত সন্ন্যাস ও প্রকৃত মনুষত্ব যে একই ইহা তিনি নিজের জীবনের আচরণে, ভাবে ও কথায় বার বার বুঝাইয়াছেন। আত্ম-সঞ্চয়ে পশুত্ব এবং আত্মত্যাগেই মনুষত্ব। ত্যাগে মহীয়ান্ হইবার জন্যই মানব সাধনার নানা রূপে প্রতীক কল্পনা করে—আত্মোৎসর্গের নানা যজ্ঞবেদী রচনা করে। যাহা সঞ্চয়-মূলক তাহা যত আয়াস সাধ্য, যত অপর্য্যাপ্তই হউক না তথাপি তাহা তুচ্ছ। সঞ্চয়ে বদ্ধ-হস্তের কর্ম্মী হওয়া অসম্ভব, ত্যাগীই যথার্থ কর্ম্মী হইতে পারেন। একপক্ষে যেমন তিনি সকল দেশে সকল সময়ে

এমন কতকগুলি লোক থাকা প্রয়োজন মনে করিতেন, যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারা সমাজের কোন সংস্রবে না আসিলেও সমাজ তাঁহাদের ত্যাগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, আবার অপর দিক দিয়া তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন, যে, কোন এক মহান্ ভাবের মধ্যে আত্মোৎসর্গ, মানবকে তাহার নিজের অজ্ঞাতেই তাহাকে সঞ্চয়ের ক্ষুদ্রত্ব হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। মানবের মনুষ্যত্বের এই উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার সম্মুখে এমন ভাবে পরিস্ফুট ছিল যে, কোন স্থানেই তাহা তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে নাই। ষ্টিম এঞ্জিনের আবিষ্কর্ত্তার কর্ম্মসাধনার মধ্যেও তিনি সেই মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছেন, তুর্কী নাবিকের নৌ চালন দক্ষতায় ও সৌজন্যে তিনি তাহার পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইয়াছেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই আত্মধর্ম্মে অকৃত্রিম একনিষ্ঠতা যেমন তাঁহার পরম শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, সেইরূপ সকল জাতীর জাতীয়ত্ব-বোধ তিনি পরম পবিত্র বলিয়া জানিতেন। ধর্ম্ম সাধনায় যেমন প্রত্যেকে ব্যাষ্টিভাবে—সেইরূপ জাতীয়ত্বের সাধনায় সমষ্টিভাবে আদর্শমনুষ্যত্বের সম্বন্ধে নিজের সমগ্র ধারণাটী প্রকাশ করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ইহাই তিনি যেন মনের সঙ্গে অনুভব করিতেন।

এই সর্ব্বত্রব্যাপক মহান্ মনুষ্যত্বের অনুভূতি তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন যদি বিস্মিত হইয়া আমরা তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে মূলে একটী মাত্র বস্তুর সত্ত্বা বুঝিতে পারি—তাহা প্রেম। সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, অথচ পুষ্পের ন্যায় কোমল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞার ন্যায় অবিচলিত অটল, আবার জননীর মত স্নেহার্দ্র, ক্ষমাপরায়ণ। সকল শৌর্য্যের আধার, সকল কোমলতার আশ্রয়। প্রকৃত প্রেমের ইহাই স্বরূপ। মহাপুরুষগণের জীবনে এই স্বপ্রকাশ-রূপার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ চিরদিন ইঁহারই উপাসনা করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "ছাড় বিদ্যা যাগ যজ্ঞ বল, সার্থহীন প্রেম যে সম্বল।" একই দান কখনও বা দাতা ও গৃহীতা

উভয়ের একের মনে অভিমান অপরের মনে নিজের হেয়ত্ব-জ্ঞান আনয়ন করে, সেই দান আবার প্রকৃত প্রেমে এমন সহজ হইয়া যায় যে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই সমান তৃপ্তি ও প্রীতির হেতু হয়। ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য দানকে পূজায় পরিণত করিয়াছেন। ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বোচ্চ সত্য সকল সময়েই অতি সহজ।" তাঁহার নিজের নিস্বার্থ মাতৃভূমি-প্রেম সকল মাতৃভূমি-সেবকের হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটী পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারিত, তাঁহার শিশুর মত সরল ইষ্ট নির্ভরতা ও আরাধ্যের প্রতি ভালবাসা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ইষ্টনিষ্ঠের হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয় মিশাইয়া লইয়াছিল। এই অদ্বৈতপন্থী বীর নিজে অনুভব করিয়া নবযুগকেও এই ভাবে বিভাবিত করিয়া গিয়াছেন যে, জগতে যে একত্ববোধে বহুত্ববোধ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রেম। যে বীর্য্যে সকল দুর্ব্বলতা ছিন্ন করা যায় তাহা প্রেম। এই নিস্বার্থ প্রেমই মানবের প্রকৃত স্বরূপ এই প্রেমই মানবের মনুষ্যত্ব।

শত শত মতবাদ, সম্প্রদায়, জাতি চিরকাল রহিয়া আসিতেছে ও রহিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক দেশ এক জাতি অথবা এক মতবাদের গণ্ডীতে বহুকে এক করিতে পারে না, এক মুষ্টি সরিসা মুষ্টির দৃঢ় বন্ধনে থাকিলেও এক হয় না।

অতএব উঠ, জাগ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাত হও। তুমি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী, তোমার নিজ অধিকার নিজ বীর্য্যে জয় করিয়া লও। হে বীর, হে প্রেমিক, কোন্ বাধা তোমাকে বন্ধন করিতে পারে, কোন অন্তরায় বা তোমার অদ্বৈত সাধনার পথে প্রাচীর রচনা করিতে পারে? অভিঃ মন্ত্রের উপাসক, অমৃতের পুত্র, কোন্ ভীতিই বা কল্পিতরূপে তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে?

আজ নববর্ষে সেই পুরোবর্ত্তী সেনাপতিগণকে আমরা প্রণাম করি, যাঁহারা সকল ক্লৈব্য হইতে, আরাম সুখ সম্পদ প্রতিষ্ঠার বন্ধন হইতে স্বাধীনতার জয়শ্রীলাভের সংগ্রামে মানবকে আহ্বান করিয়াছেন। আর যুক্তকরে ইহাই প্রার্থনা করি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব-উদ্বোধন যদি বা

সহজসাধ্য না হয়, যেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের নিকট সর্ব্বত্র সকল সময়েই আমরা শ্রদ্ধার সহিত মস্তক নত করিতে পারি।

শোকসংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ৭ই বৈশাখ, শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হৃদ্রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি বিগত দুই মাস যাবৎ মায়াবতী হইতে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন এবং ক্রমশঃ সুস্থ হইয়াই উঠিতেছিলেন। এত শীঘ্র তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন তাহা কেহই এমন কি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও অনুমান করিতে পারেন নাই। ইনি বিগত দশ বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও মিশনের নানাকার্য্যে সহায়তা করিতেছিলেন। এক বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত উদ্বোধনের সম্পাদন কার্য্য করেন। পরে গত ৪।৫ বৎসর হইতে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী প্রবুদ্ধ ভারত পত্র অতি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। ধর্ম্মভিত্তিতে কিরূপে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি যিনিই আলোচনা করিয়াছেন তিনিই তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার মধুর স্বভাব ও চরিত্রগুণে এমন কেহ নাই যিনি আকৃষ্ট না হইতেন।

তাঁহার এই অকালে (৩৯ বৎসর) দেহত্যাগে মিশন এবং সর্ব্বসাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। ভগবান্ তাঁহার শান্তিবিধান করুন।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।*

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি কোন সার্ব্বভৌমিক দর্শনিক তত্ত্ব, কোন সার্ব্বভৌমিক পৌরাণিক তত্ত্ব, অথবা কোন সার্ব্বভৌমিক আচার পদ্ধতি—যাহা সকলেই মানিয়া চলিবে, তাহা বলিতে চাহি না। কারণ, আমি জানি যে, নানা পাকচক্র-সমবায়ে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগৎরূপ দুর্ব্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটী বরাবরই চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পারি?—আমরা ইহাকে সুচারুরূপে চালাইতে পারি, ইহার ঘর্ষণবেগ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি মসৃণ রাখিতে পারি। কিরূপে?—বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমরা যেমন স্বভাবতঃই একত্ব স্বীকার করিয়াছি, সেইরূপ আমাদিগকে বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটীই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রকৃত সত্য। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক হইতে দেখিলে উহা একই জিনিষ থাকে। সূর্য্যের কথা ধরা যাউক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতেছে; সে প্রথমে একটী বৃহৎ গোলাকৃতি বস্তু দেখিতে পাইবে। তারপর মনে করুন, সে একটী ক্যামেরা লইয়া সূর্য্যের অভিমুখে

* 'The Ideal of a Universal Religion' নামক বক্তৃতার অনুবাদ।

যাত্রা করিয়া যে পর্য্যন্ত না সূর্য্যে পৌঁছায় সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে ভিন্ন। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি বিভিন্ন সূর্য্যের প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। আমরা কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই সূর্য্যের বহু প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। ভগবান্ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। উচ্চ অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যক ধর্ম্ম, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, ঊর্দ্ধগামী হইবার—চেষ্টা করিতেছেই, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যত প্রকার সত্যের উপলব্ধি করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটী ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুর নহে। মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটী জলাশয় হইতে জল আনিতে যাইলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও বা কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি। পরে আমরা যখন সকলেই পাত্রগুলি জলপূর্ণ করিলাম তখন প্রত্যেক পাত্রের জল স্বভাবতঃই নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। যে বাটি আনিয়াছে তাহার জল বাটির মত, যে কলসী আনিয়াছে তাহার জল কলসীর মত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অপর কিছু নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের সদৃশ। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান্ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে জলদ্বারা পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান্ সেই জলস্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের নিকট ভগবদ্দর্শন তৎ তৎ আকারে আসিয়া থাকে। তথাপি তিনি সর্ব্বত্রই এক। তিনিই ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা সার্ব্বভৌমিক ভাবের এই একমাত্র পরিচয় পাইতে পারি।

মতবাদ হিসাবে ইহা বেশ। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-

বিধান কার্য্যে পরিণত করিবার কি কোন উপায় আছে? আমরা দেখিতে পাই, 'সকল ধর্ম্মমতই সত্য' এ কথা বহু পুরাকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, ইউরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্ব্বশেষে আমেরিকায় একটী সর্ব্ববাদী-সম্মত ধর্ম্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্ম্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সকলগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ, তাহারা কোন কার্য্যকরী প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই সত্য, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের একত্রীকরণের এমন কোন কার্য্যকরী উপায় তাঁহারা দেখাইয়া দেন নাই, যাহা দ্বারা তাহারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই যথার্থ কার্য্যকরী যাহা ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া তাহাকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে সকল উপায়ে ধর্ম্মজগতে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে গুটিকতক মত বিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই হেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমান ঈর্ষ্যাপরায়ণ নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

আমারও নিজের ক্ষুদ্র কার্য্য-প্রণালী আছে। জানি না ইহা কার্য্যকরী হইবে কিনা; কিন্তু আমি উহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমার কার্য্য-প্রণালী কি? মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই কথাটী মানিয়া লইতে অনুরোধ করি, "কিছু নষ্ট করিও না"—বৈনাশিক সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারেই আসে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙ্গিও না—একেবারে ধূলিসাৎ করিও না, গঠন কর। যদি পার সাহায্য কর; যদি না পার, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখ, ব্যাপার কিরূপ দাঁড়ায়। যদি সাহায্য করিতে না পার অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ লোকে অকপট থাকে ততক্ষণ তাহাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটী

কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ, যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ, এবং আমরা প্রত্যেকেই এক একটী ব্যাসার্দ্ধ দিয়া তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছি তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চিতই কেন্দ্রে পঁহুছিব; এবং সকল ব্যাসার্দ্ধের মিলনস্থান সেই কেন্দ্রে আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেখানে পঁহুছাই সে পর্য্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে। সকল ব্যাসার্দ্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার স্বভাব অনুযায়ী একটী ব্যাসার্দ্ধ দিয়া যাইতেছে, আর একজন অপর একটী ব্যাসার্দ্ধ দিয়া যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবশ্যই এক কেন্দ্রে পঁহুছিব; কারণ, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, "সকল রাস্তাই রোমে পঁহুছায়"। প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃত্যানুযায়ী বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি করিবে; কারণ, শেষে দেখা যায়, মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষা বিধান করে। তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর তুমি একটী শিশুকেও কিছু শিখাইতে পার?—পার না। শিশু নিজেই শিক্ষা লাভ করে। তোমার কর্ত্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা। একটী গাছ বাড়িতেছে। তুমি কি গাছটীকে বাড়াইতে পার? তোমার কর্ত্তব্য গাছটীর চারিদিকে বেড়া দেওয়া, যেন গরু ছাগলে উহাকে মুড়াইয়া না খায়—বস্, ঐখানেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বর্দ্ধিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না—কেহই তোমাকে আধ্যাত্মিক মানুষ করিয়া দিতে পারে না; তোমাকে নিজেই শিক্ষা করিতে হইবে; তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাদাতা কি করিতে পারেন? তিনি জ্ঞানলাভের অন্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। ঐখানেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ। অতএব যদি পার সহায়তা কর; কিন্তু বিনষ্ট

করিও না। তুমি কাহাকেও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন করিতে পার, এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর। ইহা অসম্ভব। তোমার নিজের আত্মা ব্যতীত তোমার অপর কোন শিক্ষাদাতা নাই, ইহা স্বীকার কর। দেখা যাক, তাহাতে কি ফল হয়। সমাজে আমরা নানা বিভিন্ন স্বভাবের লোক দেখি। সংসারে সহস্র সহস্র প্রকার মন ও সংস্কারবিশিষ্ট লোক রহিয়াছে। তাহাদিগের সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ অসম্ভব; কিন্তু আপাততঃ, আমাদের সুবিধা মত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কর্ম্মঠ ব্যক্তি; তিনি কর্ম্ম করিতে চান; তাঁহার পেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য করা, হাঁসপাতাল তৈয়ার করা, সৎকার্য্য করা, রাস্তা প্রস্তুত করা, কার্য্য-প্রণালী স্থির করা ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ, ভাবুক লোক—যিনি সেই মহান্ সুন্দরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন। তিনি সৌন্দর্য্যের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যগুলিকে উপভোগ করিতে, এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবানকে পূজা করিতে ভালবাসেন। তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, ধর্ম্মাচার্য্য ও ভগবানের অবতারগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; খৃষ্ট অথবা বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন একথা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, কি না হয় তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না; খৃষ্টের প্রদত্ত "শৈলোপদেশ" কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, তাঁহাদের মনোহর মূর্ত্তিগুলি সমধিক আদরণীয়। ইহাই তাঁহার আদর্শ ভাবুক লোকের স্বভাবই এই প্রকার। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধিৎসু লোক—তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে, মানব-মনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, তথায় কি কি শক্তি কার্য্য করিতেছে এবং কিরূপে তাহাদিগকে জানা যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত করা যায়—এই সমুদয় বিষয় জানিতে চান। ইহাই ধর্ম্মরহস্যানু-সন্ধিৎসু মনের স্বভাব। চতুর্থ, দার্শনিক—যিনি প্রত্যেক বিষয়টী

মাপিয়া লইতে চান এবং স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে মানবীয় দর্শনের মধ্য দিয়া যতদূর যাওয়া সম্ভব, তাহারও পারে লইয়া যাইতে চান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকের উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার সেই সকল বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী খাদ্য যোগানর ক্ষমতা থাকা চাই; এবং যে ধর্ম্মে এই ক্ষমতার অভাব সেই ধর্ম্মান্তর্গত সম্প্রদায়গুলি সকলেই একদেশী হইয়া পড়ে। মনে করুন, আপনি কোনও ভক্ত-সম্প্রদায়ের নিকট যাইলেন। তাঁহারা গান করেন, ক্রন্দন করেন, এবং ভক্তি প্রচার করেন; কিন্তু যাই আপনি বলিলেন, "বন্ধু, আপনি যাহা বলিতেছেন সবই ঠিক, কিন্তু আমি ইহাপেক্ষা আরও কিছু বেশী চাই—আমি একটু যুক্তি তর্ক, একটু দার্শনিকভাবে আলোচনা, এবং একটু বিচারপূর্ব্বক বিষয়গুলি এক এক করিয়া বুঝিতে চাই।" তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনাকে দূর করিয়া দিবে এবং শুধু যে আপনাকে চলিয়া যাইতে বলিবে তাহা নহে, পারে ত আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইয়া দিবে। ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই সাহায্য করিতে পারে। তাহারা অপরকে ত সাহায্য করেই না পরন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ব্যাপার এই যে, সাহায্যের কথা দূরে থাকুক, অপরে যে অকপট ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। আবার, আর এক সম্প্রদায় আছে—জ্ঞানী। তাঁহারা ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই করেন এবং খুব লম্বা চওড়া পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু যদি আমার মত একজন সাধারণ লোক তাঁহাদের নিকট গিয়া বলে, "আমাকে কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে পারেন কি?" তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমেই একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন, "ওহে তোমার এখনও বুদ্ধিবৃত্তিই মার্জ্জিত হয় নাই। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে?" ইঁহারা বড় উঁচুদরের দার্শনিক। তাঁহারা তোমাকে কেবল ধর্ম্মের দ্বার দেখাইয়া দিতে পারেন মাত্র। আর এক দল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মরহস্যানু-

সন্ধিৎসু। তাঁহারা জীবের বিভিন্ন থাক, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক শক্তির ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে বল, "আমাকে ভাল কিছু দেখান যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। আমি তত কল্পনাপ্রিয় নহি। আমার উপযোগী হয়, এমন কিছু দিতে পারেন কি?" তাঁহারা হাসিয়া বলিবেন, "নির্ব্বোধটা কি বলে শোন; কিছুই জানে না—আহাম্মকের জীবনই বৃথা।" পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। আমি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া ধর্ম্মধ্বজীদের একত্রিত করিয়া একটা ঘরে পুরিয়া তাহাদের সুন্দর বিদ্রূপব্যঞ্জক হাস্যের ফটোগ্রাফ তুলিতে চাই!

ইহাই ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, ইহাই সকলের বর্ত্তমান মতিগতি। আমি এমন একটী ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মানসিক অবস্থার লোকের উপযোগী হইবে—ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, ও কর্ম্ম সমভাবে থাকিবে। যদি কলেজ হইতে বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্ অধ্যাপকগণ আসেন, তাঁহারা যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাঁহারা যত পারেন বিচার করুন। শেষে তাঁহারা এমন এক স্থানে পঁহুছিবেন, যেথান হইতে যুক্তিবিচারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহারা বলিয়া বসিবেন "ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি ভাবসকল কুসংস্কার মাত্র—উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" আমি বলি, "হে দার্শনিকপ্রবর, তোমার এই পঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, ইহাকে পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য আর গৃহে কিম্বা অধ্যাপনার জন্য তোমার দর্শনের ক্লাসে যাইও না। শরীর ছাড়িয়া দাও এবং যদি না পার চুপ করিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদ।" কারণ, দর্শন জগতের একত্ব এবং একই সত্তার অস্তিত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে। সেইরূপ যদি ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধিৎসু আসেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও হাতে-কলমে তাহা করিয়া দেখাইতে সদা প্রস্তুত থাকিব। যদি ভক্ত

লোক আসেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া ভগবানের নামে হাস্য ও ক্রন্দন করিব; আমরা 'প্রেমের পেয়ালা পান করিয়া উন্মাদ হইয়া যাইব।' যদি একজন বীর্য্যবান্ কর্ম্মী আসেন আমরা তাঁহার সহিত যথাসাধ্য কর্ম্ম করিব। এবং ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের এই প্রকার সমন্বয় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের খুব নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের প্রত্যেকটী ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত! ইহাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ। যাহার চরিত্রে এই ভাবগুলির একটী বা দুইটী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎ, যাহারা কেবলমাত্র নিজের রাস্তাটীই জানে, এইরূপ "একঘেয়ে" লোকে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাঁহাদের নিকট বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর। এই চারিটীদিকেই সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই, মদুক্ত ধর্ম্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে "যোগ" বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শধর্ম্ম লাভ করা যায়। কর্ম্মীর নিকট, ইহা মানবের সহিত মানবজাতির যোগ; যোগীর নিকট, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ; ভক্তের নিকট, নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের যোগ এবং জ্ঞানীর নিকট, বহুত্বের মধ্যে একত্বানুভূতিরূপ যোগ। 'যোগ' শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটী সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারি প্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগ-সাধন করিতে চান তিনিই 'যোগী'। যিনি কর্ম্মের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন তাঁহাকে 'কর্ম্মযোগী' বলে। যিনি ভগবানের মধ্য দিয়া এই যোগ সাধন করেন, তাঁহাকে 'ভক্তিযোগী' বলে। যিনি ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধানের মধ্য দিয়া সাধন করেন তাঁহাকে 'রাজযোগী' বলে। এবং যিনি জ্ঞান-বিচারের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'জ্ঞানযোগী' বলে। অতএব 'যোগী' বলিতে ইহাদের সকলকেই বুঝায়।

প্রথমে 'রাজযোগের' কথা ধরা যাউক। এই রাজযোগ—এই

মনঃসংযোগ ব্যাপার কি? (ইংলণ্ডে) আপনারা 'যোগ' কথাটীর সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি নানারকমের কিম্ভূতকিমাকার ধারণা জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব আমি প্রথমেই আপনাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি যে, যোগের সহিত ইহাদের কোনই সংশ্রব নাই। কোন যোগেই যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিয়া চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া হাঁতড়াইয়া বেড়াইতে অথবা তোমার যুক্তিবিচার কতকগুলো অর্ব্বাচীন পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে বলে না। তাহাদের কোনটাই বলে না যে, তোমাকে কোন অতিমানুষের নিকট শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতেই হইবে। প্রত্যেকেই বলে তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ালিঙ্গনে ধরিয়া তাহাতেই লাগিয়া পড়িয়া থাক। আমরা সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাভের তিন প্রকার উপায় দেখিতে পাই। প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজন্তুর মধ্যেই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা জ্ঞানলাভের সর্ব্বনিম্ন উপায়। দ্বিতীয় উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটী অসম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্তু সকলের কার্য্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্য্য করে। মানুষের বেলায় এই সহজাত জ্ঞান সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়া বিচার-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রও বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি এই বিচারশক্তিও খুব অসম্পূর্ণ। ইহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই থামিয়া যায় এবং আর অগ্রসর হইতে পারে না; এবং যদি তুমি ইহাকে বেশীদূর চালাইতে চেষ্টা কর তবে তাহার ফলে ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হইবে। যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে পরিণত হইবে। ন্যায়ের ভাষায় ইহা চক্রক দোষে (Argument in a circle) দূষিত হইয়া পড়িবে। আমাদের প্রত্যক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও শক্তির কথা ধরুন। জড় কি? যাহার উপর শক্তি ক্রিয়া করে? শক্তি কি যাহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে। আপনারা গোলমাল কি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বলেন—একটী ভাব অপরটীর উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেইটী

আবার প্রথমটীর উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, আপনারা যুক্তির পথে এক প্রবল বাধা দেখিতে পাইতেছেন, যাহাকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তথাপি ইহার পশ্চাতে যে অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে, তথায় পঁহুছিতে যুক্তি সদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের বিষয়ীভূত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের সংজ্ঞার উপর প্রতিফলিত, সেই অনন্তের এক কণিকামাত্র এবং সংজ্ঞারূপ জাল দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আমাদের বিচারশক্তি কার্য্য করে—তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। সুতরাং ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন—অতীন্দ্রিয় বোধ সেই উপায়। অতএব সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয় বোধ এই তিনটীই জ্ঞানলাভের উপায়। পশুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচারশক্তি ও দেবমানবে অতীন্দ্রিয় বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটী শক্তির বীজ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মনে বিদ্যমান থাকা চাই, এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একটী শক্তি অপরটীর বিকশিত অবস্থা মাত্র; সুতরাং তাহারা পরস্পর বিরোধী নহে। বিচার শক্তিই পরিস্ফুট হইয়া অতীন্দ্রিয় বোধে পরিণত হয়; সুতরাং অতীন্দ্রিয় বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নহে, পরন্তু তাহার পূর্ণতা সাধন করে। যে সকল বিষয় বিচারশক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে অতীন্দ্রিয় বোধ দ্বারা বুঝা যায় এবং তাহা বিচারশক্তির বিরোধী নহে। বৃদ্ধ বালকের বিরোধী নহে, পরন্তু তাহার পূর্ণ পরিণতি। অতএব তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, নিম্নশ্রেণীর শক্তিকে উচ্চশ্রেণীর শক্তি বলিয়া ভুল-করা-রূপ ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বোধ বলিয়া জগতে চালাইয়া দেওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা সাজিবার সকল প্রকার মিথ্যা দাবী করা হয়। একজন নির্ব্বোধ অথবা অর্দ্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে তাহার মস্তিষ্কে যে সকল পাগলামী

চলিতেছে সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং, সে চায় লোকে তাহার অনুসরণ করুক। জগতে যে সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পরবিরোধী অসম্বন্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদগণের সহজাত জ্ঞানলব্ধ প্রলাপকে অতীন্দ্রিয় বোধের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টামাত্র।

(ক্রমশঃ)

শিখগুরু।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

নানক, স্বীয় মৃত্যুর পর কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা লইয়া শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে যে এক বিষম আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী তাহা স্থির জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, পরবর্ত্তী গুরুপদপ্রার্থীর পথে বহু বাধাবিঘ্ন ও অন্তরায় বর্ত্তমান; তজ্জন্য হয়ত অসন্তোষ ও অবিচার, বৈষম্য ও অত্যাচারের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া শিখসম্প্রদায়ে বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করিবে এবং অচিরে সকল সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট হইবে—শিখসমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নানক প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিয়া তদীয় জীবদ্দশাতেই গুরুনির্ব্বাচন করিয়া ভবিষ্যদ্বিপদের আশঙ্কা দূর করিলেন। তিনি আপনার পুত্রদ্বয়ের অহঙ্কার ও আত্মাভিমান, উহাদিগের উদ্ধতস্বভাব ও অসদ্ব্যবহারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উহারা যে গুরুপদের একান্ত অযোগ্য, তাহা স্থির জানিয়াই আপন শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে এক-জন যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। এই নির্ব্বাচনের উপর যে শিখসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তাহা তিনি নিশ্চয়-রূপে বুঝিতেন। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাকে অতীব

বিচক্ষণতার সহিত স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে, অজ্ঞের ন্যায় কাজ করিলে চলিবে না। তিনি প্রথম হইতেই লেনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। লেনার সরল প্রকৃতি ও মিষ্টস্বভাব, উন্নত চরিত্র এবং তৎপ্রতি প্রবল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহাকে ভবিষ্যৎ গুরুপদের উপযুক্তই করিয়াছিল। উহার পরিচয়ও তিনি একটী ঘটনা হইতে স্পষ্ট পাইলেন। একদা বুধ ও লেনা সমভিব্যাহারে নানক একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্, তাহা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উহাদিগকে ঐস্থানে লইয়া যান। পথিমধ্যে সহসা একটী শব দেখিতে পাইয়া নানক বুধকে উহার মাংস ভক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন কিন্তু বুধ ঘৃণাবশতঃ উহা ভক্ষণ করিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি লেনাকে আজ্ঞা করিলেন; গুরুর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লেনা অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর করিল—"প্রভো! বলুন, দেহের কোন অংশ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব।" নানক উত্তর করিলেন—"পা হইতে আরম্ভ কর"। লেনা সানন্দে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু কি আশ্চর্য্য খাইবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ অদৃশ্য হইয়া গেল! নানক বলিলেন—"ধন্য লেনা! তোমার অচলা ভক্তির পরিচয় পাইলাম—তুমিই গুরুপদের সুযোগ্য ব্যক্তি।" তিনি লেনাকে তখন হইতে 'অঙ্গৎ' অর্থাৎ নিজদেহ এই নামে অভিহিত করিলেন। লেনা যে নানকের সহিত অভেদাত্মা তাহা তখন হইতে প্রমাণ হইয়া গেল। এই ঘটনায় তাঁহার পুত্রদ্বয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং ভবিষ্যতে উহার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। যাহা হউক, নানকের মৃত্যুর পর তদীয় প্রিয়শিষ্য লেনা 'অঙ্গৎ' এই আখ্যালাভ করিয়া গুরুপদে অভিষিক্ত হইলেন।

এস্থানে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। নানকের পরবর্ত্তী চারিজন গুরু তদীয় মতবাদে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন এবং উহাদ্বারা যে শিখজাতির সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সেইজন্যই তাঁহারা অন্য কোন নূতন মত প্রচার না করিয়া নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্ব মানবমণ্ডলীমধ্যে প্রচার

করিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের সময় হইতে শিখসমাজে ভাববৈষম্য লক্ষিত হয়—ঐ সময়েই শিখজাতি সর্ব্বপ্রথম অস্ত্রধারণ করে। এই দুই শ্রেণীর গুরুদিগের জীবন আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

অঙ্গৎ।

অঙ্গৎ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন তাঁহার প্রধান শত্রু নানকপুত্রদ্বয়। উহারা তাঁহার সকল কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে তাহাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া লেনা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহাকে উহার ফলভোগ করিতে হইবে। তাহারা গুরুর নামে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া সম্প্রদায়স্থ স্বধর্ম্মীদিগের সহায়তা ও সমবেদনা লাভে সচেষ্ট হইল। ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য না হইয়া, উহারা অবশেষে তাঁহার প্রতি বল-প্রয়োগের অভিসন্ধি করিতে লাগিল। ইহাদিগের দুর্ব্যবহারে অঙ্গৎ অত্যন্ত বিরক্ত এবং অবশেষে ভীত হইয়া কুদুর নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। তখন তিনি ব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহার এই অসহায় অবস্থায় উমার দাস ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় সহায়ক ছিল না। তিনি দ্বাদশ বৎসর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঐস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

উমার দাস।

উমার দাস জাতিতে ছত্রি ছিলেন। গোবিন্দওয়াল নামক গ্রামে তাঁহার আদিম বাসস্থান ছিল। যখন নানক-পুত্রদ্বয় দ্বারা অঙ্গৎ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া কুদুরে অবস্থান করিতেছিলেন, উমার দাস সেই সময়ে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি গুরুর প্রতি অতীব ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কুম্ভপূর্ণ জল লইয়া গিয়া গুরুর পদধৌত করিয়া দিতেন। একদা রজনীকালে যখন তিনি ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন ভীষণ ঝড় উঠিয়া দিঙ্মণ্ডল তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া উমার দাস পড়িয়া গেলেন এবং উহার ফলে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। ঐ ঘটনায় অঙ্গৎ ব্যথিত

হইলেন এবং শিষ্য কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাহা বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধ হন। তিনি বলিলেন—"জগতে তোমার আপনার বলিবার কেহ নাই বটে, কিন্তু তুমি স্থির জানিও আমি তোমার সহায়ক, তোমার কোন চিন্তা নাই।" অঙ্গৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকেই গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। ভবিষ্যতে উমারদাসকে শিখসমাজ সানন্দে গুরুপদে বরণ করিয়া লইল। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া অতীব সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার ন্যায় বিবেচক ও পারদর্শী গুরুর অধীনে শিখজাতি উন্নতির অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিল—এইকারণেই তাঁহার স্মৃতি আজিও সকলে সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের কাহারও কোন অভাব অভিযোগ তাঁহাকে একবার জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা দূরীভূত হইত। স্বগ্রাম গোবিন্দওয়ালেই তিনি বসবাস করিতেন। তথায় যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য তিনি একটী পান্থনিবাস ও জলকষ্ট নিবারণার্থ একটী 'বউলী' বা কূপ খনন করাইয়া দেন। তাঁহার সময় শিখধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দুইটী নূতন ভাব প্রবেশ লাভ করে। প্রথমটী প্রচার কার্য্য। তদীয় গুণরাজীতে মুগ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগের মধ্যে দ্বাবিংশ সুযোগ্য শিষ্যকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন; উহার ফলে শিখধর্ম্ম শুধু পঞ্চনদের চতুঃসীমানায় আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। যাহাতে শিখধর্ম্ম কালে সার্ব্বজনীনধর্ম্মে পরিণত হইয়া সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে সত্যের বীজ বপন করে এবং তাহাদিগকে অচিরে দীক্ষিত করিয়া ফেলে, ইহাই গুরু উমারদাসের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই মনোভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি উক্ত কঠিন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি শিখধর্ম্মসম্প্রদায়টীকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করেন; তাঁহার সময় হইতে উদাসী ফকির ও সাধারণ শিখ পৃথক্ হইয়া গেল। গুরু উমারদাস মোহন নামক একটী পুত্র ও মোহিনী নাম্নী একটী কন্যা রাখিয়া দ্বাবিংশ বৎসর সুচারুরূপে কার্য্য করিয়া ১৫৭৫

খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দওয়ালেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ ঐস্থলেই সমাধিস্থ করা হয়, কিন্তু অধুনা উহা নদী-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

রামদাস।

গুরু উমারদাসের পর রামদাস ঐ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত উমারদাসের কোন বংশগত সম্বন্ধ ছিল না। তিনি সোদীবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক অচিন্তিত ঘটনাচক্রে উমার দাসের কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হন। শৈশবকালে তাঁহাকে অত্যন্ত দারিদ্র্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। গোবিন্দওয়াল গ্রামে যখন উমার দাস 'বউলী' নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় উক্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য দর্শনের নিমিত্ত বহু জনসমাগম হয় এবং অনেকগুলি শ্রমজীবী ঐকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। লাহোর হইতে দরিদ্র রামদাসও আপন মাতাকে লইয়া ঐস্থানে ব্যবসার জন্য আগমন করেন। তিনি শ্রমজীবীদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তিনি বিশেষ লাভবানও হইয়াছিলেন। একদিবস গুরু উমারদাস আপনার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া শ্রমজীবীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কন্যার অনুরোধে রামদাসের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকিলেন। বলিষ্ঠকায় ও রূপবান যুবক রামদাসকে দেখিয়া মোহিনী তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং মোহিনীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গুরু উমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রামদাস তাহাকে বিবাহ করেন। উমারদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুর আসন অধিকার করেন।

রামদাস অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশ ও খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বাদশা আকবরের কর্ণেও সে সংবাদ পৌঁছিল। মহামতি আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাবেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শিখগুরুর প্রশংসা শ্রবণে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে উৎসুক হইলেন। লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া তিনি গুরু রামদাসের সহিত মিলিত

হইলেন, এবং কিয়ৎকাল তাঁহার আশ্রমেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনায় কাটাইলেন। তিনি রামদাসের নির্ম্মলস্বভাব ও অদ্ভুত প্রতিভা সন্দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে কয়েক বিঘা চক্রাকার জমি দান করিলেন; উহাই 'চক্কর রামদাস' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই পরিচয়ের পর তাঁহার প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবং ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে যখন তিনি পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পথে রামদাসের সহিত দেখা করিবার জন্য গোবিন্দওয়াল গ্রামে বিশ্রাম করেন। এবারও তিনি গুরুকে তাঁহার ইচ্ছামত কোন দান লইতে অনুরোধ করিলেন। উহাতে গুরু রামদাস বলিলেন—"মহারাজ! আমার নিজের কিছুরই অভাব নাই, তবে আমার একটী ভিক্ষা আছে। যখন আপনি লাহোর নগরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে কৃষকেরা খুব শস্য বিক্রয় করিয়াছিল কিন্তু আপনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার পর আজ কয়েক মাস যাবৎ তাহাদিগের আর ক্রেতা মিলিতেছে না। সুতরাং একান্ত অর্থাভাব ঘটিয়াছে। আমার অনুরোধ আপনি যেন এ বৎসর দরিদ্র কৃষকদিগের নিকট রাজস্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই তাহাদিগের প্রভূত উপকার করা হইবে; ইহাই আমার নিবেদন।" কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া আকবর শাহ ঐ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিলেন এবং গুরুর একটী ইচ্ছাও যে পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। গুরু রামদাস দরিদ্র অসহায় প্রজাদিগের অবস্থার প্রতিও যে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, ইহা জানিয়া উহারা তাঁহাকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল এবং যাহাতে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইভাবে অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন ও দরিদ্রের সাহায্যকল্পে স্বীয় জীবন নিয়োগ করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইল।

পূর্ব্বগুরুর ন্যায় ইঁহারও শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—

ধনবান ভূস্বামিগণ আপনাদিগের সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম মহাদেও—ইনি ফকির হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পৃথ্বীদাস—ইনি বিবাহাদি করেন এবং তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন—ইনি রামদাসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রায় সপ্তবর্ষ গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অমরধামে চলিয়া যান।

অর্জ্জুন।

রামদাসের তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন গুরুপদপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যকালকে শিখসমাজের সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অর্জ্জুনের সময় হইতে শিখগুরুদিগের খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি স্বয়ং সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। হিন্দুবণিকগণ তাহাদিগের দ্রব্যসম্ভার লইয়া পাঞ্জাবে ব্যবসায়ের জন্য দলবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, কারণ তাহারা জানিত ঐ স্থানে গুরু অবস্থান করায়, বহু লোক সমাগম হইবে। গুরু অর্জ্জুনের সময় হইতেই শিখসমাজে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। নানক প্রচারিত ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি শিখসমাজ ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিল এবং কাল-ক্রমে উহা এক বিকৃত আকার ধারণ করিল। পাঠক অবগত আছেন, গুরু নানক তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে জাগতিক আনন্দোপভোগ, বিলাসব্যসন হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকিতে বারবার উপদেশ দিয়াছিলেন; উহাই নানকের সমুদয় শিক্ষার সার কথা। নানক জানিতেন, যদি কোন কারণে শিখসমাজে একবার পার্থিব ভোগবিলাস প্রবেশ করে, তবে ভবিষ্যতে তাহা ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া শিখসম্প্রদায়ের কালস্বরূপ হইবে—উহার আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জগতে সত্যই চিরস্থায়ী হয় এবং কদাচার ও কুনীতি কালে সমাজকে প্রাণহীন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। আদর্শ সংযমী ও ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ পুরুষ গঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জীবিতকালে আপন

শিষ্যদিগের চরিত্র ঐ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কতকগুলি আদর্শ পুরুষের সৃষ্টি করেন; যাঁহাদিগকে জগৎ একদিন অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুত্রয় প্রাণপাতী পরিশ্রম দ্বারা ঐ আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরু অর্জ্জুন উহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। জগতের সকল ধর্ম্মেরই ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যতদিন উহাদিগের মধ্যে সংযমের ভাবটী বর্ত্তমান ছিল ততদিন উহারা মানবের এবং জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু যখনই সংযমের বিপরীত ভাব, ভোগ ও বিলাস উহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তখনই উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং জগতের অকল্যাণের কারণ হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধের পরার্থপরতা একদিন ভারতবাসীর কর্ণে মহামন্ত্ররূপে ধ্বনিত হইয়াছিল—তাঁহার ধর্ম্ম সমগ্র ভারত বরণ করিয়া লইয়াছিল, এমন কি সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধসঙ্ঘে নানারূপ কুপ্রথা আসিয়া উহাকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিল। ঐরূপ শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু অর্জ্জুনের সময়ই বিলাসিতার ভাব প্রথম প্রবেশ লাভ করে এবং নানক প্রচারিত উচ্চাদর্শের পতনের সূচনা করিয়া দেয়। গুরু অর্জ্জুন জাগতিক ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে ভুলিয়া গেলেন; পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগের ন্যায় আর সেই সামান্য ভাবে কালযাপন নাই, সে সরলতা ও অকপটতা নাই—শিখগুরু এখন রাজোচিত পরিচ্ছদ ও নানা আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

আমরা সংক্ষেপে তাঁহার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি তখনও জীবিত বৃদ্ধ বুধের পরামর্শে ও অনুরোধে অমৃতসহরে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে সর্ব্বসময়ে বসবাস করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ঐ স্থানটীকে তিনি 'হরমন্দার' বা ভগবানের গৃহ এই আখ্যা দেন। তিনিই 'আদিগ্রন্থের' রচনা শেষ করেন এবং যাহাতে শিষ্যগণ নিত্য ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করিতে পারে, তজ্জন্য ঐ পুষ্করিণীর তীরেই একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ

করিয়া দেন। প্রত্যহ ঐ স্থানে বহুলোক স্নান ও পুস্তকপাঠ শ্রবণ মানসে যাতায়াত করিত। এতদ্ভিন্ন অমৃতসহরের সন্নিকটে জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি 'তুরন্তর' নামক অপর একটী পুষ্করিণী খনন করেন।

তাঁহার প্রভূত অর্থ ও অতুল সমৃদ্ধি তদীয় সহোদরদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। উহার অংশ পাইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে অতি সহজে তাঁহাকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে, তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত হইল। অর্জ্জুনও তখন অপুত্রক, সুতরাং তিনি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভ্রাতৃগণ সম্পদের অধিকারী হইবে এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ও আপনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জ্ঞানে পুত্র লাভের আশায় ভগবানের নিকট হৃদয়ের সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে পরম জ্ঞানী ও প্রাচীন বুধের নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিতে পরামর্শ দিল। উহাতে সম্মত হইয়া গুরু অর্জ্জুন এক অপূর্ব্ব শোভাযাত্রার সহিত বুধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বুধ তখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন, তাঁহার শ্রবণ শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। হঠাৎ সুসজ্জিত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রাণী, লোকের ভীষণ ভিড় ও বহু শকটের একত্র সমাবেশ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঐরূপ আড়ম্বর করিয়া গুরু যে তাঁহারই সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, তাহা প্রথমে তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। তাহার পর সমীপবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহারা কোথায় যাইতেছে?" লোকটী উত্তর করিল— "মহাশয়, শিখগুরু অর্জ্জুন পুত্রকামনায় আপনার নিকট আসিতেছেন।" উহা শুনিয়া বুধ বলিলেন—"বটে! গুরুর এত আড়ম্বর! তিনি পাগল হইয়াছেন না কি? আমার সহিত দেখা করিবার জন্য এত আয়োজন?" বৃদ্ধ ঐ সংবাদে আবার আনন্দিতও হইয়াছিলেন; এবং আপনাকে স্থির রাখিতে না পারিয়া মনের উল্লাসে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন—

"বেটা হোগো বেটা হো
জীস্‌কী যাক্‌সে হুয়েনী রো।
সব্ ভওয়ন্ কা কো সুতাজ্
রুহেগা উ সব্‌কী ইলাজ্॥"

অর্থাৎ যিনি এখন অপুত্রক, তাঁহার শীঘ্রই পুত্র হইবে এবং আমি আশা করি সকল গুরু ইহাতে তাঁহার সহায়তা করিবেন। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন সানন্দে বুধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এবং বুধের কথামত কিয়ৎকাল পরে তাঁহার এক অনিন্দ্য-সুন্দর পুত্র জন্মিল। ইনিই প্রথিতনামা হরগোবিন্দ।

সেই সময়ে চন্দুশাহ লাহোরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সহিত পুত্রের বিবাহ লইয়া অর্জ্জুনের মনোমালিন্য ঘটিল; ইহার ফলে গুরু অর্জ্জুনকে অবশেষে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল। চন্দুশাহের এক অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যা ছিল—কাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন এ বিষয়ে যখন চন্দুশাহ চিন্তা করিতেছিলেন তখন তাঁহার বন্ধুগণ অর্জ্জুন পুত্র হরগোবিন্দই যে কন্যার যোগ্য পাত্র তাহা তাঁহাকে জানাইল। প্রথমে ইহা শুনিয়া তিনি ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া গুরুকে অকথ্যভাষায় গালি দিলেন এবং বলিলেন—"অর্জ্জুন প্রভূত ধনশালী হইতে পারে, তবুও সে ভিখারী!" কিন্তু তৎপরে বন্ধুগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং গুরুর মতামত লইবার জন্য একজন অনুচরকে পাঠাইলেন। কিন্তু গুরু ইতঃপূর্ব্বেই ঐ গালাগালির বিষয় অবগত ছিলেন সুতরাং তিনি অনুচরকে অপমানিত করিয়া দুর করিয়া দিলেন। পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে চন্দুশাহ স্বয়ং গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু গুরু ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। ঈর্ষ্যা ও অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া চন্দুশাহ 'এ অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ দিব' বলিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

চন্দুশাহের হস্ত হইতে অর্জ্জুন রক্ষা পাইলেন না। সম্রাটপুত্র

খুরমের (পরে সম্রাট সাজাহান) নিকট তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল। তিনি সেই সময়ে কাশ্মীর যাইবার পথে লাহোরে দুই এক দিন অবস্থান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। চন্দুশাহ তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন— 'যুবরাজ! অধুনা এক প্রবল পরাক্রান্ত শিখগুরু তাহার দলবল লইয়া একটা বিদ্রোহ ও অশান্তি উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে মোগলের বিপদ্ আশঙ্কা করি। আপনি উহাকে একবার ডাকাইয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিয়া যান।' খুরমের কঠিন আজ্ঞায় গুরু অর্জ্জুনকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি একবার মাত্র তদীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'ইনি ফকির ও সাধুব্যক্তি। ইঁহাকে এক্ষণই ছাড়িয়া দাও— ইঁহা হইতে কি কখন বিদ্রোহ আশঙ্কা করিতে পারি?'। এই বলিয়া তিনি চলিয়া যান। কিন্তু দুষ্ট চন্দুশাহের কবল হইতে অর্জ্জুনের মুক্তি নাই! তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না, চন্দুশাহ কেবল এই মাত্র বলিলন—"কাল আবার তোমার বিচার হইবে"। ইহা শুনিয়া গুরু অর্জ্জুন বলিলেন—"মহাশয়, আমার একটী অনুরোধ আছে, আমি একবার সন্নিকটস্থ রাভি নদীতে স্নান করিয়া আসি।" চন্দুশাহের সম্মতি পাইয়া গুরু সত্বর তটিনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন আশা নাই বুঝিয়া গুরু অর্জ্জুন স্বেচ্ছায় নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন! চন্দুশাহের অভীপ্সিত অসহনীয় যন্ত্রণা তাঁহাকে আর সহ্য করিতে হইল না। ঐ ঘটনা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। শিষ্যগণ তাঁহার মৃতদেহ নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া লাহোর সহরের ভিতরেই স্বর্ণমণ্ডিত সমাধিমন্দিরে সমাহিত করেন—ইহা আজিও বর্ত্তমান।*

অর্জ্জুন প্রথম শ্রেণীর শেষ গুরু; পরবর্ত্তী গুরু হরগোবিন্দের

* অপরমতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে গুরু অর্জ্জুন কারারুদ্ধ হন। কারাবাসের অসহনীয় যাতনায় সর্দ্দিগরমিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য, চন্দুশাহের ষড়যন্ত্রেই ঐ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল।

সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অভিনব পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। কিরূপে তিনি শিখসমাজের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পরিচালিত করেন, তাহা আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব।

স্বাধীনতা।

(শ্রী—)

একটু অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই, কি মানুষ, কি পশু সকল প্রাণীর মধ্যেই একটা প্রবল ভোগ বা বাসনা পূরণের ইচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ভোগেচ্ছাই তাহাদিগের সকল চেষ্টার এবং সকল কার্য্যের মূল। ঐ ভোগেচ্ছার তাড়না যাহাদিগের মধ্যে অনুভূত হয় না তাহারা জড়। জড় অপেক্ষা যাহাদের মধ্যে ঐ ভাব প্রবল তাহারা পশু এবং তদপেক্ষাও যাহাদের মধ্যে উহা আরও উগ্রভাবে অবস্থিত তাহারাই মানবপদবাচ্য। মানবের ভোগ বাসনার উগ্রত্বই তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণে উপযুক্ত করিয়াছে। সমাজগঠন, রীতি নীতির উপদেশ, আচার ব্যবহারের প্রচলন, শাসন পদ্ধতি বিকাশের উদ্দেশ্য, মানব যাহাতে তাহাদের ভোগাদর্শে সহজে পৌঁছিতে পারে, উহা প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে রক্ষা করিতে পারে এবং সকলেই সমভাবে ভোগ করিতে পারে। এই ভোগাদর্শের তারতম্য ও প্রাপ্তি-উপায়ের বিচিত্রতাই জগতে এত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা জাতির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

এখন আমরা দেখিব ভোগের অর্থ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় মানুষ তাহার জীবনে যে সকল অভাব অনুভব করে তাহার পূরণের নামই ভোগ। একজন দরিদ্র ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে,— এই যে প্রয়োজন বোধ, ইহাই তাহার ভোগেচ্ছা। যখন সে উক্ত অর্থ সংগ্রহ ও স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিল,

তখন তাহার ভোগবাসনার পূরণ হইল। এইরূপে আমরা মানবের প্রত্যেক কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, তাহাদের মূলে ঐ অভাব পূরণের বা বাসনা নিবৃত্তির তাড়না রহিয়াছে। ঐ তাড়নাকে আমরা, অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত বা স্বাধীন হইবার বলিতে পারি। অপর কথায় আমরা ভোগবাসনা পূরণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাকে এক বস্তুরই দুইটী বিভিন্ন নাম বলিতে পারি। দেহ সম্বন্ধেই মানুষ যে শুধু এই স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে তাহা নহে, সে চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে সর্ব্বত্রই উহা লাভ করিতে চাহে। যত দিন না সে ঐ স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, ততদিন তাহার আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই, দ্বন্দ্বেরও শান্তি নাই।

পূর্ব্ব এবং পর জন্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা দেখি মানুষ আজীবন ভোগ নিবৃত্তির বা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিল—তথাপি তাহার অবস্থা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া গেল। তাহার অভাব বোধের আর শেষ হইল না। সকলেই যে জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হয়, তাহা নহে, অনেকেই দ্বন্দ্বে বিজয় লাভ করে, কিন্তু তাহারাও আপনাদিগকে সর্ব্বাভাবের হস্ত হইতে মুক্ত বোধ করে না। বরং মনে হয় অভাব যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বে যাহাদের অভাব বোধ অতি সামান্য ছিল, এখন তাহারা দেখে উহা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তবে কি মানব তাহার ঈপ্সীত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না?—অভাবের হস্ত হইতে কখনই কি মুক্তি লাভ করিবে না? না, নিশ্চয়ই এমন দিন আসিবে যখন সে সমস্ত অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অব্যাহত স্বাধীনতা ভোগ করিবে। কারণ, মানুষের উৎপত্তি স্বাধীনতা হইতে এবং স্বাধীনতাই তাহার স্বরূপ। তাহাকে তাহার উৎপত্তি স্থল স্বাধীনতার রাজ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহার সমর্থন করে। বিজ্ঞান বলে যে স্থান হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাকে পুনরায় বৃত্তাকারে তথায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

পথে সে যতই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ুক না কেন—উৎপত্তি-স্থানই তাহার শেষ গন্তব্য। এক অনন্ত স্বাধীনসত্বা সকল কবিই স্বীকার করিয়াছেন এবং বহু মনীষী তাহার দ্রষ্টা। উহার অংশ যদি মানবের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে তাহার এই যে স্বাধীনতা-লাভের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? তাহার অন্তস্থলে পূর্ণ স্বাধীনতা তরঙ্গনীর তরঙ্গ আঘাত করে বলিয়াই সে সান্তের বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে" চায়। বিজ্ঞান আরও বলেন অভাব হইতে ভাবের বা শূন্য হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সেই জন্য মানবের মধ্যে যদি সেই পূর্ণ স্বাধীনতার একটী স্ফুলিঙ্গও না থাকিত তাহা হইলে ঐ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা কখনও তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইত না। তবে মানুষ স্বরূপতঃ স্বাধীন হইলেও সে যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না তাহার কারণ মানবের স্বাধীন আত্মা এই দেশ-কাল ও কার্য্য-কারণ ভাবাত্মক জগতের মধ্যে আসিয়া বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আবার যখন সে কার্য্যকারণাত্মক জগতের বাহিরে যাইবে, তখনই সে পুনরায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে।

এই কার্য্যকারণভাব সর্ব্বব্যাপী। কার্যকারণের সর্ব্বব্যাপীত্ব বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎও তদ্ব্যতীত বুদ্ধির দ্বারা কি মনের দ্বারা, যাহা কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি, তাহাদেরও উপর যাহার প্রভাব রহিয়াছে। এই জগতে থাকিয়া আমরা ইহার অনুরূপই কল্পনা করিতে পারি—বড় জোর এমন কোন স্থানের কল্পনা করিতে পারি, যাহা আমাদের জগত অপেক্ষা অতীব সুন্দর, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহাও আমাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন বিষয় নয়; কারণ, বাহ্য জগতে আমরা যাহা দেখি তদনুরূপ আমরা ধারণা করিতে সমর্থ হই—আর সেই ধারণার প্রক্ষেপণই আমাদের কল্পনা। সেই জন্য এই কার্য্য কারণাত্মক জগতে থাকিয়া আমরা এমন কিছু কল্পনা করিতে পারি না যেখানে ঐ কার্য্য কারণাত্মকভাব থাকিবে না—তাহা সুখময় স্বর্গই

হউক আর যাহাই হউক। অতএব স্বাধীন হইতে হইলে আমাদিগকে এমন স্থানে যাইতে হইবে যাহা মানব জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। অন্য কথায় মানব-মনোবুদ্ধি-গোচর জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। এই জগতে থাকিব অথচ স্বাধীন হইব এরূপ ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। এ জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের মমতা, সুখের আশা, পিতা মাতা, বন্ধু-বান্ধব, এবং জগতের সকলের সহিত সম্বন্ধ নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। তবেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব—কারণ বন্ধুত্বই নির্ভরতার ভাব আনয়ন করে এবং যেখানে নির্ভরতা সেখানে স্বাধীনতা নাই।

উক্ত সম্বন্ধ ত্যাগের দুইটী উপায় আছে, একটী 'নেতিমুখ' অপরটী 'ইতিমুখ'। যখনই স্থির করিব এই জগতের কোন কিছুর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তখনই মন হইতে আত্যন্তিক ভাবে ঐ সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই 'নেতিমুখ' পন্থা। ইহাতে কিরূপ মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহা অনুমান করাও আমাদের ন্যায় মানবের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণেই ঐরূপ মানসিক শক্তির বিকাশ সম্ভব। শ্রীবুদ্ধের গৃহ ত্যাগের কথা স্মরণ করুন। নগর ভ্রমণ কালে পথে জরাগ্রস্ত মানবের দৃশ্য তাঁহার মনে কি অপূর্ব্ব ত্যাগের ভাবই না জাগরিত করিয়াছিল। ব্যথিতান্তঃকরণ শ্রীবুদ্ধ স্থির করিলেন জন্মজরামৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বাহির করিতেই হইবে। যেমন সঙ্কল্প তখনই তাহার সাধন! পিতা মাতার স্নেহ, পত্নীর ভালবাসা, সুখৈশ্বর্য্যের মোহ এই দৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট সমস্ত ভাসিয়া গেল। ঐরূপ মানসিক দৃঢ়তা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই ঐ পথ অবলম্বনের অধিকারী। ক্ষুদ্র মানবের কি তাহা সম্ভব!

আমরা সাধারণ মানব মনে করি, আমরাও ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের ন্যায় যে কোন মুহূর্ত্তে ত্যাগী হইতে পারি অর্থাৎ জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে পারি। শুধু তাহাই নহে—অনেকে আবার ঐরূপ ত্যাগের ভাণ করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচারে ব্যস্ত। কিন্তু একটুও ভাবে না যে,

ঐরূপ ত্যাগ কত কর্ম্ম এবং সাধন-সাপেক্ষ, এবং কঠোর কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইতে পারে। যিনি কখনও কোন কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হন না, তিনি ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম নাও করিতে পারেন। তাঁহাতেই এই ইচ্ছা শোভন হইতে পারে। যাহার কর্ম্ম করিবারই ক্ষমতা নাই সে আবার কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কি করিয়া! এ নৈষ্কর্ম্ম্য তাহার আলস্যপ্রসূত—ত্যাগপ্রসূত নহে। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত ভাণ করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত আমাদিগের সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে কি না। যখন বুঝিব আমাদের সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে এবং সকল প্রকার কর্ম্মও করিতেছি তখনই দেখিতে পাইব কর্ম্মত্যাগকরারূপ গুণ আমাদিগের ভিতর আপনা হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে। তখন আর নৈষ্কর্ম্মত্ব লাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে না, দেখিব উহা আমাদের স্বভাবই হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পন্থা এই জগৎকে সত্যজ্ঞান করিয়া, জাগতিক সম্বন্ধ সকলকে সত্যজ্ঞান করিয়া অগ্রসর হওয়া। 'ইহার নাম ইতিমুখ পন্থা'। এই রাস্তায় আমাদের ভোগপ্রবৃত্তিগুলিকে জাগরিত করিয়া তাহাদের পূরণের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এই প্রবৃত্তিমূলক পথে দেখা যায় মানুষ যেমন সুখভোগও করে তেমনি দুঃখভোগও করে। তুলনা করিয়া দেখিলে সুখ অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই অধিক বলিয়া প্রতীত হয়। মানুষ এই পথে দুঃখ কষ্টের ঘা খাইতে খাইতে জ্ঞানলাভ করে যে প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই। সে দেখে, যে দুঃখ কষ্টের পারে যাইবার জন্য সে আজীবন চেষ্টা করিল কই সে ত উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিল না! তখন সে প্রবৃত্তির পথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করে। যদিও এই পথে উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা অনেক সময় এবং আয়াস সাধ্য তথাপি সাধারণ মানবের পক্ষে ইহাই সহজগম্য। কারণ, মানবের বৃত্তিগুলি সাধারণতঃ বহির্ম্মুখী—অর্থাৎ জাগতিক ভোগা-কাঙ্ক্ষী। একটী বেগবান অশ্বের তেজ মুহূর্ত্তমধ্যে দমন করা অপেক্ষা সে নিস্তেজ হইলে তাহাকে দমন করা কি সহজ নহে? তবে ঐ বেগ

যাঁহারা দমন করিতে পারেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলের সে ক্ষমতা কোথায়।

ঐরূপভাবে যদি মানুষকে ঘা খাইয়া অভিজ্ঞতা লাভের পর নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত অনেক সময় নষ্ট করিতে হইবে এবং কত শক্তি বৃথাক্ষয় করিতে হইবে তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে তাহাকে আর বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে না। কারণ, মানুষ জগতের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া কি কৌশল অবলম্বন করিলে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, কর্ম্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারে, শক্তিসমূহের কিরূপ ব্যবহার করিলে অধিক ফল লাভ করিতে পারে, ইহাই কর্ম্মযোগ শিক্ষা দেয়। প্রবৃত্তির দাস মানব যাহাতে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য কর্ম্মযোগ উপদেশ দিতেছেন, 'কর্ম্ম করিয়া যাও কিন্তু আসক্ত হইও না।'

শুধু কর্ম্ম আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। আমরা কর্ম্মের সহিত এবং জগতের সহিত যে 'আমি' 'আমার' সম্বন্ধ পাতাইয়া বসি, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা জগতে এই যে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, এত অভাব বোধ করি, তাহার কারণ, ঐ 'আমি' 'আমার' সম্বন্ধ। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, যে কার্য্যের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই তাহার সাফল্যে বা বিফলতায় আমি সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হই না। আর এই 'আমি', 'আমার' সম্বন্ধই আমাদিগকে কর্ম্মের ফলভোগী করিয়া কার্য্য-কারণ-রূপ নিয়মের বশীভূত করে। সেইজন্য কর্ম্মযোগ বলিতেছেন 'জগতের সমুদয় দ্রব্য ভোগ কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু তাহাদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিও না। সম্বন্ধ পাতাইলেই বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হইবে।'

এই সম্বন্ধ ত্যাগের উপায় কি? একটী উপায়—জোর করিয়া

দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মের ফলাফলের সহিত নিজেকে লিপ্ত হইতে না দেওয়া। ইহাতে অতিশয় মানসিক শক্তির প্রয়োজন। যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব মানেন না, তাহাদের জন্য এই পন্থা অর্থাৎ তাহাদিগকে যে কোন উপায়ে হউক অনাসক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয় উপায়টী যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদিগের জন্য। এই পথটী পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ভগবানেরই কর্ম্ম আমরা করিতেছি এবং তিনিই কর্ম্মফলভোক্তা ও দাতা, এইরূপ অপর একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করায়, আসক্তি বুদ্ধি আপনা হইতেই কমিয়া যায়। অর্থাৎ ইহাতে মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে কিন্তু স্বামিত্ববুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ও সমস্ত কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। এই পন্থা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও আমাদিগকে অতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন একটী কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া অহঙ্কারের বোঝা যেন ঘাড়ে করিয়া না বসি। স্বামিত্ববর্জ্জন বা আত্মসমর্পণের পর কোন কার্য্যের জন্য আনন্দিত বা দুঃখিত হইলে চলিবে না। এই স্বামিত্ব ত্যাগ শুধু বাচনিক না হইয়া যেন মন হইতেও দূরীভূত হয়। ক্রমে দেখিতে পাইবে কর্ম্ম আর আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিতেছে না, আমাদের আর কোন অভাব নাই। তখন আমরা যাহা কিছু করি না কেন, এই কার্য্য-কারণাত্মক জগৎ আমাদিগকে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না—আমরা মুক্তি লাভ করিব, স্বাধীন হইব।

ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

ঈশ্বর কল্পনা—ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য যে বস্তুতঃ এক ইহা সাধারণ ব্যক্তির কল্পনারও অতীত; কিন্তু তথাপি অপরোক্ষ-জ্ঞান বলে বলীয়ান বেদান্তের আচার্য্যগণ ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের একত্বই ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বর ও জীব যে বস্তুতঃ একই পদার্থ—কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া মানবের ভ্রম দূর করিবার জন্য সমস্তই এক অনাদি অনন্ত নিত্যবস্তু ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত, এই সনাতন সত্য, ঐ উভয় চৈতন্যের বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে অজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম সমষ্টি-অজ্ঞান উহা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উৎকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-অজ্ঞান অহঙ্কারাদি নিকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া মলিন সত্ত্বপ্রধান। বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বরপদবাচ্য। এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কেমন করিয়া ঈশ্বর, জীব ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা সম্ভবপর হইল? কিরূপেই বা সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কখন সর্ব্বজ্ঞের ন্যায়, কখন অল্পজ্ঞের ন্যায় কার্য্যাদি করিবার যোগ্যতা লাভ হইল? সত্যই ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় কিন্তু শুভ্র স্ফটিক যেরূপ লোহিত পুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ তৎকর্ত্তৃক উপহিত হইয়া নিজে শুভ্র হইয়াও রক্তবর্ণের ন্যায় প্রতিভাসিত হয় এবং জড় লৌহে যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃ চেতনত্বের ভাণ হয়, সেইরূপ নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সমষ্টি ও ব্যষ্টি-অজ্ঞান দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব, সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ ইত্যাদি অবস্থা সম্ভবপর।

সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের সাক্ষী বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ; সমস্ত জীবকে তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফলদান দ্বারা তাহাদিগকে চালাইতেছেন বলিয়া ঈশ্বর, সকল জীবের প্রেরক বলিয়া

নিয়ন্তা, সকল জীবের অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির নিয়ামক বলিয়া অন্তর্যামী ; প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় না বলিয়া অব্যক্ত এবং চরাচর সৃষ্টির বিবর্ত্ত অধিষ্ঠান বলিয়া জগৎকারণ।

এখন দেখা যাউক বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ কাহাকে বলে। বিচার শাস্ত্রে দুইটি প্রধান বাদ (theory) আছে ; একটি বিবর্ত্তবাদ ও অপরটি পরিণামবাদ। যখন কোন বস্তু স্বস্বরূপ বিকৃত না করিয়াই আপনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তুর রূপ ধারণ করে তাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে।—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জু রজ্জুই আছে, ছিল ও পরেও থাকিবে ; কিন্তু তথাপি আমার ভ্রমবশতঃ ইহাকে সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে রজ্জুটি তাহার স্বস্বরূপ বিকৃত না করিয়াই সর্পভ্রম উৎপাদনের কারণ হইয়াছে ; কারণ রজ্জুত কোনও দিন সর্প হইতে পারে না। যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয় উহাকে অধিষ্ঠান বলে ; অতএব রজ্জু সর্পের বিবর্ত্ত অধিষ্ঠান। ঈশ্বরও তাঁহার স্বস্বরূপ বিকারগ্রস্ত না করিয়া চরাচর সৃষ্টির বিবর্ত্ত অধিষ্ঠান। উপাদানবিশেষের বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত ও পূর্ব্বাবস্থার সহিত কিছু সৌসাদৃশ্য থাকে, ইহাকে পরিণামবাদ বলে ; যেমন দুগ্ধ ও দধি। দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়। দুগ্ধ ও দধি একই বস্তুর একটি অবিকৃত ও অপরটি বিকৃত অবস্থা মাত্র, ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য, কিন্তু রজ্জু ও সর্পে বস্তুগতই ভেদ রহিয়াছে। বেদান্তের আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদ অনুসারেই বলেন যে, এক মাত্র অপরিণামী ব্রহ্ম অধিষ্ঠানেই—রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্পভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানতাবশতঃ চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে।

সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিয়ন্তা ইত্যাদি কেন বলা হইল ? এক মাত্র চৈতন্য ব্যতিরেকে জগৎ প্রপঞ্চের কারণ অজ্ঞান অর্থাৎ জগদাদি সমস্তই সমষ্টি অজ্ঞানের বা মায়ার অন্তর্গত। অতএব সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য তদন্তর্গত সমস্ত যে জানিবেন, সকলকেই যে চালাইবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? অচৈতন্য বস্তু কখনও জ্ঞাতা, নিয়ন্তা হইতে পারে

না। সুতরাং অজ্ঞান-উপহিত ঈশ্বরচৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ। শ্রুতিতেও আছে,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া

ঈশ্বরের কারণ-শরীর, আনন্দময় কোষ ও প্রলয় স্থান—নিগুর্ণ ব্রহ্ম যখনই অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া কর্ত্তৃক উপহিত হইলেন, তখনই তিনি সগুণ হইয়া পড়িলেন। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। অজ্ঞান-সমষ্টি ঈশ্বরের উপাধি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চের কারণ হইয়াছে বলিয়া উহাকেই তাঁহার কারণ-শরীর বলা হইয়াছে। কারণ-শরীরে কেবলমাত্র মূল অজ্ঞান বা প্রকৃতি ও চৈতন্য বা পুরুষ থাকেন এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ তথায় থাকে না বলিয়া সেই কারণ-শরীর আনন্দময়। আনন্দময় কারণ-শরীর ঈশ্বরচৈতন্যকে কোষের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া থাকে বলিয়া উহাকে আনন্দময় কোষ বলে। শরীরের আচ্ছাদক যেমন চর্ম্ম, ঐরূপ ঈশ্বরচৈতন্যের আচ্ছাদক মায়া; সেই হেতু উহার নাম কোষ বলা হইয়াছে। প্রলয় কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অজ্ঞানে লীন হইয়া থাকে। ঈশ্বরে যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ নাই তখন তাঁহার স্থান প্রলয় বুঝিতে হইবে।

যে চৈতন্য সমষ্টি-মায়া কর্ত্তৃক উপহিত, যিনি মাত্র কারণ-শরীর-ধারী ও আনন্দময় কোষাচ্ছাদিত, প্রলয় যাঁহার স্থান, তিনিই ঈশ্বর।

জীব কল্পনা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্যষ্টি-অজ্ঞান মলিন সত্ত্ব-প্রধান। এই মলিন সত্ত্বপ্রধান ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে জীব বা প্রাজ্ঞ-চৈতন্য বলে।

জীবের কারণ-শরীর আনন্দময়কোষ ও সুষুপ্তি স্থান। প্রলয়কালে মূল অজ্ঞান ঈশ্বরে বর্ত্তমান থাকিয়া পরে সৃষ্টির প্রাক্কালে হিরণ্য-গর্ভাদি প্রপঞ্চোৎপন্নের কারণ হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে যেরূপ ঈশ্বরের কারণ-শরীর বলা হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি কালে জীবগত অজ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া উহাই অহঙ্কারাদি শরীর-সংস্কারের কারণ হয়

বলিয়া উহাকে জীবের কারণ-শরীর বলে এবং সে সময় আনন্দ অনুভব হয় বলিয়া এবং জীবাত্মাকে কোষের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়া, উহাই জীবচৈতন্যের আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের জ্ঞান জীবের থাকে না; সেই হেতু সুষুপ্তিই বা দৈনন্দিন প্রলয়ই জীবচৈতন্যের স্থান।

যখন আমরা জাগ্রৎ থাকি তখন স্থূল বাহ্য জগৎপ্রপঞ্চের সহিত আমাদের ব্যবহার সম্ভবপর এবং সেই হেতু উহাকে ব্যাবহারিক সত্য বলা হয়; কিন্তু যখন আমরা নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখি তখন স্থূল জগৎপ্রপঞ্চের সহিত আমাদের ব্যবহার আর থাকে না। তখন কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের ভোগ হইয়া থাকে; আবার যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হই তখন সূক্ষ্ম প্রপঞ্চেরও ভোগ হয় না; তখন আমরা মহা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত ব্যাবহারিক সত্যরূপ স্থূল প্রপঞ্চ স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত প্রাতিভাসিক সত্যরূপ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হয় এবং গভীর নিদ্রায় স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় প্রপঞ্চেরই লয় হইয়া কেবলমাত্র এক অজ্ঞান থাকে। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের উপরম স্থানকেই সুষুপ্তি বলে। যেমন জলের ফেনার লয় তাহার কারণ তরঙ্গেতে এবং তরঙ্গের লয় মূল কারণ জলেতে হইয়া থাকে; সেইরূপ স্থূল প্রপঞ্চের লয় তাহার কারণ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চে হয় এবং সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় মূল কারণ অজ্ঞানে হইয়া থাকে। প্রলয় কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় মূল অজ্ঞানে হইয়া থাকে এবং সুষুপ্তিকালেও যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হইয়া যায়, এবং সেই সুষুপ্তি অবস্থা যখন প্রতিদিনই আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

দৈনন্দিন প্রলয়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হইবার পরে যিনি বর্ত্তমান থাকেন, যিনি এই দৈনন্দিন প্রলয়ের সাক্ষীরূপে বিরাজমান, তিনিই নিত্যবস্তু, তাঁহাকেই শাস্ত্রে জীবচৈতন্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ-বৃত্তির অভাবে ঈশ্বর ও জীবের সে সময়ে আনন্দানুভব কি প্রকারে প্রমাণ হইবে? অন্তঃকরণবৃত্তির অভাবে উক্ত কালদ্বয় প্রচুর আনন্দময় হইলেও সে আনন্দের গ্রাহক যখন কেহই নাই তখন উহা যে আনন্দময় সে বিষয়ের প্রমাণ ত পাওয়া যাইতেছে না? আর কেনই বা সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে আনন্দ হইবে?

অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হইলেও যেমন তাহার বৃত্তি অঙ্গীকার করা হয়, সেইরূপ চৈতন্য-প্রদীপ্ত-অজ্ঞান অতি সূক্ষ্মতম হইলেও তাহারও সূক্ষ্মবৃত্তি স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর প্রলয় কালে মূল অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন, জীবও সুষুপ্তিকালে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা তারতম্যভাবে আনন্দ অনুভব করেন। আমরা সচরাচর ইহা দেখিতে পাই যে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া সে যে বেশ সুখে নিদ্রা গিয়াছিল ও সে সময় অজ্ঞান ছিল ইহা অনুভব করে; কারণ ঐরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, 'বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'। অতএব সুষুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অনুভব দ্বারা জানা যাইতেছে, সে সময় আনন্দ ও অজ্ঞান, এই উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে। শ্রুতিতেও আছে—"আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ"। উপরোক্ত অনুভব ও শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে ঈশ্বর ও জীবের অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা আনন্দানুভব অপ্রামাণ্য নহে; এবং প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয়ে সকল প্রকার বিক্ষেপের অভাব হয় বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উক্ত কালদ্বয়ে আনন্দ অনুভব করেন।

বহুবৃক্ষের একত্র সমষ্টি করিয়া আমরা এক বন বলি। নদী, হ্রদ, কূপ ইত্যাদি বহু জলের সমষ্টি করিয়া আমরা এক জলাশয় বলিয়া থাকি; কিন্তু সেই এক বন অথবা এক জলাশয়কে ব্যষ্টিভাবে বলিতে হইলে আমরা বৃক্ষ, হ্রদ, তড়াগ, কূপ ইত্যাদি এইরূপ বলিয়া থাকি; সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদি উৎপত্তির কারণ সমষ্টি-অজ্ঞান-রূপে এক হইলেও অহঙ্কারাদি উৎপত্তির কারণ জীবগত অজ্ঞান

ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে নানা এবং যখন মলিন সত্ত্বপ্রধান এই ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে তখন ব্যষ্টিভাবে উহা নানা, এইরূপ বলা হয় মাত্র।

বন বহুবৃক্ষের সমষ্টি বলিয়া সেই বনের ব্যষ্টি হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান যখন এক তখন সেই এক অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যের আবার সমষ্টি, ব্যষ্টি ইত্যাদি কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে?

অভেদ ও ভেদ দৃষ্টিই সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণ। ভেদ দৃষ্টিতে ব্যষ্টি, যেমন ঘট ও মৃত্তিকা; অভেদ দৃষ্টিতে এক, যেমন মৃৎপিণ্ড।

যেমন ব্যষ্টি বৃক্ষ সকল ও সমষ্টি বন বস্তুতঃ এক, যেমন ব্যষ্টি ঘট-মৃত্তিকা এবং সমষ্টি মৃৎপিণ্ড বস্তুতঃ একই পদার্থ; সেইরূপ জগৎ প্রপঞ্চোৎপত্তির কারণ ঈশ্বরগত মূল সমষ্টি অজ্ঞান এবং অহঙ্কারাদি উৎপত্তির কারণ জীবগত ব্যষ্টি-অজ্ঞান বস্তুতঃ এক।

সমষ্টি বনাবচ্ছিন্ন আকাশ, ব্যষ্টি বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন বস্তুতঃ একই পদার্থ; তেমনি সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্য জীব বস্তুতঃ একই পদার্থ। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ যাহা আমরা বলিয়া থাকি, সে ভেদ চৈতন্যগত নহে, পরন্তু উহা উপাধির ভেদ বশতঃ ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। সমষ্টি অজ্ঞান জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া এবং ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তিনি কারণ-উপাধি অবচ্ছিন্ন এবং ব্যষ্টি অজ্ঞান জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ও জীব সেই কার্য্যের সহিত জড়িত বলিয়া জীব-চৈতন্যকে কার্য্য উপাধি অবচ্ছিন্ন বলা হয়। এই কারণ ও কার্য্য-উপাধি ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীবচৈতন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দিলে এক মাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। অতএব ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য বস্তুতঃ অভেদ। বেদান্তের আচার্য্যগণও বলেন ঃ—

"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্য্য কারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন —"বিচার করতে গেলে, যাকে 'আমি' 'আমি' করছো দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার

কর—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তখন দেখ্‌বে তুমি এ সব কিছুই নও। তোমার কোনও উপাধি নেই।" এই নিরুপাধিক চৈতন্যই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, যাঁহার উপর এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহত্রয় ; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিকারত্রয় এবং জীব, জগৎ, ঈশ্বর বস্তুত্রয় অধ্যারোপিত হইয়া সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

"শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতায় যূপস্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে ; এবং উক্ত স্তম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে প্রকার যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞ কাষ্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গ জটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি, ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।"—বিবেকানন্দ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, ইজিপ্টের আইসিস এবং অসিরিস ধর্ম্মের উপর কিরূপ ভারতীয় হরগৌরী উপাসনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এই হরগৌরী উপাসনা যে ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হয় তাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদে দেখা যায়, অগ্নি দেবতাই ধীরে ধীরে রুদ্রে এবং শিখা শক্তিতে এবং বেদীই গৌরীপট্টে পরিণত হইয়াছে।

১ মণ্ডল, ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে দেখা যায়—

জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং॥

"হে অগ্নি ; তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও ; ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে (অনুগ্রহ করিয়া) যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র, তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করিতেছি।" যাস্ক ঐ ঋকের বিষয় বলেন—"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" সায়ন বলেন, "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।"

আবার ১ম, ৩৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়—

ন হি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে॥

"হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ! দ্যুলোকে তোমাদিগের শত্রু নাই, পৃথিবীতেও নাই। হে রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা একত্রিত হও। শত্রুদিগের ধর্ষানার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক।" সায়ন 'রুদ্রাস' অর্থে "রুদ্রপুত্র মরুতঃ" করিয়াছেন। আবার দেখা যায়, রুদ্‌ ধাতুর অর্থ গর্জ্জন করা হয়। অতএব রুদ্র অর্থে শব্দায়মান ঝড়ের পিতা বজ্র বলিয়াই অনুমিত হয় (Vide Webers Indische Sutdien, translated in Muir's Sanskrit Text's, Vol. IV. See also Max Muller's Origin and Growth of Religion (1882), P. 216.)।

ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় কিরূপে পৌরাণিক মহাদেবের বীজোদ্গম হইল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, "বেদবিদ্যা-পারদর্শী সুবিখ্যাত শ্রীমান ম, মূলর বলেন, বৈদিক ঋষিগণ যখন যে দেবতার স্তুতি করেন, তখন তাঁহাকে পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান ; উপাসক যখন এক দেবতার উপাসনা করেন, তখন অন্য কোন দেবতা তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত থাকেন না ; ঋগ্বেদের বচনানুসারে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি

দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নন্, এক দেবতারই সংজ্ঞামাত্র; অর্থাৎ বেদাবলম্বী হিন্দুরা অন্যান্য জাতির ন্যায় বহুদেববাদী ছিলেন না। * * * সম্প্রতি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীমান্ হুইট্‌নিও তাঁহার এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদমাত্রাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা যে এককালে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিতেন, ঋগ্বেদসংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, দ্যৌ ও পৃথিবী, উষা ও রাত্রি প্রভৃতি দুই দুই দেবতার একত্র স্তুতি ঐ সংহিতার অনেক স্থানেই সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল দুই দুই দেবতা নয়, নানা স্থানে আদিত্যগণ, মরুৎগণ প্রভৃতি বহু দেবতার একত্র সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ উল্লিখিত পুর্ব্বকালীন হিন্দুরা যে বহু দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

হুইট্‌নিওর মতে হিন্দুরা বহু দেবতার উপাসনা করিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা বিধাতার অসীমত্ব জানিতেন না, এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি। কারণ বেদের প্রায় সকল মণ্ডলেই সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-নিয়ন্তার কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ১০ম মণ্ডলে প্রথম অদ্বৈত জ্ঞানোন্মেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপর মণ্ডলসমূহেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২০ ॥
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥২১॥১ম॥২৪সূ॥

"আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন।"

"স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।"

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা সমাসতে ॥৩৯॥

১ম॥১৬৪সূ॥

"সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে, ঋক্ দ্বারা সে কি করিবে? একথা যাহারা জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।"

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইংদ্রো মায়াভিঃ পরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥১৮॥

৬ম॥৪৭সূ॥

"সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।"

ইহা ছাড়া

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ॥১ম॥১৬৪সূ॥৪৬ঋ॥

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিঃ" ॥১০ম॥১২৫সূ॥১ঋ॥

প্রভৃতি সকল জন বিদিত বহু মন্ত্র, ঋষিরা বহু দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক পর দেবতারই উপাসনা করিতেন – প্রমাণিত করে। বহুদেবতার উপাসনা করিলেই যে সর্ব্ব শক্তিমান এক বিভুর জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতে হয় তাহারও কোন অর্থ নাই। শঙ্করাচার্য্য, প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই এক পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা আবার সেই আত্মদেবতার বহুভাব ঘন মূর্ত্তি সকলও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেমন ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ আকাশ দেখা যায় সেইরূপ বেদের ঋষিরা ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্য দিয়া, এবং পুরাণের ঋষিরা গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্য দিয়া সেই একই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন।

আর্য্য ঋষিরা যাহাই শ্রীমান্, বীর্য্যবান দেখিয়াছেন, তাহাতেই

পরমদেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া, তাহারই উপাসনা করিয়াছেন। সেই উপাসনারই একটি এই রুদ্র উপাসনা। ইহা হইতেই ক্রমে পৌরাণিক গল্পের অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবেরা যেমন মহতাদি তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গাদির উপর আরোপ করিয়া চতুর্ব্যূহরূপ এক নবভাবের উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন সেইরূপ বোধ হয় তৎকালীন ঋষিরা হরগৌরী অবতারের উপর বৈদিক তত্ত্ব সকল আরোপিত করিয়া আর এক অপূর্ব্ব পৌরাণিক তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। পুরাণ বলিতেছেন, মহাদেবের পত্নীর নাম, উমা, হৈমবতী দুর্গা, অম্বিকা, দক্ষতনয়া গৌরী, কালী, করালী ইত্যাদি। কিন্তু মণ্ডুকোপনিষদেও আমরা অগ্নির সপ্ত জাহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই,—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা ॥১ম॥২য়॥৪॥

"দুর্গাও অগ্নির একটি নাম মাত্র ছিল" (রমেশ দত্ত)। যখন রুদ্র, পুরাণে সর্ব্বসংহারক কাল হইয়া দাঁড়াইলেন তখন উপরোক্ত নাম গুলি তাঁহার পত্নী-পদবাচ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নি এরূপ দেখা যায়। কেনোপনিষদে উমা এবং হৈমবতীর উল্লেখ আছে, তিনি তথায় রুদ্রের পত্নী কি না বলা যায় না, কেবলমাত্র তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। আবার ঋগ্বেদে দেখা যায়,—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥
১ম।১৬৪ সূ ॥৪১ঋ ॥

"(মেঘ গর্জ্জনরূপ) অন্তরীক্ষচারিণী বাক্ বৃষ্টি জল সৃজনকরতঃ শব্দ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদী, কখন চতুষ্পদী, কখন অষ্টাপদী, কখনও নবপদী হন এবং কখন সহস্রাক্ষর

পরিমিত হইয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থাকিয়া শব্দ করেন।" মূলে যে "গৌরী" শব্দ আছে, সায়ন তাহার অর্থে বলেন-"মেঘগর্জ্জন, রূপ বাক্ বা শব্দ" অর্থাৎ "রুদ্র বা বজ্র নির্ঘোষ।" আবার দেখা যায়,—

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতাণাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্ত পিতরং তনা॥
নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত।
অগ্নে স্নদীতি মুশিজং॥
৩য়॥ ২৭ স্থ॥ ৯, ১০ ঋ॥

"যে অগ্নি কর্ম্মদ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত, ও পিতাস্বরূপ, দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন।"

"হে বল সম্পাদিত অগ্নি! তুমি উত্তম দীপ্তিযুক্ত, হব্যাভিলাষী ও বরণীয়। তোমাকে দক্ষের (কন্যা) ইলা ধারণ করিতেছে।"

দক্ষ তনয়া অর্থাৎ বেদীরূপা ভূমি। সায়ন ইলা অর্থে "ভূমি" করিয়াছেন। সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে অর্থাৎ বেদীতে রুদ্রাগ্নি স্থাপিত হয়। এই মন্ত্রটিই গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গোৎপত্তির প্রথম নিদর্শন। এদিকে আবার বেদের স্থানে স্থানে রুদ্রের একটি নাম "ভব" পাওয়া যায় (রমেশ দত্ত)। আবার আমাদের শাস্ত্রকারেরা সকল বিষয়েরই কোনও না কোনও কারণ দেখাইতে ভাল বাসিতেন। অগ্নির রুদ্র নাম ধারণের একটি আখ্যায়িকা আছে। তৈত্তিরীয় হইতে সায়ন দেখাইয়াছেন "অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধের সময় অগ্নি দেবগণের নিহিত অর্থ লইয়াছিলেন, দেবগণ আসিয়া অগ্নির নিকট হইতে সেই অর্থ কাড়িয়া লইলেন। অগ্নি রোদন করিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাম "রুদ্র" হইল। পুরাণেও এই গল্পের অনুরূপ গল্প দৃষ্ট হয়।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীপায় প্রভরামহে মতীঃ।
যথা শম সদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ন নাতুরং॥
১ম। ১১৪ স্থ। ১ ঋক।

"মহৎ কপর্দ্দী বীরনাশী রুদ্রকে আমরা মননীয় (স্তুতিসমূহ) অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে।"

রুদ্র শব্দের প্রাচীন অর্থ বজ্র এবং রুদ্র অগ্নির রূপবিশেষ ইহা আমরা দেখিয়াছি। সায়ন কপর্দ্দী অর্থে "জটিল" অথবা জটাধারী করিয়াছেন। এখন কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জই অগ্নির জটা বলিয়া বোধ হয়। আবার দেখা যায়, বৃষ ধাতুর অর্থ বর্ষণ, তাহা হইতে বৃষ শব্দ হইয়াছে। মেঘই বারি বর্ষণ করে এবং মেঘই বজ্রের বাহক। সেইজন্য বৃষ রুদ্রের বাহন কল্পিত হইয়াছে। অপরে বলেন, অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত, সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ বৃষের পৃষ্ঠে আনয়ন করা হইত, সেই হেতু রুদ্রাগ্নির বাহক বৃষ। এবং যজ্ঞাবশেষ ভস্ম হইতে রুদ্রের বিভূত্যাঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডান্তর্গত বৈশ্বানরোৎপত্তিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়ে এ কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভবাগ্নি ব্রহ্মাকে তাঁহার উপযুক্ত স্থানে নির্দ্দেশ করিতে বলেন। ব্রহ্মা সেই অগ্নিকে শিবাগ্নি বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে অন্যান্য অগ্নির ন্যায় সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে রুদ্রাগ্নি অত্যন্ত জ্বালা-মাল বিস্তার করেন। ব্রহ্মা দেখিলেন তাঁহাতে আকার, ইকার, উকার প্রভৃতি অগ্নিও বর্ত্তমান। ব্রহ্মা ভীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কালাগ্নি রুদ্র তাঁহার স্বরূপ দেখাইলেন। ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন যে এই অগ্নিই রুদ্র।

অপর দিকে দেখা যায়, জগতে দুইটি ধর্ম্ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে,—একটি পণ্ডিতদের ধর্ম্ম অপরটি সাধারণের। দর্শন-বিজ্ঞান-পরিমার্জ্জিত ধর্ম্ম সমাজের অতি অল্পলোকেই গ্রহণ করে। পরন্তু ষষ্ঠী, মাকাল, শীতলা, ইতু, দুর্ব্বা প্রভৃতি দেবতা; কবিকঙ্কন চণ্ডী ও দাশুরায়ের পাঁচালীই সাধারণ লোককে শাসন করিতেছে। সেই সকল দেবতাই তাহাদের ভাগ্যচক্রের বিধাতা এবং সেই সকল শাস্ত্রই তাহাদের বেদ বেদান্ত। পণ্ডিতেরা ঐ গ্রাম্য দেবতাগণকে বিশেষ স্থান না দিলেও এবং সাধারণে পণ্ডিতদের দর্শন বিজ্ঞানাদি

না বুঝিলেও, পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে না। বহু বেদান্তবাগীশ, বেদান্তচূড়ামণি "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" প্রতিপাদন করিয়া আসিয়াও নদীতটে অশ্বত্থমূলে সিন্দুর লেপিত ভৈরব দেবতার প্রস্তর মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে ছাড়েন না, বা পুত্রকন্যাদের মঙ্গল কামনা করিয়া মানিক পীরের সীর্ণি মানিতে কুণ্ঠিত হন না। শাস্ত্রে না থাকিলেও তারকেশ্বরের মহিমা অনেক দেবতা অপেক্ষা বেশী। অপর দিকে পণ্ডিতের ধর্ম্মের জ্ঞান বিজ্ঞানও সাধারণের ধর্ম্মে, পল্লীভাষায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। উহা হইতেই কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কনচণ্ডী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্ম রাজ্যে এক একটি নবধারার সৃজন করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার চল না থাকা বশতঃ সেগুলি পুনরায় দেবভাষায় লিখিত হইয়া মহাপুরাণ বা উপপুরাণ বলিয়া পোষিত হইতে পারিতেছে না। এই ব্যাপার শুধু এখন নয় বেদের সময়েও দেখা যায়। ঋগ্বেদাদি পাঠ করিয়া ইহা বিশেষ ভাবে অনুমিত হয় যে, ঋষিগণপ্রচলিত শুদ্ধসত্ত্ব উপাসনা ছাড়া আরও অপরাপর বিসূচিকা, দূর্ব্বাদি নানা দেবদেবীর প্রভাব তৎকালীন আর্য্য ও অনার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে প্রবল মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এমন কি, ঋগ্বেদেই আমাদের প্রতিপাদ্য দেবতা শিশ্নদেব বর্ত্তমান ছিলেন—তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ৭মণ্ডলের ২২সূক্তে দেখা যায়—

ন যাতব ইংদ্র জূজুবুর্ণো ন বংদনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।

স শর্ধদর্য্যো বিষুণস্য জংতোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতিং নঃ॥৫॥

"হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না পৃথক্ করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।" পুনশ্চ ১০ মণ্ডলের ৯৯ সূক্তে,—

স বাজং যাতাপদুষ্পদা সন্তস্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।

অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি চর্পসা ভূৎ ॥ ৩ ॥

"তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্ববস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিত ভাবে শতদ্বার বিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং শিশ্নদেবগণকে নিজ তেজে পরাভব করেন"।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'শক্তি পূজা' নামক গ্রন্থে বলেন, "নিয়ত বর্দ্ধমান 'সুমের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের জন্য 'সুজলা সুফলা' দেশ বিশেষের অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রীপুংচিহ্নের উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। অনেককাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া ভারতে বাসের পর উহারই এক শাখা আবার মালাবার উপকূল হইতে নৌযানে মিসরে যাইয়া নীলনদ তীরে অপর এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সূচনা করিল।" কিন্তু সুমের জাতির ভারতে আসা সম্বন্ধে কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায় না। উপরন্তু তাহারাই যে মিসরে পূর্ব্ব দেশ হইত গিয়াছিল এ কথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করে। আবার ঋগ্বেদেই যখন তাহাদের উপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায় তখন তিনি অপর স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্থির বলিয়া বোধ হয়। "নারীর বিভূতি বা জায়াভাবের উপাসনা, পাশ্চাত্য বস্তু প্রাচীন কালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কারণ-প্রিয়, ভুজগভূষিত, উক্ষদেব (Bacchus) ও তচ্ছক্তি ঐশী (Isis) ইউরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পূজা পাইতেন।" * * "প্রাচীন ইউরোপে ধর্ম্মালোক বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল—মিসরে। ঐ মিসরও যে ভারতের ধর্ম্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল—এ বিষয়েরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মিসরি, মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে ঐ দেশে প্রথম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে—এ কথা মিসরিদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্যদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজাদি প্রদেশের দ্রাবিড়ির সহিত প্রাচীন মিসরের রং ঢং চেহারা,

আচার, ব্যবহার এবং পূজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান—সেই শিবশক্তি পূজা, ষাঁড়ের সম্মান, বাবরি কাটা চুল, ধুতিপরা কাছাহীন, মিস্ কালো রং! কাজেই কে না বলিবে—ঐ দ্রাবিড়িই মিসরে যাইয়া বহুপূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ?"

পুনশ্চ মিসর যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের একটি কেন্দ্র, বাবিল (Babylon) সেইরূপ আর একটি কেন্দ্র। এখানেও যে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হইয়াছিল তাহা তদ্দেশীয় সম্রাটদের বিকৃত সংস্কৃত নাম দেখিয়াই বেশ বোধগম্য হয়। যথা,—অসুর নতশির পাল (Assur-natsir Pal) ইনি বাবিল অসুরদের (Assyrian) প্রথম রাজা; ত্রিগনাথ পালেশ্বর (Tiglath Pileser) ইনি ভারতের কিয়দংশ জয় করেন। সম্মানেশ্বর (Shalmaneser); বলেশ্বর (Belshazzar); নীলগিরীশ্বর (Neriglissar); নবপালেশ্বর (Nabopolassar)—ইনি অসুর বেণীপালের (Assur bani-Pal) অধীনে বাবিলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইঁহার পুত্রই বিখ্যাত নবচন্দ্রেশ্বর (Nebuchadnezzer)। M. Lenormant অসুর রাজদের সমসাময়িক কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডাত্মক স্তোত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গুলির ঋগ্বেদের সহিত অনেক স্থলে মিল আছে। আবার বৌদ্ধ-জাতকে বর্ণিত সপ্তভূমিক প্রাসাদের সহিত কালদের (Chaldea) জিগারাট্‌সের অনেক ঐক্য বিদ্যমান। অত্রস্থ সুমের জাতির মধ্যে পুং স্ত্রী চিহ্নের উপাসনা ও অস্মদ্দেশীয় পুরাণে অসুরদের শিব উপাসনার কথা থাকায় এবং অসুর রাজগণের নামান্ত দেখিয়া তথায় যে পূর্ণ-মাত্রায় ভারতীয় শৈবধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল সে বিষয়ে প্রায় এক-প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না কি ?

এখন পূর্ব্বোল্লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেদের মতের সহিত শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দের মত যদি পাঠক মিলাইয়া দেখেন তাহা হইলেই ভারতের সহিত মিসরের সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং কেন প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সহিত হিন্দু দর্শনের এত ঐক্য তাহাও বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কুটিলকেশগণই বোধ হয় মালাবার উপকূল

হইয়া সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। পরে দেবনহুষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বর্ত্তমান আবিসিনিয়ায় বসবাস করে এবং পরে ইহাদের পুনর্বিস্তারে সমগ্র মিসরদেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

বৈদিকী ও ভারতীয় অনার্য্যদের ধর্ম্ম মিলিত হইয়া তান্ত্রিকী পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও পূজ্যপাদ স্বামীর গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝা যায়। "বৈদিক যুগের বিবাহ প্রথায়, কুমারী কন্যার মাতৃত্বশক্তি বিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র 'গভং ধেহি সিনি বালি', ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার 'মাতৃমুখের' পূজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ কাল হইতেই ভারত নারীতে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্নের বেদোক্ত ঐ পূজা যে দ্রাবিড় জাতির মধ্যগত স্ত্রীচিহ্নের পূজার বা তন্ত্রোল্লিখিত মাতৃমুখের পূজার ন্যায় ছিল না ইহা বুঝিতে বেশ পারা যায়। উদ্দেশ্যের প্রভেদ দেখিয়াই ঐ কথা অনুমিত হয়। বৈদিকী পূজার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র মাতৃত্বশক্তির সম্মান, প্রাচীন দ্রাবিড়ী অনুষ্ঠান সকলের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই পূজা; এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়া উভয় ভাবে প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই মহিমা প্রচার।"

বৈদিক রুদ্রের সহিত আর্য্য মাতৃশক্তি ও অনার্য্য স্ত্রীশক্তির সম্মিলনে তন্ত্রের উৎপত্তি। যখনই শিবগৃহিণী অপূর্ব্বগুণ-রূপ-সম্পন্না উমার এবং অপরদিকে ঘোরা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা মুণ্ডমালীনীর চিন্তা করা যায় তখনই ঐ মিলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক, উহা প্রায় খৃষ্টের ৮ম হইতে ১১দশ শতাব্দীর মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু কতকগুলি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়ায় ঐ মত একেবারেই উল্টাইয়া গিয়াছে। জাপানের হরিউজি Horiuzi মঠে মধ্য ভারত হইতে আনিত একখানি তন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। উহা চীনদেশীয় পুরোহিত কানশিন Kanshin ৭৫৩ খৃঃ লইয়া যান। ঐ তন্ত্র খানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উহা উহার মাতৃভূমিতে আরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হয়। পরে ইহাও অনুমিত হয় যে

বৌদ্ধ তন্ত্রের যুগারাম্ভ যিশুখৃষ্টের সমসাময়িক। হিন্দু তন্ত্র যে তাহারও বহুপূর্ব্বে ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কারণ বেদই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। এবং হিন্দু তন্ত্রের বিকৃত অবস্থাই এই বৌদ্ধ তন্ত্র। অবশ্য কোনও কোনও বিষয়ে বৌদ্ধ যুগে উহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উপনিষদেও তন্ত্রের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য অতি প্রাচীন উপনিষদ্। উহার ১ম খণ্ডের, ৭ম অধ্যায়ে, ২য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় "ভূতবিদ্যাং।" শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন ভূততন্ত্রং। অপরাপর পণ্ডিতে ইহার অর্থ করিয়াছেন "তন্ত্রশাস্ত্রং"। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে তন্ত্রের পূর্ণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মন্ত্ররাজ নারসিংহ অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ-যুগ-পূর্ব্ব ও পর অনেক গ্রন্থে তন্ত্র শব্দটি পাওয়া যায়, যথা—

(১) সর্ব্বানুপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং
(ভারত ১৩। ৪৮। ৬)।

(২) দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যামস্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ
(আশ্ব শ্রৌ ১। ১। ৩)।

(৩) তন্ত্র মঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদি সংস্থাজপান্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রনাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে (কর্ক)।

কিন্তু এ সব সূত্র এবং উপনিষদের যুগের কথা। ইহারও পূর্ব্বে তন্ত্রের "শক্তি" ও "কারণ" যে ব্রাহ্মণের "সোম" ও "সহধর্ম্মিনীর" মধ্য দিয়া উঁকি মারে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সকল আলোচনা করিতে গিয়া পুরাণের দুটী গল্প মনে পড়ে। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে আছে সুদাস রাজা কাশীতে রাজ্যভার ব্রহ্মার নিকট এই স্বত্বে গ্রহণ করেন যে শিবকে ঐ স্থল ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এদিকে মন্দর পর্ব্বত শিবকে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে শিব মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন। সুদাস নৃপতি অতি যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। যজ্ঞ বলে বলীয়ান হইয়া প্রজা পালন

করিতেন। শিবের আজ্ঞায় বিষ্ণু বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়া তাঁহার বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উচ্ছেদ করেন। তখন সুদাস হীনবীর্য্য হইয়া পড়ায় এবং শিবও পুনরায় কাশীধামে প্রবেশ করেন। এই গল্প ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এই আগম শাস্ত্রকে একেবারে ভারত বহির্গত করিয়া দেয়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের সহিত ইহার পুনরাগমন হইয়াছিল। ভাগবতে আর একটি গল্প আছে যে—নন্দী শিবনিন্দাকারীকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগু এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে তাহারা পাষণ্ডী বলিয়া খ্যাত হইবে। সেই শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধিদের সুরাই দেববৎ আদরণীয় হইবে। এই গল্পটি হিন্দু তন্ত্র হইতে বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এখন এই সকল আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের যুগে এই হিন্দু তন্ত্র হর-গৌরী বিষয়ক নানা উপাখ্যান সমন্বিত হইয়া দ্রাবিড়ীদের মধ্য দিয়া জল বা স্থল পথে নানা দেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকামাখ্যাধাম।

(শ্রীশস্ত্রপাণি শর্ম্মা)

(উৎস)

রাত্রি গভীর-গভীর অতি সুগভীর। চরিদিকে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কোথাও উজ্জ্বল আলোক, কোথাও নিবিড় অন্ধকার, কোনও বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নাই; সব এই আলোক আঁধারে যেন মিশিয়া গিয়াছে।

মানব জীবনের চিত্রই এই। কখন আলোক, কখন অন্ধকার, কখন আলোক-অন্ধকারের অপূর্ব্ব মেশামেশি।

এই মহাপুণ্য তীর্থ আদি-মাতা সতীর যোনি পীঠ। গুরুকৃপায় কামগন্ধহীন না হইলে এ মহাপীঠের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত। মুখে বলা সোজা—"এই ব্রহ্মযোনি হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ত্রিভুবনের উদ্ভব হইয়াছে"। কিন্তু কয়জন ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" এই মহাবাক্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন! যোনি-মুদ্রাই মায়ের মাতৃত্বের প্রধান অভিব্যক্তি—যাহা হইতে জীবমাত্রই উৎপন্ন। অবতার হইতে কীটানু পর্য্যন্ত এই যোনি হইতে উদ্ভূত। বৃক্ষ হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাও ঐ যোনির ভিতর দিয়া। কাঠ, পাথর, ধুলা পর্য্যন্ত একদিন ঐ যোনি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ যে গ্রহ, নক্ষত্র আকাশে জ্বলিতেছে শাস্ত্রীয় বচনে উহারাও যোনি সম্ভব।

এই সর্ব্ব-সম্ভাবী যোনি-মুদ্রা কি? লম্বা লম্বা কথায় 'আদ্যাশক্তি', 'প্রধানা প্রকৃতি' ইত্যাদি বলা যায়, কিন্তু সাদাকথায় "মা" নামে তাঁহাকে অভিহিত করিলে ক্ষতি কি? তিনি "মা," আর প্রসূত যা কিছু সবই তাঁহার সন্তান।

পশুতে মাতা-পুত্র, বা ভাই-ভগ্নী সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করে না। মানব জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মর্য্যাদা বুঝে, বিশেষতঃ মায়ের মর্য্যাদা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন না করিয়া কেহই কখন জগন্মাতার শুদ্ধ-সত্ত্ব ভাবের কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুধাবন করিতে পারে না। মানুষের চরমোন্নতির ইহাই অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা;—কেন? তা কি বুঝতে বাকি থাকে! আমরা যে স্ত্রীপুরুষ সকলে এক-মায়ের পেটের সন্তান!

কথাটা শুনিতে যত সোজা, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা ততটা সোজা নয়। কারণ, শোনা ও উপলব্ধি করা আকাশ পাতাল তফাৎ।

বড় বড় ভাবগুলি চিরকালই নিতান্ত সহজ ও সরল। বহু-কালাভ্যস্থ সংস্কার ও আত্মপ্রতারণা দ্বারা আমরাই সেগুলি

জটিল করিয়া তুলি। পুরুষ প্রকৃতির অবাধ মিলন ও অজস্র প্রজা সৃষ্টি ত ইতর জন্তু ও উদ্ভিদের ধর্ম্ম। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সকলি হইতেছে,—তাঁহার অলঙ্ঘ্যনিয়মে মানুষের মধ্যেও ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে প্রজা বর্দ্ধন হইতেছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু মানুষ জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে মুক্তিকাম বা ঈশ্বর-কাম হইয়া পশু সুলভ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত? বিজ্ঞব্যক্তি হয়ত বলিবেন ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগে প্রজালোপের সম্ভাবনা। কিন্তু সে ভাবনা কার? সৃষ্টপ্রজার না সৃষ্টি কর্ত্তার? আর এক কথা বহুত্বই সৃষ্টির মূল। কিন্তু যেখানে বহুত্ব সেখানেই দুঃখ ও অশান্তি। জ্ঞানী চান পূর্ণ-ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া সমগ্র দ্বৈতপ্রপঞ্চ তাঁহাতে লীন করিতে। ইহাকেই ঋষিরা অপবর্গ বা মোক্ষ বলিয়াছেন। আর সকলেই যদি বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করিয়া সর্ব্বাত্মা, আত্মারাম হয়, তাহা হইলে দোষটা কি? কিন্তু চিরদিনই মহামায়ী এক হইয়াও বহুরূপে ক্রীড়া করিবেনই—সৃষ্টির ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

আর এক কথা—পুরুষ ও স্ত্রী, এই দ্বিবিধ সৃষ্টির কি প্রয়োজন? সকলেই যখন এক মায়ের সন্তান তবে পরস্পরে প্রবল আসক্তিযুক্ত এই মিথুন গঠনের কি উদ্দেশ্য? গলদ গোড়াতেই—'দ্বিবিধ ভাব,' 'আসক্তি' এ সব কথা কোথা হইতে আসিল। পাঁচ বৎসরের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে কি ভাবে দেখে? 'জ্ঞান বৃক্ষের' ফল খাইয়া আদম ও হবা সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন উপায় এই কামনা-রূপ সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিষ উগরিয়া ফেলা। আমাদিগকে আবার পাঁচ বৎসরের ছেলের মত হইতে হইবে। মায়ের ছেলেকে মায়ের কোলে আশ্রয় লইতে হইবে। মা ত হাত বাড়াইয়া আছেন, ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে পড়িতে পারিলেই হইল। ঐ কোল ভিন্ন নিরাপদ স্থান আর কি আছে? সেখান হইতে তুমি সম্রাট্ আর তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পা গিয়াছ কি একেবারে থানায়।

জগজ্জননী প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত নহেন জগৎ জুড়িয়া সন্তানের জন্য

কল্যাণ-কোল পাতিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমন ব্যাদ্‌ড়া যে সোজাসুজি কল্যাণের পথে কিছুতেই যাইতে চাহি না। কাজে কাজেই থাবড়া খাইতে হয়।

সংস্কার কেন হইল, কোথা হইতে আসিল, এ সব কথা বিজ্ঞ-পণ্ডিতে বলিতে পারেন ও তর্কে বুঝাইতে পারেন। আমরা কিন্তু মোটামুটি দেখিতেছি কতকগুলা মহাপাজি সংস্কার জন্মাবধি আমাদের আসে পাশে বেড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর একটি একটি করিয়া ঐ সংস্কারগুলি খসাইয়া ফেলিবার পর মনটি শুদ্ধ হইলে তবে সিদ্ধকাম হইব, এ ভাবনাটা বড় আশাপ্রদ বলে বোধ করি না, বরং হৃৎকম্প হয়! আবার শুনি অনন্ত সৃষ্টি অনন্তকাল ধরে চলিয়াছে; তোমার আমার কথায় বা ইচ্ছায় একটি গাছের পাতাও পল, অনুপল না গুণে পড়্‌বে না। সমুদ্রের ঢেউ চিরকাল ধরে উঠিতেছে পড়িতেছে। তা বলিয়া আমিও ত নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছি না! এই যে ভাবিতেছি, ইহাও ত তাঁহারি ইচ্ছায়! পর্ব্বত প্রমাণ সংস্কারই থাকুক, আর অনন্ত কালই বহিয়া যাক "মা" তাহা বুঝিয়া লইবেন—"মা" থাক্‌তে ছেলের অত ভাবনার প্রয়োজন কিসের?

আচ্ছা তাঁহাকে "মা" বলিতেছি কেন? কি বলব? হয় প্রভু, না হয় পিতা, না হয় স্বামী, না হয় স্ত্রী, না হয় ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন, বন্ধু, না হয় শত্রু একটা যাহোক্ কিছু ত বলিতে হইবে। যাহাই বলি না কেন মনে মনে, জানিতেছি তিনিই সব—আর তিনি ছাড়া যাহাকিছু তাহাও তিনি। মা বলাটা সবচেয়ে সোজা, কেননা মা হতেই উৎপত্তি। আর যাহাকে চিনি বা জানি সে মারই দ্বারায়! অত কথায় দরকার কি, আর কেও আপনার থাক্ বা না থাক্ মার গর্ভ হইতে যখন হইয়াছি তখন আমি ত তাঁহারই। মা ছেলের জন্য যতটা করে অপর কেহ কি ততটা করিতে পারে? অবশ্য স্ত্রী, স্বামীর জন্য জীবন্ত পুড়িয়া মরিতে পারে, কিন্তু স্বামী যে স্ত্রীর সর্ব্বস্ব! তার নিজের সুখ দুঃখ স্বামীর সঙ্গে জড়িত। মা কি ছেলেকে সেরূপ ভালবাসে; মার স্বার্থের সম্ভাবনাটা কোথায়।

এমন কি পশু পক্ষীতে পর্য্যন্ত মাতৃ-স্নেহেরই সবচেয়ে বেশী বিকাশ দেখা যায়। মায়িক সংসারেই যখন এতটা তখন ভগবান্কে জগজ্জননী বলে ডাক্তে ইচ্ছা হবে তা আর আশ্চর্য্য কি?

এই "মা" দুই ভাবে বিরাজ করছেন দেখতে পাই। বিদ্যামায়া—স্নেহ, দয়া, শান্তিরূপিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা; আর অবিদ্যামায়া—মূর্ত্তিমতী পিশাচিনী। এই দুইভাবেই যে তিনি এক উপাস্য ভগবান্ তা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই কালী মূর্ত্তিতে তিনি এই দুই ভাবের পূর্ণ সমন্বয়-রূপা হয়ে রয়েছেন। তাঁর আরো এক ভাব আছে, তিনি সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণময়ী, ত্রিলোকেশ্বরী। তা তাঁর যত ভাবই হোক, আমরা তাঁহার স্নেহময় কোলের চির অধিকারী। মায়ের ভালবাসা চিরকাল সমভাবেই সন্তানে প্রবাহিত। কোন্ মা কবে ভাব বিচার করে ছেলেকে ভালবাসে? ছেলেই বা কবে মায়ের ভাব বেছে মাকে ভালবাসতে পারে। ছেলের কাছে "মা" চিরকালই "মা"। যে ভাবেই আসুন, যে মূর্ত্তিতেই আসুন ছেলের কাছে তিনি "মা"। তিনি তাঁর নিজের খুসিতে নানারূপে, নানাভঙ্গীতে বিরাজ করচেন—এই পর্য্যন্ত।

"মা" বল্লে মোটামুটি কি বুঝি। আমরা বুঝি, নিজের গর্ভধারিণী মা—তিনি যদি সত্য হন্ ত সেই জগজ্জননী আরও কত সত্য! নিজের গর্ভধারিণী মা যদি শক্তি, স্নেহ ও মমতায় অসীম হন, ত জগজ্জননী আরও কত বেশী অসীম!

এমন "মা" থাক্তেও যে আমরা মা কে ভুলে থাকি, এটা কি কম ভেল্কির খেলা। মা আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার নানারূপের মধ্যে তোমাকে "মা" বলে চিন্তে পারি—পাঁচ বছরের ছেলের মত তোমার কোলে স্থান পাই।

টলষ্টয়ের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

টলষ্টয়ের অনুমোদিত আদর্শ-জীবন সম্বন্ধে গত চৈত্রের উদ্বোধনে আলোচনা করা হইয়াছিল। তিনি বলেন, জীবন হইতে সকল প্রকার বিলাস ও কৃত্রিমতা বর্জ্জন করা উচিত। পৃথিবীর সকল মানবের দুঃখ, নিজের দুঃখের ন্যায় অনুভব করিয়া তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা উচিত। তাঁহার মতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের জীবন আদর্শ-জীবন হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছে,—সকলেই অর্থ এবং কল্পিত সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। এ সকল বিষয়ে বোধ হয় টলষ্টয়ের মত অধিকাংশ লোক অনুমোদন করিবেন। কিন্তু এই উপলক্ষে টলষ্টয় বলিয়াছেন, কখনও কোনও অবস্থায় কাহাকেও আঘাত বা বধ করা উচিত নয়, যুদ্ধ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান ঈশ্বরের নির্দেশ বিরুদ্ধ। এই বিষয়ে মত-ভেদ হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা; এ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা দেখা যাউক।

প্রথমেই দেখা যায়, কখনও যুদ্ধ করা উচিত নয়, অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া অন্যায়,—ইহা হিন্দুশাস্ত্রের প্রচারিত আদর্শ নহে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন হিন্দুর আদর্শ-জীবন। তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন—অন্যায়ের প্রতিবিধানার্থ বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় ধর্ম্মযুদ্ধ এবং অধর্ম্মযুদ্ধ এতদুভয়ের প্রভেদ হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, না করা পাপ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রামাণিক স্মৃতি-গ্রন্থে অপরাধীর দণ্ডবিধান বিহিত হইয়াছে।

অথচ অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশের যে মহত্ত্ব তাহাও সম্যক্‌ভাবে দেখান হইয়াছে। রামায়ণে দেখি হনুমান অশোকবনে সীতার নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত হইয়াছে এবং রাবণ নিহত হইয়াছে। অশোক-বনের রাক্ষসীদিগকে দেখিয়া হনুমানের ক্রোধ হইল, তিনি বলিলেন,

ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্ব্বাঃ যাভি স্ত্বং তর্জ্জিতা পুরা॥
ক্লিশ্যন্তীঃ পতিদেবাং ত্বাং অশোকবনিকাং গতাং।

* * *

ইহ দৃষ্টা ময়া দেবি রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ॥
অসকৃৎ পরুষৈর্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজ্ঞয়া।

"হে দেবি, এই রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় আপনাকে ভৎসনা করিয়াছে, আমি দেখিয়াছি। আপনি অনুমতি দিলে ইহাদিগকে বধ করিব ইহা আমার ইচ্ছা।" তখন দীনবৎসলা করুণাময়ী সীতা বলিলেন—

ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ।
ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্ব্বং স্বকৃতং হ্যুপভুজ্যতে॥

* * *

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্য্যং কারুণ্যমার্য্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥

"আমার যে এত দুঃখ হইল তাহা আমার পূর্ব্বকৃত জন্মের ফল। তাহার জন্য এই রাক্ষসীদিগের দণ্ড দিয়া কি হইবে? যতদূর অন্যায়-কারী হউক না কেন সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা উচিত।"

এখানে অন্যায়কারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত, এই নীতি প্রচারিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সীতাদেবী একটি পুরাণোক্ত কাহিনীর উল্লেখও করিয়াছিলেন। সে কাহিনী এইরূপ,—

কোনও ব্যাধ ব্যাঘ্রানুদ্রুত হইয়া আত্মরক্ষার্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক ছিল। ব্যাঘ্র ভল্লুককে বলিল,

"এই ব্যাধ আমাদের সকল বন্য জন্তুর শত্রু। উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" কিন্তু ভল্লুক রাজি হইল না, বলিল, তাহা হইলে ধর্ম্মহানি হইবে।" এই বলিয়া ভল্লুক নিদ্রা গেল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে বলিল, "ভল্লুক ঘুমাইয়াছে, উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া ব্যাধ ভল্লুককে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ভল্লুক কিন্তু মাটিতে পড়িল না, অপর শাখা ধরিয়া ফেলিল। তখন ব্যাঘ্র ভল্লুককে পুনরায় বলিল, "ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে উহাকে ফেলিয়া দাও।" কিন্তু তাহাতেও ভল্লুক রাজি হইল না। সে বলিল—

ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্ম্মণাং
সময়ো রক্ষিতব্যোহি সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ ॥
সময়ঃ=অপকর্ত্তৃন্ প্রত্যপকারবর্জ্জনরূপঃ আচারঃ।

অতএব হিন্দুশাস্ত্রে অপকারীর দণ্ডবিধান এবং ক্ষমা প্রদর্শন উভয়ই আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কোন্ স্থলে দণ্ডবিধান করা উচিত, কোন্ স্থলে ক্ষমা করা উচিত। আমার বোধ হয় ইহার উত্তর এই ভাবে দিতে হইবে। যেখানে ক্ষমা করিলে অপরাধীর মনে অনুতাপ হইবে এবং তাহার স্বভাবের উন্নতি হওয়া সম্ভব সেখানে ক্ষমাই প্রশস্ত। কিন্তু যেখানে ক্ষমা করিলে অপরাধীর স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না, সে অন্যায় অত্যাচার করিয়া জগতের পীড়ন করিতে থাকিবে সেখানে অপরাধীর দণ্ডবিধান করাই সমুচিত। হনুমানের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া যে রাক্ষসীগণ প্রাণভয়ে শঙ্কিতা হইতেছিল, তাহারা যখন দেখিল, সীতাদেবী হনুমানকে নিবৃত্ত করিতেছেন, তখন তাহাদের হৃদয়ে ঘোর অনুতাপ হইবারই কথা, এবং ভবিষ্যতে কোনও অসহায় স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে তাহাদের পরাঙ্মুখ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যদি রাবণের অন্যায়ের প্রতিবিধান না করিতেন তাহা হইলে রাবণের মনের কোনও পরিবর্ত্তন হইত না। সে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া জগৎ পীড়ন করিতে থাকিত। তাই রাবণের অন্যায়ের দণ্ডবিধান করাই সমুচিত হইয়াছিল। অতএব অপরাধীর দণ্ডবিধান

করা উচিত কি না তাহা স্থির করিতে হইলে, অপরাধীর স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব কি না তাহার বিচার করা প্রয়োজন এবং কিসে জগতের কল্যাণ হইবে তাহাও দেখিতে হইবে। আমাকে দুঃখ দিয়াছে বলিয়া উহাকে দণ্ড দিতে হইবে,—এই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি দমন করা উচিত। আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহার কারণ আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। আমি পূর্ব্বে পাপ না করিলে এ ব্যক্তি আমাকে দুঃখ দিতে পারিত না। পাপ যখন করিয়াছি তখন এ ব্যক্তি দুঃখ না দিলেও অন্যভাবে আমি দুঃখ পাইতাম—এ ব্যক্তি নিমিত্ত-মাত্র এইরূপ বিচার করা উচিত। তাহা হইলে মনে ক্রোধের উদয় হইবে না। শুধু দেখিতে হইবে কিসে জগতের কল্যাণ হয়, কিসে অনিষ্টকারী ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। এই ভাবে বিবেচনা করিয়া, যেখানে দণ্ড দেওয়া প্রয়োজন হইবে, সেখানেও নিজের ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমন করিয়া নিষ্কাম ভাবে, আমি ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি এইরূপ মনে করিয়া দণ্ড দিতে হইবে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মত বলিয়া বোধ হয়। ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

যুদ্ধ করিবার সময় (এবং সকল কর্ম্ম করিবার সময়) কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য করিতে হইবে। অহঙ্কার-জ্ঞানও যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হইবে।—"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী" "তিনি আমাকে যেরূপ করাইতেছেন, আমি সেইরূপ করিতেছি" এইরূপ মনে করিতে হইবে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

* * *

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বুঝিতেন, কোনও কর্ম্ম ন্যায় কি অন্যায় তাহা স্থির করিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মিথ্যা কথা বলা সাধারণতঃ অন্যায় হইলেও এমন অবস্থা হইতে পারে যখন মিথ্যা কথা বলা অন্যায় নহে। যেমন কোনও ব্যাধ এক মৃগের অনুসরণ করায় সেই মৃগ প্রাণভয়ে লুকাইল। ইহা যদি কেহ দেখিতে পায় এবং সেই ব্যাধ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "এই ধারে একটা মৃগ পলাইয়া আসিতেছিল, এইখানে কোথাও লুকাইয়াছে তুমি দেখিয়াছ কি?" তাহা হইলে মিথ্যা উত্তর দেওয়া অন্যায় হইবে না। কারণ অনেক সময় "আমি উত্তর দিব না" এরূপ বলাও চলে না, এরূপ বলিলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে সন্দেহ হইবে, এবং মৃগ কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা বাহির হইয়া পড়িতে পারে। মিথ্যা কথা বলা যেমন কোনও বিশেষ অবস্থায় দোষাবহ না হইতে পারে, সেইরূপ আঘাত করা বা হত্যা করাও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নির্দ্দোষ হইতে পারে। মনে কর এক দুর্ব্বৃত্ত কোনও অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে। তুমি হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িলে। সে দুর্ব্বৃত্ত হয়ত তোমাপেক্ষা এত বেশী বলবান যে তাহাকে ধরিয়া রাখা তোমার সাধ্যাতীত। কিন্তু তোমার হাতে অস্ত্র আছে; তখন তাহা দ্বারা তুমি দুর্ব্বৃত্তকে আঘাত করিয়া অক্ষম করিতে পার। তাহা করিলে তোমার কি অন্যায় হইবে? তুমি অবশ্য প্রথমে তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু সে যদি না শোনে তাহা হইলে আঘাত করা বা অবস্থা বিশেষে হত্যা করাও অন্যায় হইবে না।

কিন্তু যাঁহারা টলষ্টয়ের প্রচারিত আদর্শ গ্রহণ করেন তাঁহারা বলেন, এরূপ অবস্থাতেও আঘাত করা উচিত হইবে না, এবং আঘাত না করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—তুমি যদি অত্যাচারী ব্যক্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাত কর তাহা হইলে তাহার

ক্রোধ বর্দ্ধিত হইবে। এখন তাহার শরীরের বল যদি তোমার অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে সে তোমাকে পরাস্ত করিয়া তাহার অভীষ্ট অন্যায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তুমি যদি অত্যাচারীকে আঘাত না কর, যদি অত্যাচারী ব্যক্তি এবং যাহার উপর অত্যাচার হইবে উভয়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াও এবং নির্ব্বিরোধে ক্রুদ্ধ অত্যাচারী ব্যক্তির সকল আঘাত সহ্য কর তাহা হইলে ক্রোধ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহার মনে কর্ত্তব্যবুদ্ধিও জাগিবে এবং সে অন্যায় হইতে বিরত হইবে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অনেকস্থলে এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে, এবং সে স্থলে আততায়ীকে আঘাত না করাও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থাও হইতে পারে, যেখানে বহুকাল ক্রূরকর্ম্ম করিয়া আততায়ীর স্বভাব অত্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়াছে, ন্যায় এবং কর্ত্তব্যের ধারণা সহজে তাহার মনে উদয় হয় না, সেখানে তাহাকে আঘাত করা অন্যায় হইবে না। সব ক্ষেত্রেই যে আঘাত করা উচিত তাহা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে। কোন স্থলে আঘাত করা উচিত কোনস্থলে উপদেশ দিয়া এবং প্রয়োজন হইলে নিজে আঘাত সহ্য করিয়া নিরস্ত করা উচিত, তাহা আততায়ীর চরিত্র দেখিয়া স্থির করিতে হইবে।

টলষ্টয় তাঁহার আদর্শ সমর্থন করিবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যীশুর উক্তি সম্বন্ধে বিচার। সে সকল কথা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। আমাদের বিশ্বাস যীশু বাস্তবিকই 'কখনও বলপ্রয়োগ করিবে না' এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদনুসারেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু টলষ্টয় একটী যুক্তি দিয়াছেন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, যে বল প্রয়োগ করে সে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে। কাহাকে দণ্ড দিতে হইবে বা না হইবে, তাহা ঈশ্বরের কাজ। তুমি যদি কোনও অন্যায়কারীকে দণ্ড দাও তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, আমার হাত দিয়া দণ্ড দেওয়া যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়,

তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে। দণ্ড দেওয়া তাঁহার কার্য্য বটে কিন্তু তিনি ত আমাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। এ অবস্থায় কিরূপ মনের ভাব হইতে পারে তাহা বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। রোহিণীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে নিশাকর প্রসাদপুর' গিয়াছে। নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রার সোপানাবলীত উপর বসিয়া সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে :—

"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়! রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয়, সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপপুণ্যের যিনি দণ্ডপুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই এ কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'।"

আর একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "কাহাকেও পীড়া দিব না" এই নীতির অনুসরণ করিলে সমস্ত জীব জগতে পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার করা উচিত, কারণ তাহাদেরও সুখদুঃখের অনুভূতি আছে। নীতি অনুসারে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকেও আঘাত করা অন্যায় হইবে। ব্যাধির চিকিৎসা করাও যুক্তি-সিদ্ধ হইবে না। কারণ শারীরিক ব্যাধি আরাম করিতে অনেক সময় লক্ষ লক্ষ জীবাণুর বিনাশ সাধন করিতে হয়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অন্তরায়।

(শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত)

অনেকে গিরিশচন্দ্রকে মহাকবি বলিলেও সমগ্র শিক্ষিতবাঙ্গালী-সমাজ কিন্তু এখনও গিরিশচন্দ্রকে মহাকবিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ, গিরিশচন্দ্রের রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালী এখনও সম্যক্ ধরিতে পারে নাই। উহার কতকগুলি হেতুও আছে! তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষিত-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই মোটের উপর পাশ্চাত্য ভাবাভিভূত ; কেহ বেশী কেহ কম। একদল আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্যক আয়ত্ত করিয়া ভারতকে আধুনিক জাতি-সমবায়ের সমাজে উঠাইতে চান। ভারতের অতীত তাঁহাদের কাছে হয় তমসাবৃত, নয় ত আধুনিক সময়ের সম্যক্ অনুপযোগী বলিয়া একেবারে পরিহার্য্য। আর একদল আছেন যাঁহারা অতদূর যাইতে নারাজ ; তাঁহারা ব্যাপার-বিশেষে ভারতীয় জীবনযাত্রার পদ্ধতি সংরক্ষণে ইচ্ছুক। কিন্তু যে সাধনা এই জীবনযাত্রার মূলে বিদ্যমান, তাহা ধরিতে না পারিয়া পাশ্চাত্যভাবের আলোকসম্পাতে ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের চিত্র পরিস্ফুট করিতে চান। যাহার গুণে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে অমর, সেই অধ্যাত্মবাদমূল সমাজগঠন যে ভারতের সনাতন বিশিষ্টতা তাহা তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই বা মানিতে চান না। কাজেই ব্যক্তি-গত ও জাতিগত জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গৌরব কতখানি তাহা উভয় দলের কাহারও যথোচিত পরিমাণে উপলব্ধি করা হয় নাই, এবং এইজন্যই এই তত্ত্বানুশীলনে তাঁহারা বিমুখ। অনুশীলনের অভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। অথচ আধ্যাত্মিক ভাবসম্বলিত নাটকেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষিত-সমাজের যে এইরূপ অবস্থা ইহাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায়।

নাটকে সন্নিবেশিত ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ রক্ষা করা, এবং নাটকে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মানসিক ভাবগুলির উৎপত্তি, পুষ্টি, খেলা ও পরিণাম সুকৌশলে প্রদর্শন করা প্রভৃতি যে সব ব্যাপারে নাটককারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, গিরিশচন্দ্রের সেই কৃতিত্ব তাঁহার ধর্ম্মমূলক নাটকসমূহেই অধিকতর পরিস্ফুট। কোন্ কোন্ অবস্থায় মানুষের প্রাণে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে—কোন্ কোন্ অবস্থায় কিরূপে তাহা পরিস্ফুট হয়, পূর্ব্ব-সংস্কার আসিয়া কিরূপে নবোন্মেষিত ভাবকে সঙ্কুচিত বা প্রস্ফুটিত করে, আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবর্ত্তক তখন কোন্ আশ্রয় ধরিয়া ইষ্টলাভে সমর্থ হয়—বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিচার, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই ভাবের কোন অবস্থায় কতটুকু অনুকূল বা প্রতিকূল—মনোজগতের এই সব তত্ত্ব-প্রদর্শনে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নাটকের ইতিহাসে, মানবমনের এই গভীর রহস্যের আলোচনা, এইরূপ নানাভাবে ও বিবিধ আলোকসম্পাতে আর কোনও কবি করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব মনস্তত্ত্বের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিভাগে নিযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গালী তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের বিচার করিবার সুযোগ পাইল না। কারণ, বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এই উক্তির অনুশীলনে ও ইহার ফলাফল আলোচনায় বাঙ্গালীর সহানুভূতি নাই। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে এই অনাস্থাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে দুরতিক্রমণীয় অন্তরায়।

"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" মহাকবির একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্ব্বকালের শিক্ষক। এই শিক্ষা দ্বিবিধ। মনোবিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলি কবি তাহার সৃষ্ট চরিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া দেন। আবার প্রবৃত্তির খেলায় নায়ক-নায়িকাদের উত্থান, পতন ও বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান এবং উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুভাশুভ ফলসাধন প্রভৃতি অনুধাবন করিয়া সব দেশের সব সময়ের লোক কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সমসাময়িক ব্যাপারে ও নিজের জীবনে সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে পারেন। এবম্বিধ

শিক্ষা সার্ব্বভৌম শিক্ষা। এ শিক্ষা জগতের সকল লোকজগতের মহাকবিগণের নিকট হইতেই পাইতে পারে। এই সার্ব্বভৌম শিক্ষা ছাড়াও মহাকবি অন্যবিধ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তাহার নাম জাতীয় শিক্ষা, জাতির জাতীয়ত্ব যেখানে সেখানে আঘাত করিয়া কবি সর্ব্বকালে জাতির আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া থাকেন। সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে একদিকে যেমন জগতের সকল লোকই একটা সার্ব্বজনীন শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি আবার ঐ নাটকাবলী ইংরাজ জাতির জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করে। ইংরাজের উগ্র দেশাত্ম বোধ, স্বাধীনতা প্রিয়তা ও সংরক্ষণশীলতা এবং তাহার কর্ম্মকুশলতা ও প্রখর কাণ্ডজ্ঞান—এক কথায় সমগ্র ইংরাজজাতির প্রাণপ্রবাহই সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে প্রতিফলিত। রামায়ণ ও মহাভারতে এমন সব আদর্শ চিত্রিত আছে যাহা সকল দেশের সকলযুগের ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয়। আবার উহাতে ভারতের হৃদ্স্পন্দন ধ্বনিত বলিয়া, ভারতীয় জীবন-যন্ত্রের প্রধানসুরটি ঐ গ্রন্থদ্বয়ে বাজিতেছে সেইজন্য মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাস ভারতের সর্ব্বকালেই জাতীয়তার শিক্ষক।

গিরিশচন্দ্রের যথোচিত প্রতিভার পরিচয় পাইতে হইলে বুঝিতে হইবে গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই দ্বিবিধ শিক্ষা—সার্ব্বভৌম ও জাতীয়—কি পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে সকল সার্ব্বজনীন শিক্ষা পাওয়া যায় তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই প্রধান ও অনন্যসাধারণ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জগৎ আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারপূর্ব্বক আধ্যাত্মিকতা লাভের চেষ্টা না করিতেছে, ততদিন গিরিশচন্দ্রের কাব্য হইতে এই শিক্ষা লাভের অবসর কোথায়?

তাহার পর জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের সহিত আধুনিক বাঙ্গালীর যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান। আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কি তৎসম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করেন তাহাদিগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল বলেন, nationality

বলিতে যাহা বুঝায় ভারতে তাহা কখনও ছিল না। এখন তাহা গড়িয়া লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে ঐ জাতীয়তার ভাবটি আমদানী করা হইয়াছে সেই দেশেরই অনুকরণে পাশ্চাত্য রাজনীতিকে ভিত্তি করিয়া আমরা আমাদের জাতীয়তা গড়িয়া তুলিব। অপরদল বলেন, 'জাতীয়তার অর্থ ব্যাপকভাবে ধরিলে বলা যায়, ভারতবর্ষে জাতীয়তা ছিল অর্থাৎ বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া ভারতীয় জননেতাগণ ভারতবাসীর কর্ম্ম ও চিন্তা সুব্যবস্থিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই যুগে যে নূতন ভারতীয় জাতি সংগঠনের কথা হইতেছে তাহার মূলেও সেই সনাতন উদ্দেশ্য ও প্রণালী থাকা উচিত। আধ্যাত্মিক সাধনাই ভারতের মুখ্য জাতীয় সাধনা—অন্যান্য ব্যাপার তাহাতে আনুষঙ্গিক ও পরিপোষক—এই কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া এই সনাতন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি বাঙ্গালীদের অধিকাংশই প্রথমদল-ভুক্ত। অপরদলে লোকসংখ্যা কম বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সূক্ষ্মদর্শী মনস্বী এই দলের অগ্রণী পুরুষ গিরিশচন্দ্র এই দলভুক্ত। তাই তিনি ধর্ম্মমূলক নাটকাদিকে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিক্ষার উপায় মনে করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বলেন—"ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। * * * যেরূপ বীরচরিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোক-ধর্ম্মসম্মানকারী নায়ক হিন্দুহৃদয়ে স্থান পাইবে। * * * এই দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। * * * এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।" (১) অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত গিরিশচন্দ্রের এই মতানৈক্য থাকায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বুঝিতে বাঙ্গালীর বিলম্ব হইতেছে।

গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে আর এক অন্তরায় তাঁহার জীবনের

(১) ১৩১৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যার নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত "নাট্যকার" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

বৈচিত্র্য। যে বৈচিত্র্য তাঁহার জীবনকে, কাহারও কাহারও মতে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে সে বৈচিত্র্যই কাহারও কাহারও নিকট গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়।

আধুনিক শিক্ষার একটা লক্ষণ এই যে, তাহা সকল লোককে একই যন্ত্রে ফেলিয়া এক ঘেয়ে করিয়া ফেলিতেছে। আদর্শের হিসাবে উদারতা ও সার্ব্বভৌমতার যতই বড়াই করুক না কেন আধুনিক শিক্ষা ঐক্য সাধন করিতে যাইয়া একাকারত্বের দাবী করিয়া বসে। লোক ধর্ম্মাচরণে এক পথাবলম্বী, ধর্ম্মমতে এক সম্প্রদায়ভুক্ত ও সামাজিক আচারব্যবহারে একাকার হউক; আহারে বিহারে শিক্ষায় দীক্ষায় ও সাধনায় মানুষ একাকার হইয়া একটি মাত্র বিশ্ব-মানব-সমাজে পরিণত হউক—ইহাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে মৌলিক একত্বের উপলব্ধিরূপ বৈদান্তিক সত্য আধুনিকতা এখনও একান্তভাবে ধরিতে পারে নাই। তাই আধুনিকতা-প্রিয় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের এক অঙ্গ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। তাহারই ফলে তাহাদের অননুমোদিত আচার ব্যবহার কর্ম্মপ্রণালী বা সাধনার পক্ষপাতী লোকের উপর তাহাদের স্বভাবতঃই এমন এক বিরাগ আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহার ভিতর কি আছে না আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয় না। বৈচিত্র্যময় গিরিশ-জীবনের এমন মনের স্তর আছে যেখানে তাহাদের সহানুভূতির কোমল-রেখাপাত হয় না। তাই তাহারা বিরাগভরে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত যাহা কিছু তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনিচ্ছুক। কাজেই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অবসরও তাহাদের হয় না।

আবার আধুনিক শিক্ষার বিলাসিতা ও দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা, এই দুইয়ের সংঘর্ষে শিক্ষিতসমাজের অপর এক অংশের বিচার বুদ্ধির প্রখরতা, মানসিক বল ও শ্রদ্ধা এতই কমিয়া আসিয়াছে যে যেখানেই জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখে সেখান হইতেই তাহারা পশ্চাৎপদ ফিরিয়া আসে। যে সবল বুদ্ধিবৃত্তি, যে তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা, যে শ্রদ্ধার ভাব, কবির তত্ত্বানুশীলনে জটিল রহস্যোৎঘাটনে লোককে সমর্থ করে বাঙ্গালী সমাজের একাঙ্গে সে বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশীলতা ও শ্রদ্ধা পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। তাই গিরিশ-জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইতে তাহাদের উদ্যম হয় না। কাজেই অন্যান্য লোক গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য কারণে যে উপেক্ষার ভাব অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা নির্ব্বিচারে সেই উপেক্ষাকেই অবলম্বন করে।

গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার আর একটি অন্তরায় আছে। সমাজের মতামত উপেক্ষা করিয়া তিনি যে সর্ব্বদাই "অনাবৃত ভাবে" সংসারে বিচরণ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজ (অন্ততঃ তাহার এক বিশিষ্ট অংশ) তাঁহাকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। এই অবজ্ঞাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে অপর বাধা। গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা যাঁহাদের নিকট পরিচিত তাঁহারা জানেন "সংসার ও গিরিশবাবুর মধ্যে অনেক কাল দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল। সংসারে মনে একপ্রকার, মুখে অন্যপ্রকার, ভাবরাশি লইয়া নিজ কাটাছাঁটা কেতাদুরস্ত রীতিপদ্ধতি সম্মুখে ধরিয়া, নিন্দাস্তুতিরূপ অস্ত্রধারণ করিয়া ঈর্ষাকষায়িত নয়নে প্রতিনিয়ত তাঁহাকে অন্য সাধারণের সহিত একপথে যাইতে আহ্বান ও ভয়প্রদর্শন করিতেছিল; মনও স্বীয়গতি প্রতিরোধে অসহিষ্ণু হইয়া, সকল ভয় প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সংসারেরই চাতুরীতে তাহাকে অধিকতর চতুর হইতে হইয়াছে বলিয়া উহারই দোষ দেখাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অন্য পথে চলিয়াছিলেন।" * এ অবস্থায় ইহা আশা করা যাইতে পারে না যে সমাজ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে। গিরিশচন্দ্র যে অবজ্ঞা সমাজকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তাহাই ঘৃণার আকার ধারণ করিয়া সমাজের দিক হইতে গিরিশচন্দ্রের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইল। এদিকে তদীয় গুরুদেবের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার বিকাসে তাঁহার বন্ধুবর্গ যতই চমৎকৃত ও উল্লসিত হইতে লাগিলেন সমাজস্থ শত্রুপক্ষের ঘৃণা ততই বাড়িতে লাগিল। বিদ্রোহী নগণ্য হইলে অবজ্ঞা ক্রমে উপেক্ষায় পরিণত হয়। কিন্তু যদি সে মনীষা-সম্পন্ন ও প্রতিভাশালী হয়, তাহাহইলে অবজ্ঞা ঘৃণায় ঘণীভূত হইয়া লোককে নির্য্যাতন-প্রয়াসী ও নিন্দাপরায়ণ করিয়া তোলে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সমাজ যখন দেখিল যে বিদ্রোহী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তখন সে ঘৃণা ও নিন্দার আবরণে তাহার প্রতিভা-রশ্মিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টাপর হইল। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ এখনও চলিতেছে। তাঁহার অদ্ভুত জীবনের উপর শিক্ষিত সমাজের এক প্রধান অঙ্গের যথোচিত সহানুভূতি নাই—কাজেই তাহার কাব্যের গুণ বিচারে প্রবৃত্তি নাই। এই জন্যও সমাজ গিরিশচন্দ্রকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

* ১৩১৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যার উ
প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

নিভৃত-চিন্তা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,

"অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজেয়াপ্ত হবে জান না।"

অর্থাৎ আজই হউক বা একশত বর্ষ পরেই হউক, আমাদের এই শরীর থাকিবে না। যদিও আজকাল আর একশত বর্ষ বাঁচিতে বড় একটা দেখা যায় না—ইহার মধ্যেই মানবের লীলাখেলা ফুরাইয়া যায়।

বাস্তবিক এই মৃত্যুর মত কঠোর সত্য জগতে আর কিছু দেখা যায় না। অথচ ইহাকে আমরা যতটা ভুলিয়া থাকি, আর কিছুই তত ভুলিয়া থাকি না। সেই জন্য প্রাচীনকালে রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়াছিলেন—

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥'

প্রাণিগণ প্রত্যহই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে—অথচ যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহারা মনে করিতেছে, আমরা চিরকাল বাঁচিব—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? একদিন আমাকে মরিতেই হইবে। মরিলে আমার কি অবস্থা হইবে? আমার কি একেবারে লোপ হইবে, না, আমি তখনও থাকিব? যদি থাকি, কি অবস্থায়ই বা থাকিব?

কঠোপনিষদে গল্প আছে, নচিকেতা নামে একটী ঋষিবালক স্বয়ং মৃত্যুর অধিপতি যমকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

বাস্তবিক আমাদের এই কর্ম্মে উন্মত্তবৎ ব্যস্ততার ভিতর অনেক সময় ভুলিয়া গেলেও একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেই এই প্রশ্নই ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের মনে উদয় হয় আমি মরিলে কি হইবে?

অনেকে প্রশ্নটীকে চাপা দিতে চেষ্টা করেন। যাহা জানিতে পারা যায় না, তাহা লইয়া অনর্থক মাথা ঘামাইয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া কি হইবে? উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া যাও।

কিন্তু কি করিব? ঘুরিয়া ফিরিয়া যে প্রশ্ন উঠে! আবার প্রশ্ন উঠে, কর্ত্তব্য কি? কি কর্ম্ম করিব?

যমরাজও নচিকেতার প্রশ্নটী চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে পূর্ব্বকালে দেবতারাও সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন—এ বিষয় সহজে জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু সহজে জানা যায় না বলিয়া ত আমরা উহাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতে পারি না। না জানিলে যে উপায় নাই। উহা না জানিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিরূপে নিরূপিত হইবে? মৃত্যু হইলেই যদি সব শেষ হয়, তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি দাঁড়ায়?

যদি কাহারও নিশ্চিত জ্ঞান হইত যে, মৃত্যু হইলে সব শেষ হয়, তবে সে যদি ইহ জীবনে খুব দুঃখে কষ্টে থাকে, তবে আত্মহত্যাই তাহার পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য—কারণ, তাহাতেই সকল যন্ত্রণার অবসান। আর যদি সে নানারূপ সুখে পরিবেষ্টিত থাকে, তবে তাহার কর্ত্তব্য কি দাঁড়ায়?—চার্ব্বাকের মত

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥'

এই ভাবিয়াই কি সে সুখে ডুবিয়া থাকিতে পারে? আমার ত বোধ হয় তাহা পারে না। মানুষ নাস্তিক্যভাব অবলম্বন করিয়া নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মন ভুলে কই? নতুবা যখন যমরাজ নচিকেতাকে সমুদয় ভোগ্যবস্তু বররূপে দিতে চাহিলেন, নচিকেতার মনে কেন সেগুলি লাগিল না? ভোগ না হয় করিলাম, কিন্তু তাহাতে হইল কি?—ভোগ্যবস্তুসমূহ এই দেখিতেছি, এই

নাই—আবার ভোগকালেই ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—তবে দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও আমার স্বরূপজ্ঞানই কি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় নয়?

আমাদের সম্মুখে দুটী পথ রহিয়াছে—একটী আপাতমনোরম—ঐ পথে উপস্থিত যথেষ্ট সুখ কিন্তু উহাতে শান্তি নাই—নিরুদ্বিগ্নভাবে ঐ সুখ ভোগ করা চলে না—সর্ব্বদাই আশঙ্কা—কখন এ সুখ চলিয়া যাইবে। আবার ঐ সুখ-ভোগের দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে জীবনের মহত্তম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। মন ধ্যানস্থ হয় না—চিন্তা-শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। ভোগসুখাসক্ত না হইয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিতে করিতে তবে যদি এই জন্মমৃত্যু মহারহস্য একটু বোধগম্য হয়—তবে যদি অন্ধকারে একটু আলো পাওয়া যায়।

আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত জ্ঞানের আর উপায় কি? তবে বিষয় কামনায় যখন এই আত্মপ্রত্যয় মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মত থাকে, ততক্ষণ তাহা দ্বারা কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু যখনই একটু স্থিরমনে নিজ-স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখনই কি মনে হয় না, আমি দেহ নহি—দেহের সঙ্গে আমার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে এবং দেহের মৃত্যুর সঙ্গে আমারও বিনাশ হইবে, তাহাও নহে। আমার সহিত দেহের সম্বন্ধ একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব—এই কার্য্যকারণ চক্রের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—

> 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
> নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥'

আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি অবিকার, আমি কর্ত্তাও নহি, সুতরাং কর্ম্মের সুখদুঃখ পাপপুণ্যাদির ফলভোক্তাও নহি। তবে কেন বোধ করিতেছি, আমি কর্ত্তা—তবে কেন বোধ হইতেছে—আমি বিকারী? এই বোধ উপাধিযোগে হইতেছে। শুধু স্থূলদেহ নহে, মনও আমার

একটী উপাধি। সেই মনের সহিত মিশিয়া মনের চাঞ্চল্যের জন্য নিজেকে চঞ্চল এবং বিকারী ও মনের অহংভাবজন্য অভিমানে আপনাকে কর্ত্তা ভাবিতেছি। কিন্তু স্থির হইয়া ভাবিলে দেখি, আমি ত কর্ত্তা নহি। সুতরাং কর্ম্মের ফলভোগ মনের হউক, আমার সহিত ঐ ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরকাদির কোন সংশ্রব নাই। আমি আনন্দস্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।

তবে আর কেন মিছা কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বভ্রমে ভুলিয়া থাকি? নিত্য-ধ্যান আমার স্বরূপ—নিজ স্বরূপ বুঝিয়া আমাকে শান্ত হইতে হইবে। সমুদয় উপাধি এক এক করিয়া ছাড়িতে হইবে—নিরুপাধি, নিরাময়, নিশ্চিন্ত, শান্ত, পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে।

কিন্তু এত দিনের উপাধিসংসর্গে যে সং সাজা হইয়াছে, তাহাকে কি চট্ করিয়া ভুলা যায়? তাই বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া সংস্কার আসিয়া চাপিয়া ধরে। সেই সংস্কারকে ক্রমে ভুলিতে হইবে। যে সত্যকে আত্মপ্রত্যয়ে সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তাহার সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য ত ঐ কথাই বলে—বার বার উহা শুন—মনে মনে বার বার ঐ এক কথারই আন্দোলন কর—তার পর উহার অহরহঃই ধ্যান করিতে থাক—তবেই উহার সাক্ষাৎকার হইবে, উহাকে দেখিতে পাইবে, উহার উপলব্ধি হইবে, উহার দর্শন হইবে।

বার বার ওঙ্কার মন্ত্র জপ করিয়া, উহার দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া মনকে শান্ত কর, আর সেই শান্তমনে আত্মদর্শন কর। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ, কেবল বাহিরের কাম্যবিষয়ে ছুটিতেছে। দৃষ্টি প্রত্যাহৃত কর—চক্ষুর্দ্বয়কে অন্তর্ম্মুখী কর, কর্ণে বহির্বিষয় শুনিও না। অমৃতত্ব লাভের যদি আশা কর, তবে ধ্যানস্থ হও, দেহ ইন্দ্রিয় মন মর্ত্ত্য—উহাদের দ্বারা মৃত্যুর পারের সেই অমৃতকে পাইবে না। উহাদিগকে বশ করিতে হইবে—তবেই সেই অমৃত, আনন্দস্বরূপ তোমার বিস্ময়দৃষ্টির সমক্ষে প্রকাশিত হইবেন। উঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের নিকট যাইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর—এই পথ ক্ষুরধারের ন্যায়

দুর্গম। কিন্তু নিরুৎসাহ হইও না। আমরা চেষ্টা করিলে এই সূক্ষ্ম-পথও পাইতে পারি, আবার ভোগের প্রশস্ত পথও আমাদের সম্মুখে খোলা আছে। এই আত্মতত্ত্ব—এই যোগ শ্রবণে সকলেরই অধিকার। বিষয়ে ভুলিয়া এই অধিকার ত্যাগ করিও না শ্রবণ কর—জানিও অনেকে ইহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না। আবার শুনিয়া ধারণার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি উহা দ্বারা জীবনের পরিবর্তন সাধিত না হইল, তবে আর কি হইল—উহাকে বুঝিবার চেষ্টা, জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় উহার জ্ঞান হয় না। শব্দজনিত জ্ঞানে অনেক সময় ভাবের দিকে লক্ষ্য থাকে না—'ডুকৃঞ্‌ করণে' করিতে করিতেই সারা জীবন গেল, কবে আর ভাব আয়ত্ত হইবে? ভাবের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, নিজেকে নিজে জাগরিত করিয়া ঐ আত্মতত্ত্বকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। প্রাণ ব্যাকুল হইলেই এই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়—ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদি যাহারা আত্মতত্ত্বের দ্বার রোধ করিয়া রহিয়াছে, তাহারা শান্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়, তখন তিনি নিজ মহিমায় প্রকাশিত হন।

এই মনের দ্বারাই আত্মতত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে—এই মনই শুদ্ধ ও একাগ্র হইলে আত্মতত্ত্বোপলব্ধির সহায়ক হয়।

শুদ্ধ ও একাগ্র মন সহায়ে নিত্যানিত্য বিচার করিতে হইবে। জগতে আমরা দেখিতেছি নানা বস্তু—বিভিন্ন বস্তু আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিতেছে। যতক্ষণ এই প্রয়োজন বোধ বা কামনা, ততক্ষণ বহু বস্তুতে আমাদের মন আবদ্ধ থাকে। কিন্তু কামনা যত কমিয়া আসে, তত আর বহুতে প্রয়োজন থাকে না, ততই বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানের দিকে মন ধাবিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান কি না, স্বরূপ জ্ঞান। আমরা যে সকল বস্তু দেখি, সেগুলির উপাদান বিচার না করিয়া তাহাদের বিভিন্ন নামরূপের দিকেই আকৃষ্ট থাকি—আমরা জালা, খুরি, ভাঁড়, কলসী প্রভৃতি নামে ও ঐ ঐ প্রকার বিভিন্ন রূপে আকৃষ্ট, কিন্তু উহাদের সকলের উপাদানই যে এক মাটি,

সে দিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। যিনি সদাসর্ব্বদা বিচার করেন, তাঁহার দৃষ্টি নামরূপ হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া যাহার নাম, যাহার রূপ সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়, কাজেই তাহার কর্ম্ম কমিতে থাকে।

'—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥'

বাস্তবিক নানা বস্তু নাই—যে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুগ্রস্ত হয়।

অনিত্যে আসক্তিই মৃত্যু। কারণ, অনিত্য যাহা তাহা মৃত্যুর রাজ্যের। মৃত্যু অর্থ কি? মৃত্যু অর্থ বিকার—এই একরূপ দেখিতেছি—আবার আর একরূপ হইল। মাটির তালটার মৃত্যু হইল—উহা মরিয়া একটা হাঁড়ি হইল—আবার হাঁড়ি মরিয়া কতকগুলি চূর্ণ হইল। এইরূপ বিকার, এইরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তন ক্রমাগত চলিতেছে। সত্য বস্তু কি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই ব্যাপারকেই শাস্ত্রে ষড়্ভাব-বিকার নামে নির্দ্দেশ করে—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি। জন্মাইতেছে, খানিকক্ষণ থাকিতেছে, বাড়িতেছে, পরিবর্ত্তন হইতেছে, ক্ষয় হইতেছে, নষ্ট হইতেছে। মানুষ জন্মাইল, বাড়িল, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ হইল, মরিল। এইরূপ চলিতেছে। ইহার মধ্যে নিত্য কি? কে জন্মাইতেছে, কে বাড়িতেছে, কে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, কে নষ্ট হইতেছে? আমাদের জ্ঞান এই পরিণামীর মধ্যে অপরিণামীকে ধরিতে যায়—অপরিণামী একটা সত্তা আছে, ইহা বিশ্বাস না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু উহাকে ধরিতেও পারে না। উহাকে ধরা যায় না। ইন্দ্রিয়, মন—ইহারাও পরিণামী—ইহাদের দ্বারা সেই অপরিণামীকে ধরা যাইবে কিরূপে? এইরূপ জগতের সঙ্গে আমাদের সদাসর্ব্বদা লুকোচুরি খেলা হইতেছে—আমরা আমাকেও জানিতে পারিতেছি না—জগৎকেও নহে।

দুইরূপে জানিবার চেষ্টা হইতে পারে—এক নিজেকে দেহ

বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার মধ্যে আত্মা আছেন কি না জানিবার চেষ্টা করা, আর এক—নিজ অস্তিত্বের উপর নিজে দাঁড়াইয়া—এই অহং-প্রত্যয়গম্য আত্মাতে—আমাতে বিশ্বাসী হইয়া। আমি পিতামাতা হইতে হইয়াছি—আমি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, আমি বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী এ এক রকমের জ্ঞান—আর আমি আমিই, আমি স্বয়ংসিদ্ধ—আমি আছি—এই জ্ঞানই আমার অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ—শুধু বর্ত্তমান অস্তিত্বের নহে—ভূত ও ভাবী অস্তিত্বেরও প্রমাণ। দেহ কি কখন ভাবিতে পারে, আমি কোন কালে ছিলাম না বা থাকিব না? মন একটু স্থির হইলে—চিত্ত একটু নির্ম্মল হইলে এই জ্ঞানই ক্রমে নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত হয়। আমার নানারূপ উপাধি দেখিতেছি—মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, দেহের বৃত্তি—ইত্যাদি নানাবিধ মিশ্রিত বৃত্তির সহিত আমি নিজেকে মিশাইয়া নানারূপ সুখদুঃখ বোধ করিতেছি। আমাকে এই সকল উপাধি হইতে মুক্ত করি - আমি আমি আমি এই যে ধারা আমার জ্ঞানে অবিরত উঠিতেছে, উহাকে বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া জানি। এই পৃথক্ করণের নামই বিবেক—ইহাই সাধনা—

মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ—

তৃণ হইতে তাহার ডাঁটাটী যেমন পৃথক্ করে—আমিও তদ্রূপ আমাকে দেহ ইন্দ্রিয় মন হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করি।

চেষ্টা, চেষ্টা—সাধনা, সাধনা। যত অধিক চেষ্টা হইবে, ততই অধিক সুখী হইব—আমি যে স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, আমি যে স্বয়ং সুখ-স্বরূপ, আমি যে নিত্যস্বরূপ, আমি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমাতে জন্ম মৃত্যু কোথায়? আমার আবার পিতামাতা কে? দিবারাত্র এই বিচার চলুক—দিবারাত্র এই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন চলুক—কেমন না সাক্ষাৎকার হয়।

ওঁ—ওঁ—এই প্রণবধ্বনি অহরহঃ করিতে থাক। মন স্থির হইয়া আসিবে—মন স্থির হইয়া আসিলেই তাহাতে একটী স্বসংবেদ্য অনুভূতি প্রতিভাত হইবে। উহা রহিয়াছেই—আমরা উহাকে

দেখিতেছি না বলিয়া যেন উহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এই ছাই গাদা সরাইয়া আত্মতত্ত্বরূপ রত্নের উদ্ধার সাধন কর।

যমনিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হও—ব্রহ্মচর্য্যই পরম তপস্যা। তুমি শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ—স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। কেন নিজেকে দেহ উপাধির সহিত মিশাইয়া আপনাকে পুরুষ স্ত্রী আদি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছ? তুমি পুরুষ বা স্ত্রী নহ—অতএব তোমার আবার স্ত্রী বা স্বামী কিরূপে থাকিতে পারে? নিজের শুদ্ধস্বরূপের অহরহঃ চিন্তা কর—ব্রহ্মচর্য্য তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রত্যহ খানিকক্ষণ অন্ততঃ স্থিরভাবে বসিয়া নিজস্বরূপে সমাহিত হও—দেখিবে জীবনে কি গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে। তোমার কাঁচা আমি গিয়া—পাকা আমি আসিবে।

ত্যাগ, ত্যাগ—ত্যাগের দ্বারাই ক্রমে উপাধিশূন্য হইবে। উপাধি জড়াইও না—অষ্টপাশে নিজেকে জড়াইও না—বন্ধন ছিন্ন কর। তুমি সিংহ—কেন তুমি নিজের রচিত জালে নিজেকে বাঁধিয়াছ?

নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী—জগজ্জালরূপ পিঞ্জর হইতে বাহিরে এস—পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল। আর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার একমাত্র উপায়—নিজ বলে বিশ্বাসী হওয়া---জানা যে, পিঞ্জর হইতে আমার শক্তি বড়—কোন পিঞ্জর আমাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। শত শত বন্ধন আসুক—শত শত পিঞ্জর আমাকে তাহার ভিতর পুরিতে চেষ্টা করুক—কেহই আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।

আকাশ কি কখনও ঘটে আবদ্ধ হয়? তবে আমি কেন দেহে বদ্ধ হইব? তবে কেন আমি জন্মমৃত্যু শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব? তবে কেন আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইব? আমি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দ স্বভাব—শত শত বিষয় মিলিয়া আমার আনন্দ এক কণা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না।

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্।

অতএব আমার চাহিবারও কিছু নাই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

মোট কথা, আমাদিগকে ইন্দ্রিয় মন সংযত করিতে হইবে, তবেই আমি যে কি বস্তু, তাহা আমি জানিতে পারিব। নতুবা যদি ইন্দ্রিয় মন ক্রমাগত বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, তবে ক্রমাগত অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের জন্য আত্মার মহিমা দর্শনে আমি বঞ্চিত হইব।

ভোগপ্রবৃত্তি ও সংযম বা বৈরাগ্য—এই দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন—ভোগের দিকে যত অধিক আমরা ধাবিত হইব, ততই ত্যাগ-প্রবৃত্তি কমিয়া আসিবে, আবার ত্যাগের দিকে গেলে ভোগপ্রবৃত্তি কমিবে। এ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব। কতক বৈরাগ্য ও কতক ভোগ-প্রবৃত্তি লইয়া একরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সামঞ্জস্য সাময়িক মাত্র—তাহাতে শান্তি হয় না, তাহাতে একটা স্থিতি হয় না, তাহাতে একটা শেষ হয় না। উহা কিছু দিনের জন্য একটা আপোষ মাত্র—কারণ, ভোগপ্রবৃত্তি আমাকে পূর্ণ ভোগের দিকে টানিতেছে, আবার ত্যাগপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগে আমার প্রবৃত্তি দিতেছে। এই দুইটীর মধ্যে একটী প্রবল হইয়া অপরটিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করিতে পারিলে পথের শেষ হইবে না।

আমার মনে হয়, এই দুইটা প্রবৃত্তির মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তিকে যদি অবাধে বাড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে উক্ত ত্যাগপ্রবৃত্তিকে একেবারে নষ্ট করিতে পারিবে, তাহা কখনই হইতে পারে না, কিন্তু ত্যাগপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বাড়িতে দিয়া ভোগপ্রবৃত্তির একেবারে উচ্ছেদসাধন করা যাইতে পারে।

আর একটী সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হয় যে, আমদের উন্নতি কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে, না, উহার কোথাও শেষ আছে? আপাততঃ মনে হয় যখন আমরা সান্ত অথচ আমাদের লক্ষ্য যখন

অনন্ত তখন উন্নতি অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে, কারণ, সান্ত কখনও অনন্তের নিকট পঁহুছিতে পারে না। অনন্তের দিকে চিরকাল অগ্রসর হইবে, অথচ চিরকাল সে সান্তই থাকিয়া যাইবে। মনে কর, আমি এই আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য সমাধি অবস্থা লাভ করিলাম—এখন এই সমাধি অবস্থা ত আবার ভঙ্গ হয়, সুতরাং এই সমাধি অবস্থা যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল—এই সমাধি অবস্থার স্থায়িত্ব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু এমন কোন অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যে অবস্থায় সমাধি কখনও ভঙ্গ হইতে পারে না, এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উন্নতি অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে।

আমাদের শাস্ত্রে যে মুক্তির বিষয় পড়া যায়, তাহা কিন্তু এই ধারণার বিরোধী। মুক্তি যে একটা অবস্থা বিশেষ নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য, বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মুক্তিই ত আত্মার স্বরূপ। অর্থাৎ কেহই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ নহে—অথচ বদ্ধ যতক্ষণ মনে করে, ততক্ষণই সে বদ্ধ—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিতে পারে, আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত, তখন সে যে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালেই মুক্ত, তাহা সে বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহাতে আবার এক সন্দেহ হয় যে, যদিও আত্মা বাস্তবিকই মুক্তস্বভাবই হয়, অথচ বুঝা বা না বুঝার জন্য যদি এতটা তারতম্য হয়, তবে এক মুহূর্ত্তে যে আমি বুঝিলাম মুক্ত, কিছুক্ষণ পরে সে বোধ চলিয়া যাইবে না, আর আমাকে আমি বদ্ধ বলিয়া মনে করিব না, তাহারই বা স্থিরতা কি? ইহার উত্তরে কথিত হয়, যথার্থ একবার বোধ হইলে আর কখনও ভ্রান্তজ্ঞান আসিতে পারে না। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই যে, কখনও আর অজ্ঞান না আসিলেই বুঝা যাইবে যে, যথার্থ জ্ঞান হইয়াছিল।

মোট কথা, এই জায়গায় আর তর্কবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি ঠিক চলে না. হয় শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়, নতুবা বুদ্ধির

অতীত বোধি বা intuition নামক অবস্থা বা বৃত্তিবিশেষ স্বীকার করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

কিন্তু অনন্ত উন্নতিই স্বীকার কর, আর মুক্তিই স্বীকার কর, বর্ত্তমান অবস্থায় যে আমাদের সাধন করিবার কিছু আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এই সাধন কি? –

সদাসর্ব্বদা নিজ স্বরূপের চিন্তা করাই একমাত্র সাধন—নিজ স্বরূপ বা আত্মা শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ের পারে—ধ্রুব—স্থির—অবিকারী, সদা একরূপ। সুতরাং তাহার সাধন—মনের সহিত সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিরোধ—বুদ্ধির পর্য্যন্ত অচাঞ্চল্য—ইহার চেষ্টা করা। সাধন অর্থেই চেষ্টা—বার বার অভ্যাস। সদা সর্ব্বদা বিচার কর ও সেই স্থির অবস্থায় থাকিবার যত্নরূপ অভ্যাস কর। এক দিনে কিছু হইবে না—বার বার চেষ্টা করিতে হইবে—তবেই যদি শান্তি লাভ হয়, তবেই যদি সেই লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি যাওয়া যায়।

বড় কঠিন ব্যাপার! এক কথায় ত লিখিয়া দিলাম, কিন্তু কার্য্যে ইহার কতকটাও পরিণত করা কত শক্ত! কিন্তু কঠিন বলিয়া ত ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কারণ, ইহা আমাদের জীবন মরণের ব্যাপার। ইন্দ্রিয়গুলি কেবল বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, বলপূর্ব্বক সেগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সদাই বহির্ম্মুখ ভাবকে কমাইয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও অন্তর্ম্মুখ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ যেন নদীর যে দিকে স্রোত যাইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে চলিবার চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা ছাড়া যে গত্যন্তর নাই। হাল ছাড়িয়া দিলে ত চলিবে না, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়েরা আমাদিগকে বিষয় সাগরে লইয়া গিয়া একেবারে ডুবাইবে। আর এই সংযমের কঠোর চেষ্টার দরুণ প্রথমে খুব ক্লেশ হইবে বটে, কিন্তু পরিণামে উহাতে শান্তি তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, মানুষের সুখ তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক।

তামসিক সুখ নিদ্রা আলস্যাদি হইতে হয়—উহাতে আত্মার স্বরূপ একেবারে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, রাজসিক সুখ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ-জনিত। তামসিক ব্যক্তির ভোগবাসনা যে নাই, তাহা নহে কিন্তু সে ভোগের জন্য কোন চেষ্টা করিবে না, অথচ ভোগ্য বস্তুগুলি তাহার নিকট আসিবে, ইহাই সে চায়। যদি কিছু চেষ্টা করে, তবে সে ভোগ করিবার সিধা রাস্তা খোঁজে—সেই জন্য তামসিক লোকেই চোর, ডাকাত, জুয়াড়ে হয়। রাজসিক লোকে খুব চেষ্টা করে—ঐ রজঃ একটু সত্ত্বসংযুক্ত হইলে সে ধর্ম্মপথে, ন্যায়পথে থাকিয়া ভোগার্জ্জনের চেষ্টা করে, কিন্তু যত সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, ততই সে বুঝিতে পারে—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্
পরিণামে বিষমিব—

ভোগে আপাত সুখ হইলেও উহা পরিণামে বিষতুল্য। তাই সে ভোগ্যবস্তু হইতে সরিয়া গিয়া ভোগের ইচ্ছা পর্য্যন্ত যাহাতে হৃদয়ে না উদিত হয়, তজ্জন্য অভ্যাসযোগে প্রবৃত্ত হয়—অর্থাৎ মনটা বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মায় স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার বিজাতীয় কষ্ট হয়। প্রিয় বিষয়গুলি হইতে দূরে থাকিতে হইবে—মনের মধ্যে বিষয়বাসনা উঠিতেছে, সেই বাসনা তাড়াইয়া আত্মবাসনা জাগাইতে হইবে—ইহা কি কম কষ্ট? কিন্তু এই কষ্ট প্রথমেই হয়—কিন্তু যতই অধিক অভ্যাস হয়, যতই মনটা বিষয় হইতে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য সরিয়া আত্মারূপ কমলের মধু পান করে, ততই তাহার একটা আনন্দ, একটা সুখ লাভ হইতে থাকে। এই অভ্যাস আবার খুব স্থূল হইতেও আরম্ভ করা যাইতে পারে। অপরের সেবা করার চেষ্টা, অপরের বাহ্য দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ইহার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অপরের সুখ বিধান করিতে গেলেই নিজের স্বার্থ কিছু ছাড়িতেই হয়—ভাল জিনিষ কিছু পাইলে আমি একা তাহা ভোগ করিব না; আর পাঁচ জনকে তাহার ভাগী করিব—এইরূপ চেষ্টা হইলেও বিষয়ভোগের দিকে আসক্তি কতকটা কমিয়া আসিতে থাকে—তাহাতেও কষ্ট হয়, কিন্তু অভ্যাসবশে এই পরোপকারকার্য্যেও

সুখ বোধ হয়,—এই সুখ সাত্বিক সুখের আভাস। সেই জন্যই বলে,
সৎকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে
চিত্ত শুদ্ধ হইলেই শেষে আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

শিখগুরু।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

কালের অপ্রতিহত গতি বিশ্বরাজ্যে যে কত পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব লইয়া আসে তাহা নির্ণয় করা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। মনুষ্য নিজ তর্ক ও বিচারশক্তি সহায়ে ঐ সকলের কার্য্যকারণ সঠিক নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া ফেলে এমন কি, অনেক সময়ে উহা ধারণা করাও তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। জাতীয় ইতিহাসালোচনায় ইহার পরিচয় আমরা পদে পদে দেখিতে পাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী একই আদর্শানুসরণে জাতীয় জীবন হয়ত প্রভূতশক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়া নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া যাইল কিন্তু সমভাবে চিরদিন কাটে না—কি যেন এক অলক্ষিত শক্তি উহা সম্পূর্ণ বিভিন্নপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিল। সেজন্য জাতীয় উত্থান-পতন বা উন্নতি অবনতির কারণগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে উহাদের মূলে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নূতন পথে জাতীয় জীবনপ্রবাহ রোধকল্পে আজ পর্য্যন্ত ত মনুষ্যের সকল চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়াছে। অদ্ভুত নিয়তি চিরদিনই আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে ও করিবে—ভবিতব্য কেহই খণ্ডন করিতে সক্ষম নহে।

শিখজাতির ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা ইহাই লক্ষ্য করি। নানকপ্রমুখ গুরুগণের নেতৃত্বে শিখদিগের জাতীয় জীবন এক বিশিষ্ট

আদর্শধারায় প্রবাহিত হইতেছিল ; পরে অর্জ্জুনের সময়ে শিখজাতি উক্ত মূল ধারা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেও উত্তরকালে হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এক অভিনব পন্থার অনুসরণ করিল। যে ক্ষুদ্র জলরেখা পাঞ্জাব প্রদেশের একপ্রান্তে ক্ষীণ রজতমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, উহা যে কালক্রমে আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া স্বীয় শক্তি ও গর্ব্বভরে মানবের সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? বিষয় নিস্পৃহ সংযতেন্দ্রিয় তপস্বী শিখগণ যে ভবিষ্যতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করিয়া এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবে তাহাই বা কে কল্পনায় আনিতে পারিয়াছিল? সর্ব্বজীবে দয়া যাহাদিগের জীবনের প্রধান ব্রত, ভগবদ্দর্শন যাহাদিগের ধ্রুবলক্ষ্য, তপস্যা ও সংযম যাহাদিগের নিত্যকর্ম্ম তাহারা যে সৈনিক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা কেহই অনুমান করিতে সক্ষম হয় নাই।

হরগোবিন্দ।

গুরু অর্জ্জুনের অপঘাত মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে শিখগণ উহা শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। গুরুকে তাহারা চিরদিন সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক আদেশ প্রতিপালন করিতে, মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে তাহারা আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। সেই গুরুকে তাহাদিগের সমক্ষেই মুসলমান দৌবারিক আসিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল আর তাহারা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল—তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না—ইহা ভাবিয়া তাহাদিগের তীব্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং উহার জন্য আপনাদিগের মানবজন্মকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত ক্ষমতা যাহাদিগের নাই, যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও কোনরূপ বাধাদানে সমর্থ হয় না তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সকল চিন্তায় বিক্ষুব্ধ শিখসমাজ

আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ লইবার জন্য বড়ই উদ্যগ্র হইয়া উঠিল, এবং স্বভাবতঃই উহা সমগ্র শিখসমাজে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিল। চন্দুশাহের ন্যায় সামান্য একজন যবন যদি আত্মবলে গুরুর প্রাণহত্যায় সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের উপায় কি? ইহা ছাড়া শিখগণ দেখিল, চন্দুশাহ মোগলের প্রিয়পাত্র; সে যদি মোগলের সহায় লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। শিখদিগের প্রতি চন্দুশাহের প্রবল বিদ্বেষ যে সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে ইহাও তাহারা উত্তমরূপেই বুঝিত; তাই আসন্ন বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

এদিকে পিতার অপমৃত্যুর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তেজস্বী গুরু হরগোবিন্দ একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ে মুসলমান-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। তিনিও উক্ত অন্যায়ের সমুচিত প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময়ে শিখগণ যখন তাঁহাকে আপনাদিগের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি উহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। পাঞ্জাববাসী তদীয় উত্তেজক আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া সকল দৌর্ব্বল্য ও নৈরাশ্য পরিহরণপূর্ব্বক নব উদ্যমে অভিনব প্রাণালীতে গুরুসেবা করিবার জন্য উদ্যত হইল। শিখগণ নবাদর্শে এই গুরুসেবা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া উহা শেষে দেশ ও জাতিসেবায় পরিণত করিয়া ফেলে।

আমরা জাতীয় জীবনালোচনায় দেখিয়া থাকি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি ও সঙ্গম স্থলে একজন উন্নত মহৎব্যক্তির আবির্ভাব হয়—যিনি বিপদে অবিচলিত, পরাজয়ে অক্ষুণ্ণ ও নৈরাশ্যে আত্মনির্ভরশীল থাকিয়া আপন প্রতিভা ও চরিত্রবলে যেন দৈবশক্তি দ্বারা চালিত হইয়াই আশা ও ভরসার বাণী শুনাইয়া জাতীয় প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন। সমগ্রজাতি এইরূপ যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া আবার সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি মহৎগুণ সমূহ ফিরিয়া পায়। ইঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, কথোপকথন এমন কি দৈনন্দিন জীবন-

যাপন-প্রণালীও ব্যষ্টিজীবনে অনুপ্রেরণা ও প্রবল উত্তেজনা লইয়া আসে। এইরূপে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা সাধনা ও সিদ্ধিকে এক করিয়া লইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করে না। তাই দেখিতে পাই, যে সম্প্রদায় বা জাতি পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল, সহসা এইরূপ মহাজনদিগের সংস্পর্শে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে—যাহা কেহ কখনও আশা করে নাই, তাহাই অবশেষে সম্ভব হয়।

শিখগণ হরগোবিন্দের ন্যায় একজন নেতা লাভ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্টসাধনে তৎপর হইল। হরগোবিন্দ পিতার জীবদ্দশাতেই মোগলদিগের সহিত কিয়ৎকাল যাপন করেন—ঐসময় হইতেই অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে; বাল্য হইতে শারীরিক ব্যায়াম করিতে তিনি অভ্যস্ত হন এবং মোগলদিগের নিকট হইতেই রণবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন—ভবিষ্যতে ইহা তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজনে আসিল। তিনিই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার হস্তে অনুক্ষণ দুইখানি তরবারি থাকিত—উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্টই বলিতেন—"একখানি পিতার অপমৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য এবং অপরখানি মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছি—ইহাই আমার জীবনের ব্রত।" তিনি শিখগণকে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন—কঠোর সৈনিক জীবনের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রত্যহ অভ্যাসের ফলে তাহারা অচিরে রণকুশল সৈনিকে পরিণত হইল। হরগোবিন্দ সর্ব্বদা সশস্ত্র অনুচরে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। শত্রু যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং প্রস্তুত থাকাই বিবেচকের কর্ম্ম।

তাঁহার সময়ে সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পাঞ্জাবের রাজ-প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য অতীব দক্ষতাসহকারে পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত গুরুর বিশেষ পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। যুবরাজ কখনও কোন ধর্ম্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার করেন নাই,

তাঁহা ছাড়া, তিনি শিখদিগের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবানও ছিলেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

একটী সামান্য ঘটনা লইয়া মোগলের সহিত গুরুর বিবাদ বাধিল। উহা স্বেচ্ছাসম্ভূত কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। কথিত আছে, হরগোবিন্দের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহার জন্য একটী সুন্দর ঘোটক ক্রয় করিয়া আনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদশার অনুচরদিগের ঐ সৌষ্ঠবাঙ্গ প্রাণীটী দেখিয়া খুব লোভ হইল এবং কোনমতে লোভ সম্বরণ করিতে সক্ষম না হইয়া তাহারা ঘোড়াটী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া লাহোরে চলিয়া গেল। উহাতে কোনপ্রকার গোলযোগ ঘটিল না। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে ঘোড়াটী খঞ্জ হইয়া যায়। রাজ অনুচরেরা অকর্ম্মণ্য প্রাণীর কোন প্রয়োজন নাই দেখিয়া কাজীর নিকট উহা দিয়া আসিল। গুরু ঘোড়াটীকে বড় স্নেহ ও যত্ন করিতেন— তিনি দশসহস্র মুদ্রাদানে প্রতিশ্রুত হইয়া কাজীর নিকট হইতে উহা উদ্ধার করিলেন। কাজীকে প্রতারিত করিবার জন্য তিনি মুদ্রা দান না করিয়াই ঘোটকটী লইয়া লাহোর পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃতসহরে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনা সম্রাট সাজাহানের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি গুরুর অপরাধের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন হরগোবিন্দের এক দুষ্ট অনুচর তাঁহার বড় সাধের শ্বেত শ্যেন পক্ষীটী গোপনে অপহরণ করিয়াছে। এইবার সম্রাটের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সমগ্র শিখসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন ও সাত হাজার অশ্বসৈন্যসহ মুকলাস খাঁকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে মোগলসৈন্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে জানিয়া গুরু তৎক্ষণাৎ সমগ্র পাঞ্জাববাসিগণকে সত্বর সমরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রচার করিলেন। তদীয় আহ্বানবাণী শ্রবণে অবিলম্বে পঞ্চসহস্র সুদক্ষ সৈন্য আসিয়া মিলিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই শিখদিগকে তিনি অস্ত্রসঞ্চালনের সকল কৌশল যথারীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা একপ্রকার প্রস্তুতই ছিল। শিখদিগের জাতীয় জীবনে উহা এক স্মরণীয় দিন। মোগলের

হস্ত হইতে স্বদেশ ও স্বজাতির মানসম্ভ্রম রক্ষাকল্পে ও জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিখসৈন্য গর্ব্বভরে সর্ব্বপ্রথম সম্মুখ সমরে মোগল-শক্তির বিনাশসাধনের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। গুরু হর-গোবিন্দকে তাহারা দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিত—তাই চতুর্দ্দিক হইতে কোলাহল ও জয়ধ্বনি অবিরাম উত্থিত হইতে লাগিল। শিখ আজ রণোন্মত্ত—পারদর্শী ও সমরনীতিজ্ঞ সেনাপতি পাইয়া তাহা-দের আনন্দের সীমা নাই। তাহারা জয়লাভে নিঃসংশয় হইল—তাই জাতীয় স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে শিখগণ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আপনাপন জীবন বিসর্জ্জন দিল। তাহাদিগের অপূর্ব্ব একপ্রাণতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও ধৈর্য্যের বিরুদ্ধে মোগলশক্তি অধিকক্ষণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না—বিধ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। মোগলের রক্তস্রোতে রণভূমি ভাসিয়া গেল—অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্যসহ সেনাপতি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া লাহোরে আশ্রয় লইলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ও রণকৌশলী মোগলসেনানী শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে—এই বার্ত্তা সম্রাটের নিকট পেঁীছিলে তিনি একান্ত লজ্জিত হইলেন এবং সেনাপতিকে কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

হরগোবিন্দ শুধু যে একজন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন তাহাই নহে তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। মোগলের সহিত বহুকাল ব্যবহার করিয়া তিনি উহাদিগের আচারপদ্ধতি, স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিপদকালে উহা তাঁহার একান্ত প্রয়োজনে আসিয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, শত্রু একবারমাত্র পরাজিত হইয়া নিরাশ হইবার পাত্র নহে, মোগলের সহিত পুনর্ব্বিবাদ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই উহার জন্য সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক সাজাহানও সেই সময়ে বিবাদের কারণানুসন্ধানে উৎসুক ছিলেন। সমগ্র ভারতের অধীশ্বর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল সামান্য একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া একান্ত হীনবলের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়াছে, এ অপমান সাজাহানের সহ্য হইল না, যে কোন

উপায়ে শত্রু দমন করিতেই হইবে—ইহাই অনুক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হরগোবিন্দ আনন্দোল্লাসে অধীর হইলেন না; তিনি স্থির জানিতেন, তাঁহার জীবন নাশ না করিয়া মোগল কখনই শান্ত হইবে না—বুঝিলেন বিপদ আসন্ন। পাছে আবার যুদ্ধ করিতে হয় এই আশঙ্কা করিয়া তিনি অবিলম্বেই হিসর প্রদেশান্তর্গত কুদ্রুরনামক স্থানের সন্নিকট বথিণ্ডারণ্যে আশ্রয় লইলেন। গুরুর আবাসস্থল বলিয়া উহা 'গুরু-কা-কোট' নামে অভিহিত হয়। এরূপ নিভৃত প্রদেশে বসবাস করিলেও তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি তথায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, তন্মধ্যে বুধনামক (নানকের শিষ্য নহে) একজন বিখ্যাত দস্যু ও লুণ্ঠনকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তিই মোগলের সহিত পুনর্ব্বিবাদ ঘটায়। এই বুধ গোপনে লাহোরান্তর্গত রাজ অশ্বালয় হইতে দুইটী ঘোড়া অপহরণ করিয়া হরগোবিন্দকে উপহার দিল। উহার ফল এই হইল সাজাহান যুদ্ধযাত্রার সুবিধা পাইলেন—তাঁহার কোপ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইল—এবং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ বীর কুনুমার বেগ ও লালবেগকে বিপুল মোগলসেনাসহ সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিয়া শিখের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

হরগোবিন্দের গুপ্তস্থান কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য সেনাপতিদ্বয় শতদ্রু নদী পার হইলেন। বিস্তৃত প্রান্তরে জলাভাবে মোগলবাহিনীর অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। প্রথম আক্রমণে বিফল হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন আপন শীকার খুঁজিতে বাহির হয় ও সমগ্র বনভূমি আলোড়িত করিতে থাকে, সেইরূপ প্রথম চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া মোগলসৈন্য পাঞ্জাবভূমির চতুর্দ্দিকে শত্রুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদিগের অস্ত্রের ঝনৎকার ও ত্বরিত পাদক্ষেপে সেই বিজনপ্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল।

হরগোবিন্দ ইতিপূর্ব্বেই আপন সৈন্যগণকে মোগল ধ্বংশের জন্য প্রান্তরে সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহসা রণোন্মত্ত সেই বিপুল

শিখবাহিনীকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মোগলেরা ত্রস্ত ও চমকিত হইল। শিখদিগের অতুল বিক্রম, রণচাতুর্য্য ও মানসিক দৃঢ়তার নিকট দ্বিতীয়বার দুর্দ্ধর্ষ মোগলবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল - চেষ্টা করিয়াও মোগলসৈন্য বিপক্ষের অগ্রগমন রোধ করিতে সমর্থ হইল না—অবশেষে সেনাপতি কুন্মারবেগ ও লালবেগের দেহ শিখসৈন্যের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে বাত্যাহত ছিন্নদ্রুমের ন্যায় ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মোগলসেনা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পলাইয়া প্রাণে বাঁচিল। শক্রর নিকট হইতে সেনাপতি-দ্বয়ের মৃতদেহ রক্ষা করিতেও সমর্থ হইল না - নিরাশ ও ব্যর্থ হইয়া ফিরিল। রণস্থলে শিখদিগের বিজয়নিশান উড্ডীন হইল। শিখের বিজয়বার্ত্তা অচিরে সমগ্র ভারতভূমে প্রচারিত হইয়া গেল—হরগোবিন্দের অসামান্য বীরত্ব, অসাধারণ তেজস্বিতা ও অদ্ভুত সাহসের পরিচয় পাইয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

দুইবার মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া হরগোবিন্দের প্রাণে নব আশার সঞ্চার হইল। মোগলসৈন্যকে তিনি যে এত সহজে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবেন তাহা তিনি পূর্ব্বে আশা করেন নাই—ভাবিয়াছিলেন শত্রুর সম্মুখীন না হইয়া গোপনে অনিষ্টসাধনে তৎপর থাকিবেন, কিন্তু শিখসৈন্যের পরাক্রম ও বীর্য্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়ায় তাঁহার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিল। মোগলশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যুদ্ধের পর তিনি অনুচরবর্গ লইয়া শতদ্রু নদী পার হইলেন এবং কুরতারপুর নামক স্থানে পৌঁছিলেন। পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রার জন্য তদনুরূপ শক্তিসঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইয়া অবিলম্বে এক বৃহৎ বাহিনী গঠন করিলেন—উহাতে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয়ই রহিল। অতঃপর খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন।

যুদ্ধসম্ভাবনা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইল। হরগোবিন্দের

পাণ্ডে খাঁ নামক এক পাঠান অনুচর ছিল; প্রথমে গুরুর প্রতি তাহার অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিয়ৎকাল অতীত হইলে গুরুর সহিত কোন কারণে তাহার বিবাদ ও মনোমালিন্য ঘটে; ঐ ব্যক্তি গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ তাহার হৃদয় অধিকার করিল এবং তখন হইতেই কি উপায়ে গুরুর অমঙ্গল ও অনিষ্টসাধন সম্ভবপর হয় তাহাই অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে এক প্রশস্ত উপায়ের সন্ধান মিলিল। পাণ্ডে খাঁ স্থির করিল, সম্রাট সাজাহান নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, কারণ সে জানিত, বাদশা পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ-যাত্রার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া পাণ্ডে খাঁ রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছিয়া সাজাহানের নিকট তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল এবং মোগলের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই যে ঐরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিবেচনা করিয়াছিল, তাহা সম্রাটকে বুঝাইয়া দিল। সানন্দে সাজাহান তাঁহার সহিত প্রভূত মোগলসেনা প্রেরণ করিলেন এবং বিদায়কালে বলিলেন—"খোদা করুন, যেন আপনাকে আবার সমর-বিজয়ীরূপে রাজধানীতে অভি-নন্দন করিয়া লইতে পারি।"

এইরূপে মোগলসৈন্যের সহিত মহোল্লাসে পাঠানবীর পাঞ্জাব-প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ সংবাদ হরগোবিন্দের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি সমরক্ষেত্রে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। তৃতীয়বার দুই শক্তি পরস্পরের উচ্ছেদসাধনের জন্য প্রবৃত্ত হইল। শিখসৈন্যদিগের সেই অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, সেনাপতির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, তাহাদিগের সুশৃঙ্খল সমাবেশ ও শান্তসৌম্যমূর্ত্তি রণভূমির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া-ছিল। প্রথম আক্রমণ হইতেই মুসলমানসৈন্য সকল ক্ষমতা ও বীর্য্যপ্রয়োগে যত্নবান হইল—শিখ উহাতে কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া পুনরাক্রমণে সবিশেষ শৌর্য্য প্রদর্শন করিল। উভয়পক্ষই প্রাণপণে বিপক্ষবিনাশে তৎপর—পরিশেষে কাহারা বিজয়ী হইবে তাহা বুঝা

গেল না। অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী শিখের প্রতি প্রসন্না হইলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে শিখ জয়ী হইল। মোগলসৈন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহারা শেষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে সেনাপতি পাণ্ডে খাঁ হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক নিহত হইলে উহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

তৃতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখসৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং কিয়ৎকাল বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন হইল। এতদ্ব্যতীত হরগোবিন্দ বুঝিলেন, শীঘ্রই পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মোগলবাহিনী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবে—সুতরাং এরূপক্ষেত্রে কোন নির্জ্জনপ্রদেশে চলিয়া গিয়া কিয়ৎকাল শান্তিময় জীবনযাপন করাই শ্রেয়ঃ। অতঃপর সৈন্যসহ দূরবর্ত্তী কোন এক পর্ব্বতক্রোড়ে বসবাস করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে বিতস্তা নদীর দক্ষিণোপকূলে রুহেলা নামক স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন—উহার নাম হিরাতপুর। জনহীন নির্জ্জন প্রদেশে শান্তিময় জীবনযাপন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

যোদ্ধৃজীবনের কঠোরতা ও শ্রমশীলতা সহ্য করিয়া শিখদিগের জীবনীশক্তি ও প্রাণের স্ফূর্ত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। সর্ব্বদা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস, কখনও নিরাহার, কখনও কখনও বা স্বল্পাহারে দিনযাপন, অসহনীয় শৈত্য বা উত্তাপে জীবনধারণ করা যে কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। হরগোবিন্দ শিখসমাজে যে নব আদর্শের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাহার সাফল্যেত্যায় তিনি সবিশেষ কার্য্যকুশলতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গুরুগণ উক্ত আদর্শ শিখসমাজে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বসমাজের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি যে উহার মধ্যে জাতীয়ত্ব-বোধ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে এবং উহাকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহাই হরগোবিন্দের জীবনের আত্মপ্রসাদ স্বরূপ

হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া তিনি পরবর্ত্তী গুরু নির্ব্বাচন করিলেন।

হরগোবিন্দের তিনটী বিবাহ হয়। তিনি পাঁচটী পুত্রলাভ করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুরুদিত্তে, তৎপরে তেজবাহাদুর, সুরৎসিং, আনরৎ ও উত্তুলরাও। জ্যেষ্ঠ তদীয় জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তৎপুত্র হররাওকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন এবং উহাকেই গুরুপদে নির্ব্বাচিত করিয়া যান। উহাতে তেজবাহাদুরের জননী অতীব মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি জানিতেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় পুত্রেরই গুরুপদলাভের সম্ভাবনা বেশী। হরগোবিন্দ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন -"তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, তেজ এখনও শিশু। তোমার ভয় নাই, তেজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গুরুপদ পাইবে। আমার নিজের অস্ত্রগুলি তোমাকে দিয়া যাইতেছি, তেজকে উপহার দিবে।"

যাহা হউক, ঐ ঘটনার পর আর বেশী দিন তিনি জীবন ধারণ করেন নাই। একাত্রিংশ বৎসর গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া খৃষ্টাব্দের ১৬৩৯ বর্ষে তিনি হিরাতপুরেই দেহত্যাগ করেন।

হররাও।

হরগোবিন্দের মৃত্যুতে শিখসমাজ এক অমূল্য রত্ন হারাইল। যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার উত্তরাধিকারী গুরুপদের মর্য্যাদারক্ষণে একান্ত অযোগ্য হইলেন। সে কার্য্যদক্ষতা, সে আত্মসম্মান, তেজস্বিতা ও আত্মসংযম আর মিলিল না! প্রথমেই গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। সকলে ভাবিল, বুঝি শিখসমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। দুর্ব্বলের হস্তে ক্ষমতা থাকিলে উহার সদ্ব্যবহার হয় না—তাই হররাও জ্যেষ্ঠতাত তেজবাহাদুরকে কোনরূপ সম্মান প্রদান করা দূরে থাক নানা উপায়ে অপমানিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবহারে সম্প্রদায়স্থ অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহাকে সাহায্যদানে বিরত হইল।

এই সময়ে মোগল রাজপরিবারেও বিষম বিবাদ চলিতেছিল।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন পাইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। নির্ভীক দারা তখন পাঞ্জাবপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি সেই সময়ে একান্ত অসহায়; তাই স্বীয় অনুচরবর্গকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে দুর্ব্বল শিখগুরু তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়াই দারার সহিত যোগদান করিলেন—উহার দণ্ড তাঁহাকে পরে ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই যুদ্ধে দারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মুলতানাভিমুখে পলায়ন করেন। আওরঙ্গজেবের দুর্দ্দান্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে একাকী শিখগুরু যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না, তাই তিনি অগত্যা হিরাতপুরেই ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুকাল অতীত হইল; ভ্রাতৃহত্যায় কৃতকার্য্য হইয়া আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম হইতেই শত্রু-পীড়নে তাঁহার নজর পড়িল। তাঁহার অসহায় অবস্থায় গুরু দারাকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলেন নাই—উপযুক্ত অব-সরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গুরুকে রাজদূতের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি ক্ষমতা থাকে, রাজদ্রোহী হইয়া বীরত্বের পরিচয় দিবে—আমি তোমাকে রণে আহ্বান করিতেছি।"

অনুচরের নিকট হইতে ঐরূপ তেজস্বী ভাষা শ্রবণ করিয়া গুরুর প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপ জানিতেন—আরও বুঝিলেন, শিখসমাজ তাঁহার উপর একান্ত বিরূপ, সুতরাং যুদ্ধঘোষণা করা বড়ই বাতুলের কর্ম্ম। তাই অতীব বিনয় বচনে নতজানু হইয়া দূতকে বলিলেন—"সম্রাট আওরঙ্গজেবকে আমার শত শত কুর্নিশ জানাইতেছি। আমি একজন সামান্য অসহায় ফকির, তিনি যাহাতে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া প্রজাপালনে রত থাকিতে পারেন তজ্জন্য অনুক্ষণ ভগবানের নিকট

সকাতর প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার সহিত কখনও কি আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়? তাঁহাকে বলিবেন—আমি এখন একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে অনুলিপ্ত থাকায় পুত্র রামরাওকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছি—আশা করি, তিনি উহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন এবং স্বীয় গুণে আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" এতদ্ব্যতীত তিনি ঐ মর্ম্মে সম্রাটকে একখানি পত্রও লিখিয়া পাঠাইলেন।

দূতের সহিত রামরাও কয়েক দিনের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছিল। আওরঙ্গজেব সকল সমাচার অবগত হইয়া এবং পত্র পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সফল হওয়াতে তাঁহার আত্মপ্রসাদ হইল। পূর্ব্ব হইতেই উপদিষ্ট হইয়া রামরাও অতীব সৌজন্যের সহিত সম্রাটের সকল প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন—"আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, হররাও বাস্তবিকই নির্দ্দোষ।" যুবককে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া রাজদরবারে কিয়ৎকাল যাপনের জন্য সমাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। রামরাও রাজসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিল।

এই সংবাদ গুরুর নিকট পৌঁছিলে তাঁহার সকল চিন্তা দূর হইল এবং তিনি শান্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল; অবশেষে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পরবর্ত্তী গুরুদ্বয় কি ভাবে শিখজীবন নিয়ন্ত্রিত করেন এবং কতদূর কৃতকার্য্য হন, তাহা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

জগৎ ও ঈশ্বর।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

যখন এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়, যখন আমরা দেখি কত উচ্চ উচ্চতর পর্ব্বতমালা তাহাদের হিম-মণ্ডিত গগনস্পর্শী শিখর উত্তোলন করিয়া শোভা পাইতেছে, যখন আমরা দেখি কত সুদীর্ঘ নদী আবার সেই সকল কঠিন প্রস্তরনির্ম্মিত গিরি ভেদ করিয়া শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কত গ্রামের কত পল্লীর, কত নগরের কূল প্লাবিত করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে আবার অনন্ত জলরাশি পরিপূর্ণ সেই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের শুভ্র ফেনযুক্ত তরঙ্গরাজি যেন সহাস্যে বহুদূর হইতে সমাগত নদীগুলিকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য তীরের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছে, যখন আমরা দেখি কত বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের অসংখ্য প্রকারের ফল ফুলাদির দ্বারা জগৎকে যেন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, যখন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র পরিশোভিত অনন্ত নভোমণ্ডল আমরা নিরীক্ষণ করি, এবং অপরদিকে যখন মাতা পিতার স্নেহে, ভ্রাতা ভগ্নীর প্রেমে, স্ত্রীর ভালবাসায়, পুত্র কন্যার প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে, বন্ধুর বন্ধুত্বে মন বিহ্বল হইয়া যায় তখন যেন স্বতঃই মনে হয় উপনিষদ্ যে বলিতেছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি" ইহা কি সম্ভবপর? হে পাঠক! এইরূপ সংশয় যে অবশ্যম্ভাবী ইহা বেদান্তের আচার্য্য-গণের অবিদিত ছিল না এবং সেই হেতু তাঁহারা এই জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে শ্রুতি-বাক্য মিথ্যা নহে। এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

যাহা কিছু সৃষ্ট-পদার্থ তাহারই একটা নিমিত্ত ও একটা উপাদান কারণ আছে। যেমন ঘট—উহার নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও দণ্ডচক্র ইত্যাদি এবং উহার উপাদান কারণ

মৃত্তিকা। সেইরূপ আমাদের সন্মুখস্থিত জগৎও সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং উহারও নিমিত্ত ও উপাদান কারণ আছে। কারণ ও কার্য্য যখন অভেদ তখন এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কোন্ পদার্থ তাহা জানিতে পারিলেই আমরা জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব।

গত চৈত্রের 'অজ্ঞান বা মায়া' প্রবন্ধে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির কথা বলা হইয়াছে। একমাত্র সদ্‌বস্তু ব্রহ্মচৈতন্য মায়ার আবরণ-শক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া পরে সেই মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। জল ও জলবুদ্‌বুদ বস্তুতঃ এক হইলেও যেমন নামে ও রূপে ভেদ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, সেই-রূপ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ-প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক হইলেও নাম এবং রূপের আবরণে বহু বলিয়া বোধ হয়। নাম ও রূপ যেমন কল্পনামাত্র সেই প্রকার এই জগৎও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন রজ্জু্জ্ঞানের অভাবে উহাতে সর্পভ্রম উৎপন্ন হয় সেইরূপ আত্মজ্ঞানের অভাবে নিজ আত্মাতে বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। আত্মাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু দণ্ড যেরূপ ঘটের নিমিত্ত কারণ সেইরূপ নহে। দণ্ড তাহার ঘটরূপ কার্য্যে ব্যাপিয়া থাকে না কিন্তু জগতের নিমিত্ত কারণ আত্মা তাঁহার জগৎরূপ কার্য্যে ব্যাপিয়া আছেন। শ্রুতিতেও আছে "তৎসৃষ্টাতদেবানু প্রাবিশৎ"। জড় লোহা চুম্বকের নিকটবর্ত্তী হইলে যেমন উহাতে চেষ্টার লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ জড় অজ্ঞান বা মায়া চৈতন্য সান্নিধ্য-বশতঃই চেতনত্ব লাভ করে ও তাহার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা জগদাদি ভ্রম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং জগৎ যখন অজ্ঞানেরই বিকার এবং অজ্ঞান যখন চৈতন্য সন্নিধানেই চেতনত্ব লাভ করে তখন চৈতন্যই অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, আত্মা জগতের নিমিত্ত কারণ হইলেও তিনি ইহার উপাদান কারণ হইতে পারেন না; কেন না, অচেতন জড়-প্রপঞ্চের উপাদান কারণ চৈতন্য ইহা কখনও সম্ভবপর নহে এবং যদিও হয় তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের অভেদ-বশতঃ প্রপঞ্চজগতের

চৈতন্যরূপই প্রমাণ হয় ও ইহার অনিত্যত্বও প্রমাণ হয় না অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ নিত্য হইয়া পড়ে, অতএব উহা কি প্রকারে সম্ভবপর ?

সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের মায়া সাক্ষাৎ উপাদান হইলেও মায়াধীশ ঈশ্বরকে মায়া আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ঈশ্বর যে জগতের উপাদান কারণ, ইহা অসম্ভব নহে। বিবর্ত্তবাদ অনুসারে ঈশ্বর-চৈতন্যের বিকার না হইয়াই অজ্ঞানতাবশতঃ জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। রজ্জু অধিষ্ঠানে ভ্রমদৃষ্ট সর্প যেরূপ মিথ্যা, চৈতন্য অধিষ্ঠানে অধ্যারোপিত জগৎও সেইরূপ মিথ্যা।

একই চৈতন্য কিরূপে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পারেন, তাহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেমন মাকড়সা ও তাহার জাল। মাকড়সা তাহার জালের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই হইয়া থাকে। মাকড়সা কথাটিতে মাকড়সা দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই লক্ষ্য করা হইতেছে বুঝিতে হইবে, কারণ চৈতন্য অভাবে অর্থাৎ মৃত মাকড়সার দ্বার জালনির্ম্মাণ কার্য্য দেখা যায় না। মৃত মাকড়সা যখন জাল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তখন চৈতন্য যে ঐ জালরূপ কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং মাকড়সাতাহার দেহ হইতে লালা বাহির করিয়া জাল তৈয়ার করিলেও মৃত মাকড়সার দেহাংশ হইতে যখন জাল তৈয়ার হয় না, তখন মাকড়সার দেহটি সাক্ষাৎ উপাদান হইলেও চৈতন্যই প্রকৃত উপাদান ; সেইরূপ ঈশ্বর-চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ঈশ্বর জগতের আধার ও আধেয় দুইই"। এবং যে উপাদানে কার্য্য হইয়াছে সেই উপাদানবিষয়ক জ্ঞান কর্ত্তার বা সেই কার্য্যের কারণের থাকা আবশ্যক, কারণ কর্ত্তৃত্বের উহা একটি লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বের আরও দুইটি লক্ষণ আছে—চিকীর্ষা ও কৃতি। কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে চিকীর্ষা বলে ও কার্য্যে প্রযত্নই কৃতি। এক্ষণে ঈশ্বরে অথবা অন্য কিছুতে যদ্যপি জগৎরূপ কার্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা এবং কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকেই এই

জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। জড় কখনও এই জগতের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না, কারণ জড়ের কখনও চিকীর্ষাদি সম্ভবপর নহে। মায়া জড় সুতরাং মায়া এই জগতের নিমিত্ত কারণ নহে. কিন্তু ঈশ্বরের যে জগৎ উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, চিকীর্ষা আছে ও কৃতি আছে সে সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ ঃ—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥"

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁর জ্ঞানই তপস্যা তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।" ইহা ঈশ্বরের উপাদানবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ।

"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

"তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।" ইহা ঈশ্বরের চিকীর্ষার লক্ষণ।

"তন্মনোঽকুরুত—"

"তিনি মনকে করিয়াছিলেন।" ইহা ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্নের লক্ষণ। প্রদর্শিত শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে. ঈশ্বরে কর্তৃত্বের তিনটি লক্ষণই আছে, সুতরাং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। শ্রুতি আরও বলিতেছে যে, ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহাতেই স্থিত আছে ও প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, রজ্জু-অধিষ্ঠানে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানে জগৎভ্রম হইয়া থাকে। এই জগদাকারে পরিণত মায়ার অধিষ্ঠান হওয়ার নামই উপাদানত্ব। ঈশ্বর যে জগতের উপাদান কারণ সে সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"—"এই সমস্তই সেই আত্মা"
"সচ্চ ত্যচ্চ"—"তিনিই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইয়াছিলেন"
"বহুস্যাং প্রজায়েয়"—"আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।"

কার্য্য ঘট ও তাহার উপাদান মৃত্তিকা যেমন বস্তুতঃ এক, সেইরূপ ব্রহ্ম যদ্যপি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ, ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় বস্তুতঃ এক হওয়া উচিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ জগতে দেখা যাইবে বা জাগতিক সকল বস্তুতেই ঐ তিন লক্ষণ থাকিবে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাক্, ঐ তিন লক্ষণ জাগতিক বস্তুতে আছে কি না। সৎ, চিৎ ও আনন্দ অথবা অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিন লক্ষণই জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া জগতেও আছে। কারণ যে বস্তু যাহাতে অধ্যস্ত, তাহার লক্ষণাদি সেই অধ্যস্ত বস্তুতে থাকিতে দেখা যায়—যেমন রজ্জুর দৈর্ঘ্যকাদিলক্ষণ অধ্যস্ত সর্পে দেখা যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, উপাদান কারণ কার্য্যে অনুস্যূত থাকে। এক্ষণে ব্রহ্মের অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিন লক্ষণ জগৎকার্য্যে অনুস্যূত ইহা জানিতে পারিলে ব্রহ্মের জগৎ উপাদানত্বে আর সংশয় থাকিবে না। অস্তি অর্থে আছে, এই জগৎ রহিয়াছে, ইহা সকলেই অনুভব করিতেছে, ইহা যে ভাতি অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে ইহাও সকলেই জ্ঞাত এবং ইহা প্রিয়ও বটে, কারণ জগতে প্রিয়বস্তুর দর্শনেই যখন আনন্দ হয় তখন অস্তি, ভাতি ও প্রিয় বা সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন লক্ষণ ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগতে রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, এ জগতে দুঃখও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং যখন আনন্দময় বা প্রিয়ব্রহ্মে এই দুঃখ অধ্যস্ত তখন দুঃখ আমাদের প্রিয় হয় না কেন? দুঃখেতে তাঁর আনন্দাংশ অধ্যস্ত হইয়া দুঃখ আমাদের প্রিয় হয় না কেন? দুঃখ ত কাহারও প্রিয় বলিয়া শুনিতে পাই না? ঐরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ একটা কোন কিছু আমরা অনুভব করার পর, কেন এইরূপ অনুভব হইতেছে ইত্যাদি হেতুর অনুসন্ধান করিয়া থাকি। এই জগৎ অথবা ঘট আমাদের প্রিয়, এইরূপ অনুভব হয় বলিয়াই তাহার হেতুর অনুসন্ধান করা হয়। হেতু আছে বলিয়া যে ঐ হেতু সকল স্থানেই আরোপিত হইবে এমন কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ ব্রহ্মে "প্রিয়" এই লক্ষণটি আছে বলিয়াই যে

উহা দুঃখাদিতেও আরোপিত হইবে এমন কোন প্রয়োজন দেখি না। দুঃখ যদ্যপি প্রিয় বলিয়া কাহারও অনুভব হইত, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলা যাইতে পারিত। যাহার অনুভবই হয় না তাহার আবার অধ্যাস কি? যদিও দুঃখে "প্রিয়" অংশের প্রতীতি হয় না কিন্তু অস্তি ও ভাতি এই দুইটি লক্ষণের প্রতীতি হয় এবং এই অস্তি ও ভাতি লক্ষণের আধিক্যবশতঃই সম্ভবতঃ "প্রিয়" অংশের অনুভব হয় না।"

জগতের সকল পদার্থে ব্রহ্মসান্নিধ্যবশতঃ অস্তি, ভাতি ও প্রিয় ও অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া নাম এবং রূপ এই পাঁচটি অংশের উপলব্ধি হয়। পঞ্চদশীতে আছে ঃ—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

অস্তি ভাতি ও প্রিয় এই তিনটি জগৎ হইতে বাদ দিলে অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ করিলে নাম ও রূপ অবশিষ্ট থাকে। ঐ রূপ ও নামই তাহা হইলে জগৎ আর যাহা আছে তাহা ব্রহ্মের। সুতরাং নামে ও রূপেই ব্রহ্ম হইতে জগৎকে পৃথক বোধ করাইতেছে, বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রের জল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে কিন্তু তথাপি একটা কল্পনাপ্রসূত নাম ও রূপের দ্বারাই উহাকে পৃথকভাবে দেখিয়া থাকি সেইরূপ অবিদ্যাপ্রসূত নাম ও রূপের সম্বন্ধবশতঃই জগতে বহুত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। নাম ও রূপ যখন কল্পনামাত্র তখন ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। ঐ ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানেই মায়াকৃত জগদাদি অধ্যারোপিত হইতেছে। নাম ও রূপ ছাড়িয়া দিলে এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুই থাকেন কিন্তু এমনি মায়ার প্রভাব যে সে অবস্তুকে বস্তু ও প্রকৃত বস্তুকে অবস্তুর ন্যায় দেখাইতেছে, এই জন্যই ব্রহ্মবিদেরা মায়াকে অঘটনঘটনপটিয়সী বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেবক উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

বৃহস্পতি-শিষ্য উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, 'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥—উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয় সেরূপ প্রিয় আর কেহ নহে। ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর মৎস্বরূপ হইলেও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, শ্রী ভার্য্যা হইলেও তোমার মত প্রিয় নহে। এমন কি আমার নিজ মূর্ত্তিও তোমার মত প্রিয় নহে। ভগবান্ প্রভাস-যাত্রার পূর্ব্বে উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাইতে অনুজ্ঞা করেন। কিন্তু উদ্ধব প্রিয় প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাস-যাত্রা করেন। সেখানে ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ভগবানের আনন্দঘনমূর্ত্তি দেখিয়া উদ্ধব কৃতার্থ হইলেন। এবং ভগবান সেই সময়ে তাঁহাকে আত্মার পরমা স্থিতি উপদেশ দেন। বিরহাতুর উদ্ধব ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন। উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে পাঠাইবার উদ্দেশ্য—ভগবদুপদিষ্ট জ্ঞানপ্রচার। ভগবান্ ভাবিয়াছিলেন, "অস্মাৎ লোকাৎ উপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্। অর্হতি উদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রতি আত্মবতাং বরঃ॥ ন উদ্ধবঃ অনু অপি মন্ন্যূনঃ যদ্‌গুণৈঃ ন আৰ্দ্দিতঃ প্রভুঃ। অতঃ মদ্বয়ুনম্ লোকং গ্রাহয়ন্ ইহ তিষ্ঠতু॥"—ইহলোক হইতে আমি চলিয়া যাইব, এক্ষণে আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমার জ্ঞানের অধিকারী। সম্প্রতি আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতেছি না। বিশেষতঃ উদ্ধব আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, কারণ বিষয় দ্বারা ইঁহার মন মোটেই ক্ষুব্ধ হয় না। অতএব লোকদের মদ্বিষয়ক জ্ঞান

শিক্ষা দিবার জন্য উদ্ধব এখানে থাকুন। ভগবৎকল্প মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমী উদ্ধব লোক-শিক্ষার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোদ্ধব-সংবাদে উদ্ধবের ভগবৎপ্রেমের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। বিদুর দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। পর্য্যটন করিতে করিতে যমুনাতীরে হঠাৎ উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরম ভাগবত উদ্ধবের দর্শন পাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া বিদুর যদুবংশীয়দের, পাণ্ডবগণের এবং বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ভগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের কিরূপ অবস্থা হয়, শুক বর্ণনা করিয়াছেন—

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্ত্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্। প্রতিবক্তুং ন চ উৎসেহে ঔৎকণ্ঠাৎ স্মারিতেশ্বরঃ॥ যঃ পঞ্চহায়ণঃ মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তৎ ন ঐচ্ছৎ রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥ স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসম্ গতঃ। পৃষ্টঃ বার্ত্তাং প্রতিব্রূয়াৎ ভর্ত্তুঃ পাদৌ অনুস্মরন্॥ সমুহূর্ত্তং অভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সুধয়া ভৃশং। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ॥ পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ মুঞ্চন্ মিলদ্দৃশা শুচঃ। পূর্ণার্থঃ লক্ষিতঃ তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ॥ শনকৈঃ ভগবৎ লোকাৎ নৃলোকং পুনরাগতঃ। বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যা আহঃ উদ্ধব উৎস্ময়ন্॥—বিদুর প্রিয়জনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র উদ্ধবের স্মৃতিপথে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন। তিনি বিরহোৎকণ্ঠাবেশ হেতু—প্রতিবচন প্রদানে সমর্থ হইলেন না। উদ্ধব পঞ্চমবর্ষ বয়স কালে খেলায় কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রচনা করিয়া পরিচর্য্যা করিতেন। সে সময় মাতা প্রাতরাশ যাচ্ঞা করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না—সেই উদ্ধব দীর্ঘকাল তাঁহার সেবা করিয়া কালবশতঃ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভর্ত্তার কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার পাদস্মরণ করিতে করিতে কেমন করিয়া হঠাৎ প্রতিবচন দিবেন? তিনি মুহূর্ত্তকাল

নিস্পন্দ-তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণপাদসুধায় উত্তমরূপে সুখী হইতে লাগিলেন এবং তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা যেন সেই সুধাতে অত্যন্ত নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রকাশিত হইল। তার পর ঈষন্মীলিত নেত্র-হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে উদ্ধবকে নিমগ্ন দেখিয়া বিদুর ভাবিলেন, এ ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। তারপর উদ্ধব ভগবল্লোক হইতে মনুষ্যলোকে আস্তে আস্তে পুনরাগমন করিয়া অর্থাৎ দেহানুসন্ধান পুনর্প্রাপ্ত হইয়া নেত্রমার্জ্জন করিয়া ভগবচ্চাতুর্য্যস্মরণে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রীতির সহিত বিদুরকে বলিলেন। ভগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের গভীর সমাধি হইল। তার পর পুলকে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, তার পর অশ্রু বিগলিত হইল, তার পর দেহানুসন্ধান আসিলে তিনি পুনর্ব্বচন প্রদানে সমর্থ হইলেন।

উদ্ধব বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ-দিবাকর অস্ত গিয়াছেন, কালসর্প আমাদের গৃহ গ্রাস করিয়াছে, আর কুশল কি বলিব? এই ভুবন অতিশয় ভাগ্যহীন। আর যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য! কারণ তাহারা এতকাল তাঁর সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তারা যে নির্ব্বোধ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু ভাগ্যদোষে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহারা তাঁহাকে যদুশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতকাল তাঁহার সেই মঙ্গল মূর্ত্তি দেখাইয়া মানুষের নয়ন হইতে বলপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি আকর্ষণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। সেই অত্যাশ্চর্য্য মূর্ত্তি সৌভাগ্য-সম্পত্তির পরাকাষ্ঠা ছিল। সময় সময় ভগবান্ নিজেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ভগবানের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ত্রিভুবনস্থ লোক দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিতে ব্রজাঙ্গনাগণের নয়ন সংলগ্ন হইলে তাঁহারা নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত। ভগবান্ অজ হইয়াও যে বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তবীর্য্য হইয়াও অরি

ভয়ে ব্রজে যাইয়া গোপনে বাস করেন এবং কাল যবনাদির ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করেন, এই সকল ভাবিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়। তিনি মথুরায় পিতামাতার পাদদ্বয় ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে তাত! হে অম্ব! কংসভয়ে ভীত হইয়া এতকাল আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।' তাঁহার পাদদ্বয়ের ধূলি একবার সেবা করিয়া কে তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে? রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপাল তাঁহার কত দ্বেষ করিয়াছিল, কিন্তু সেই শিশুপাল যোগিজনদুর্লভ সিদ্ধি পাইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে নরলোক বীরগণ অর্জ্জুনের রথে তাঁহার বদনারবিন্দ পান করিয়া তাঁহার গতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকপালগণ করযোড়ে তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিত, কিন্তু উগ্রসেনের নিকট তাঁহার কৈঙ্কর্য্য স্মরণ করিলে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। রাজা উগ্রসেন রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, 'মহারাজ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হউক!' তাঁহার আশ্চর্য্য দয়া! দুষ্টা পুতনা স্তনদ্বয়ে কালকূট লেপন করিয়া সেই স্তনপান করাইয়াছিল। কিন্তু সেও মাতা যশোদার গতি প্রাপ্ত হইল। আমি অসুরগণকে পরম ভাগবত মনে করি, কারণ তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেশমার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ট থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ আর কি বলিব?

"ভগবান্ কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসের ভয়ে তাঁহাকে নন্দের ব্রজে রাখিয়া আসেন। সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত একাদশ বৎসর গূঢ়তেজা হইয়া বাস করেন। তিনি গোপবালকদের সহিত বৎস চারণ করিতে করিতে মুগ্ধসিংহ শিশুর ন্যায় যমুনাতীরস্থ উপবনে বিহার করিতেন। তাঁহার কৌমারচেষ্টা দেখিয়া ব্রজবাসীদের হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। তিনি বংশীধ্বনি করিয়া অনুচর গোপালদিগকে ক্রীড়া করাইতেন। সেই সময় রাজা কংস তাঁহার প্রাণ-সংহারাভি-

প্রায়ে কামরূপ নানা মায়াবীকে প্রেরণ করে। বালক ভগবান্ অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ সংহার করেন। যমুনার জল কালীয় বিষে বিষাক্ত হইলে তিনি কালীয়ের প্রাণবধ করিয়া গোপ-গোপীকে নির্ব্বিষ জল পান করান। গোপরাজ নন্দের বিত্তের সদ্ব্যয়ার্থ তাঁহাকে গো-যজ্ঞ করান। প্রবল বর্ষাপাতে ব্রজপুর কাতর হইলে তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লীলাতপত্র করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করেন। তিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নাপ্লুত বনভূমিতে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এইরূপে একাদশ বর্ষ বৃন্দাবনে বাস করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় রাজা কংসকে নিহত করিয়া পিতামাতার কারামোচন করেন। তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবার মাত্র উপদেশে ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ম্বরকালে সমাহূত অসংখ্য নৃপতিগণের সমক্ষে গান্ধর্ব্ব বিধানেতে রুক্মিণীকে হরণ করেন।

"কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য নৃপতিকে মিলিত করিয়া পরস্পরদ্বারা তাহাদের সংহার করাইয়াছিলেন। যখন দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ভূমিশায়ী হন তখন তিনি তাহার দুর্দ্দশা দর্শনে আনন্দিত হন নাই বরং অবিসহ্য যাদবকুলের বিনাশ চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সাধুপথ প্রচলন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উত্তরার গর্ভ অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্রে নিদগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে তিনি তাহা রক্ষা করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারই মতে অবনীমণ্ডল রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভগবান্ দ্বারকাপুরীতে স্নিগ্ধ সস্মিতদৃষ্টি, পীযূষতুল্য বচন ও শ্রীর নিকেতনস্বরূপ নিজ স্নেহদ্বারা পুরীস্থ সকলকে আমোদিত করিতেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া যদুকুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন ঋষিদের কোপ উৎপাদন করিল।

ঋষিগণ ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অভিশাপ দিলেন। যাদবগণ প্রবাসতীর্থে গমন করিল। তথায় তীর্থোদক দ্বারা দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুল দান করিল। ক্রিয়া সমাপ্তির পর তাহারা মদিরা পান করিয়া জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিল।

"ভগবান্ এই সমস্ত দর্শন করিয়া সরস্বতী জলে আচমনপূর্ব্বক একটী অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিলেন। এই সমস্ত ঘটনার পূর্ব্বে দ্বারাবতীতে আমাকে বদরিকাযাত্রা করিতে আজ্ঞা করেন। আমি তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। আমি প্রভাসে পঁহুছিয়া দেখিলাম তিনি অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম রাখিয়া উপবিষ্ট আছেন। যদিচ সে সময় বিষয়সুখ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলাম যেন তিনি আনন্দপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। সেই সময় সেখানে ভগবানের অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি পর্য্যটন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ভগবান্ আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমি জীবলোক ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছি। এসময় এই নির্জ্জন স্থানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি সৃষ্টির উপক্রম সময়ে ব্রহ্মাকে পরমজ্ঞান বলিয়াছিলাম।' ভগবানের কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহভাজন হইয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং আমি উপরুদ্ধকণ্ঠ হইলাম, অনেকক্ষণ পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলাম, 'ভগবন্! যে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের কোনটাই দুর্ল্লভ নহে। কিন্তু আমি সে সকল আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার মন কেবল তোমার চরণসেবার জন্য উৎসুক। হে প্রভো! তুমি নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যে কর্ম্ম কর, অজ হইয়াও যে জন্ম লও, আর কালস্বরূপ হইয়াও যে অরি ভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর এবং আত্মারাম হইয়াও যে ভূরি ভূরি নারী-সমভিব্যহারে গৃহস্থধর্ম্মাচরণ কর, ইহা দেখিয়া বিদ্বানরাও বুদ্ধিহারা হয়। প্রভো! তোমার বিস্তা-

শক্তির অভাব নাই। আপনি সকল মন্ত্রণা করিতে পারিতে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অজ্ঞের ন্যায় আমাকে আহ্বান করিয়া অবহিত হইয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিতে, এই সব যখন আমার স্মরণ হয় তখন আমি অস্থির হইয়া পড়ি। হে ভগবন! ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান বলিয়াছিলে উহা যদি আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়, বলুন।' এই অভিপ্রায় নিবেদন করিলে কমললোচন ভগবান্ স্বীয় পরমা স্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন। এইরূপে তাঁহার নিকট পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হই। পরে তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিরহে আতুর হইতেছে।" এইরূপে ভগবানের অমৃতকথা প্রসঙ্গে নিমেষে রাত্রি যাপন করিয়া বিদুরকে মৈত্রেয় মুনির নিকট যাইতে উপদেশ দিয়া উদ্ধব প্রস্থান করিলেন।

উদ্ধব মহাপ্রাণ ছিলেন। তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

তাপত্রয়েণ অভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনি ঈশ।
পশ্যামি ন অন্যৎ শরণং তব অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ অমৃতাভিবর্ষাৎ॥
দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলে অস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্র সুখোরুতর্ষং।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়া অপবর্গৈঃ বচোভিঃ আসিঞ্চ মহানুভাব॥

ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপে তাপিত সন্তপ্তজনের তোমার অমৃতবর্ষ পাদযুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন অন্য শরণ দেখিতেছি না। এই সংসারকূপে মানুষ পতিত, কাল-অহি কর্ত্তৃক দষ্ট, সুখ ক্ষুদ্র কিন্তু মানুষ উরুতৃষ্ণায় তৃষিত। হে মহানুভব! কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর এবং অপবর্গবোধক বাক্যামৃতদ্বারা অভিষিক্ত কর।

ভারতীয় শিক্ষা

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

The Sannyasin, as you all know, is the ideal of the Hindu's life, and every one by our Shastras is compelled to give up. Every Hindu who has tasted the fruits of this world must give up in the latter part of his life, and he who does not is not a Hindu, and has no more right to call himself a Hindu. We know that this is the ideal—to give up after seeing and experiencing the vanity of things.—VIVEKANANDA.

প্রত্যেক জাতির চরিত্রের উপর তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্ভর করে। জাতীয় চরিত্র যদি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক হয় শিক্ষাও ঠিক তদনুযায়ী হইবে। এই চরিত্র তাহার উপাদান সংগ্রহ করে তত্তদ্দেশীয় জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে। শীতপ্রধান, অনুর্ব্বর বা পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক সাধারণতঃ কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বার্থপর হয়। পারিপার্শ্বিক সংগ্রামে জয়ী হইয়া কোন প্রকারে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সে নিজেকে সুখী মনে করে। জীবনসংগ্রামে আমরণ পরিশ্রম করিয়া জগদান্তরালে বা হৃদয়-গুহায় কোন্ অনাদি, অনন্ত সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার তাহার সময় কোথায়? জরা, মরণ, ব্যাধি দুই একবার হয়ত কাহারও হৃদয়ে ক্ষণ-স্পন্দনের সঞ্চার করে কিন্তু সে বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীর অনুরণন্ কাহারও কর্ণপটাহে আঘাত করে না, সে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ধীরে ধীরে আকাশেই লীন হইয়া যায়। তাহার সকল চেষ্টা, সকল শিক্ষা কেবল ভোগমুখী, তাহার সাহিত্য কামোদ্দীপক, তাহার বিজ্ঞান সর্ব্বসংহারী, তাহার দর্শন জড়প্রাণ। সে অপরকে কি শিক্ষা দিবে—তাহার শিক্ষা বলে

'আগে আমি, পরে তুমি—আমার ভোগের জন্য তোমার সৃষ্টি।' তাহার শিক্ষা জানে, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য সম্পাদন করিতে, সুশান্ত শান্তি-পরায়ণ হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে।

কিন্তু ভারত তাঁহার সন্তানকে সে ভাবে পালন করেন নাই। করুণাময়ী চিরকালই নিজের সন্তানকে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং পরদেশে যে বিদ্যা চাহিয়াছে তাহাকে বিদ্যা, যে আশ্রয় চাহিয়াছে তাহাকে আশ্রয়, যে ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছে তাহাকে তাঁহার শেষ কপর্দকটী পর্য্যন্ত দান করিয়া, পরে বিন্দুবিন্দু নিজ শোণিত দানে তাহার পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। আর তাঁহার সন্তানের জন্য রাখিয়াছেন নিজ শুদ্ধ চেতন দেহ—সেই চির-শস্য-শ্যামল অঞ্চল, অভ্রভেদী তুষার-মণ্ডিত কিরীট, ভ্রূমধ্যে বালার্ক সিন্দুরফোঁটা, চন্দ্রকলা-প্রতিফলিত গঙ্গাযমুনার হার, পাদপ্রক্ষালনকারী সুনীল বারিধি, মানব দুঃখে উত্তপ্ত মরুহৃদয়, নক্ষত্রশোভিত নির্ম্মল ললাটাকাশে ঘন বলাহকের কুন্তলদাম এবং তদুপরি চপল বিদ্যুল্লেখা এবং নিবিড় তরুচ্ছায়ায় শান্ত শীতল ক্রোড়—আর শিখাইয়াছেন ভুবন-মন-মোহিনী নিজ মাধবী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির উপাসনা করিতে—পরে তাহারও অন্তরবর্ত্তী অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপমব্যয়ম্ সেই 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্তুতি সুন্দরী'র রূপসাগরে ডুব দিয়া অবাক্ আত্মহারা, দিশেহারা হইয়া 'নুনের পুতলের' আমিত্বটুকু চিরতরে লীন করিতে। এ সাধনার মন্ত্র ত্যাগ, এ সাধনার অর্ঘ্য পবিত্রতা। যুগযুগান্তরব্যাপী কত অত্যাচার, অবিচারের মধ্য দিয়া ভারত-ভারতী এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। জড়-বিজ্ঞান-দর্শনের মোহে পড়িয়া সে আজ পাষণ্ড সাজিতে পারে কিন্তু সে পোষাক তাহার ভাল লাগিবে না যখনই সে বিবেকদর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইবে তখনই সে সেই সাজ পোষাক থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কারণ, ত্যাগই তাহার প্রকৃতি, ত্যাগই তাহার ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য। ভারতের ব্রহ্মচারী সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-ত্যাগী, গৃহস্থ বহুজন-হিতায় স্বোপার্জ্জিত সমগ্র বিত্তত্যাগী, বানপ্রস্থী সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী।

ভারতে শ্রমজীবী পরসেবায় জীবনপাত করে, পরের সম্ভোগের জন্য বণিকের শিল্প বাণিজ্য, দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য যোদ্ধার অস্ত্র ধারণ, আর সকল সুখসম্পদ-ত্যাগী ধর্ম্মরাজ্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। ভারতের রাজা কখনও ছলে বলে কৌশলে পররাজ্য অপহরণ করেন নাই। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিতেন বটে—কিন্তু "ছত্র ও চামর" ব্যতিরেকে প্রতিক্ষণেই তিনি তাহার সমগ্র বৈভব প্রজাকে দান করিতে প্রস্তুত। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া এ দেশের রাজা রাম, যুধিষ্ঠির, অশোক ; এদেশের ক্ষত্রিয় ভরত, ভীষ্ম,চণ্ড। ইদানীং যাহারা ত্যাগের অগ্নিদীক্ষা ভুলিয়া ইন্দ্রিয় ভোগের অনাধিক্য হেতু দুঃখিত, তাহাদিগকে অতীত ভারতের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তক সন্ন্যাসী—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

নানাদেশের সহিত তুলনা কর, দেখিবে সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ কতদূর ঋণী। "নিরীহ হিন্দু" এই তিরস্কার বাক্যের মধ্যে কত সত্য নিহিত আছে। জগতের নানা দেশে নানা সত্য উদ্ভূত হইয়াছে, নানা শক্তিশালী জাতি তাহাদের প্রচার করিয়াছে কিন্তু ঐ প্রচার রণভেরীর নির্ঘোষে, গর্ব্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত হইয়াছিল। প্রতি প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ভারত, যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার-গর্ভে লুক্কায়িত, আধুনিক ইউরোপ যখন জার্ম্মনীর গভীর অরণ্যমধ্যে নীলবর্ণে দেহ অনুরঞ্জিত করিত, ইতিহাস যে যুগের খবর রাখে না, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সে যুগেও ভাবের পর ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতে কেবল ভারতই যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা দেশ জয় করে নাই। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, গ্রীক-বাহিনীর বীরদর্প এখন কোথায়? রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয় পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গেল? কত জাতি উঠিয়াছে, পড়িয়াছে কিন্তু ভারত যেমন তেমনই রহিয়াছে কেন? কেন তাহারা

মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব-বিস্তারপূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়ক কলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া জল বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে ?

কিন্তু সত্যই কি ভারত কখন পরদেশ ইচ্ছাপূর্ব্বক জয় করে নাই ? এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প কি কখনও তাঁহার ছিল না ?—অবশ্য ছিল, কিন্তু সে সমরনীতির বাহিনী ছিল রাজর্ষি ও সন্ন্যাসী, দুর্গ ছিল চরিত্র ও সঙ্ঘ, পতাকা ছিল আত্মবলির রক্তদণ্ডের উপর ত্যাগের গৈরিক, তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন খাল বিল, নদী নালা, পাহাড় পর্ব্বত নয়, চিন্তা রাজ্য, আধিপত্য করিয়াছিলেন নিগড়বদ্ধ দেহের উপর নয়—হৃদয়ের উপর।

সর্ব্ব প্রথম বিস্তৃতভাবে ভারতীয় শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সময়। তৎকালীন শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া যে অপূর্ব্ব নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রায় পৃথিবীর সমগ্র অসভ্য জাতির উপর আধিপত্য করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, রাক্ষসরাজ রাবণের বধের জন্য যখন বানর-রাজ সুগ্রীবের আদেশে সৈন্য সংগ্রহ হয় তখন নানা দেশীয় এবং নানা জাতীয় বানর ও ঋক্ষনামক অসভ্য জাতিরা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতির পতকা তলে সমবেত হয়। তাহার মধ্যে কোনও কোনও জাতি লোহিত-বর্ণ, কোনও জাতি শ্বেত বর্ণ, কোনও জাতি বা শ্যামল, কেহ বা পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে, কেহ বা সমুদ্রতট হইতে আগমন করিয়াছিল। ইহারা যে মধ্যভারত, হিমালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম এবং মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তত্তদ্দেশীয় আকৃতি ও বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরে সুগ্রীব সমবেত সৈন্যগণকে সীতা-দেবীর অন্বেষণের জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই তাহাদিগকে যবদ্বীপ (Java) এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসকলেও অনুসন্ধানের জন্য বলা হইয়াছিল। এবং অপর দিকে ইক্ষু সমুদ্রের ধারে (বোধ হয় পারস্যোপসাগর), অসুরদের রাজ্যের (Assyria) পর লোহিত সাগর (আরব সাগর বা শঙ্খ

সাগর) পার হইয়া গরুড়দেবের মন্দির যে দেশে আছে সেই সকল দেশেও (Egypt—"beaked headed winged statues"—ম্যাস-প্যারো লিখিত ইজিপ্ট এবং কালদের ইতিহাসের পক্ষীদেবতার—চিত্র দেখ) অনুসন্ধান করিবার জন্য বলা হয়। পরে সমুদ্রের পর-পারে স্বর্ণ-খচিত জটারূপ পর্ব্বতের কথা আছে। ইহা মেক্সিকো (Mexico) বলিয়া বোধ হয়। মেক্সিকো সংস্কৃত 'মাক্ষিক' শব্দ হইতে আসিয়াছে। মাক্ষিক-শব্দের অর্থ স্বর্ণ। জটারূপের সংস্কৃত অর্থ স্বর্ণ। পরে নাগরাজ অনন্তের আবাসে অনুসন্ধানের কথা আছে। যেখানে সুবর্ণ পর্ব্বত সৌমাংস দণ্ডায়মান। সূর্য্যদেব জম্বুদ্বীপ অতিক্রম করিয়া প্রভাতে এই পর্ব্বতচূড়া হইতে উদিত হন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, উল্লিখিত স্বর্ণস্থান আমেরিকা। প্রাচীন আমেরিকায় সর্পের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তদ্দেশীয় আদিমবাসীরা নাগ-চিহ্ন ধারণ করিত। হিন্দুরা যে কলম্বসের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আমেরিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন সে সম্বন্ধে অপর স্থানে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ডাক্তার জন ফ্রেজার (Dr. John Fraser L. L. D) বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যদিগের প্রসারের সহিত কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়ী অনার্য্যেরা একদিকে পোলেনেসিয়া (Polynesia —Australia, Eastern Peninsula, Indonesia and Ocenia, Melanesians) অপরদিকে লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ হইতে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাহার প্রমাণে তিনি বলেন যে, মাদাগাস্কারে যে ভাষা প্রচলিত তাহা ও ১২০ অংশ দ্রাঘিমার নিকটবর্ত্তী মধ্য ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপনিবাসীদের সমোয়া (Samoa) ভাষা প্রায় একই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সিংহলের অনার্য্যদের আকৃতি প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য অতি নিকট (Polynesian Journal, Vol. IV, December 189,)। শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলারও তাঁহার 'Science of Religion' নামক গ্রন্থে এ বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদের বক্তব্য এই যে,

অনার্য্যদের দেশান্তর প্রাপ্তি তরবারির দ্বারা হয় নাই। উহা সর্ব্বচরাচরপালক মহারাজ রামচন্দ্রের বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের ফলেই হইয়াছিল। নানা অসভ্য দেশে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনীর সহিত ভারতীয় সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ দেশের অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কাহাকেও অনিচ্ছাসত্বে বিতাড়িত করেন নাই। বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়াছিলেন, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য দিয়া সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সৈন্যদের প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত নানাদেশে তাঁহার যশঃ-মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহা নানা দেশীয় গ্রন্থের আবিষ্কারের সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। "শ্যাম দেশীয় ভাষায় বিরচিত বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অন্তর্গত রাম ও লক্ষণ চরিত্র, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাত্ম্য কথন, সুগ্রীব-সহোদর বালিরাজার বৃত্তান্ত এবং কাম ধেনু, নাগ কন্যা, যক্ষ, রাক্ষসাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ভাষায়ও রামচরিত্রাদিবিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত উভয় ভাষাতেই ঐ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতর কাব্য ও নাটক বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণরূপে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই" (Asiatic Researches London, Vol x., 1811, pp 234 and 248—251)। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগে "ভারতবর্ষীয় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে নীত হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি প্রকাশ করিয়াছে। কেবল যব ও বালি দ্বীপে নয়, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল, নানা বিষয়ে তাহার অনেকানেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সুমাত্রা, লেম্বা, সেলিবিজ প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলী ও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের ন্যায় কবর্গ,

চবর্গাদি বর্গ-বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়" (The Journal of the Indian Archipelago vol II. No xii, pp. 770—774.)। পুনরায় আমেরিকাখণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া (Peru) দেশে প্রচলিত 'রামসীতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতি-গণের সূর্য্যবংশ ও ইক্ষুকুল (Dynasty of Sugar-cane) হইতে উৎপত্তি প্রবাদ, ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম "সিবু" প্রভৃতি হইতে সম্রাট রামচন্দ্রের অতুলনীয় প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (A. R. vol. I. p. 426)।

ভারতের জগৎশিক্ষার দ্বিতীয় অভিযান হয় শ্রীকৃষ্ণের সময়। তিনি একদিকে যেমন অর্জ্জুনের এবং উদ্ধবের প্রতি উপদেশের দ্বারা তৎকালীন মানবের আধ্যাত্মিককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, অপর দিকে দুরন্ত রাজাদিগেরও সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া জগতে শান্তি-বিধান করিয়া যান। তাঁহার প্রভাব যে শুধু ভারতেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে; মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন প্রায় সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডই উহা অনুভব করিয়াছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদিগের নিকট যে এই ধর্ম্ম পরিচিত ছিল তাহা ভীলসার (Bhelsa) একটি বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তর-অনুলিপিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ লিপিতে আমতালিকিতা (Amtalikita) বলিয়া একজন মহারাজের নাম আছে। এই আমতালিকিতা যে গ্রীকরাজ অ্যানটিয়ালকাইডাস (Atialkidas), সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কানিংহাম (Cunningham) তাঁহার রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন ১৭৫ খৃঃ পূঃ, কিন্তু উইলসন সাহেব স্থির করিয়াছেন ১৩৫ খৃঃ পূঃ (vide the Journal of the Royal Asiatic Society, of the year 1909, Part IV, Oct.)। অপর দিকে বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কালযবন গার্গ্যের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৌশলে নিধন করেন। এই কালযবন অসুর

যে কালদে (Chaldea) নিবাসী তাহাও নানা কারণে বেশ অনুমিত হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন আমরা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে এই বিষ্ণুর উপাসনা ভারতে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ১ম, ২৩ সূক্তের ১৭ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূলহমস্য পাংসুরে॥ ১৭॥

"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" যাস্ক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ।" নিরুক্ত ১২।১৯। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধেপদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন ত্রেধা ভূবে কমিতি। সমারোহণে উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদ মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।"

ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে বৈদিক হিন্দুগণ সূর্য্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন। সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে গমন, বিষ্ণুর এই তিন পদবিক্ষেপ।—ঔর্ণবাভ।

তাই শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উপরোক্ত মন্ত্রের টিপ্পনিতে বলেন,—"এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎবিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন,

'বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের।' অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।—৬।১৫॥) শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে, বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। (শতপথ-ব্রাহ্মণ। ১। ২। ৫॥) ঐ ব্রাহ্মণে (১৪। ১। ১) বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫। ১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৭। ৫) এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণুর বামন অবতার, বলিরাজার দমন ও হয়গ্রীবোপাখ্যান সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে!*

"বিষ্ণু সূর্য্যের একটি নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটি নাম মাত্র; তিনি পুরাণের জগৎপাতা পরমদেব হইলেন কিরূপে? ইহা মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেদরচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্য্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্য্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য্য, আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কার্য্য মাত্র, একজন কর্ত্তা এই কারণসমূহের দ্বারা, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন, সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের কি নাম দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন,

* মৎস্য—শতপথ ব্রাহ্মণ ১। ৮। ১॥; বরাহ—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭। ১। ৫॥; কূর্ম্ম—শতপথ ব্রাহ্মণ ৭। ৫। ১। ৫॥; হয়গ্রীব—শতপথ ১৪। ১। ১॥; বামন—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬। ১৫॥ শতপথ ১। ২। ৫॥

তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া" থাকেন, এরূপ বর্ণনা বেদে আছে; অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্য্যের 'বিষ্ণু' নামটী গ্রহণ করিয়া জগতের পালনকর্ত্তাকে সেই নাম দিলেন।" কিন্তু এই বহুদেবতার উপাসনা সত্বেও বৈদিক ঋষিরা যে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী পরম দেবতাকে জানিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। তৎকালীন ভারত-ভারতী প্রকৃতির প্রতি বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মনীষী ছিলেন তাঁহারা আবার ঐ সকল দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক সৎ দেবতার অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ঐ বিজ্ঞান পৌরাণিক যুগে সাধারণ মানবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন ও হয়গ্রীব অবতারের প্রসঙ্গ থাকিলেও প্রকৃত অবতারতত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল পৌরাণিক যুগে। এই যুগেই হর-গৌরী অবতারে বৈদিক অগ্নিরুদ্রাদি দেবতা শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া শ্রীভগবানের সংহারমূর্ত্তির অপূর্ব্ব প্রকটন করিয়াছে। সেইরূপ আবার বৈদিক নানা আখ্যানসমন্বিত সূর্য্যদেবতা, রাম ও কৃষ্ণ অবতারে লীন হইয়া শ্রীভগবানের পালনীশক্তির অত্যাদ্ভুত প্রকটন করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই যুগে সাংখ্য দর্শনের মহদাদি তত্ত্ব বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। ঋগ্বেদে আছে,—

ইংদ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদংত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

"(এই আদিত্যকে) মেধাবিগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে।"

মূলে "সুপর্ণঃ গরুৎমান্" আছে। "সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুৎমান্ গরণবান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব।"—

সায়ন। আদিত্যরূপ বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক কথা আছে, তাহা এইরূপ বৈদিক উপমা হইতে বোধ হয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে রামায়ণপরিচিত ইজিপ্ট ও আসিরিয়া দেশীয় গরুড় দেবতাও বোধ হয় এই দেশ হইতেই গিয়াছে। যে সকল বেদনিন্দুক, ভগবদ্দ্বেষীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদের শব্দজালবিস্তার সত্ত্বেও আমরা উপরোক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ছান্দগ্যোপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ, অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (যথা রথপালসূত্রসন্নে, ললিতবিস্তার) কেশবের কুন্তলের মাধুরীবর্ণন এবং শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক ভগবদ্ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিয়া আর কোনও সংশয় আমাদের হৃদয় অন্ধকার করে না। শ্রীকৃষ্ণ ভারত-ভারতীর হৃদয়ের রাজা। তাহারা তাঁহাকে বহু মন্ত্রতন্ত্রে দর্শন করিয়াছে, বহু ছন্দে-বন্দে বর্ণনা করিয়াছে,—নাস্তিকের নাস্তিকতা কি তাঁহাকে ভুলাইয়া দিতে পারে? তাঁহার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর, হিমানীর ন্যায় মহান, পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ; তাঁহার শাসন এখনও ভারতে অপ্রতিহত।

এইরূপে শ্রীভগবান তাঁহার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ লীলাভূমি ভারতে আগমন করিয়া যুগে যুগে দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনের দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তৃতীয় মহাভিযানের শ্রেষ্ঠ নেতা শ্রীবুদ্ধদেবের শিক্ষা ও প্রচার লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতেই মানসিক ভাব ও অনুভূতিসকল উৎপন্ন হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই এইরূপ মত। পাশ্চাত্যের শারীর-বিজ্ঞানের (physiology) আলোচনায় দেখা যায়, আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগতের পদার্থসকলের সঙ্ঘর্ষে উপস্থিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত ও কম্পিত হইয়া উঠে ; ঐ কম্পন স্নায়ুমণ্ডলী অবলম্বনে ক্রমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় এবং মস্তিষ্ক উহার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করিয়া থাকে, ঐরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই আমাদিগের অন্তরে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির এবং বাহ্য বস্তুসমূহের অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ পদার্থবিশেষ বলিয়া মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কোথায় ?

প্রাচ্য-দর্শন কিন্তু পাশ্চাত্যের সহিত ঐ বিষয়ে একমত নহে। উহা বলে, মানবের নিত্য উপলব্ধ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদিকালে সময় সময় এমন প্রত্যক্ষসকল দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগের আলোচনায় পাশ্চাত্য দর্শনের ঐ মত অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণেরও কেহ কেহ ঐ কথা স্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছেন, ঐরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষনিচয় বিরল হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নহে। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সিজার লম্ব্রসো (Cæsare Lombroso) দুষ্কৃত-কারিদিগের বাহ্যান্তর গঠনপরিণতি (Criminal Anthropology) নামধেয় শারীর-বিজ্ঞানের নূতন এক অঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকে বায়ুরোগগ্রস্তা (হিষ্টিরিয়া) এক বালিকার অত্যদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বিবরণী হইতে কতকগুলি

কথা এখানে উদ্ধৃত করিলে আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের সহায়তা হইতে পারে।

এই বালিকার বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর ছিল। তাহার পিতা এক জন অতি বুদ্ধিমান, কার্য্যক্ষম এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া সমগ্র ইতালীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। হিষ্টিরিয়া হইবার এক মাস পর হইতে ঐ বালিকা তরল খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু খাইতে পারিত না এবং অনেক সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় (Somnambulism) উঠিয়া সকল প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইত। গৃহকার্য্যে ও সঙ্গীতচর্চ্চায় ঐ সময়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত এবং পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহার কিছু দিন পরে তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। বালিকার চক্ষুর দৃষ্টি বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তাহার নাসিকাগ্রে এবং বাম কর্ণপত্রের নিম্নভাগে (ear-lobe) দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হইল। শরীরের ঐ দুই স্থান বিশেষতঃ নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া সে সকল প্রকার লেখা পড়িতে লাগিল! সিজার লম্ব্রসো যৎকালে বালিকাকে পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ডাকঘর হইতে একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখন বালিকার চক্ষুদ্বয় বেশ করিয়া তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া ঐ চিঠি তাহাকে পড়িতে দিয়াছিলেন এবং সেও উহা তাঁহার সমক্ষে অনায়াসে পাঠ করিয়াছিল। বালিকার নাসি-কাগ্রে ও বাম কর্ণে আবির্ভূত ঐ দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার পরিমাণও লম্ব্রসো পরীক্ষাপূর্ব্বক স্বরচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চক্ষুর উপর আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া দিলে যেরূপ ক্লেশ উপস্থিত হয়, বালিকার নাকের এবং বাম কর্ণের যেখানে দৃষ্টি-শক্তি নিহিত ছিল, সেই স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া দিলে সেইরূপ অসচ্ছন্দতার উদয় হইত। লম্ব্রসো ঐরূপে ঐ বিষয় পরীক্ষা করিবার কালে বালিকা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল,—'তুমি কি আমাকে অন্ধ করিতে চাও?'

দর্শনশক্তির ন্যায় এই বালিকার ঘ্রাণশক্তিও স্থানচ্যুত হইয়াছিল। নাসিকা ছাড়িয়া উহা চিবুকের নীচে আবির্ভূত হইয়াছিল। যে এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ মানবসাধারণ কষ্টে সহ্য করে তাহা এই বালিকার নাসিকার নিকটে ধরিলে সে কিছুমাত্র গন্ধ পাইত না। কিন্তু কটু বা মৃদু গন্ধবিশিষ্ট কোন পদার্থ তাহার চিবুকের নিকটে আনিলে সে উহা অনায়াসে অনুভব করিত। কোনরূপ দুর্গন্ধ আসিলে হস্ত দ্বারা নিজ চিবুক চাপিয়া ধরিত এবং মস্তক দোলাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিত। ঐরূপে কোনরূপ সুগন্ধ আবার তাহার চিবুকের নিকটে ধরিলে সে চক্ষু মুদ্রিত ও মৃদুহাস্যপূর্ব্বক জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া আনন্দের ভাব প্রকাশ করিত।

প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বয় স্থানভ্রষ্ট হইবার কিছুকাল পরে এই বালিকাতে দূরদর্শনশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে এই কালে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা দুই বৎসর মধ্যে সফল হইয়াছিল এবং দেড় মাইল দূরস্থিত একটি নাট্যালয়ের কোনখানে বসিয়া তাহার ভ্রাতা অভিনয় দেখিতেছে তাহাও এক দিবস নিজ ভবন হইতে দেখিতে পাইয়াছিল।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ সিজার লম্ব্রসো কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শারীরিক বিকৃতিপরিণতিই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে মন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জড় দেহের বিকৃতাবস্থায় মনের ঐরূপ অসাধারণ ক্রিয়া ও শক্তিপ্রকাশ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা আমরা কলিকাতার মেডিক্যাল ক্লাবের মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছি।* লেখক ঐরূপ ঘটনাবলীর সহায়ে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান যে, জড় স্নায়ুমণ্ডলী অবলম্বনে মানসিক শক্তি সাধারণতঃ প্রকাশিত হইতে দেখা যাইলেও উহা স্নায়ুমণ্ডলী ব্যতিরেকেও আত্ম-

* Vide, Jouınal Calcutta Medical Club Vol. V, Page 222.

প্রকাশ করিতে সময়ে সময়ে সক্ষম হইয়া থাকে। মনের ঐ অপূর্ব্ব শক্তিকেই আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে মানবের 'অজড়' ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করিয়াছি। স্নায়ুমণ্ডলীর বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট সুস্থাবস্থা ও নিত্যপরিদৃষ্ট সাধারণ শক্তি অনেকাংশে লুপ্ত হইবার পরে মনের অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশের যে সকল বিবরণ আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহা হইতে আমাদিগের মধ্যে ঐ অজড় ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে সকল প্রতিভাশালী মনীষী পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনে এমন কতকগুলি অসাধারণ প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, দর্শন অথবা প্রত্যাদেশ উপস্থিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সংসারভূমির নহে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান উহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে আংশিক উন্মত্ততার পরিচয়ই এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

সক্রেটিস (Socrates) নিজ জীবনের জটিল সন্ধিস্থলসমূহে কোন পথে চলিতে হইবে—কোন বিষয় করিতে এবং কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে, তদ্বিষয়ক প্রত্যাদেশ লাভপূর্ব্বক উহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ইংরাজী বিশ্বকোষে (Encyclopaedia Britannica) সক্রেটিস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে, তাহাতে সক্রেটিসের ঐপ্রকার অসাধারণ অনুভূতির আলোচনাপূর্ব্বক নানা কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হজরৎ মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই কোরাণাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইত জানিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাঁহার মৃগীরোগ ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লডার ব্রাণ্টন (Lauder Brunton) ঐ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশলাভরূপ হজরৎ মহম্মদ সম্বন্ধে যে কথা প্রসিদ্ধ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত মৃগীরোগের খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে;

পটাস্ ব্রোমাইড খাওয়াইয়া তাঁহার চিকিৎসা করা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস নিশ্চয় ভিন্নাকার ধারণ করিত।

প্রাচীন যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মা পৃথিবীকে ধর্ম্ম-ধনে ধনী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধিবলে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নূতন সত্যসমূহ আবিষ্কারপূর্ব্বক লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এরূপ কথা কখন বলেন নাই। তাঁহারা সতত প্রচার করিয়াছেন, দৈবশক্তিবলে তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিতে আরূঢ় হইয়া যে অলৌকিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, ত্রিবিধ দুঃখ বন্ধন হইতে মুক্ত ও অনন্ত শান্তি এবং আনন্দের অধিকারী করিবার জন্য তাহাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। উপনিষদাদি গ্রন্থে ঋষিগণ বিশ্ব জগতের কারণ সম্বন্ধে যে সকল চরমতত্ত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা ঐরূপেই বলা হইয়াছিল। স্বীয় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা তাঁহারা ঐ বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ বিচারবুদ্ধিসহায়ে নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আবিষ্কারপূর্ব্বক আমরা জ্ঞানের পথে যতই অগ্রসর হইতেছি ততই ঋষিদিগের প্রচারিত ঐ অমূল্য বাক্যসকলের সত্যতা সম্বন্ধে সমর্থন পাইতেছি। ইহা স্বল্প বিস্ময়ের কথা নহে। ঐরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন স্বপ্নতত্ত্বের যথাযথ আলোচনা আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বুঝিবার পথেই অগ্রসর করিবে।

জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যে সকল অসামান্য অনুভূতিকে উন্মাদের লক্ষণ (hallucination) বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কর্ম্ম-জগতেও তাহা কখন কখন অসাধ্য সাধন করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে পাশ্চাত্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জোয়ান্ অব আর্কের (Joan of Arc) কথা এখানে বলা যাইতে পারে। সেই প্রাচীন যুগে ফ্রান্সের 'স্বাধীনতাসূর্য্য ইংলণ্ডের প্রবল প্রতাপে অস্তমিতপ্রায় হইলে এক ষোড়শী কৃষক-কন্যা রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং শত্রুর কবল হইতে দেশ পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক যুবরাজের রাজ্যাভি-

ষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিল। যথার্থই সে প্রত্যাদেশ পাইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে পরীক্ষাও করা হইয়াছিল। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার কালে যুবরাজের এক বন্ধু রাজবেশ এবং যুবরাজ স্বয়ং পরিচারকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জোয়ান তাহাতে প্রতারিতা না হইয়া যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে রাজন, আপনার ছদ্মবেশ কি আমাকে প্রতারিত করিতে পারে? আমি যে মনশ্চক্ষে আপনার মূর্ত্তি দেখিয়াছি।"

পরে যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। জগতের ইতিহাসে তাহা এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। ফ্রান্সের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সেই দরিদ্রা, অশিক্ষিতা, নগণ্যা কৃষক-কন্যকা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল!

ঐরূপে প্রতিভাশালী ঈশ্বর-সাধকদিগের ন্যায় বিশিষ্ট কর্ম্মিদিগের জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহাকে উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিসকলের মধ্য দিয়াই তাহাদিগের অসাধারণত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট সুস্থ স্নায়ুমণ্ডলীযুক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তথাকথিত অসুস্থ স্নায়ুমণ্ডলীযুক্ত লোকদিগের মধ্যেই ঐ অসাধারণত্ব সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।* পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান যাহাকে স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থ ও সহজ অবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে তাহা মানবের অন্তরনিহিত অসাধারণ শক্তিসকলের বিকাশের পথে অন্তরায় হয় বলিয়াই কি ঐরূপ হইয়া থাকে? নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte) এবং জুলিয়াস সিজার পৃথিবীর ইতিহাসে দুইজন অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ছিলেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে কিন্তু তাঁহারা উভয়েই এক প্রকার মৃগীরোগাক্রান্ত ছিলেন। নিৎজে (Nietzsche), সুইফ্‌ট (Swift),

* The Insanity of Genius—J. F. Nisbet.

স্কোমান (Schumann), ল্যাম্ব (Lamb) ইঁহারা সকলেই জীবৎকালে কখন কখন উন্মাদ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।* কেপলার (Kepler), বেকন (Bacon), টার্নার (Turner) পাগলের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাগলের বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির উদাহরণ আমাদের দেশেও বিরল নহে। দূরদৃষ্টিমূলক স্বপ্নসকলের ন্যায় উপরোক্ত ঘটনাগুলি ও কি আমাদিগের অন্তরে অজড় ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচনা করে না? দূরদর্শনশক্তি সম্ভবতঃ কেবলমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও উহার অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। মনস্তত্বানুশীলন সভার পত্রিকায় (Journal of the Psychical Research Society) ঐ বিষয়ক অনেকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।†

নিম্নশ্রেণীর জীবের দূরানুভূতি থাকা স্বীকার করিলে আমরা এক্ষণে যাহা ভাল বুঝিতে পারি না জৈব জীবনের এমন কতকগুলি ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।‡ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থায় স্নায়ুমণ্ডলী একপ্রকার সচরাচর অদৃষ্ট অবস্থা লাভ করে। ঐ অবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষে দূরদৃষ্টিশক্তির বিকাশ হইয়াছিল আমার জানা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পুস্তকাদিতে এই অবস্থায় দূরদৃষ্টিশক্তি বিকাশের কথা বিরল পাওয়া যায়। প্রফেসর উইলিয়াম গ্রেগরী (Professor William Gregory) ঐ সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন—"ব্রেড (Braid) এই অবস্থাগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে দূরদৃষ্টির ঘটনা দেখেন নাই এবং নিজেও কখন উহা উৎপাদন করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐ অবস্থায় দূরদৃষ্টি প্রকাশ হইতে পারে,

* Vide British Medical Journal, June, 1911.

† Vide Journal of the Psychical Research Society, Vol. XI. pp. 278-290 and pp. 323-4; the same Vol. XII. pp. 21-3; the same Vol. IV. pp. 289.

‡ e.g. Chemio-tanis,

একথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি ব্রেডকে বিশেষরূপে মান্য করি, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি গভীর গবেষণার পরিচায়ক নহে। আমি ঐ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিবার বহুদিন পরে এইরূপ উচ্চ স্তরের ঘটনা দেখিতে পাইয়াছি। * আমাদিগের ধারণা দূরদৃষ্টিপরিচায়ক ঘটনা, স্বপ্নের ন্যায় হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থাতেও কচিৎ ঘটিয়া থাকে। সম্ভবতঃ উহা হিপ্‌নোটাইজ্‌কারীও ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত—কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয় ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। ঐ অবস্থায় (হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্‌) আমি যে স্থলে দূরদৃষ্টি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি, সেইখানে ঐ দুইজনই বিশেষ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ছিলেন।

ধর্ম্ম সাধনা করিবার কালে প্রাণায়াম করিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গ-দর্শন পত্রিকায় তাঁহার 'নৌকা ডুবি' গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিবার কালে প্রাণায়ামের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এইরূপ ছিল—বাক্য ও মনের দ্বারা জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার কথা আমরা সকলে বিদিত আছি; ঐ সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া তাহার দ্বারাও তাঁহার উপাসনা করিতে চেষ্টা করার নামই প্রাণায়াম। নৌকাডুবির গল্পটি কিন্তু যখন পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে প্রাণায়াম সম্বন্ধে উক্ত ব্যাখ্যা বাদ দিয়া দেওয়া হয়। ঠাকুর মহাশয়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের অনুরোধে ঐরূপ করিতে হইয়াছে। আবার চিন্তাশীল কোন কোন ব্যক্তির ধারণা, প্রাণায়ামের দ্বারা সাধকগণ এক প্রকার হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থায় স্বতঃ উপস্থিত হয়েন। বাহ্যেন্দ্রিয়ক্রিয়াসমূহ স্তব্ধ হইয়া ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগের অন্তরনিহিত অসাধারণ, শক্তিসকল জাগরিত হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে। সাধনপ্রণালীসকলের মধ্যে প্রাণায়ামের সমাদর ঐ জন্যই ভারতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

* Animal Magnetism by William Gregory, M.D., F.R.S.E.

হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ (hypnotism) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গবেষণার দুই একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা ভাল। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেহে দুই প্রকার স্নায়ু আছে, প্রথমতঃ ক্রেনিয়াল নার্ভস্ (Cranial nerves) অথবা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ু। এই শ্রেণীর ১১ জোড়া স্নায়ু আমাদের দেহের মধ্যে আছে। এইগুলি ব্যতীত মানবশরীরান্তর্গত অন্য সমস্ত স্নায়ুই স্পাইনাল নার্ভস্ অর্থাৎ কশারুক মজ্জা Spinal cord হইতে উৎপন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে মস্তিষ্ক-নির্গত কোন এক জোড়া স্নায়ুর অন্তরে কিছুকালের জন্য মৃদু অথচ ধারাবাহিক উত্তেজনা আনয়ন করিতে পারিলে প্রায়শঃই হিপ্‌নো-টাইজ্‌ড্ অবস্থা লাভ করা যায়। যেমন মনস্থির করিয়া যদি উজ্জ্বল আলোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখা যায়, কিম্বা শিবনেত্রে ভ্রূমধ্যে অক্ষিগোলকদ্বয় স্থিরভাবে ধারণ করিয়া রাখা হয়, কিম্বা মৃদুধ্বনির প্রতি মনস্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অনেকের হিপ্‌নো-টাইজ্‌ড্ অবস্থা লাভ হয়। ১১ জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নিউমোগাষ্ট্রীক নার্ভস্ Pneumo-Gastric nerves, কশারুক মজ্জা Spinal cord এবং সিম্পাথেটিক নার্ভস্ Sympathetic nerves ব্যতীত আমাদের দেহে পূর্ব্বোক্ত স্নায়ু Pneumo-gastric nerves অপেক্ষা প্রধান স্নায়ু আর নাই। এই স্নায়ু, দেহের তিনটি সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র—যথা, হৃদপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ এবং পাকস্থলীর পরিচালন কার্য্যের মধ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ঐ স্নায়ুর মৃদু ও ধারাবাহিক উত্তেজনা করিয়া কিরূপে হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্ অবস্থা আনা যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু এদেশে প্রাণায়ামের মধ্য দিয়া ঐ উপায় আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে এবং বোধ হয় ঐরূপ উত্তেজনায় দেহেরও মঙ্গল হয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, পারমার্থিক সাধনে অগ্রসর হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেহমনে ঐ প্রকার কৃত্রিম অবস্থা আনয়ন করাটা কি ভাল?

উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ইহসংসারে কোন কার্য্য সুচারু-

রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে আমাদিগকে কেবলমাত্র জাগ্রৎকালে উপলব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয় না; কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় দেহমনরূপ যন্ত্রকে নিত্য কিছু কালের জন্য নিয়মিতভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন হয়। উহা দ্বারা বুঝা যায়, জাগ্রৎকালে আমরা মন এবং চৈতন্যের যে অংশটুকুর সহিত পরিচিত আছি তাহাই আমাদিগের সমগ্র মন ও চৈতন্য নহে এবং উহাই যে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাবস্থা তাহাও বলা যায় না। অতএব জাগ্রৎকালে সাধারণতঃ প্রকাশিত মানসিক শক্তি অপেক্ষা বিচিত্র ও অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে নিদ্রা ও সুষুপ্তি অপেক্ষা গভীরতর কোন এক জাগ্রৎভিন্ন অবস্থায় দেহমনকে নিত্য কিছু কালের জন্য নিয়মিত ভাবে রক্ষা করার প্রয়োজন হইবে। ঐ অবস্থাই আমাদিগের শাস্ত্রে সমাধি অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে কিছুকালের জন্য বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া থাকে এবং উহা বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার কাহার স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি যে সমগ্র মন ও চৈতন্য উপলব্ধি করেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ, ঐ ব্যক্তির অনন্যসাধারণ জ্ঞান এবং সকল বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাধি অবস্থা আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বিরল হইলেও কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মধ্যে মনস্তত্ত্বভাবে ঐ অবস্থার বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা বর্ত্তমানকালে আরব্ধ হইয়াছে। এক জন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ঐ অবস্থা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

ইনি বলেন, এই অবস্থার চারিটি লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) অনুভূতিগম্যতা—সমাধি অবস্থায় চৈতন্য থাকিবার এইটিই প্রধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা এই অবস্থা অনুভব

* The Gifford Lectures (1901-1902)—William James L. L. D. &c. delivered at the University of Edinburgh.

করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলেন যে, এই অবস্থার বিষয় বুঝাইয়া বলা যায় না। যাহারা কখন এই অবস্থার উপলব্ধি করে নাই তাহাদিগকে ইহার ভিতরকার ভাব কথায় বুঝান যায় না। অতএব ইতর সাধারণকে উহার বিষয় বুঝাইতে হইলে কেবলমাত্র নেতি নেতি প্রণালীর মধ্য দিয়া বুঝাইতে হয়।* কিন্তু অবস্থাটির স্বরূপ নেতি বা অভাব বস্তু নহে। এই অবস্থার ভিতর দিয়া যে 'ইতি' বা ভাববস্তু অনুভব করা যায়, আমাদের সাধারণ অবস্থার চৈতন্যের ভিতর দিয়া অনুভূত 'ইতির' সহিত তাহার তুলনাই হয় না—তাহার ভাব এত গভীর। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে হয় এবং এই হিসাবে ইহাকে বুদ্ধিগম্য বলিয়া হৃদয়গ্রাহী অবস্থাবিশেষ বলা যাইতে পারে। কারণ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ না করিলে হৃদয়গ্রাহ্য মনোভাবসকল কাহাকেও বুঝান যায় না। যে প্রেমের ভাব অনুভব করে নাই, সে প্রেমিকের অবস্থা বুঝিবে না, এবং তাহার ব্যবহার অর্থশূন্য ও চিত্তের দৌর্ব্বল্যপ্রসূত বলিয়া মনে করিবে। যাহার সুরজ্ঞান নাই, সে সঙ্গীত সুধারসের মহিমা বুঝিবে না।

(২) এই ভাবের মধ্যে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে সমাধি হৃদয়গ্রাহ্য অবস্থাবিশেষ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু যাঁহারা এই অবস্থা অনুভব করেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা জ্ঞানের অবস্থা বলিয়াই অনুভূত হয়। ভাবমগ্নাবস্থার অন্তর্দৃষ্টিতে যে তত্ত্বসকল সহজবোধ্যও হয়, তাহা আমরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা ধরিতেই পারি না। উহাতে তমঃ কাটিয়া যাইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন আলোক প্রকাশিত হয়, নূতন তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, যাহার অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা কথায় ব্যক্ত করা যায় না।† এই অবস্থার অনুভূতি জীবনে একবার

* বীরবাণী নামক পুস্তকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি অবস্থা সম্বন্ধী গানের সহিত তুলনা করুন।

† রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতার সহিত তুলনা করুন—রইল না আর আড়াল

মাত্র আসিলেও সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন উহার প্রভাবে পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে।

(৩) কর্ত্তৃত্বভাব শূন্যতা—সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুভূতি হয় যেন তাঁহার নিজ ইচ্ছাশক্তি এক বিরাট ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সতত বিধৃত এবং চালিত হইতেছে। প্রেতাত্মার আবেশে মিডিয়ামগণের স্বাধীন ইচ্ছার বিলোপ হইতে দেখিয়া এবং মানসিক অবস্থাবিশেষের আবির্ভাবে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ হয়ত ভাবিয়া বসিবেন, সমাধি অবস্থা উহাদিগেরই অনুরূপ কোন প্রকার অবস্থাবিশেষ হইবে। কিন্তু ঐ সকলের সহিত সমাধি অবস্থার একটি বিশেষ বিভিন্নতা আছে। ঐ সকল অবস্থা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কোনই প্রভাব রাখিয়া যায় না। সমাধি-চৈতন্য হইতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের কার্য্য হয়। উহা শুধু আসিয়াই চলিয়া যায় না, আমাদের অন্তরঙ্গ জীবনের উপর উহার ভাবের ছবি চিরকালের জন্য মুদ্রিত রাখিয়া যায়। অবশ্য ঐ মুদ্রণের গভীরতার পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

(৪) ক্ষণস্থায়িত্ব—সমাধি অবস্থা অধিকক্ষণ রাখা যায় না। দুই একটি বিরল দৃষ্টান্ত ব্যতীত, দুই এক ঘণ্টা মাত্র মন ঐ অবস্থায় থাকিবার পরে পুনরায় সাধারণ চৈতন্যের অবস্থায় নামিয়া আসে; অবশ্য ইহার একাধিকবার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে এবং ঐরূপ আবৃত্তি দ্বারা ইহার শক্তি এবং প্রভাব বাড়িয়া যায়।”

প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগত পানে, হৃদয় শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে, এই ফুটল রে।

* * * * *

আকাশ হতে প্রভাত আলো আমার পানে হাত বাড়ালো; ভাঙ্গা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠলে রে। নিশার স্বপন ছুটল রে ঐ ছুটলরে টুটলরে আঁধার টুটলরে।

জেমস্ সাহেবের সমাধির কালনির্ণায়ক পূর্ব্বোক্ত কথার বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায় যে, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি, সমাধি অবস্থা কেবল মাত্র দুই এক ঘণ্টা নহে, একাধিক দিন পর্য্যন্তও থাকিতে পারে।

ভাবুকতার মূলে সমাধিচৈতন্যের আবেশ থাকে, এ বিষয় জেমস্ সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসহায়ে অনেক অকবির বা নীরব কবির সমাধি-ভাবাবস্থা লাভের কথা জানিতে পারা যায়। সঙ্গীত, কবিতা, ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি হইতেও ঐরূপ ভাবাবস্থা আসিবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আবার কাহারও শব্দ বিশেষ জপ এবং উহার উপর মনঃস্থির করিলে সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি টেনিসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্জ্জনে বসিয়া নিজ নাম জপ করিলে তাঁহার ঐ অবস্থার উদয় হইত। তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

* In a letter to Mr. B. P. Blood, Tennyson reports of himself as follows :—

"I have never had any revelations through anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state, but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility —the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words?"

আমাদের দেশে প্রচলিত 'শিবোঽহং' বা 'সোঽহং' মন্ত্রাদি জপের দ্বারা সাধকদিগের যেরূপ অবস্থা ও মনোভাবের উদয় হয়, কবি টেনিসনের নিজ নাম জপের দ্বারা সেইরূপ হইত বলিয়া অনুমিত হয়।*

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মা—শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত। প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাত', ৫৫নং অপারচিৎপুর রোড। মূল্য আট আনা।

এই গীতি ৬৯টি প্রসাদী পদচ্ছায়ায় রচিত গানের সমষ্টি। রচয়িতা ঠাকুর মহাশয় ভূমিকায় এই গানগুলি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ইহার যথাযথ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। "এই সকল গানের ভূমিকা কি লিখিব জানি না—মা লিখাইয়াছেন, লিখিয়াছি। আমি লেখক মাত্র। কেমন করিয়া কিসের জন্য এ সকল গান আমি লিখিলাম, তাহা আমি জানি না। মায়ের ছেলের আবদারপূর্ণ

Professor Tyndall in a letter, recalls Tennyson saying of this condition: "By God Almighty! there is no delusion in the matter! It is no nebulous ecstasy, but a state of transcendent wonder, associated with absolute clearness of mind."

Memoirs of Alfred Tennyson, ii. 473.

* শ্রীমুকুন্দ দাস মহাশয়ের রচিত একটি গান ঐরূপ ভাবের পরিচায়ক। যথা—

কেবা করে কার আরাধন
আপনি পাতিয়া কান শুন আপনারি গান,
আপনা আপনি আলাপন।
কারে ডাক বার বার কে দিবে তোমারে সাড়া,
আপনারে নাহি জান রয়েছ আপনাহারা,

কথা—এ সকল প্রকাশ করিবার যোগ্য কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কেবল মায়ের নাম শুনাইয়া সুখ হয় বলিয়া এগুলি প্রকাশ করিলাম—যদি আমার অপর কোন ভাইকে এগুলির একটিও মায়ের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই আমি পরম সুখী।"

এই নির্ম্মল পবিত্র মাতৃবিষয়ক সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও চিত্ত নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয়, জীবনে ব্যাকুলতার উদয় হয়—তাহা হইলে আমরাও সুখী হইব।

সতুর মা—গল্পপুস্তক। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

সতুর মা, বিশ্বেশ্বর দর্শনে, বন্ধু, অলক্ষণা, হ্যালির ধূমকেতু, মিলন, বীণার বিবাহ—'সতুর মা' এই সাতটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি প্রথমে 'কুশদহ' এবং 'সুপ্রভাত' পত্রে প্রকাশিত হয়। এবং পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিতে বঞ্চিত হয় নাই। লেখিকার গল্প লিখিবার শক্তি আছে, 'সতুর মা' এবং 'বীণার বিবাহ' এই দুটি গল্পে উহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটিই বিশেষভাবে উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, 'সতুর মা' পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

পুস্তকের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(স্বামী সারদানন্দ)

(৫)

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তফি প্রমুখ অনেক গৃহস্থভক্তের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসংঘে যিনি পরে স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন—শ্রীযুত সারদাপ্রসন্ন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথমদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের ন্যায় অনেকে আবার ইতিপূর্ব্বে দুই একবার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্কার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং সুযোগ পাইলেই নিভৃতে নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন। আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে ঐরূপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপ-

যোগী নানাপ্রকার আসন ও অঙ্গসংস্থান দেখাইতে লাগিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐভাবে উভয় হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া বলিলেন, ইহাই সকল প্রকার সাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। পরে ঐ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষাপূর্ব্বক প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলী ঋজু রাখিয়া এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, ইহাই নিরাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। ঐকথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্ব্বক মনকে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামাইয়া বলিলেন, "আর দেখান হইল না ; ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেই উদ্দীপনা হইয়া মন তন্ময় ও সমাধিলীন হয় এবং বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে ; ডাক্তার ঐজন্য সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে।" যুবক তাহাতে কাতর হইয়া বলিল, 'আপনি কেন ঐ সকল দেখাইতে যাইলেন, আমি ত দেখিতে চাহি নাই।' তিনি তদুত্তরে বলিলেন "তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু আধটু না বলিয়া, না দেখাইয়া থাকিতে পারি কৈ?" যুবক ঐ কথায় বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাঁহার মনের অলৌকিক সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধুর্য্য ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত যে, নবাগত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি আমরা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবৎসল কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। যথা সম্ভব তাঁহারই ভাষায় আমরা উহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব—

উপেন্দ্র * আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি করিত। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে তাহাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, 'এবার যখন আসিবে তখন তোমাকে এক অদ্ভুত জিনিস দেখাব।' বড়দিনের ছুটিতে আসিয়া সে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি বলিলাম, 'মনে করেছিলাম তোমায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখাব—কিন্তু এখন তাঁর অসুখ, শ্যামপুকুরে আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারদের বারণ—তুমি নূতন লোক, তোমায় এখন কেমন করিয়া লইয়া যাই?' সে দিন গেল। তাহার পর উপেন্দ্র আর একদিন মেজদাদার (গিরিশচন্দ্রের) সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, ঠাকুরের কথা উঠিল এবং মেজদাদা তাহাকে বলিলেন, 'যাস্ না একদিন অতুলের সঙ্গে, তাঁকে দেখ্‌তে।' উপেন বলিল, 'উনি তো ছয় মাস (পূর্ব্ব) হইতে বলিতেছিলেন—লইয়া যাইব, কিন্তু যখন এখানে আসিয়া সেই কথা বলিলাম তখন বলিলেন,—এখন হইবে না।' আমি শুনিয়া মেজদাদাকে বলিলাম—'আমরাই এখন সব সময় ঢুকিতে পাই না, নূতন লোককে কেমন করিয়া লইয়া যাই।' মেজদাদা বলিলেন, 'তাহা হউক, তবু একদিন লইয়া যাস্, তাহার পরে ওর অদৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন দিবেন, আদর করিবেন।'

তাহার পর একদিন অপরাহ্ণে উপেনকে লইয়া যাইলাম। সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাঁহার বিছানার নিকট হইতে দুটি সপ্ বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর, নানারকম আজে বাজে কথা হইতেছে—যেমন, ছবি আঁকার কথা (কারণ, চিত্রবিদ্যাকুশল অন্নদা বাগ্‌চি সেখানে ছিল), সেক্‌রার দোকানে সোনারূপা গলানর কথা †

* শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইনি শ্যামবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কোন আত্মীয়াকে বিবাহ করেন এবং মুন্সেফ ছিলেন।

† সেকরাদিগের সোনারূপা চুরি করিবার দক্ষতা সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদিগকে একটি মজার গল্প সময়ে সময়ে বলিতেন। অতুলবাবু এখানে ঐ গল্পটির ইঙ্গিত করিয়াছেন। গল্পটি ইহাই

ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, (ঐরূপ কথা ভিন্ন) একটিও ভাল কথা হইল না! ভাবিতে লাগিলাম, আজ এই নূতন লোকটিকে লইয়া আসিলাম আর আজই যত আজে বাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!—ভাবিয়া আমার মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যত বার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন—যেন ঐ সকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে। তখন ইসারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে তাহাকে আর একটু বসিতে ইসারায় জানাইল। ঐরূপে দুই তিন বার ইসারা করার পরে সে উঠিয়া আসিল। তখন তাহাকে বলিলাম, 'কি শুনছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথার শুনিবার কি আছে বল দেখি?—সাধে তোকে 'বাঙাল' বলি (তাহার কপালে একটি উল্‌কির টিপ ছিল বলিয়া তাহাকে আমরা ঐরূপ বলিতাম)। সে বলিল, 'না হে, বেশ শুনিতেছিলাম। পূর্ব্বে universal love (সকলের প্রতি সমান ভালবাসা) কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতেও উহার প্রকাশ দেখি

কয়েক জন বন্ধু-সমভিব্যাহারে এক ব্যক্তি একখানি গহনা বিক্রয়ের জন্য এক স্বর্ণকারের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গ শিখামাল্যধারী বৃদ্ধ স্বর্ণকার সম্মুখে বসিয়া গম্ভীর ভাবে হরিনাম করিতেছে এবং তাহার তিন চারি জন সহকারী ঐরূপ তিলকমালাদি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে নানাবিধ অলঙ্কার গঠনে নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ স্বর্ণকার ও তাহার সহকারীদিগের সাত্ত্বিক বেশভূষা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ও তাহার বন্ধুগণ ভাবিল—ইহারা ধার্ম্মিক, আমাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলঙ্কারখানি তাহারা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহা বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া উহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ করিল। বৃদ্ধও তাহাদিগকে সাদরে বসাইয়া একজন সহকারীকে তামাকু দিতে বলিল, এবং কষ্টিপাথরে কসিয়া অলঙ্কারের স্বর্ণের দাম বলিয়া তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উহা গলাইবার নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ এক সহকারীর হস্তে প্রদান করিল। সেও উহা তৎক্ষণাৎ গলাইতে আরম্ভ করিয়া সহসা দেবতার স্মরণপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, 'কেশব, কেশব'। ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল 'গোপাল, গোপাল'। গৃহমধ্যস্থ এক সহকারী উহার পরেই বলিয়া উঠিল 'হরি, হরি, হরি'। যে তামাকু আনিয়াছিল সে ইতিমধ্যে কলিকাটি

নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উঁহাকে (ঠাকুরকে) আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু আর এক দিন আসিতে হইবে, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিব।'

তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম। তখন ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই—কেবল সেবকদিগের দুই একজন ও আমার ভগ্নীপতি মল্লিক মহাশয় ছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে উপেনকে পৈ পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিবার স্বয়ং করিবি। তাহা হইলে মনের মত উত্তর পাইবি—কাহাকেও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করাইবি না।' কিন্তু সে মুখচোরা

আগন্তুকদিগকে প্রদানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, 'হর, হর, হর'। ঐরূপ বলিবামাত্র প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত স্বর্ণ সম্মুখস্থ বারি পরিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার সহিত নিক্ষেপ করিয়া আত্মসাৎ করিল। স্বর্ণকার ও তাহার সহকারিগণ শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত নামসকল যে ভিন্নার্থে ব্যবহার করিতেছে—অর্থাৎ 'কেশব', না বলিয়া 'কে সব,' ইহারা চতুর অথবা নির্ব্বোধ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ও ঐ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপেই 'গোপাল' অথবা গরুর পালের ন্যায় নির্ব্বোধ, এই কথা বলিতেছে, এবং 'হরি' ও 'হর' শব্দদ্বয় অপহরণ করি ও কর, এই অর্থে উচ্চারণ করিতেছে—একথা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া নিশ্চিন্ত-মনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অনন্তর গলিত স্বর্ণ ওজন করাইয়া উহার মূল্য লইয়া তাহারা প্রসন্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ঠাকুরের পরম ভক্ত অধরচন্দ্র সেনের ভবনে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেদিন বঙ্কিমবাবু সন্দেহবাদীর পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ঠাকুরকে ধর্ম্মবিষয়ক নানা কূটপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'তুমি নামেও বঙ্কিম, কাজেও বঙ্কিম।' প্রশ্নসকলের হৃদয়স্পর্শী উত্তর লাভে প্রীত হইয়া বঙ্কিমবাবু অনন্তর বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁটালপাড়ার বাটিতে যাইতে হইবে, সেখানে ঠাকুরসেবার বন্দোবস্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।' ঠাকুর তাহাতে রহস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কেমনতর হরিনাম গো, সেকরাদের মত নয় ত?' বলিয়াই ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সভামধ্যে হাস্যের রোল উঠিয়াছিল।

ছিল, যাহা বারণ করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া তাহাই করিয়া বসিল—মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা প্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর করিলেন, কিন্তু উপেনের মুখের ভাবে বুঝিলাম, উত্তরটি তাহার মনের মত হইল না। তখন আমি তাহাকে পুনরায় চুপি চুপি বলিলাম, 'ঐরূপ ত হইবেই; আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আপুনি কর্‌বি; নিজে জিজ্ঞাসা কর্ না, মোক্তার ধরেছিস্ কেন?'

সাহস করিয়া এইবার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? আর যদি দুই-ই হন্, তাহা হইলে একসঙ্গে ঐরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের দুই-ই কেমন করিয়া হইতে পারেন?" ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, "তিনি (ঈশ্বর) সাকার নিরাকার দুই-ই—যেমন জল, আর বরফ।" উপেন কলেজে বিজ্ঞান (Science Course) লইয়াছিল, তজ্জন্য ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল এবং উহার সহায়ে সে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইল। ঐ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু সে নিরস্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাহিরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে, একটি মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিয়া আসিলে কেন?' সে তাহাতে বলিল, 'তাহা বুঝি বুঝ নাই—ঐ এক উত্তরে আমার তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।'

তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা * এই সময়ে প্রায়ই বাটিতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আফিসের কাপড় চোপড় সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিতেন এবং দুই এক ঘণ্টা এখানে কাটাইয়া বেশ-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন আজ উপেনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন তখন তিনি আফিসে যাইবার বেশ পরিতে পরিতে ঐ ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বাহিরে আসিয়াছি অমনি রামদাদা

* শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত।

বলিয়া উঠিলেন, "অতুলদাদা ওঁকে (উপেনকে) এদিকে নিয়ে এস; ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথা বলিয়াছেন, উনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার এই বইখানা ওঁকে পড়িতে হইবে তবে উনি ঠাকুরের ঐকথা বুঝিতে পারিবেন।" ঐকথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়া ফেলিলাম, "রামদাদা, তুমি না আমাদের চেয়ে সাত বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ ও তাঁর কাছে যাওয়া আসা করছ?—উনি (ঠাকুর) যা বল্লেন তা বুঝতে পারবে না, আর, তোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পারলেন না তা বুঝতে পারবে! এটা তোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে তোমার বইখানা * পড়তে দেবে, দাও—সেটা আলাদা কথা।" রামদাদা ঐ কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পুস্তকখানি উপেনকে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রকৃত শিক্ষার প্রথম লক্ষণ এই হওয়া চাই যে, ইহা কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না। এবং আপনারা দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগগুলি এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজযোগের কথা ধরা যাউক। রাজযোগ মনস্তত্ত্ববিষয়ক যোগ—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া একত্বে পঁহুছিবার উপায়। বিষয়টী খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই 'যোগে'র অভ্যন্তরীণ মূল ভাবটীই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। জ্ঞান লাভ করিবার আমাদের একটী মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মনুষ্য হইতে সর্ব্বোচ্চ 'যোগী'

* শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রণীত "তত্ত্বপ্রকাশিকা"।

পর্য্যন্ত সকলকেই সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়—একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ্ যখন তাঁহার পরীক্ষাগারে (Laboratory) কাজ করেন, তখন তিনি তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি একীভূত করেন—কেন্দ্রীভূত করেন, এবং সেই কেন্দ্রীভূত শক্তিকে মূলভূতগুলির উপর প্রয়োগ করিবামাত্র তাহারা বিশ্লেষিত হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞান লাভ করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ও তাঁহার সমুদয় মনঃশক্তিকে একীভূত করিয়া কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া বস্তুর উপর প্রয়োগ করেন, এবং ভ্রাম্যমান নক্ষত্রনিচয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাঁহার নিকট তাহাদের রহস্য উদ্ঘাটিত করে। অধ্যাপনারত আচার্য্যই বল, অথবা পাঠ-নিরত ছাত্রই বল যেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, উহা যদি আপনাদের ভাল লাগে, আপনাদের মন উহাদের প্রতি একাগ্র হইবে; তখন যদি নিকটেই একটা ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহা শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম ও শক্তিসমূহকে যতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টী আপনাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞান লাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়—'নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এমন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংযোগ করে, তাহা হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়া বুরুশ করিবে; পাচক একাগ্র হইলে তাহার খাদ্য আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। অর্থোপার্জ্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক—যে কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে, কাজটী ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। দ্বারের নিকট গিয়া ডাকিলে বা উহাতে করাঘাত করিলে যেমন দ্বার

উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি একমাত্র এই উপায়েই প্রকৃতির ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জগতে আলোকবন্যা প্রবাহিত করায়। এই একাগ্রতা-শক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় শুধু ইহারই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা অতিশয় অন্যমনস্ক রহিয়াছি—আমাদের মন শত দিকে ধাবিত হইয়া তাহার শক্তি ক্ষয় করিতেছে। যখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই না চাহিলেও শতসহস্র বাসনা মস্তিষ্কে আসিয়া এককালে উপস্থিত হয়, শতসহস্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া উহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিরূপে ঐ সকলকে নিবারণ করিয়া মনকে বশে আনিতে পারা যায়, ইহাই রাজযোগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে কর্ম্মযোগের অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানলাভের কথা ধরা যাউক। সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন না কোন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন শুধু চিন্তার রাজ্যেই একাগ্র হইয়া নিবদ্ধ থাকিতে পারে না—তাহারা বোঝে কেবল কাজ—যা চখে দেখা যায় এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকদের জন্যও একটী সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ শক্তির অপব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ, আমরা কর্ম্মের রহস্য জানি না। কর্ম্মযোগ এই রহস্যটী বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, উপস্থিত কর্ম্মে কি ভাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহা শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের বিরুদ্ধে, উহা দুঃখজনক এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আমাদিগকে তাহারও বিচার করিতে হইবে। সমুদয় দুঃখকষ্ট আসক্তি হইতে আসে। আমি কাজ করিতে চাই—আমি কোন লোকের উপকার

করিতে চাই ; এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, আমি যাহাকে সাহায্য করিয়াছি সেই ব্যক্তি সমস্ত উপকার ভুলিয়া আমার শত্রুতা করিবে ; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবম্বিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম্ম হইতে বিরত হয় এবং এই দুঃখকষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম্ম ও উদ্যমের অনেকটা নষ্ট করিয়া দেয়। কাহাকে সাহায্য করা হইতেছে, কিসের জন্য সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া অনাসক্ত-ভাবে শুধু কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্মযোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন, কারণ উহা তাঁহার স্বভাব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন যে এরূপ করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণজনক—ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি জগতে সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছুর প্রত্যাশা করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্তু প্রতিদানস্বরূপ কিছুই চান না, সুতরাং তিনি দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পান। যখনই দুঃখ আমা-দিগকে গ্রাস করে, তখনই বুঝিতে হইবে 'আসক্তির' প্রতিক্রিয়া মাত্র।

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে ক্রিয়া-কলাপের সাহায্য লন এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরম্য মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ রাখেন। আপনারা কি বলিতে চান, তাঁহারা ভুল করেন ? আমি আপনাদিগকে একটী সত্য কথা বলিতে চাই, তাহা আপনাদের বিশেষতঃ এই দেশে, মনে রাখা ভাল।—যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তত্ত্বসম্পদে সমৃদ্ধ তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর যে সকল সম্প্রদায় কোন প্রতীক বা অনুষ্ঠান বিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবানলাভের চেষ্টা করিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্, সমস্ত নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়াছে, খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম্ম গোঁড়ামী মাত্র, তাহা শুষ্ক। জগতের ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং এই সকল অনুষ্ঠান ও পুরণাদিকে গালি দিও না। যে

সকল লোক তাহাদের লইয়া থাকিতে চায় তাহারা তাহাদিগকে লইয়া থাকুক। তোমরা অযথা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিও না, "তাহারা মূর্খ, উহা লইয়াই থাকুক।" তাহা কখনই নহে; আমি জীবনে যে সকল আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এই সকল অনুষ্ঠানের নিয়মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আমি নিজেকে তাঁহাদের পদতলে বসিবার যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিনা তাঁহাদের সমালোচনা করিতে যাইব! এই সমুদয় ভাব মানবমনে কিরূপ কার্য্য করে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী আমার গ্রাহ্য, কোন্‌টী ত্যাজ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমরা উচিত অনুচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের সমালোচনা করিয়া থাকি। লোকে এই সকল সুন্দর সুন্দর উদ্দীপনা-পূর্ণ পুরাণাদি যত ইচ্ছা গ্রহণ করুক; কারণ, আপনাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ লোকেরা সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া থাকিতে মোটেই পছন্দ করেন না। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট 'ধরা ছোঁয়ার' বস্তু, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহাকে দেখেন, ভালবাসেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভগবান্ লইয়াই থাকুন। তোমার যুক্তিবাদী, ভক্তের চক্ষে সেইরূপ নির্ব্বোধ—যেমন কোন ব্যক্তি একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া উহা কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা দেখিতে চায়। 'ভক্তিযোগ' তাহাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়; কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে না। লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, কোন এষণাই থাকিবে না, শুদ্ধ ভগবানকে এবং যাহা কিছু মঙ্গলময় তাহাকে শুধু কর্ত্তব্যবোধে ভালবাসা। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবানই প্রেমস্বরূপ—ইহাই ভক্তিযোগের শিক্ষা। ভক্তিযোগ তাঁহাদিগকে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, শাস্তা, এবং পিতা ও মাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা যাহা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে অথবা মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে যে সর্ব্বোচ্চ

ধারণা করিতে পারে তাহা এই—তিনি প্রেমময়। "যেখানেই কোন প্রকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাই তিনি, সেখানেই প্রভু বিদ্যমান। স্বামী যখন স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে তিনিই বিদ্যমান; মাতা যখন শিশুকে চুম্বন করেন, তথায় তিনিই বিদ্যমান; বন্ধুগণের করমর্দ্দনে সেই প্রভুই প্রেমময় ভগবানরূপে বিদ্যমান।" যখন কোন মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাসিয়া তাহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রভুই তাঁহার মানবপ্রেমভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে ভালবাসা বিতরণ করিতেছেন। যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। ভক্তিযোগ এই সকল শিক্ষা দেয়।

সর্ব্বশেষে আমরা 'জ্ঞানযোগীর' কথা আলোচনা করিব—তিনি দার্শনিক ও চিন্তাশীল যিনি এই দৃশ্য জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের তুচ্ছ জিনিষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। তিনি আমাদের পানাহারাদি প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর পারে যাইতে চান; সহস্র সহস্র পুস্তক পড়িয়াও তাঁহার শান্তি হয় না; এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কারণ, তাহারা বড় জোর, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটী তাঁহার জ্ঞানগোচর করিতে পারে। বাহ্য এমন কি আছে যাহা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারে? কোটী কোটী সৌরজগৎ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার চক্ষে তাহারা 'সৎ' সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। তাঁহার আত্মা এই সকলের পারে, সকল অস্তিত্বের যাহা সার তাহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়—সত্যস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়; তিনি ইহাকে উপলব্ধি করিতে চান, ইহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিতে চান, সেই বিরাট সত্তার সহিত এক হইয়া যাইতে চান। তিনিই জ্ঞানী। ভগবান্ জগতের পিতা, মাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পথপ্রদর্শক—ইত্যাদি বাক্য তাঁহার নিকট ভগবানের মহিমা প্রকাশে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তিনি ভাবেন, ভগবান্ তাঁহার প্রাণের প্রাণ, তাঁহার আত্মার আত্মা। ভগবান্ তাঁহার নিজেরই আত্মা। ভগবান্ ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই।

তাঁহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই বিদ্যমান থাকে, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

একই গাছে দুইটী পাখী রহিয়াছে, একটী উপরে একটী নীচে। উপরের পাখীটী স্থির, নির্ব্বাক, মহান্, আপনার মহিমায় আপনি বিভোর; নীচের ডালের পাখীটী কখনও সুমিষ্ট, কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া উঠিতেছে এবং পর্য্যায়ক্রমে আপনাকে সুখী ও দুঃখী বোধ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখীটী একটি অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে তাকাইল এবং অপর পাখীটীকে দেখিতে পাইল সেই অপূর্ব্ব সোনার রঙ্গের পাখাওয়ালা পাখীটী—সে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খাইতেছে না এবং আপনাকে সুখী বা দুঃখীও মনে করিতেছে না, পরন্তু প্রশান্তভাবে আপনাতে আপনি রহিয়াছে—আপনার আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। নীচের পাখীটী ঐরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল কিন্তু শীঘ্রই ইহা ভুলিয়া গিয়া আবার ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত ফল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় দুঃখ হইল এবং সে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল এবং উপরের পাখীটীর কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। আবার সে একথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল। বার বার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে সুন্দর পাখীটীর খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং দেখিল তাহার

পক্ষ হইতে জ্যোতির ছটা আসিয়া তাহার নিজ দেহের চতুর্দ্দিকে পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্ত্তন অনুভব করিল—যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে; সে আরও নিকটে আসিল, দেখিল তাহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই গলিয়া যাইতেছে—অন্তর্হিত হইতেছে। অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখীটী যেন উপরের পাখীটীর ঘনীভূত ছায়া মাত্র—প্রতিবিম্ব মাত্র ছিল। সে নিজে বরাবর স্বরূপতঃ সেই উপরের পাখীই ছিল। নীচের ছোট পাখীটীর এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সুখদুঃখ বোধ করা—এ সমস্তই মিথ্যা—স্বপ্ন মাত্র; সেই প্রশান্ত, নির্ব্বাক, মহিমময়, শোকদুঃখাতীত উপরের প্রকৃত পাখীটী সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখীটী ঈশ্বর, পরমাত্মা—জগতের প্রভু; এবং নীচের পাখীটী জীবাত্মা—এই জগতের সুখদুঃখরূপ বিষ ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা। মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত আসিয়া পড়ে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশ হয়। সে তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্যজাল মাত্র। কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বহির্জগতে টানিয়া নামাইয়া আনে, এবং সেও পূর্ব্বের ন্যায় এই জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে। আবার সে এক অতি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া জ্ঞানালোক প্রবেশ করে। এইরূপে ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই সে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার 'কাঁচা আমি'র আপনা আপনি লয় হইতেছে। যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই ভগবান্ এবং বলিয়া উঠে, "যাঁহাকে আমি তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দ্র-সূর্য্যেও বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তিনিই আমাদের এই জীবনের অবলম্বন- আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাহাই নহে,

তুমিই সেই, তত্ত্বমসি।” ‘জ্ঞানযোগ’ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মানুষকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ ভগবান্। ইহা মানুষকে প্রাণীজগতের মধ্যে যথার্থ একত্ব দেখাইয়া দেয়—আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি সামান্য পদদলিত কীট হইতে যাঁহাদিগকে আমরা সবিস্ময়ে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করি সেই সকল শ্রেষ্ঠ জীব পর্য্যন্ত সকলেই সেই এক ভগবানের প্রকাশ মাত্র।

শেষ কথা এই যে, এই সকল বিভিন্ন যোগগুলিকে আমাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিলে কিছুই হইবে না। ‘শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।’ প্রথমে তাহাদিগের সম্বন্ধে শুনিতে হইবে। পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে—যেন আমাদের মনে তাহাদের একটা ছাপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে হইবে—যে পর্য্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম্ম জিনিষটা আর শুধু কতকগুলি ধারণা বা মতবাদের সমষ্টি অথবা বুদ্ধির সায় মাত্র হইয়া থাকিবে না তখন ইহা আমাদের জীবনের সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খামিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয়ত আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম কখনই পরিবর্ত্তিত হয় না। ধর্ম্ম অনুভূতির বস্তু—উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নহে—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবার বস্তু—শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিষ নহে; সমস্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম্ম।

(সমাপ্ত)

শিখগুরু।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

সাগর-সৈকতে দাঁড়াইয়া একটী মহোর্ম্মি উত্থিত হইতে দেখিলাম—পরক্ষণেই উহা অতলবারিধিতলে মিলাইয়া গেল; তৎপরে সমুদ্রবক্ষ আবার শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল—পুনরায় কালাতিপাতে নূতন তরঙ্গ উঠিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জাতীয় জীবন-প্রবাহও ঐ একই নিয়মানুসরণ করিয়া চলিয়াছে। গুরু হরগোবিন্দের আদর্শ তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদিগের মধ্যে যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, তাঁহার সময়ে শিখজীবনে যেরূপ নূতন কর্ম্মপ্রবণতা ও প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তদীয় দেহত্যাগের অব্যবহিতকাল পরেই আবার ততোধিক প্রাণহীনতা ও জড়ভাব পরিলক্ষিত হয়; উহার কারণ আর কিছুই নহে—পরবর্ত্তী গুরুদ্বয় জাতীয় শক্তি-সঞ্চয়ের প্রতি প্রবল ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন—তাঁহারা তুচ্ছ গৃহবিবাদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্যই শিখদিগের জাতীয় জীবন কিয়ৎকাল শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সিন্ধু আপাত স্তব্ধভাব ধারণ করিলেও তাহারই মধ্যে যেমন তরঙ্গ-লীলার মহাশক্তি নিহিত থাকে—তদ্রূপ শিখজাতি হরগোবিন্দের পরবর্ত্তী গুরুদ্বয়ের সময় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেও হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক সঞ্চারিত শক্তি তাহাদেরই মধ্যে গূঢ় ভাবে ছিল। তাহাদের এই তুষ্ণীম্ভাব যেন ভবিষ্যতের মহা উত্থানেরই পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু শিখদিগের সুপ্তশক্তি উদ্দীপ্ত করিতে মহামতি হরগোবিন্দের ন্যায় আর একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইল—শিখগণ যেন তাঁহারই আশায় পথপানে চাহিয়া রহিল। কবে তাহাদিগের নৈরাশ্যের অমানিশা অতিবাহিত হইয়া আবার সৌভাগ্য-সূর্য্য শুভ্ররশ্মি বিকিরণ করিবে!

হরকিষণ।

হর্‌রাওয়ের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র হরকিষণ আপনাকে গুরু বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলেন; জ্যেষ্ঠ রামরাও তখন মোগল দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠকে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত পুরস্কার প্রদানে সঙ্কল্প করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক অভীষ্টসাধনোদ্দেশ্যে হরকিষণকে বলিয়া পাঠাইলেন— "আমি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং গুরুপদের আমিই অধিকারী। আমার অবর্ত্তমানে আমাকে না জানাইয়া এরূপ কার্য্য করা তোমার উচিত হয় নাই। স্থির জানিও, আমাকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তোমাকে শীঘ্রই উহার ফলভোগ করিতে হইবে।" কিন্তু তাঁহার ভয়প্রদর্শন বিশেষ কার্য্যকরী হইল না—তদীয় ভৃত্য অপমানিত হইয়া দরবারে ফিরিয়া আসিল। হরকিষণ সঙ্কল্প করিলেন—কোনমতেই আমি পরাজয় স্বীকার করিব না—প্রাণত্যাগ করিতে হয় সেও স্বীকার! কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা বেশী দিন অটুট রহিল না। রামরাও সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন এবং কনিষ্ঠ যে কিরূপ অন্যায় করিয়াছে তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে সহসা একদিবস বাদশার সশস্ত্র সিপাহী আসিয়া গুরুকে ধরিয়া লইয়া গেল। হর্‌রাও কর্ত্তৃক উৎপীড়িত শিখসমাজ কোনই বাধা প্রদান করিল না। তখন হরকিষণ মনে মনে অত্যন্ত ত্রাস্ত হইলেন—আপন গর্হিত কর্ম্মের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর সমীপবর্ত্তী স্থানসকলে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। গুরু নিরাশ হইয়া ভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন, যেন শীঘ্র তিনিও ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—তাহা হইলে আর তাঁহাকে মোগলের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। ঐভাবে চিন্তান্বিত হইয়া তিনি সিরাই নামক স্থানে পৌঁছিলেন - তথায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দিল্লীর পথে বসন্ত রোগে

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলেন। তদীয় মৃতদেহ দিল্লীতে সমাহিত করা হয়।

তেগ্‌বাহাদুর।

হরকিষণ নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে গুরুনির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মাত্র বলেন, "আমার পর বাবা বোকালাই গুরুপদ পাইবেন।" গুরু কাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন—তাহা ঐ সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। বোকালার একটী স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। উহা বিপাশা নদীর দক্ষিণোপকূলে গোবিন্দওয়ালের সন্নিকটস্থ একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। গুরু হরগোবিন্দ পার্ব্বত্যপ্রদেশে যাত্রা করিবার পথে ঐ স্থানেই নিজ অনুচরদিগের মধ্যে কয়েকজনকে রাখিয়া যান। তদবধি উহারা ঐ স্থানেই বসবাস করিত। তেগ্‌-বাহাদুরের জননীও ঐ সঙ্গে পরিত্যক্তা হন।

হরকিষণের শেষ ইচ্ছার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে বোকালার সোদীগণ স্বাধিকার লাভের আশায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। তেগ্‌বাহাদুর সেই সময়ে মাতার সহিত ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি ঘৃণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দেন নাই যে হরগোবিন্দ তাঁহাকেই গুরুপদে নির্ব্বাচিত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, ঐরূপ চাঞ্চল্য ও অস্থৈর্য্যে কিয়ৎকাল গত হইলে সকলে মুখহানশাহ নামক হরগোবিন্দের কোন এক অনুচরকে মধ্যস্থ মানিল। মুখহানশাহ ইতিপূর্ব্বেই হরগোবিন্দের মনোভিপ্রায় অবগত ছিলেন। তিনি শান্তভাবে উহার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া হরকিষণের শেষ ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উহা যথাযথভাবে বিবৃত করিলে তিনি নানারূপ বহুমূল্য উপ-ঢৌকনাদি লইয়া তেগ্‌বাহাদুরকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন এবং বিনয়নম্রবচনে ঐগুলি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জাগতিক ঐশ্বর্য্যে তেগ্‌বাহাদুরের কোনরূপ আসক্তি ছিল না, তাই তিনি বলিলেন—"আমি ফকির—ইহা লইয়া আমার কি হইবে?

আমার নাম দেগ্ বাহাদুর—আমি তেগ্ বাহাদুর (অর্থাৎ তরবারির অধিস্বামী) নহি—তোমরা বোধ হয় ভুল করিতেছ। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি কি কখনও গুরুপদে আসীন হইতে পারে?” তিনি যে আত্মগোপন করিতেছেন তাহা মুখহানশাহ্ অনায়াসেই বুঝিয়া লইলেন; তদ্দিবসেই ঐ স্থানে সকলে সমবেত হইয়া তেগ্ বাহাদুরকে সানন্দে গুরুপদে বরণ করিয়া লইল।

যাহা হউক, নির্ব্বাচনকার্য্য সমাহিত হইলে কিয়ৎকালের জন্য সর্ব্বত্র সুখশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল এবং গুরু প্রথম প্রথম কার্য্যক্ষমতাও দেখাইলেন। তেগ্ বাহাদুরের পদপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামরাও তৎপ্রতি একান্ত বিরূপ হইল। হরকিষণের মৃত্যুর পরও রামরাও দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিল। ঈর্ষায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল এবং সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য আওরঙ্গজেবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। কিছুদিন অতীত হইলে বোকালার সোদীগণের সহিত গুরুর দুই একটী সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইল, কালে উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা একান্ত অপমানিত হইয়া তিনি ক্রমে ধৈর্য্য হারাইলেন এবং সমুচিত শাস্তিদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। মুখহান শাহের নিকট তিনি প্রস্তাব করিলেন যে উহাদিগের সকলকে বোকালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়াই সমীচীন। কিন্তু মুখহানশাহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে উহাতে তাঁহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী, কারণ সোদীগণ সকলেই যদি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে, হয়ত তাহারা অনায়াসেই তাঁহার প্রাণনাশে সক্ষম হইবে, সুতরাং শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত উক্ত পন্থা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। যাহা হউক, উহা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না দেখিয়া তিনি আপনিই ঐ স্থান পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় বোধ করিলেন। অতঃপর মুখহানশাহের সহিত আপন পরিবারবর্গ লইয়া রাজধানী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গুরু স্বয়ং দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া রামরাও মনে মনে খুব আনন্দিত হইল, কারণ তাহা হইলে প্রতিশোধ লইবার শুভসুযোগ উপস্থিত হইবে। তাহা ছাড়া—গুরু তখন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ত্রস্ত ও ভীত হইয়া রাজধানীতে শান্তিলাভের আশায় আসিতেছেন, সুতরাং ঐ সময়ে তদীয় একান্ত অন্যায় কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া উহার একটা প্রতিবিধানের জন্য রামরাও সমুৎসুক হইল। নিজ মনোভাব গোপন রাখিয়া রামরাও সম্রাটকে বলিল –"মহারাজ! বোকালার সোদীগণের সহিত তেগ্‌বাহাদুর অতীব দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, আপনি উহাকে সত্বর দরবারে আহ্বান করিয়া ঐ সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করতঃ গুরুর অন্যায় কর্ম্মের জন্য শাস্তিবিধান করুন।" ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া আওরঙ্গজেব ঐ সময় অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর বলপ্রয়োগ ও নানারূপ উৎপীড়নের আয়োজনে উদ্যত ছিলেন। শিখসম্প্রদায়টীকেও সমূলে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া বহুদিন হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল। উহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত বুঝিয়া তিনি স্থির করিলেন, গুরুকে আপন সম্মুখে আহ্বান করিবেন এবং তদীয় ব্যবহারের কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেই শাস্তি প্রদানের আজ্ঞা দিবেন। কিন্তু সভাসদ্‌দিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না—তাঁহারা একবাক্যে গুরুকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া দিলেন এবং গুরুকে বিনা কারণে রাজদ্বারে উপস্থাপিত করা যে কিরূপ অন্যায়, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাদিগের সকল যুক্তি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়া অবশেষে উহাদিগের সহিত একমত হইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি আপন অভীপ্সিত কর্ম্ম কোনমতেই সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না—বহু বাধাবিঘ্ন আসিয়া সকল পণ্ড করিয়া ফেলিবে।

ঐ ঘটনার বিবরণ শুনিয়া গুরু প্রমাদ গণিলেন। বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ তিনি দিল্লী যাত্রা করেন কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর বিপদজালে পতিত হইয়াছেন।

তিনি আরও নিরাশ ও হতোদ্যম হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পেটনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহার সকল চিন্তা ও ভীতি দূর হইল এবং তিনি সকলপ্রকার কোলাহল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কিয়ৎকাল শান্তিময় জীবনযাপন করিয়া ধন্য হইলেন। অতঃপর স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার দিল্লীতে পৌঁছিছিলেন। এবার রামরাও আওরঙ্গজেবের সহিত অভিসন্ধি করিয়া গুরুকে রাজদরবারে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিল। রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া গুরু বুঝিলেন, রামরাওয়ের হস্ত হইতে তাঁহার আর উদ্ধার নাই; সুতরাং আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার আশায় নির্জ্জন পার্ব্বত্যপ্রদেশে কুলুরাধিপতির নিকট আশ্রয় লইলেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর তিনি 'দেবা মুখু' নামক স্থানটা পঞ্চশত মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া উহারই উপর 'মুখওয়াল' নামক একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ দিল্লীতে নীত হইলে রামরাও অতীব ক্রুদ্ধ হইল এবং গুরুর প্রাণনাশকল্পে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহার চক্রান্তজালে বিজড়িত হইয়া মোগলসম্রাট স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই কঠিন আজ্ঞা দিয়া একজন সশস্ত্র সৈনিককে গুরুকে লইয়া আসিবার জন্য ঐস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। রাজানুচরকে সম্মুখীন দেখিয়া তেগ্‌বাহাদূরের সকল ভরসা বিলুপ্ত হইল—একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া তিনি অনুচরের সহিত গমন করিলেন। কিন্তু স্থির জানিতেন, তাঁহাকে আর ফিরিতে হইবে না—তাই, যাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীপুত্রের নিকট চিরবিদায় লইয়া গেলেন। বালক গোবিন্দসিংহকে আপন পিতৃদত্ত তরবারি প্রদান করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণপূর্ব্বক কহিলেন—"পুত্র! শত্রুগণ আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে। দেখিও—মৃত্যুর

পর আমার দেহ যেন শৃগালকুক্কুরে নষ্ট না করে; যেন এই অপমৃত্যুর সমুচিত প্রতিশোধ লওয়া হয়। ভগবদ্পদে ভক্তি রাখিবে, তিনিই তোমার রক্ষাকর্ত্তা—তোমার পালক। আশীর্ব্বাদ করি যেন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সিদ্ধ হইতে পার।"

যাহা হউক, কোনপ্রকার বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল; বিনাপরাধে এই ভাবে নিগৃহীত হইয়া এবং কঠোর দণ্ড ভোগ করিয়া গুরু অবিচলিত রহিলেন—ক্রমে সুখদুঃখে তাঁহার সমভাব আসিল এবং সহাস্যাননে প্রাণত্যাগ করাই তিনি স্থির করিলেন। দুই চারি দিবস ঐভাবে অবস্থানের পর তিনি অবশেষে রাজসমক্ষে নীত হইলেন। স্বয়ং আওরঙ্গজেব বিচারাসনে সমাসীন—চতুর্দ্দিকে উৎসুক দর্শকবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে শিখগুরুর বিচার আরম্ভ হইল। গুরুর মুখমণ্ডল আজ স্বর্গীয় জ্যোতিতে সুশোভিত। সর্ব্বপ্রথমে ধূর্ত্ত রামরাও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তেগ! তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়া গুরুপদ লইয়াছ—এইবার শাস্তিভোগের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত—প্রস্তুত হও। যদি এখনও আত্মরক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা প্রকাশ কর, নতুবা প্রাণ হারাইবে।" তেজস্বী শিখগুরু রামরাওয়ের ন্যায় সামান্য একজন লোকের ভৎসনা-বাক্যে বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না—সেইজন্য অতীব সাহসের সহিত অম্লানবদনে উত্তর করিলেন—"প্রাণনাশের ভয় কাহাকে দেখাইতেছ? তুচ্ছ মানবজীবনের জন্য আমি কখনও মিথ্যা কহিতে পারিব না। আমি একজন ফকির—এমন কোন অন্যায় কর্ম্ম আমি করি নাই যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আরাধনা, তাঁহার মহিমা ও গুণকীর্ত্তনেই আমি আমার কালক্ষেপ করি—আমার নিকট মানবশক্তি তুচ্ছ।" এইরূপ নির্ভীক উত্তর শ্রবণে রামরাওয়ের ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। আওরঙ্গজেব উপায়ান্তর না দেখিয়া গুরুকে অগত্যা স্বীয় ধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে আজ্ঞা করায় গুরু উত্তর করিলেন—"জীবনের শেষে আমি একটী—জিনিষ

দেখাইতেছি। একখণ্ড কাগজে কয়েকটী কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিলাম। দেখিবেন, ঘাতকের অসি যেন উহা স্পর্শ না করে—উহাতেই আমার সমুদয় বক্তব্য লিখিত রহিল।” এই বলিয়া তিনি আপন মাথা বাড়াইয়া দিলেন—সম্রাটের আজ্ঞায় নিমেষমধ্যে ঘাতকের শাণিত অসি শিখগুরুর শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। মরজগতে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গুরু দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসিকতার পরিচয় সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইল। ধর্ম্মান্ধ ভূপতি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন—কাগজখণ্ড খুলিয়া দেখিলেন, জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

“শির্ দিয়া সার না দিয়া।”

“মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব দিলাম না।”

এই ভীষণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া সভাসদ্ ও দর্শকগণ সকলেই চমকিত হইল। গুরুর পবিত্র দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখা হইল এবং ছিন্ন মুণ্ড মুখহানশাহকে প্রদত্ত হইল। এইভাবে প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষের কিঞ্চিদধিক কাল গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তেগ্‌বাহাদুর অমরধামে চলিয়া গেলেন। তদীয় স্ত্রী গুজুরির গর্ভে প্রথিতনামা পুত্র গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। সেই সময়ে গোবিন্দসিংহ চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকমাত্র ছিলেন।

শিখজাতির ভাগ্যনির্ণায়ক দশমগুরু গোবিন্দসিংহ তৎপরে কিরূপ অভিনব সংস্কারসাহায্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া কি ভাবে জাতীয় উন্নতি বিধান করেন, অতঃপর আমরা তাহারই বিশদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পথের সম্বল।

(শ্রীহরিপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল)

কোন অপরিচিত দূরদেশে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু পথের সম্বল সংগ্রহ করিয়া থাকেন ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। কেহ অর্থ, কেহ আহার্য্য, কেহ বা বস্ত্র, শয্যাদি ভবিষ্যতের প্রয়োজন বুঝিয়া সঙ্গে লইয়া থাকেন। যেরূপ স্থানে ও যে উদ্দেশ্যে গমন, এই সম্বলও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। বালক যখন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিবার জন্য যাত্রাকালে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের চরণে প্রণত হয় ও তাঁহাদের, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ বালকের মস্তকে বর্ষিত হয়, বালক তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল জ্ঞান করিয়া বহির্গত হয়; স্বামী যদি পীড়িত হইয়া আরোগ্যলাভের আশায় দূর-দেশস্থ সুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ জন্য দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হন, পত্নী সেই সময়ে দেবতার নিকট তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবতার নিমিত্ত মঙ্গল কামনা করেন—পত্নীর সেই শুভেচ্ছা স্বামীর অন্যতম পথের সম্বল। এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ঘটনা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তা সে নিজেই করুক অথবা তাহার জন্য তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়েরাই করুন—যাহা তাহার জীবনসৌধের ভিত্তিস্বরূপ হয়, সেইগুলিকে তাহার জীবনযাত্রার সম্বল বলিয়া আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য, এই যে সম্বলের আবশ্যক যাহা প্রতি জীবনে প্রত্যেক ব্যাপারে দৃষ্ট হয়, তাহার শেষ কোথায়? যে পর্য্যন্ত আমার এই পৃথিবীতে অবস্থান, যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না আসিয়া আমাকে গ্রাস করে, যে পর্য্যন্ত না আমি আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া ও আমার শত্রু বা দ্বেষ্টাদিগকে হাসাইয়া প্রস্থান করি, সেই পরিমিত সময়ের জন্যই কি আমাকে সম্বল সংগ্রহ করিতে হইবে,

না তাহার পরের কোন অবস্থা সম্ভবপর হইলে তাহার জন্যও সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সেইরূপ সম্বল সংগ্রহ সম্ভবপর কি না? ইহার উত্তর দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং ইহার উত্তর দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক :—

১। আমি কে? ২। মৃত্যুর পরিণাম কি? ৩। আমার গন্তব্য স্থান কোথায়? ৪। সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্বল সংগ্রহ চলে কি না? যদি চলে, তাহা কি?

১। আমি কে?

এই প্রশ্ন নূতন নহে, জগতে দর্শনশাস্ত্রের প্রথমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত ঐ প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ঐ প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসাও করিয়াছেন।

এক শ্রেণীর লোক "আমি" বলিতে দেহের অতিরিক্ত কিছু বুঝেন না। তাঁহাদের মতে এই দেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই দেহের অবসানেই "আমি"র অবসান হয়—মরিয়া গেলে কিছুই থাকে না—"Mind is a function of the brain"—মন মস্তিষ্কের স্পন্দনব্যাপার মাত্র। ইহাই দেহাত্মবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই এই মতের পরিপোষক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুখের বিষয় এইরূপ দেহাত্মবাদীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

অন্য শ্রেণীর মতে মন ও দেহ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে লক, হিউম, বেন, মিল প্রভৃতি এক শ্রেণীর লেখকগণ Mind, Ego বা Self এর একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা এই :—আমাদের মানসিক অবস্থাগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা thought or intellect, feeling, will or volition। একটী গোলাপফুল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমরা তাহার বর্ণ, আকার, ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি—ইহাই হইতেছে গোলাপফুল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান,

ইহাকে thought বলা যায়। গোলাপফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমাদের মনে যে আনন্দ উত্থিত হয় তাহাই হইল feeling বা ভাব; আর ঐরূপ জ্ঞান ও আনন্দ হওয়ার পর আমরা যে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই হইল will or volition। অথবা মনে করুন আপনার সম্মুখে কোন এক নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পাষণ্ড দুর্ব্বল ও সহায়হীন ব্যক্তির প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে উদ্যত; দর্শনমাত্রেই আপনার ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল ও আপনি তাহাকে বাধা দিয়া আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এখানে দর্শনক্রিয়া, জ্ঞানের অন্তর্গত ও পরিত্রাণের চেষ্টা, ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত এবং ক্রোধ ও ঘৃণা, ভাবের অন্তর্গত। মানসিক যে কোন অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাউক না কেন, তাহা এই তিনটীর একটী হইবেই হইবে, কিন্তু মন যে এই তিনটী বিভাগের কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া অপর দুইটীকে একেবারে বাদ দিয়া কার্য্য করে, তাহা নহে। মনের প্রত্যেক অবস্থাতেই এই তিনটী বৃত্তি অল্লাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে—কোন অবস্থা জ্ঞানপ্রধান, কোন অবস্থা ভাবপ্রধান, কোন অবস্থা বা বা ইচ্ছাপ্রবল। বাহ্য জগতেও ইহা সুন্দররূপে প্রতীত হয়; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকলের সমবায়ে জগৎ—ইহার কোনটী সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আমরা উপলব্ধি করি না, তবে কোন বস্তু শব্দ-প্রধান কোন বস্তু বা স্পর্শপ্রধান ইত্যাদি। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহার নাম "পঞ্চীকরণ" দেওয়া হইয়াছে। এখন উপরোক্ত দার্শনিকগণ বলেন যে মন এই অবস্থাসমূহের সমষ্টিমাত্র। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন আন্তরিক অবস্থা অনুভব করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত থাকে ও অবশিষ্ট অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত থাকে, কিন্তু স্মৃতিশক্তির প্রভাবে আমরা তাহাদিগকে অতীতের গর্ভ হইতে বর্ত্তমানে উপস্থিত করিতে পারি এবং ইহাও আমরা উপলব্ধি করি যে, এই সকল অবস্থা পর্য্যায়-ক্রমে একের পর আর—শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘটিয়া আসিয়াছে ও তাহাদের মধ্যে একটী শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে। স্মৃতিশক্তিপ্রভাবে উপস্থাপিত,

পর্য্যায়ক্রমে সঙ্ঘটিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ অতীত অবস্থানিচয়ের সহিত সম্পর্কিত বর্ত্তমান মানসিক অবস্থাসমষ্টিকে মন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। Millএর মতে Mind is a permanent possibility of sensations, thought emotions and volition. এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে এই সকল অবস্থা হইতে পৃথক স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অস্তিত্ব জানিবার উপায় নাই—মিলের মতকে সেই জন্য অজ্ঞেয়-বাদ বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু Mind বা Egoর এই ব্যাখ্যায় অনেকে তৃপ্তি লাভ করেন না; তাঁহারা বলেন যে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় মানসিক কোন এক অবস্থা অন্য এক অবস্থাকে জানিতে পারে না। আমরা কখনই বলিতে পারি না যে, আমার একটী দর্শনক্রিয়া বা শ্রবণক্রিয়া আর একটী দর্শনক্রিয়া বা শ্রবণক্রিয়াকে জানিতে পারিল, কি আমার কোন এক চিন্তা বা thought, কোন একটী feeling (ভাব) বা will (ইচ্ছা) কে জানিতে পারিল। যদি তাহাই না হইল, তবে যুগপৎ বর্ত্তমান মানসিক অবস্থাসমূহের সমষ্টিই বা কোন এক অবস্থাবিশেষকে জানিবে কি করিয়া? ব্যষ্টিভাবে মানসিক অবস্থায় যে শক্তি নাই, সমষ্টিভাবে তাহার সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে? ব্যক্তি সাধারণ বলিয়া থাকেন "আমার মন" "আমার সুখ দুঃখ" "আমার জ্ঞান" "আমার ইচ্ছা"। এইরূপ ব্যবহার হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞাতা বা ভোক্তা বা কর্ত্তা ইনি আপনাকে স্বীয় জ্ঞান বা ভাব বা ইচ্ছাদি কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়া জ্ঞান করেন ও সেইরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে আমি এক্ষণে অবস্থাবিশেষ অনুভব করিতেছি, সেই আমি পূর্ব্বেও অবস্থাবিশেষ অনুভব করিয়াছিলাম; পূর্ব্ব অনুভূত-অবস্থা ও বর্ত্তমান অনুভব-অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও অনুভবকর্ত্তা যে আমি—তাহা একই। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থায়ী একত্বের এই যে ধারণা, ইহাই হইতেছে "আমিত্বে"র বা egoর প্রাণ।

"Self is thought to be the unity in the midst of diverse kinds of sensations, the permanent element in the midst of

transient and successive sensations, the one conscious subject in the midst of many known objects.

এইরূপ চিন্তাপ্রণালী দ্বারা আমরা এই সত্যে উপস্থিত হইলাম যে মন বা ego দেহ নহে বা মানসিক অবস্থানিচয়ের সমষ্টিমাত্র নহে। ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ—অবস্থানিচয় যাহার বিকার মাত্র। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে ইহাকে noumenon কহে, as opposed to phenomenon। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট প্রভৃতি এই মতের পোষক।

এইখানে ইহা বলা উচিত যে, ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতের পরিচয় দিবার কালে Self ego mind পরস্পর convertible terms বা অনুরূপ শব্দ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রে Self বা Ego এবং মন ইহাদের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। Self বা Ego চৈতন্য পদার্থ, মন জড় ইন্দ্রিয় মাত্র—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম। আমাদের দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় দিবার কালে ঐ বিষয় পরিষ্কার করা যাইবে। আরও বলা উচিত, আধুনিক জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ অনেকাংশে বেদান্তের উপর তাঁহাদের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কাজেই হিন্দুদর্শনের সহিত তাঁহাদের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "আমিত্বে"র একটা ধারণায় আমরা উপস্থিত হইলাম, এই "আমিত্বে"র শেষ কোথায়? ইহার goal কোথায়? যত দিন আমার দেহ, তত দিনই কি আমি? মৃত্যুতেই কি "আমার" অবসান? এই যে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া, আশা নিরাশার ভিতর দিয়া, "জয় পরাজয় উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার" ভিতর দিয়া প্রীতি অপ্রীতির সহিত বন্ধুত্ব ও বিবাদ করিয়া, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, মায়া মমতার গণ্ডী দিয়া আমাকে তৈয়ার করিলাম—মৃত্যু ধ্রুব জানিয়াও "আমার আমার" এই গগনভেদী শব্দে জগতের মধ্যে আমার নিজস্ব একটা অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আসিলাম, পাঞ্চভৌতিক দেহের বিশ্লেষণের সহিত কি তাহা লোপ পাইল? তাই যদি হয় তবে এত

করিবার প্রয়োজন কি? এত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিবার, এত পরীক্ষা দিবার, এত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ উদ্যমের আবশ্যক কি? কোথায় দায়িত্ব-বোধ, কোথায় পাপপুণ্য, কোথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, কোথায় দণ্ড পুরস্কার—কিছুরই ত অবসর থাকিল না? জীবন যে মুহূর্ত্তে অসহ্য বোধ হইল তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া ফেলিলেইত আপদ চুকিয়া গেল! মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার অমরসৃষ্টি হ্যামলেটের মুখ দিয়া—এই জীবনসমস্যা তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।—"To be, or not to be, that is the question—" ইত্যাদি—বাহুল্যভয়ে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

সংসারে মানবজীবন লাভ করিয়া এই প্রশ্ন মানবহৃদয়ে উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, তাই জগতের সাহিত্যভাণ্ডারে ইহারও মীমাংসার চেষ্টা দেখিতে পাই।

২। মৃত্যুর পরিণাম কি?

প্রথমে জনৈক চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের এই সম্বন্ধে চিন্তা পাঠকগণের সম্মুখে স্থাপন করিব। তিনি বলেন—

(ক) মানবেতর জীবের প্রতি লক্ষ্য করিলে জন্মাবধি অন্তকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অবস্থার কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় গুটীপোকা প্রজাপতি আকারে পরিণত হইলে, পক্ষী ডিম্ব ভেদপূর্ব্বক শাবক আকারে পরিণত হইলে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার, শক্তিসামর্থ্যের কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়। মানবজাতিতে এই বিচিত্র ও বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। মাতৃগর্ভে বীজ আকারে অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্যের পলিত কেশ জীর্ণ দেহ কুঞ্চিত ত্বক পর্য্যন্ত যেমন দৈহিক পরিবর্ত্তন, ক্ষুদ্র মানসিক শক্তির উন্মেষ হইতে প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার বিকাশ পর্য্যন্ত তেমনি মানসিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তবে মৃত্যুও যে একটা পরিবর্ত্তন নয়, তাহা কে বলিল?

(খ) পরমেশ্বর আমাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ অনুভব করিবার বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন—নিত্যই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করি। কার্য্য

বিশেষ আমাদের সুখের কারণ, অপরদিকে কার্য্যান্তর আমাদিগের নিকট দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সুখ দুঃখানুভবের শক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনের পরেও আমাদের সেই শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা শক্তির ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকা বিশ্বাস করিয়া থাকি। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ আজ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সুদূর অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও সুদূর ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে—ইহা কি আমরা বিশ্বাস করি না? তাহা যদি বিশ্বাস করিয়া থাকি, তবে আমাদের সুখদুঃখানুভবের শক্তি যাহা ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, তাহা যে পরেও বর্ত্তমান থাকিবে ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি?

(গ) এই বিশ্বাস দুই প্রকারে জন্মিতে পারে।

(১) মৃত্যুরূপ পদার্থের প্রকৃতিগত শক্তি অথবা ধর্ম্ম (reason of the thing) পর্য্যালোচনা দ্বারা অথবা (২) জাগতিক ব্যাপার হইতে অনুমান দ্বারা।

মৃত্যুর প্রকৃতিগত শক্তি অথবা ধর্ম্ম যে কিরূপ—সে বিষয়ে সাধারণ মানব অজ্ঞ। মৃত্যু যে স্বরূপতঃ কি তাহা আমরা অবগত নহি, আমরা কেবল মৃত্যুজনিত কতকগুলি ক্রিয়া বা ফলের সহিত পরিচিত—যেমন আমরা দেখিতে পাই মৃত্যু হইলে জীবের অস্থিমাংসাদি গঠিত দেহ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে জীবের ধ্বংস হয়, ইহা অনুমান করা সমীচীন নহে। যেমন জড়পদার্থে গতি শক্তি অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান থাকে তেমনি নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত অবস্থাতে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি অলক্ষিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর নয় বলিয়া ঐ শক্তি-সমূহ যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

জাগতিক ব্যাপার হইতেও ইহা অনুমান করিবার বিশিষ্ট কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, জগতে এমন কোন উদাহরণ আমরা

দেখিতে পাই না, যাহা হইতে আমরা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অস্তিত্বশালী শক্তিগুলির তাহার পরক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল—ইহা বলিতে পারি। আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিতে আমরা তাহাদিগকে উপলব্ধি না করিতে পারি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম মৃত্যুর অপর পারে তাহাদিগকে অনুসরণ না করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিব যে তাহারা লোপ পাইল? আমাদের শক্তিহীনতা তাহাদের আয়ুকালের পরিমাপযন্ত্র হইতে পারে না।

যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখা যাউক।

(১) বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, যাহা মৌলিক, অন্য বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নহে তাহার বিনাশ নাই। যাহা একাধিক বস্তুর সংযোগে গঠিত তাহার বিনাশ হইতে পারে অর্থাৎ ঐ একাধিক বস্তুর পরস্পর বিয়োগ ঘটায় সেই সংযোগোত্থ বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহা মূলেই এক, তাহার বিয়োগ ঘটান চলে না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের জ্ঞান কি যৌগিক? তাহা কোন অংশেই আমরা অনুভব করি না। জ্ঞান এক হইলে জ্ঞানের আধার যে জীব বা পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞাতা তিনিও এক এবং বিজ্ঞানের নিয়মে তাঁহার বিনাশ হইতে পারে না। অবশ্য দেহের সহিত এই জীবের অর্থাৎ জড়ের সহিত চৈতন্যের সাহচর্য্য রহিয়াছে বটে কিন্তু জড় সংযোগ ব্যতীত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নহে।

(২) জ্ঞাতা বা পুরুষের একত্ব বা অপরিচ্ছিন্নতা বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রমাণ করা দুষ্কর হইলেও ইহা বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে দেহস্থিত জ্ঞাতা পুরুষ দেহ নহেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি হইতে পারে, আমাদের ইন্দ্রিয়-বিশেষ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে এমন কি আমাদের দেহের অধিকাংশ নষ্ট হইতে পারে তথাপি আমরা পূর্ব্বেও যে জীব ছিলাম অঙ্গহানি বা ইন্দ্রিয়াদি বিনাশের পরেও সেই জীবই

থাকি। বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটা পরীক্ষিত সত্য যে জীবের দেহগঠনকারী অণুপরমাণু নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। বাল্যাবস্থায় আমার দেহে যে উপাদান বর্ত্তমান ছিল বৃদ্ধাবস্থায় তাহার কিছুই থাকে না, অথচ আমার তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমি শিশু অবস্থাতেও যে আমি, মৃত্যুশয্যাতেও সেই আমি। একটু বিশেষভাবে যদি ইন্দ্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলেও ঐ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের দর্শনশক্তি লাভ হয়, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের শ্রবণশক্তি লাভ হয় ইত্যাদি। আমরা নিত্যই দেখিয়া থাকি যে, চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে আর নিরপেক্ষ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তখন তাহার সাহায্য জন্য চশমার প্রয়োজন হয়; অনেকেই নানাকারণে শ্রবণশক্তির অল্পতা আসিবার পরে তাহার সাহায্যজন্য যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া পড়ে। পদহীনতার জন্য গমনশক্তির হ্রাস বা অভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে গমনাগমন সাধন করিতে পারা যায়। আবার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন করিয়া থাকে। স্বাভাবিক গমনশীল ব্যক্তি কৃত্রিম উপায়ে চলাচলের দ্রুততা সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে একজন মৃত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি হয়ত বেশ নির্দ্দোষ অবস্থায় আছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় না। এইরূপ বিচার দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রমাত্র, তদতিরিক্ত যন্ত্রী যিনি তিনিই "আমি"। যন্ত্রের বিনাশের সহিত যন্ত্রীর বিনাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

এ পর্য্যন্ত আমরা দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়া আলোচনা করিলাম কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত মানবের আরও কতকগুলি সম্পদ্ আছে, যেমন তাহার চিন্তা বৃত্তি, প্রীতি বৃত্তি। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য দেহ বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎভাবে আবশ্যক হয় না। অবশ্য ঐজন্য প্রথমে

পঞ্চেন্দ্রিয়সহযোগে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় বটে, কিন্তু উপাদান সংগ্রহ হওয়ার পর আর ইন্দ্রিয় যে অবস্থাতেই থাকুক না, আমি অনায়াসে চিন্তা করিতে ও প্রীতির অনুশীলন করিতে পারি। চক্ষু মুদিত করিয়া শ্রবণবৃত্তি রোধ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা সম্ভোগ করিতে পারি, স্বপ্নে দেবত্ব লাভ করিয়া জগতে জীবকল্যাণের জন্য অপরিমেয় শান্তিসুধা বিতরণ করিতে পারি। তবেই দেখা যায় যে, চেতনের ঐ ঐ বৃত্তির সহিত অচেতনের ঘনিষ্ঠ কোন সম্বন্ধ নাই ; একের লয়ে অপরের লয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। স্থূল দেহের বিনাশে sensation (ইন্দ্রিয়ানুভূতি) গ্রহণ করিতে না পারি, reflection (মনন) এর কোন বাধা নাই।

এই সকল যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া Bishop Bulter বলিতেছেন—"And thus when we go out of the world, we may pass into new scenes, and a new state of life and action, just as naturally as we came into the present. And this new state may naturally be a social one. And the advantages of it, advantages of every kind, may naturally be bestowed, according to some fixed general laws of wisdom, upon every one in proportion to the degrees of virtue."

এতক্ষণ আমরা এই দুই প্রশ্ন সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মত দেখিলাম ; এইবার আত্মা, মন, মৃত্যুর ফলাফল সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন কি বলিতেছেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। এখানে আমরা কেবল মাত্র যুক্তিতর্কের ক্ষীণ ভাষা শুনিয়াই পরিতৃপ্ত নহি—প্রত্যক্ষদর্শীর গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

প্রথমেই পঞ্চদশী কি বলেন দেখুন। স্থানাভাব তত সুগম নহে বলিয়া মূল শ্লোকগুলির অনুবাদ মাত্র নিম্নে দিতেছি। জীব সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে— জাগ্রৎ, অর্দ্ধজাগ্রৎ ও অর্দ্ধসুষুপ্ত (অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা) এবং সুপ্ত - এই তিন অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সকলের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"শব্দস্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয়সকল বিচিত্রভাবশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্।

সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত ঐ বিষয়সকলের যে সম্বিৎ (Consciousness) একরূপতাপ্রযুক্ত অভিন্ন।

"স্বপ্নকালেও সেইরূপ, পার্থক্য এই যে স্বপ্নকালে বেদ্য বিষয়সকল অস্থির অর্থাৎ অব্যবস্থিত, জাগৎকালে স্থির অর্থাৎ সুব্যবস্থিত।

"স্বপ্নকালে ও জাগ্রৎকালে দুয়ের মধ্যে বিষয়ঘটিত এইরূপ প্রভেদ কিন্তু উভয় কালের সাক্ষীস্বরূপা যে সম্বিৎ তাহা একই, অভিন্ন (কেননা সম্বিৎ যদি একই না হইত তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোন স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহারও স্মরণে আবির্ভূত হইত না)।

"সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার-বোধ আবির্ভূত হয় অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না, এইরূপ স্মরণ হয়। এখন দেখুন যে জ্ঞাতপূর্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্ব বিষয় কখনও স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। অতএব সুষুপ্তিকালে 'আমি কিছু জানিতেছি না'।

'এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই অজ্ঞান অন্ধকার-বোধ অজ্ঞান অন্ধকাররূপ বিষয় হইতে পৃথক্।

"এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন এক দিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহা দিনান্তরেরও সাক্ষী।"

তাহার পর পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মাসাব্দ যুগকল্পেষ গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥"

মাস, বৎসর, যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—তাহার মধ্যে কেবল স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না, অস্তও যায় না। তার পরেই বলিতেছেন

"ইয়ং আত্মা"—"এই সম্বিৎই আত্মা"। *

পঞ্চদশী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, আত্মা বা Self শব্দস্পর্শাদি-ভূত বিষয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বস্তু।

অতএব আমরা যদি সাংখ্যের বা বেদান্তের বা ভাগবতপুরাণের কি গীতার এই সম্বন্ধে মত আলোচনা করি তাহা হইলেও দেখিতে পাইব, তাঁহারা সমস্বরে প্রকাশ করিতেছেন—আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আত্মা পুরুষ ও মন প্রকৃতির বিকারজনিত

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

ইন্দ্রিয়াদির অন্যতম একাদশ ইন্দ্রিয়—ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে ঐ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সাংখ্যের দুই একটী শ্লোকের অনুবাদ এখানে দিলাম।

"মূল প্রকৃতি বিকৃতি নহেন; মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সাতটী বস্তু প্রকৃতি বটে; ষোলটী বস্তু পাঁচটী বিকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন।

"প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; অহঙ্কার হইতে ষোড়শ তত্ত্ব, সেই ষোড়শ তত্ত্বের অপকৃষ্ট পঞ্চতত্ত্ব হইতে (স্থূল) পঞ্চভূতের উৎপত্তি।

"অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই দ্বিবিধ কার্য্যই উৎপন্ন হয়।

"এই একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে, এবং পঞ্চ তন্মাত্র তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, এই উভয়বিধ বস্তুরই রাজস অহঙ্কার অন্যতর কারণ।'

"জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী"।

"মন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়স্বরূপ; সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনও একটী ইন্দ্রিয়।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাংখ্যদর্শনের সহিত অন্য দর্শনের বা শাস্ত্রের এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সকল শাস্ত্রের শিক্ষার স্থূল মর্ম্ম এই যে—পুরুষ আত্মা, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি এবং উভয়ই অনাদি—অবশ্য সাংখ্যে ও বেদান্তে এই স্থানে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আছে। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ স্থাপন করিয়া এই দ্বৈতভাবের উর্দ্ধে উঠেন নাই; বেদান্ত ঐ দ্বৈতভাব ঘুচাইয়া এক চরম একত্বে উপস্থিত হইয়াছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। বেদান্তের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি একই পরমাত্মার বিভিন্ন ভাব মাত্র (different aspects)। কিন্তু আমরা যে আত্মা ও মনের পার্থক্য বুঝিতেছিলাম, তৎ সম্বন্ধে উহাতে আসে যায় না। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়া মহত্তত্ত্ব; মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়ের নাম 'করণ' এবং সেই জন্য

মনের নাম 'অন্তঃকরণ'—এই সকল তত্ত্ব হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি। কিন্তু এই সমস্তই জড়; চৈতন্যময় আত্মার অধিষ্ঠানবশতঃই তাহারা চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। (পৌরাণিক কথা)।

এই যে শাস্ত্রমতে দেহ ও মন হইতে পৃথক আত্মা পাইলাম—এই আত্মার স্বরূপ কি? ইনিই ব্রহ্ম। ইঁহাকে শ্রুতিতে নির্গুণও বলিয়াছেন সগুণও বলিয়াছেন। কোন মতে তিনি নিরুপাধিক, নির্গুণ, বাক্য-মনের অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য। কোন মতে তিনি সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণের আকর; তিনি বাক্য মন ও বুদ্ধির অগোচর নহেন। তিনি অজ্ঞেয় বা অচিন্ত্য নহেন (গীতায় ঈশ্বরবাদ)। অদ্বৈতবাদীর ও বিশিষ্টা দ্বৈতবাদীর এই মতদ্বৈতরূপ গহনবনে ক্ষুদ্র আমাদের যাইবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, সেই আত্মাই কি 'আমি'? জ্ঞানীর মতে তাহাই বটে। কিন্তু ভক্ত বলেন, না। 'আমি' তাহার অংশবিশেষ, তিনি চিদ্ঘন, আমি চিদংশ, তিনি অগ্নি আমি স্ফুলিঙ্গ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—'ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ-যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" সমাধিযোগে চরম একত্বের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ মানবের অহংবুদ্ধি থাকিবেই এবং ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষেও দ্বৈতবাদীর পন্থাই প্রশস্ত। শুধু তাহাই নহে, উহা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। তাই তিনি বলেন, তিনি সাগর আমি বুদ্বুদ, তিনি সূর্য্য, আমি সূর্য্যকিরণ। কি জানি কোন লীলা করিবার অভিপ্রায়ে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষ পরমাত্মা "বহু" হইবার ইচ্ছাকরতঃ উপাধি গ্রহণ করিয়া জীবরূপে দেখা দেন—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। আমি সেই জীব—আমার আত্মা সেই জীবাত্মা "আমি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দানিলয় অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার অংশবিশেষ। পরমাত্মা বিভু, তিনি নিজ মহিমায় মহিমান্বিত; আমি দুর্ব্বল, শোকমোহে মুহ্যমান জীব, তথাপি তাঁহারই মহিমা আমাকেও মহিমান্বিত করিয়াছে।' এখন এই যে "আমি" বা জীবাত্মা—মৃত্যুর সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? মৃত্যুতেই কি ইহার

বিনাশ? এ সম্বন্ধে ইংরাজী দর্শনের উত্তর পাইয়াছি, হিন্দুশাস্ত্র কি বলেন দেখুন —

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭
"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

ভগবান্ বলিতেছেন যে আত্মা অবিনাশী, অব্যয়, নিত্য, অপ্রমেয়, বাহ্যরহিত, শাশ্বত, পুরাণ, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থাণু, অনাদি ; এ শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

তবে মৃত্যু কি?

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

"দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র অতএব জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না।"

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ

করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।”

> “দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
> দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ভাঃ ১০।২য় ৩৯
> ব্রজং স্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
> যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ঐ ৪০

এই দেহ নাশ হইলে—কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহী, দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর ত্যাগ করে। যেমন পুরুষ গমনকালে এক পদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে—যেরূপ জলৌকা তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে; সেইরূপ কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যু তাহা হইলে দেহান্তর প্রাপ্তি, জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ ভিন্ন কিছুই নহে। জলৌকা যেমন এক তৃণ পরিত্যাগ করিয়া তৃণান্তর গ্রহণ করে, আমি তেমনই আমার জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করি। তবেই দেখিতেছি, মহামনা সেক্ষপীয়র যে সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল কবির কল্পনা মাত্র নহে, তাহার মূলে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে—চিন্তার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝিলাম যে, আমার মৃত্যুর সঙ্গেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি নহে, জীবনযাত্রার শেষ হইল না, গন্তব্য স্থান আছে। কোথায় সে স্থান—ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন।

(আগমীবারে সমাপ্য)

উদ্ধব ও ব্রজগোপী।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগ। দেবভাগের পুত্র শ্রীউদ্ধব। বৃহস্পতির শিষ্য এবং বৃষ্ণিগণের মন্ত্রিপ্রবর উদ্ধব অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরা যাত্রার সময় গোপীগণকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন, আমি শীঘ্র ব্রজে ফিরিব। ভগবান্ জানিতেন, ব্রজপুরীস্থ গোপীরা তাঁহার অদর্শনে বিরহোৎকণ্ঠ্য বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। সেজন্য ভগবান্ অনন্যমনা অতিপ্রিয় উদ্ধবকে একদিন নির্জ্জনে বলিলেন, "হে সৌম্য! একবার ব্রজে যাও এবং পিতামাতার নিকট প্রীতি লইয়া যাও, আর বিয়োগবিধুরা গোপীগণকে আমার সন্দেশ দ্বারা শান্ত করিয়া আসিও। আহা! তাহারা আমার অদর্শনে মৃতকল্প হইয়া আছে।" উদ্ধব নিজ প্রভুর সন্দেশ বহন করিয়া গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন, দিবাকর অস্তোন্মুখ হইবার সময় নন্দালয়ে পৌঁছিলেন। সন্ধ্যার গোধূলি-ধূসরিত আবরণে তাঁহার রথ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর আসিয়াছেন শুনিয়া নন্দ আনন্দে বাসুদেব জ্ঞানে তাঁহার সৎকার করিলেন। পরে কৃষ্ণরামের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথামৃত আলোচনা করিতে লাগিলেন। উদ্ধব নন্দযশোদার শ্রীভগবানে পরম অনুরাগ দেখিয়া প্রীত হইলেন। নন্দযশোদার তীব্র অনুরাগাতিশয্যহেতু শ্রীকৃষ্ণে মানুষবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উদ্ধব বুঝাইলেন যে, রাম ও কৃষ্ণ মানুষ নহেন, দেবতাও নহেন, কিন্তু জগৎকারণ অন্তর্যামী। তাঁদের আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁরা সামান্য নন।

যস্মিন জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবিশ্য মনোবিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥

এই রাম বা কৃষ্ণে যদি প্রাণ বিয়োগকালে ক্ষণমাত্রও কেহ

বিশুদ্ধ মন নিবিষ্ট করিতে পারে সে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মবাসনা ছেদন করিয়া "ব্রহ্মময়" আনন্দস্বরূপ ও "অর্কবর্ণ" প্রকাশস্বরূপ হইয়া পরপদ প্রাপ্ত হয়। তোমাদের তাঁহাতে পরম অনুরাগ, অতএব তোমরা নিশ্চয়ই কৃতকৃতার্থ হইয়াছ। নন্দযশোদার তীব্র দর্শনলালসা বুঝিয়া বলিলেন :—

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥

হে মহাভাগ! খেদ করিওনা। কৃষ্ণ কাছেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখ। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠে, সেইরূপ তিনি ভূতগণের অন্তর্হৃদয়ে রহিয়াছেন। সত্য বটে, কাষ্ঠ মন্থন না করিলে অগ্নি দেখা যায় না, সেইরূপ ভক্তি বিনা কৃষ্ণ দেখা যায় না। কিন্তু তোমাদের তো পূর্ণ ভক্তি, তোমাদের সাক্ষাৎকার অবশ্যই হইতেছে।

নন্দযশোদার ভগবানে আত্মীয়বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

ন হ্যস্যাস্তিপ্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ বাস্তি অমানিনঃ।
নোত্তমঃ নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা।
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এবচ।
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্র যোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে।

তিনি দেহাভিমান শূন্য ও সমদ্রষ্টা। কেহ তাঁর প্রিয় নহে, কেহ অপ্রিয় নহে; সেইরূপ কেহ উত্তম নহে, কেহ অধম নহে, কেহ অসমও নহে।

তাঁহার কেহ মাতা নাই, কেহ পিতা নাই; তাঁহার ভার্য্যা নাই, পুত্র নাই, আত্মীয় নাই, পর নাই; তাঁহার দেহ নাই, জন্ম নাই, কর্ম্ম নাই; তবে লীলাহেতু ও সাধুগণের পরিত্রাণজন্য কখন কখন দেবাদি শরীরে, কখন কখন মৎস্যাদি শরীরে, কখন কখন নৃসিংহাদি শরীরে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন।

তাঁদের পুত্রবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।

সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতামাতা চ ঈশ্বরঃ॥

ভগবান হরি কেবল তোমাদের পুত্র নহেন, কিন্তু সকলের পুত্র। তিনি সকলের আত্মা, পিতা, মাতা ও স্বামী।

তার পর উদ্ধব বুঝাইলেন, এই বিশ্ব কৃষ্ণময়। দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকং বা। বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ।

যাহা কিছু দেখ, শুন, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ, অল্পক—সবই সেই অচ্যুত; সেই অচ্যুত ছাড়া আর কিছু বাচ্য নাই। কারণ পরমার্থভূত তিনিই সব। এইরূপ কথাবার্ত্তায় উদ্ধব ও নন্দ সে নিশা যাপন করিলেন। রাত্রিশেষে গোপীকণ্ঠে কৃষ্ণগান শুনিতে লাগিলেন। "নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্"—ঐ প্রভাতী কৃষ্ণ-গীতি সর্ব্বদিকের অমঙ্গল নাশ করে। দিনমণি উদিত হইলে গোপীরা নন্দদ্বারে হেমময় রথ দেখিল। গোপীরা রথদর্শন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, এ কে আসিল! আবার কি অক্রূর আসিল! এইবার আমাদের মাংস দ্বারা পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিবেন! তারপর তাঁহারা দেখিলেন, অক্রূর নহে, কিন্তু এক আজানুলম্বিত বাহু, কমললোচন, পীতাম্বর, পুষ্করমালি সুন্দর পুরুষ। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার বেশ কৃষ্ণের ন্যায়। ইনি কে! কোথা হইতে আসিলেন? তারপর শুনিলেন, তিনি কৃষ্ণানুচর। গোপীরা তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।

তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ।

গোপীরা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁর কৈশোর ও বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া সেই সব বর্ণন করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পারিয়া উঠিতেছেন না।

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযুষ বিপ্রুট্ সকৃদ

দনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদিগৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা।
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

যাঁর লীলা পরমানন্দজনক ও কর্ণপীযূষ তাহার কণিকা একবার আস্বাদন করিলে বহুজনের পতিপত্নীস্নেহ ত্যাগ হইয়া যায় এবং তাহারা অচেতনপ্রায় হয় এবং শীঘ্র দুঃখিত গৃহকুটুম্ব ত্যাগ করিয়া ভোগহীন পক্ষীর ন্যায় ইহলোকে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া মাত্র প্রাণধারণ করে। অতএব কৃষ্ণকথা যদ্যপি পরিত্যজ্য, কিন্তু আমরা তাহা ত্যাগ করিতেছি না, কি করিব?

উদ্ধব তাঁদের কৃষ্ণদর্শনলালসা দেখিয়া বলিলেন—

অহো য়ূয়ম্ পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসাং ইত্যর্পিতং মনঃ॥
দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপিদুর্লভা॥
দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বা বৃণীত যদ্য়ূয়ং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং॥

অহো, তোমরা কৃতার্থ হইয়াছে; তোমরা লোকপূজিত, কারণ ভগবান বাসুদেবে তোমরা ঈদৃশ মন সমর্পণ করিয়াছ।

দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্য বিবিধ শ্রেয়সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয়।

আর তোমাদের ভাগ্যক্রমে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে মুনিগণেরও দুর্লভা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে তোমরা পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, ভবন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষকে বরণ করিয়াছ।

উদ্ধব ভাবিতেন, ভগবান নিরর্থক গোপীদের প্রশংসা করেন। ভগবান উদ্ধবের মানস বুঝিয়া তাঁহাকে ব্রজে পাঠান। উদ্ধব গোপীদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন,

সর্ব্বাত্মভাবেঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে ।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥

হে মহাভাগ্যবতীগণ ! তোমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তিযোগে প্রাপ্ত হইয়াছ। ভগবদ্‌বিরহ দ্বারা একান্ত ভক্তি লাভ হয়, ইহা তোমাদের নিকট শিখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। উদ্ধব তারপর ভগবদ্‌সন্দেশ বলিলেন,—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী ।
তথাহং চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয় গুণাশ্রয়ঃ
আত্মান্যেবাত্মনাত্মানং সৃজেঽহন্ম্যনুপালয়ে ॥
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মনা ॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ ॥
সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্ম্মনোবৃত্তিভিরীয়তে ॥
যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥
এতদন্তঃ সামাম্নয়োঃ যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্ ।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥
যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরেবর্ত্তে প্রিয়োদৃশাম্ ।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥
যথা দূরপরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে ।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ॥
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥

এই ভগবদ্‌সন্দেশের দুইটী ব্যাখ্যা আছে। কেহ কেহ বলেন, এই সন্দেশ জ্ঞানময়, কেহ কেহ বলেন প্রেমময়। জ্ঞানময় ব্যাখ্যা এইরূপ—

আমি সকলের উপাদান, সেজন্য তোমাদের সঙ্গে আমার বিয়োগ

দেশতঃ কালতঃ হইতে পারে না। যেরূপ চরাচর ভূতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল মহী এই মহাভূত আশ্রয়রূপে স্থিত, সেইরূপ আমি মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের কারণ এই সকলের আশ্রয়রূপে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছি। আত্মমায়া কার্য্য ভূতইন্দ্রিয়গুণরূপে আত্মাতে আত্ম-দ্বারা আত্মাকে জগদ্রূপে সৃজন করি, পালন করি ও লয় করি। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, শুদ্ধ, ত্রিগুণকার্য্য হইতে ব্যতিরিক্ত, গুণে অন্বিত নহেন। যদিচ আত্মা সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরণাদি মায়াবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীত হন, কিন্তু উপাধিবিয়োগে বিশ্ব তৈজসও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীত হন না, কিন্তু তুরীয়রূপে প্রতীত হন। স্বপ্নোত্থিত জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া জানে। সেইরূপ স্বপ্নবৎ শব্দাদি যে মন দ্বারা চিন্তা কর এবং চিন্তা করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হও, সেই মনকে নিয়মন কর।

প্রেমময় ব্যখ্যা এইরূপ—

আমার সঙ্গে তোমাদের বিয়োগ সর্ব্বরূপে নহে, এক কেবল দেহের বিয়োগ। তোমাদের মন বুদ্ধি আমাতে আছে, আমার মন বুদ্ধি তোমাতে আছে। তোমরা সর্ব্বদা প্রেমের সহিত আমাকে চিন্তা করিতেছ, আমিও তোমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শব্দাদি আশয় করিয়া আছি, যেরূপ করিয়া ভূতগণ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী আশ্রয় করিয়া আছে। তোমাদের মনে, আমার মনপ্রভাবে দেহ-ইন্দ্রিয়-সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির সহিত আমার রূপ আবির্ভাব করি, অন্তর্দ্ধান হই ও সংভোগলীলার্থ মুহূর্ত্তের জন্য পালন করি; আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হই নাই, অন্য কাহারও সঙ্গ করি নাই। তোমাদের বিয়োগে আমি খিন্ন। তোমাদের সৌন্দর্য্য সুষুপ্তিকালে সামান্যভাবে, স্বপ্নে বিশেষভাবে, জাগ্রতে নানামাধুর্য্যময়রূপে সাক্ষাৎ অনুভব করি। মূর্চ্ছার অবসানে তোমরা প্রবুদ্ধ হইয়া সত্য আমার দর্শনস্পর্শন যে মন দ্বারা স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া চিন্তা কর, সেই মনকে তিরস্কার কর। যেহেতু বিনিদ্র হইলে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ পাইয়া থাক—অনুরাগান্ধ তোমাদের সহিত আমার সত্য সংযোগ মিথ্যা বলিয়া মনে কর, সেজন্য এই সন্দেশ প্রেরণ।

যেরূপ মন নিরোধ হইলে সংসার তরণ হয়, সেইরূপ আমার বিরহ তরণ তোমাদের মননিরোধ হইলে হইবে।

মনীষিগণের সাধনকলাপের এই মন নিরোধই অবধি অর্থাৎ পর্য্যাবসান। অষ্টাঙ্গ যোগ, বিবেক, সন্ন্যাস, সধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, ইহাদের ফল মননিরোধ অর্থাৎ মার্গভেদ হইলেও ফল এক— যেরূপ বহু নদীর এক সমুদ্রে পর্য্যবসান। যদিচ আমি তোমাদের প্রিয় কিন্তু চক্ষুর দূরে রহিয়াছি, তোমরা আমাকে অনুধ্যান করিবে বলিয়া। সেই ধ্যান দ্বারা মনের সন্নিকর্ষ হইবে। যেরূপ স্ত্রী পুরুষের দূরচর প্রিয়জনে মন আবিষ্ট হইয়া থাকে—সেরূপ নিকটে চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে হয় না। অতএব আমাতে সম্পূর্ণ অশেষ বৃত্তিশূন্য মন স্থির করিয়া আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া অচিরে আমাকে পাইবে।

গোপীরা বলিল—

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ॥
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া॥
ক উৎসহেত সংত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদং।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ॥
গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে॥
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে॥

মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ। বনবাসিনী আমাদিগে তাঁর কি

প্রয়োজন? অথবা অন্য কামিনীতেই বা তাঁর কি প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমরা তাহা জানি। তথাপি শ্রীকৃষ্ণে আমাদের দুরত্যয়া আশা। উত্তমঃশ্লোকের একান্ত বার্ত্তা কোন প্রাণী ত্যাগ করিতে পারে? তাঁর ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁর উরস্থল হইতে কমলশ্রী বিচলিত হন না। হে প্রভো! রামকৃষ্ণ-সেবিত সেই সরিৎ, শৈল, বনোদেশ গাভী, বেণুরব, শ্রীর নিকেতনস্বরূপ আর তাঁর পদাঙ্ক তাঁকে মুহুর্মুহু আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অতএব তাঁকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তাঁর ললিত গতি, উদারহাস, লীলাবলোকন, ও মধুর বচনে আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছে। কিরূপে বিস্মৃত হইব? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিনাশন, এই গোকুল দুঃখসমুদ্রে মগ্ন, ইহাকে উদ্ধার কর।

গোপীরা প্রিয় সন্দেশ পাইয়া বিরহজ্বর ত্যাগ করিল উদ্ধবকে আত্মা ও অধোক্ষজ জানিয়া পূজা করিল। উদ্ধবও কয়েক মাস গোপীদের সহিত বাস করিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণবার্ত্তায় সে কয় মাস ক্ষণপ্রায় বোধ হইয়াছিল।

গোপীদের ব্যাকুলতা দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এবম নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।

বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়োঃ বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥

ক্বেমা স্ত্রিয়ো বনচরী ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে ক্বচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।

নন্বীশ্বরো নু ভজতো বিদুষোঽপি সাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্য-গদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ,উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধ রুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজ-সুন্দরীণাং॥

আসাম্ অহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ যসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥

এই গোপীরা দেহধারীর মধ্যে ধন্য, কারণ নিখিলাত্মা গোবিন্দে তাঁহাদের প্রেম হইয়াছে। এই অনুরাগ সংসারভীরু মুনিরাও বাঞ্ছা করেন। আর ভক্ত আমরাও ইচ্ছা করি। ভক্তিই মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য। ভগবানের কথাতে যাদের অনুরাগ হয়, তাদের চতুর্মুখ জন্মেও কোন আতিশয্য হয় না। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। এই বনচরী ব্যভিচারদুষ্টা গোপী কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ কোথায়? ঔষধিশ্রেষ্ঠ অমৃত উপভুক্ত হইলে যে তার প্রভাব জানে না, তাকেও শ্রেয়োফল দান করে। সেইরূপ এই গোপীরা জানে না যে কার সঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু তাদের ফল ফলিয়াছে। রাসক্রীড়াতে ব্রজবল্লভীদের ভুজদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গনরূপ প্রসাদ যেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল সেরূপ প্রসাদ নলিনগন্ধকান্তি স্বর্গাঙ্গনারা পায় নাই। এমন কি বক্ষস্থিত একান্তরতি লক্ষ্মীর ভাগ্যে এ প্রসাদ লাভ হয় নাই। যে শ্রীপদ লক্ষ্মী পূজা করেন ও আপ্তকাম পুরুষগণ, চতুর্মুখ, ও সিদ্ধ যোগেশ্বরগণ মনে মনে যে পদ চিন্তা করেন সেই চরণারবিন্দ রাসক্রীড়াস্তে স্তনে ন্যস্ত করিয়া ইহারা আলিঙ্গন দ্বারা কামসন্তাপ ত্যাগ করিয়াছিল। অর্থাৎ ভগবদালিঙ্গনে তাদের কাম নিঃশেষে নাশ হইয়াছিল। উদ্ধব গোপীদের প্রণাম করিলেন। অহো! এই গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতৌষধির

মধ্যেও আমি যেন একটা কিছু হই। এই গোপীরা দুস্ত্যজ পতিপুত্র ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অতিদুর্ল্লভ মুকুন্দপদবী আশ্রয় করিয়াছে। [উদ্ধব গোপী হইবার প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু গোপীদের পদরজসেবী গুল্মলতৌষধি হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন] যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণু আমি বারংবার বন্দনা করি।

গোপগণও প্রার্থনা করিলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া॥
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতি নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥

আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হউক!
আমাদের বাক্ তাঁর নামাভিধায়িনী হউক!
আমাদের কায় তাঁর নমস্কার করুক!

মঙ্গলাচরিত ও দান দ্বারা, বা পুণ্য পাপ কর্ম্ম দ্বারা, ঈশ্বরেচ্ছায়, যে কোন জন্ম হউক, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের অনুরাগ হয়।

ভারতীয় শিক্ষা।

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্ম।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

You must not imagine that there was ever a religion in India called Buddhism, with temples and priests of its own order! Nothing of the sort. It was always within Hinduism—Only at one time the

influence of Buddha was paramount and this made the nation monastic.

—Vivekananda.

সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম-মহাসমুদ্র-মন্থনোদ্ভব নির্ব্বাণামৃত কলসহস্ত ধন্বন্তরি শ্রীবুদ্ধদেবের রহস্যময় জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত আমরা সকলেই জানি—যাহা প্রায় সকল অবতারেই ঘটিয়াছে। একটী নক্ষত্র হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি রত্ন-প্রসূ নারী মায়ার অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাহাতেই তিনি রত্ন গর্ভ ধারণ করেন। তাহারই ফল জগতে এই অতুল মণি শ্রীবুদ্ধ। রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে এই ভয়ে পিতা শুদ্ধোধন স্বর্ণ পিঞ্জরে পোষা পাখীর ন্যায় তাঁহাকে প্রমোদ কাননে রাজধানী কপিল-বস্তুতে রাখিয়া দিলেন।—কিন্তু ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী পরে নর্ত্তকীর বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চটক ভাঙ্গিল—শব দেখিয়া সিদ্ধার্থ শিহরিয়া জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিলেন। এবং সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

ইহাই কি সকলের পরিণাম ?

হাঁ, প্রভু।

কেন আমার বিম্বাধরা রমনীদের—তাহাদের কোমল অঙ্গও কি জরায় লোল হইবে ?

তাহাদেরও! সিদ্ধার্থ পুনরায় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

আমার দেহেরও কি ঐ পরিণাম।

হাঁ প্রভু, আপনারও! যাহাদের জন্ম আছে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। রাজপুত্র শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে নিস্তব্ধতার অন্তরে সমগ্র সাগর-ব্যাপী প্রবল তরঙ্গের একত্র সমাবেশ হইল। ছন্নকে কহিলেন—রথ ফিরাও, বুঝিয়াছি, সন্ন্যাসই জীবের একমাত্র আশ্রয়।

এদিকে জীবের মুক্তি চিন্তা করিয়া অন্তরীক্ষে দেবতারা আনন্দধ্বনি করিলেন। লীলাময়ের জগৎরঙ্গমঞ্চের একটী পট পরিবর্ত্তন হইল। নবজাত-শিশু-ক্রোড়ে নিদ্রিতা গোপা ও অতুল

মহিমান্বিত রাজপদ সমস্তই তুচ্ছ করিয়া জগদ্‌গুরু জীবের মুক্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য বাহির হইলেন। নানাদেশ বিদেশ ঘুরিলেন, নানা তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত দেখিলেন কোথাও শান্তি পাইলেন না। অবরুদ্ধ সিংহের ন্যায় মুক্তির পথের সন্ধান না পাইয়া উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে নানা সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্যে তাঁহার এক দৃঢ় সঙ্কল্প আসিল। "ইহাসনে মে শুষ্যতু শরীরম্ ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্লভাম্ নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে॥" যুগ, যুগ প্রবাহী সংস্কার তরঙ্গিণীকে যেন তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীম বিক্রমে তাহার নিজ জন্মস্থানে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। হইলও তাহাই। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন—মারের চাতুরী খাটিল না। সকল জড় জীব প্রাণী আনন্দে জয়ধ্বনি করিল, সেইদিন হইতে তাহারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিরহ এই পঞ্চ মহাদুঃখের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

দান করিবে, সত্য কথা বলিবে, হিংসা করিবে না, সৎ কর্ম্মের ফল সুখ, অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ, সমস্ত বাসনা ত্যাগ না করিতে পারিলে মুক্তি লাভ হয় না—এ সকল কথাত ভারতবর্ষে নূতন নহে—তবে শ্রীবুদ্ধ ভারতে এবং জগতে কি নূতন দান করিলেন?—তাঁহার প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান নির্ভীকতা। যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছ দেবদত্ত ও চিঞ্চার ন্যায় ধূর্ত্তের শত চাতুরীসত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা উচ্চৈস্বরে সকলের নিকট বল ও দৃঢ়তার সহিত উহা সম্পাদন কর। সংসার যদি মিথ্যা বুঝ এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ কর। বেদ, হাঁ মানিব, যদি আমার বিবেক-বৈরাগ্য প্রসূত অপরোক্ষানুভূতির সহিত মিলে।—দেখিতে পাই, জগতে যদি এমন কোনও লোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি কখনও জ্ঞানতঃ ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই, তাঁহা হইলে তিনি আমাদের বুদ্ধ। তাঁহার দ্বিতীয় দান সঙ্ঘ। আশ্রম ভারতবর্ষে অনেক কাল ধরিয়াই ছিল কিন্তু এ ধর্ম্মসঙ্ঘ অতি অদ্ভুত। যখন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন তখন এই সঙ্ঘ-সন্তানেরা, পৃথিবীর

একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীবুদ্ধের আলোক-বাণী বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় দান, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য সেবা—ইঁহারা যাগযজ্ঞ করিতেন না, ঔষধ-পথ্য, বিদ্যা ও ধর্ম্মদানের দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করিতেন। এই সকল কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপাদানরূপে তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন; চিত্তশুদ্ধির জন্য সোমরস, সহধর্ম্মিণী, পশুবধ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন বোধ করিতেন না। শ্রীবুদ্ধের পঞ্চম দান উপনিষদ্। যে শাস্ত্র এতদিন অরণ্যের মধ্যে দুই চারি জন মাত্র ভোগ করিতেন ও লুক্কাইত রাখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি নিজ অধ্যবসায় বলে উদ্ধার করিয়া জগৎ সমক্ষে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম জগৎকে দেখাইয়াছেন যে সত্যের উপর, ধর্ম্মের উপর এবং শাস্ত্রের উপর সকলেরই সমান অধিকার। যাহা সত্য স্বরূপ তাহার নিকট 'জাতি কুলের ভরম্' নাই। তাঁহার ষষ্ঠ দান স্ত্রীলোকের মুক্তি—তাহাদিগকে সন্ন্যাসের অধিকারী তিনিই জগতে প্রথম করেন এবং উহা হইতে স্ত্রীসঙ্ঘের উৎপত্তি হয় এবং যাহার পরম পবিত্র ফল—সঙ্ঘমিতা।

উপনিষদ্ কথাটী শুনিয়া অস্মদ্দেশীয় কোনও কোনও শ্রেণীর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা হয় ত বলিয়া বসিবেন, এ কিরূপ হইল! সৌগত ধর্ম্ম ত নিরীশ্বরবাদ পাষণ্ড ধর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রে ইহার মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ত অসুরদিগকে ভুলাইবার জন্য এই নাস্তিক-বাদ প্রচার করিয়াছেন। একথা ত স্পষ্ট করিয়া ভাগবতে আছে।'—আবার অপরদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, "উৎপত্তির দিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বত্ব স্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ব্বথা সম্পূর্ণ প্রতি-ক্রিয়াগুলির মধ্যে এই বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যতম। ইহা এমন একজন লোকের ধর্ম্ম, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও স্বীয় সরল ও নীতিগত

শিক্ষা প্রভাবে ভারতীয় জন সঙ্ঘকে তাহাদের অতীত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"*

"বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মমতের ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদ্ভূত আর্য্যেতিহাস হইতে,সহস্র বৎসর অনুশীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া একমাত্র তাঁহারই কথার উপর ইহা গড়িয়া উঠিল, যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তিবলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলনীয়।"†

"পৌরোহিত্যোন্মোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিত্রাতা, সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি অপরের বহুকালের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভাবটীকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণা করিয়া যাজককুলের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সকল জাতিগত উচ্চাধিকারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।" ‡

কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? বৌদ্ধধর্ম্ম যে আমাদের ঘরের কথা। এই ত্রিপিটকীয় ধর্ম্ম যে বহু পূর্ব্ব হইতে বেদেই নিহিত ছিল তাহা বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম § নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। উপযুক্ত স্থান বোধে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি। যাহা হউক বিষয়টী বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার জন্য 'পিয়দশী' অশোকের দ্বাদশ গির্ণার অনুশাসন উদ্ধৃত করিব,—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ

---

* Weber.

† Max Duncker.

‡ Prof: Monier Williams.

§ 'উদ্বোধন'—অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না—যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সার বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্য সংযম—কিরূপ? স্বধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে যেন আদৌ না হয় এবং বিষয় বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়; এরূপ না করিলে স্বধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই ভাল।—কিরূপ? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন।—কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়ন সম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বলা উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সার বৃদ্ধি-যেরূপ আদরণীয়,—দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত নানাবিধ মহামাত্র্য ব্রচভুমিকেরা ও অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্ সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ।” আবার দেখা যায় হিন্দুর যেমন গীতা, বৌদ্ধদের তেমনি “ধম্মপদ” এই ধর্ম্মপদের আদর্শভাগের নাম “ব্রাহ্মণ বগ্‌গো”। তাহা ছাড়াও সম্রাট্ অশোকের অন্যান্য অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় “ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতিসদ্ব্যবহার”, “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান” “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধুকার্য্য বলে”। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইদানীং যেমন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নানা সম্প্রদায়সত্ত্বেও তাহারা সকলেই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যও প্রচলিত

আছে, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রবল সম্প্রদায় মাত্র ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশাখাদির উপাখ্যান পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় বৌদ্ধ-যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধে অবাধে বিবাহ হইত ; বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধ গৃহস্থেরা মানিয়া চলিতেন ; তাহাদেরও গৃহদেবতা থাকিত, তাঁহাকে ভোগ রাগাদি দেওয়া হইত ; জাতি বিভাগ মানিয়া সকলে চলিতেন ; স্ত্রীজাতির হীনত্ব-জ্ঞান বৌদ্ধধর্ম্মেও প্রবল মাত্রায় ছিল। ম্যাক্সমূলর সত্যই বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্কুরোৎপত্তির স্থান উপনিষদের মধ্যেই আছে। উপনিষদ্ প্রোক্ত ধর্ম্মাভিমতগুলিকে চরম বিকাশের পথে পৌঁছাইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক তাহা নহে, পরন্তু ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি সহায়ে একটী নূতন সামাজিক শৃঙ্খলারও বিন্যাস করিয়াছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের সম্যক্ সম্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী যাহা ভিক্ষুও তাহাই, তবে সে ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থিগণের নীরস আত্ম সংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্ত্তব্য ভার ও ব্রাহ্মণ প্রব্রজিতগণের নানারূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত। সন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি—সেই মণ্ডলীর দ্বারা তরুণ কিম্বা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র, ধনী কিম্বা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। বস্তুতঃ বৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত সম্পর্ক-শূন্য নহে—উভয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা বর্ত্তমান এবং আপাত দৃষ্টিতে তীব্র বিরোধ সমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই তাহাদের মীমাংসা উপনিষদের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দর্শন ও ধর্ম্ম মূলতঃ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। দর্শনের কার্য্য স্বধর্ম্মকে বিচারের দ্বারা স্থাপিত করা। সময় সময় এই দর্শনশাস্ত্র বিদেশের এবং অপর ধর্ম্মের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনে অপর কোনও বিজাতীয়

চিন্তার ছাপ পড়ে নাই। কাজেকাজেই যদি আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির সহিত প্রাচীনতর বৈদিক ধর্ম্মের তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্ব-গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ আর একটী নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র। সে ধারা স্বদেশের সরসতা সম্পাদন করিয়া, নিজ সঙ্কীর্ণ জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতের অনুর্ব্বর ভূমি সিক্ত করিয়াছে। পঞ্চ দুঃখ, কর্ম্মবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি অমূল্য মণি বৈদিক ধর্ম্মের খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল। শ্রীবুদ্ধ পুনরায় তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে নূতন ভাষায় নূতন ভাবে সেই তত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন—যে দেবতা অরণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাঁহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কার্য্য ভারতে নূতন নহে। ভারতের ভগবান্ বহুবার এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করে যদি বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয় ও এত বিসদৃশ হইয়া পড়িল কেন? ইহার মূল কারণ প্রচারকের অভাব। বৌদ্ধযুগের পর তক্ষশীলা, নলন্দা ও বিক্রমশীলার ন্যায় আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিও হয় নাই তথা বিক্রমপুরনিবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভিক্ষুর ন্যায় দৃঢ়ব্রত সন্ন্যাসীও জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সপ্ততীবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া নব সভ্যতার উদ্বোধন করিবেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই রাজগৃহ নিবাসী ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আর শাঙ্গনবাসুও জন্মগ্রহণ করিলেন না। শ্রীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটী বিশাল নব তরঙ্গ, শ্রীশঙ্কর আর একটি। প্রথমটি হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি মালা নিঃসৃত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অপরটির সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে যখন

পুনরায় নব তরঙ্গের উত্থান হইল তখন সে তরঙ্গ আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌঁছিল না। শ্রীশঙ্করের প্রচারের পর ভারতবাসী বুঝিল তাহারা ঋজুপথ ত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন করিয়াছে—উহা বুঝিয়া তাহারা পুনরায় সত্য পথ অবলম্বন করিল। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বী অপর দেশসমূহে কি হইল? সে আলোক তথায় পৌঁছাইল না—জ্ঞানালোকবহনকারী প্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল, উপরন্তু তত্তৎদেশীয় মনীষীরা নব নব যুক্তি ও তথ্যের আবিষ্কার করিয়া তাহাকে মাতৃভূমি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অন্ধকারে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাই বিদেশের বুদ্ধ এত উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে আর একখানি আসন পাতিয়া দিয়াছিল তাহার অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রমালার মধ্যে যেন আর একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবাসী তাঁহাকে পূজা করে—অবতার বলিয়া মানে কিন্তু তাঁহার পথ যে একমাত্র পথ তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শ্রীভগবান্ মানবের অবস্থা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান্ মানবের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্মকেই গরীয়ান করিয়াছিলেন।

এখন একবার বৈদিক ও ত্রিপিটকের মূল তত্ত্বগুলির লইয়া আলোচনা করা যাক্ সাংখ্যকারিকায় দেখিতে পাই -

দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চৈন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥

এই যে দুঃখত্রয় বা ত্রিতাপ, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতির "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্যই

"অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।" এই শ্রীবুদ্ধ বাক্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহারও স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখনও মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না।"

প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষায় তাহার পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"গম্ভীর মিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্।"
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি।"
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।"
"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"

বৌদ্ধ ধর্ম্মে "শূন্যম্" "গম্ভীরম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে তাহাই "পূর্ণম্" "সৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ছিল।

জাতক গ্রন্থের পুনর্জন্মবাদও শ্রুতিতেই বীজানুকারে, কখনও বা স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তৃতীয়-বরে বলিতেছেন ঃ—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

"মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন 'আছে' কেহ বলেন 'নাই' আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি ; আমার বরের মধ্যে এইটী তৃতীয় বর।"

ঈশোপনিষদে আছে—

অসূর্য্যা-নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

"আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে।"

ছান্দোগ্যে,—

ত ইহ ব্যাঘ্র বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি॥

তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র কিংবা সিংহ, বৃক কিংবা বরাহ, অথবা কীট বা পতঙ্গ, ডাঁস বা মশক, যাহা যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়।

আচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

যস্মাচ্চ এবমাত্মনঃ সদ্রূপতামজ্ঞাত্বৈব সৎ সম্পদ্যন্তে, অতঃ তে ইহ লোকে সৎকর্ম্মনিমিত্তাং যাং যাং জাতিং প্রতিপন্না আসুঃ—ব্যাঘ্রাদীনাং—ব্যাঘ্রোঽহং সিংহোঽহমিত্যেবম্ তে তৎ কর্ম্মজ্ঞান বাসনাঙ্কিতাঃ সন্তঃ সৎ প্রবিষ্টা অপি তদ্ভাবেনৈব পুনরাভবন্তি—পুনঃ সত আগত্য ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ যৎ পূর্ব্বমিহ লোকে ভবন্তি সম্বভূবুরিত্যর্থঃ, তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি। যুগসহস্রকোট্যন্তরিতাপি সংসারিণো জন্তোর্যা পুরা ভাবিতা বাসনা, সা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥

"যেহেতু তাহারা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়াই সৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব, তাহারা ইহলোকে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্রাদি যে যে জাতি—আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ ইত্যাদি প্রকার প্রাপ্ত ছিল তাহারা সেই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম-সংস্কার

সহকারে সৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া সেই ভাবেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে; সৎ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বস্ব কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বে এখানে ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, কিংবা বৃষ, অথবা কীট, পতঙ্গ, কিম্বা বরাহ, ডাশ কিম্বা মশক যাহা যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও ঠিক তাহাই হয়; কারণ 'প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সংস্কার অনুসারে জন্ম হয়', এই অপর শ্রুতি হইতে জানা যায় যে সংসারী জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত যে বাসনা (সংস্কার), তাহা সহস্র কোটী যুগ ব্যবধানেও বিনষ্ট হয় না।"

পরে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। শ্রীবুদ্ধ যদি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? আমরা বলি ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবীরদিগের ধারাই এইরূপ। ইহা কিছু নূতন কথা নহে। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্ত কণ্ঠে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকে বহুবার এতদ্দেশীয় আস্তিক বা নাস্তিক দার্শনিকেরা আক্রমণ করিয়াছেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদকিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা সমাসতে॥ ৩৯ ১ম।
১৬৪ সূ, ঋক।

"সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে ঋক্‌দ্বারা সে কি করিবে? একথা যাহারা জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।"

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো— ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

চার্ব্বাক্ দর্শনে আছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃর্নির্ম্মিতা ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও দেখা যায়—

নির্ব্বীর্য্যয়ঃ শ্রৌত জাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাইব ॥

যাহা হউক সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই অনুমতি হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুজাতির নিজস্ব যিশু খৃষ্টকে তাঁহার স্বদেশবাসীরা বুঝিতে পারে নাই পরন্তু তাঁহার ভিন্নদেশীয় শিষ্যেরাই তাঁহার ধর্ম্মের যথার্থ অনুশীলন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীবুদ্ধের শুদ্ধ-বেদান্ত ধর্ম্ম লইয়া সেরূপ হয় নাই। ইহার ফল পৃথক হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার স্বদেশবাসীরা ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভিত্তিহীন ভিন্নদেশীয় ভারত-শিষ্যেরা সংযোগস্থাপনকারী প্রচারকের অভাবে এবং ধর্ম্মকে তাহার মূল খাতে প্রবাহিত করিবার শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণের অভাব প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ যথাযৎ অনুশীলন না করিতে পারিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম হইতে একটি পৃথক ও বিসদৃশ ধর্ম্মে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধান দেশসমূহের বর্ত্তমান যুগে নবাদর্শে জাতীয় জীবন গঠন করিবার চেষ্টা উহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। শ্রীশঙ্কর নামমাত্রাবলম্বী নাস্তিক ব্যাভিচার-দুষ্ট বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে ভারত বহিস্কৃত করিয়াছিলেন। ধীর ও শান্তচিত্তে অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্যে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মত বিরোধ থাকিলেও বুদ্ধদেবের যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম তাহাই শ্রীশঙ্কর নিজ ভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাধ্যমিক, বৈভাষিক, প্রভৃতি নাস্তিক দর্শন যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন তাহা

শ্রীবুদ্ধের মত নয় উহা তাঁহার অল্পধী শিষ্যেদের মস্তিষ্ক প্রসূত। এবং সেই জন্য অস্মদেশীয় কোনও কোনও পরমভাগবত শঙ্কর দর্শনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন।

এখন কিন্তু বাদ-বিসম্বাদের রজনী গতপ্রায়। সমন্বয়ের মহা-সূর্য্য উদিত হইতেছে 'যতমত ততপথ'রূপ তীব্র জ্ঞানালোকে সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত। হে পাঠক! আসুন আমরা সকলে শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি যুগাবতারদিগের শ্রীচরণে ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণত হই।

(ক্রমশঃ)

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়।

আবেদন।

যাঁহারা ভারতের প্রকৃত উন্নতিকামী তাঁহারাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিরূপ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণরূপ অনুষ্ঠানটীর সুসিদ্ধির নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। সহৃদয় স্বদেশবাসীর নিকট পুনঃ পুনঃ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এ পর্য্যন্ত যথাযৎ উত্তর না পাইলেও আমরা আশা করি তাঁহারা এই বিদ্যালয়বাটীর জন্য উপযুক্তরূপ সাহায্য করিয়া প্রকারান্তরে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বিবেকানন্দ পুরস্ত্রীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ আমরা নিম্নলিখিত দান স্বীকার করিতেছি।

প্রাপ্তিস্বীকার

ব্রহ্মচারী গনেন্দ্রনাথ ৪৭৲
জনৈক বন্ধু ১০০৲
স্যার জষ্টিস্ আশুতোষ চৌধুরী ৫০৲
মিনার্ভা, বোম্বাই ২য় কিস্তী ২০৲
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী ..
লেবটেনেণ্ট সৌরীন্দ্রমোহন পাঠকের মাতার স্মরণার্থ ৩য় দফে ২৫৲
শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র প্রামাণিক বোম্বাই ৫০৲
শ্রীবি. সি, মিত্র ২০৲
শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী শিলং ১৲
„ জনৈক বন্ধু মাঃ সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত কাঁথি ২৫৲
„ কাঙ্গালীচরণ গিরি „ ১৲
„ বিশ্বনাথ দাস „ ১৲
„ যতীন্দ্র নাথ বসু „ ১৲
„ উপেন্দ্র নাথ মজুমদার „ ১৲
„ গদাধর মাইতী „ ১৲
„ জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় কলিকাতা ২য় কিস্তি ১০৲
জনৈক বন্ধু ১৲
শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ কুমার জয়পুর হাট বগুড়া ২৲
মিস বি, ই. বোথাম, নিউজিল্যাণ্ড ১৪৸৴০
মোহান্ত যমুনা দাস কাঁথি ১৫৲
মিঃ এন, সরকার, কলিকাতা ১০৲
শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র নাথ ঘোষ „ ২য় কিস্তি ১০৲
জনৈক বন্ধু „ ১৲
„ অতুলকৃষ্ণ দে „ ১৲
শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ রাণীঘাট ২৲
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় সবজজ সিলেট ৫৲
„ রায় রমাপতি মিত্র কাঁথি ৫৲
„ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ „ ৫৲
„ ঈশ্বর চন্দ্র দিনদা „ ৫৲
„ শিবপ্রসাদ জানা „ ৪৲
মাঃ শ্রীনাথ সাউ „ ৩৲
জনেক বন্ধু মাঃ স্বামী পূর্ণানন্দ ২॥০
„ গোপাল মুখোপাধ্যায় „ ২৲
„ বসন্তকুমার দত্ত „ ১॥০
„ শ্রীধর মান্না „ ১৲
„ শ্রীনাথ সাউ „ ১৲
„ নবকুমার বেরা „ ১৲
„ চন্দ্রমোহন মাইতী „ ১৲
„ কুমুদবন্ধু পাণ্ডা „ ১৲
„ মুনীন্দ্র নাথ মণ্ডল „ ২৲
রায়, এম. সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্সর ৩০৲
রায়, নিখিল নাথ রায় বাহাদুর, কাঁথি
শ্রীযুক্ত নিলমাধব দেব ঐ
„ দেবেন্দ্র নাথ হাজরা ঐ ২৲
„ সুরেন্দ্র নাথ ভৌমিক „
„ কেনারাম মঝি „ ২৲
„ বিমলকৃষ্ণ বসু „ ২৲
খুচরা আদায় মাঃ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ২৲
„ রামচন্দ্র দাস „ ১৲
„ উমেশ চন্দ্র মিধ্যা „ ১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ প্রধান „ ১৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র বেরা „ ১৲
„ সুধীর চন্দ্র মান্না „ ১৲
„ নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তি সিলেট ৩
„ গৌরীকান্ত বিশ্বাস পুণা ২৲

" নন্দলাল বসু কলিকাতা ২০
সেক্রেটারী ডিবেটিং ক্লাব, হিন্দুহোষ্টেল
কলিকাতা ১০
ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা ৪
শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায় শিলিগুড়ি ২৫
" রমেশ চন্দ্র দত্ত সাকচি ২
" পি, এন, দপমা আমেদনগর ২
" এ, আর কুমার গুরু, বেঙ্গালোর ৪
" জিতেন্দ্র মোহন চৌধুরী রাঁচি ২
"দত্ত" ১০০
"কনকাঞ্জলী" ৪
জনৈক মহিলা ৫
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত বরিশাল ৪
শ্রীমতী নিরুপমা দেবী কলিকাতা ৫
"রামচন্দ্র" ৫
শ্রীনলিনী নাথ মল্লিক কলিকাতা ৬
জনৈক বন্ধু মাঃ শ্রী অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় নলহাটি ১০
শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন রায় ভবানীপুর ৫০
"বন্ধু" ১
পি, এন, নটেশ আয়ার জলগাঁও ১৬
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ রাঁচি ১
মিঃ ডিমেলো মেগুালে ৫০
সার বিনদ চন্দ্র মিত্র ২৫
স্বর্গীয় কাননবালা মিত্রের স্মরণার্থ ১০
প্রমথলাল বোস ১
ডাঃ অঘোর নাথ ঘোষ কাটিহার ১০
শ্রীরাধানাথ সিং পেগু ৫
শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে পাঞ্জাব ৫
" নরেন্দ্র ভূষণ দত্ত চাটগাঁ ৫
মাঃ নলিনীমোহন গোস্বামী বালী ১৮৶০
৮ম পল্টনের সিপাহিগণ বোম্বাই ২০
ষষ্টি চন্দ্র দত্ত, স্যাণ্ডওয়ে, বর্ম্মা ২
শ্রীযুক্ত এন সরকার, ভাস্তাড়া হুগলী ২
শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী কলিকাতা ৪
শ্রীমতী শিবরাণী দাসী ৫০
কে, এস, আয়ার বর্ণিও ১৩৷৴০
শ্রীমতী সরোজবাসিনী সেনগুপ্তা স্বন্দিপ ২
"শ্রীমতী" ১

বস্ত্রসঙ্কট

বস্ত্র মহার্ঘ্য হওয়ায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, সকলেই বিশেষ অবগত আছেন। যাঁহারা স্বভাবতঃই কষ্টে স্বষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর আবার এই কষ্ট প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন লোকের এই অসহায় অবস্থায় কিরূপে সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় হুকুমচাঁদ বিজ্ঞরাজ নামক জনৈক সহৃদয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া মিশনের হস্তে উক্ত কার্য্যের জন্য ১৭০ জোড়া বস্ত্র দেওয়ায় মিশন উক্ত কার্য্যে

অগ্রসর হইতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন। মিশন কার্য্যপ্রণালী এই স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে উহার যে শাখাসমূহ আছে, তাহাতে ভাগাভাগি করিয়া ঐ বস্ত্র প্রেরিত হইবে; তাঁহারা দরিদ্র এবং যথার্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া বস্ত্র বিতরণ করিবেন। মিশনের সাক্ষাৎ অন্তর্ভুক্ত শাখাসমূহ ব্যতীত বঙ্গদেশে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি আছে যাহাদিগের সহিত মিশন অল্প বিস্তর পরিচিত। এই সকল সমিতির সাহায্য গ্রহণ করিতেও আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি। উপস্থিত আমরা এইরূপভাবে ১৭টী বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে স্থির করিয়াছি। কিন্তু একবার কার্য্য আরম্ভ হইলে ঐ ১৭০ জোড়া কাপড় সমুদ্রে শিশিরপাতের ন্যায় হইবে। এই কারণে আমরা সহৃদয় ধনী মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আরও এই স্থান হইতে নিয়মিতভাবে এতগুলি স্থানে বস্ত্র পাঠাইতে গেলে তাহার প্রেরণব্যয়, অনেক। তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং আমরা নূতন ও পুরাতন বস্ত্র এবং অর্থ—এই উভয়ই সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এক্ষণে উক্ত ১৭টী কেন্দ্রের অধ্যক্ষগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছি—উহাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা এই বস্ত্র বিতরণের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন, পরে তাঁহাদের ঠিকানা প্রভৃতি প্রকাশ করিব—যাহাতে যাঁহার যেখানে সুবিধা সেইখানেই অর্থ বা বস্ত্র পাঠাইতে পারেন। বর্ত্তমানে কেবল নিম্নলিখিত দুইটী ঠিকানায় সাহায্য গৃহীত হইবে।

(১) উদ্বোধনকার্য্যালয়, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

(২) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ, হাওড়া।

সারদানন্দ
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।
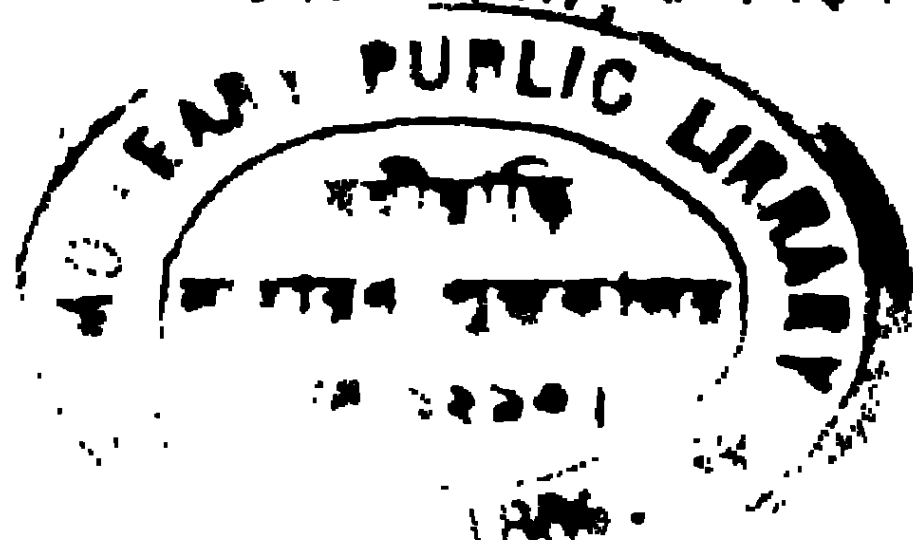
স্বামী প্রেমানন্দ

মহাসমাধি।

বিগত ১৪ই শ্রাবণ, সন ১৩২৫—মঙ্গলবার বেলা ৪টা ১৪মিনিটের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম পরিচালক, সন্ন্যাসিকুলতিলক মহাপ্রাণ মহাত্যাগী আদর্শ-পুরুষপ্রবর স্বামী প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মৈকাদর্শ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঞ্জীবনীশক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ এতাদৃশ মহাপুরুষগণের কাহারও তিরোধানের সংবাদ শ্রবণ করা অতি দুঃখের—আরও দুঃখের সেই সংবাদ লিপিবদ্ধ করা।

কিন্তু এই শোক-বাসরে অশ্রুধারা ভক্তির ত্রিধারায় পরিণত হইয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হউক, এখন ইহাই একমাত্র আমাদের প্রার্থনা, একমাত্র সান্ত্বনা।

যাঁহারা এই মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্নেহ ভালবাসা এবং মঙ্গলাশীষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভাব কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহাদের এই অভাব, তাঁহাদের এই চিত্তের শূন্যতা স্মৃতির তীব্রতায় পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হউক, এবং তাঁহাদের জীবন পূর্ণস্বরূপের দিকে অগ্রসর হউক—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। অভাবের ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠুন, এবং তাঁহাদের ভিতর তিনি উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজ করুন, আমরা তাঁহাদের দেখিয়াই যেন তাঁহাকে দেখিতে পাই, এই স্মৃতিবাসরে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত বাসনা কলঙ্কিত আমাদের নিকট সত্য, সাধুত্ব, পবিত্রতা সাধনার বস্তু। কিন্তু এই মহাপুরুষে সত্য, সাধুত্ব এবং পবিত্রতা মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত। ঠাকুর একসময়ে ইঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "এর (স্বামী প্রেমানন্দের) দেহ মনে কোনরূপ অপবিত্র ভাব পর্য্যন্ত উদয় হইতে পারে না।" যাঁহারা ইঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন—সত্যই, পবিত্রতা ইঁহার একটি গুণ নহে, ইনি নিজেই পবিত্রতা।

সে স্নেহ এবং ভালবাসা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই পবিত্র নির্ম্মল অতুলন মাতৃস্নেহের স্বাদ অনুভব করিয়াছেন। তিনি যেন রামকৃষ্ণ মঠের জননীস্বরূপ ছিলেন। একদিনও যিনি তাঁহার কোন-রূপ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার এই কথাই মনে জাগিয়াছে। তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ত্যাগী, তিনি জ্ঞানী, সর্ব্বোপরি তিনি যেন মায়ের মত। এতাদৃশ মহাপুরুষের শিক্ষাদান কঠোরতার ভিতর দিয়া নয়—নিয়মের শৃঙ্খলের ভিতর দিয়া নয়, উহা যেন মাতার বিগলিতস্নেহ স্তন্যধারার আস্বাদনের ভিতর দিয়া। ভগবদ্‌স্নেহ মানুষ-বুদ্ধিতে ধারণা করা দুরূহ। মনে হয়, সে স্নেহ যেন বিচারের শাসনের দ্বারা নিয়মিত। শাস্ত্রে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন, কিন্তু খেদের বিষয়—উহা আমাদের নিকট কতকটা কথার কথা। প্রত্যক্ষ কতকটা না দেখিলে উহা বুদ্ধিগম্যই হয় না। ভগবদ্‌প্রাণ, ভগবল্লক্ষণ মহাপুরুষগণে ভগবানের এই স্নেহভাব দেখিলে উহার কতকটা উপলব্ধি হয়। এবং এই আস্বাদন-স্পৃহাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া ভগবদ্ভাবোদ্দীপক হয়। এতাদৃশ মহাপুরুষসঙ্গ মানুষের চিত্তে ভগবৎ পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, এই জন্যই ইঁহারা আমাদের এত আত্মীয়, আমাদের এত কল্যাণকারী।

বৎসর কাল অতীত হইল, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ আগমনে দেশবাসীর মধ্যে সত্য সত্যই একটা স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে

যেখানেই গিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসায়, তাঁহার সাধুত্বে তত্রস্থ অধিবাসিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান্ সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন-জন জ্ঞানে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। নিরক্ষর মুসলমান হিন্দু সন্ন্যাসীর ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছে, ইহা একটা দেখিবার বিষয় বটে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বামী প্রেমানন্দ সত্য সত্যই প্রেমানন্দ ছিলেন। 'তস্য প্রীতি তৎ প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ'—এই কামনাহীন সন্ন্যাসীর জীবনেই একমাত্র উপাসনা এবং একমাত্র কামনা ছিল।

এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব এবং অলৌকিক জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার নিকট অতি পরিচিত। এবং এই পরিচয় কতটা, সে কথা মুখে বলিবার নয়, কেন না সে পরিচয় অন্তরের পরিচয়। আর যিনি সে পরিচয় লাভ করিতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন কথাই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত পথ।

এই শোক-বাসরে আমরা এই মহাপুরুষের মহাসমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে কথা সর্ব্বপ্রথমে সহজে স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে, সে কথা পুনরায় আবৃত্তি করিতেছি—

হে মহাপ্রাণ, তুমি আমাদের, তুমি দেশের, তুমি জগতের! তুমি কল্যাণ, তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ! তুমি ছিলে—আছ—থাকিবে!

পথের সম্বল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীহরিপ্রসাদ বসু, এম এ, বি এল)

৩। আমার গন্তব্য স্থান কোথায় ?

হিন্দুশাস্ত্র এ সম্বন্ধে একবাক্যে বলিয়াছেন যে পরমপিতার পদারবিন্দই আমাদের একমাত্র গন্তব্যস্থান।

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥"

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় অর্থাৎ সর্ব্বোপদ্রবশূন্য পদ প্রাপ্ত হন।

পরে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না. যাঁহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে সেই আদ্যপুরুষেরই শরণ লইলাম।

আমি যেখান হইতে আসিয়াছি আমাকে সেইখানেই পৌঁছিতে হইবে, তাহাই আমার goal। অংশকে অংশীতে পৌঁছিতে হইবে, খণ্ডকে অখণ্ডে পৌঁছিতে হইবে, অপূর্ণকে পূর্ণে পৌঁছিতে হইবে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে হইবে; প্রকৃতির সহিত পুরুষের রাসলীলা করিতে হইবে—তবেই জীবনের সার্থকতা হইবে। এই যে জন্মজন্মান্তর নটের বেশ ধরিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া কত কি অভিনয় করিলাম, কখনও রাজচক্রবর্ত্তী সাজিয়া, কখনও বা পথের ভিখারী হইয়া, কখনও বা নরাকারী দেব হইয়া, কখনও বা মানবদেহধারী পশু হইয়া বিচরণ করিলাম. ইহার শেষ অঙ্ক অভিনয়

হইবে তখনই যখন আমার পরম কারুণিক পিতা আমার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আমাকে স্থান দিবেন। তখন আর আমার ভয় থাকিবে না—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া সকল দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম পান না। যেহেতু তাঁহারা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঐ শুনুন ভগবানের অভয় বাণী—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

হে পার্থ, যাহারা পাপবংশসম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র, তাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন। সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন, ইহাতে আর কথা কি? তুমি মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত এবং আমার উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর, মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে মনকে আমাতে সমাহিত করিলেই আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

"মামেবৈষ্যসি" আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাই চরম পুরুষার্থ। ক্ষুদ্র শিশু পিতার অঙ্ক প্রাপ্ত হইলে, আর তাহার ভাবনা কিসের?

এই চরম অবস্থা সম্বন্ধেও মতভেদ নাই তাহা নহে। জ্ঞানমার্গীরা চান মুক্তি বা মোক্ষ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপাসকগণের মতে মুক্তি পাঁচ প্রকারের হইতে পারে—সালোক্য—একলোকে বাস; সার্ষ্টি—তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া; সামীপ্য—নিকটে থাকা; সারূপ্য সমান রূপ পাওয়া. সাযুজ্য বা অভিন্ন হইয়া যুক্ত হওয়া।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন।—

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে। এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশি, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে;
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

কেবল ভক্তিমার্গীরা মুক্তি বা মোক্ষ চাহেন না। এই মোক্ষ শব্দকে "কৈতবপ্রধান" বলিয়া চরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন—

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতবপ্রধান
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।

এবং ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং—ইত্যাদি।

ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ হিংসাদিরহিত সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে। পরম ধর্ম্ম কেন? না "প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ" অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম কেবল ঈশ্বর আরাধন-লক্ষণ ধর্ম্ম মোক্ষাভিসন্ধিশূন্য।

অন্যত্র ভাগবত হইতে তুলিয়াছেন—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

অর্থাৎ পঞ্চবিধ মুক্তি আমার ভক্তদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত কিছুই লইতে চাহেন না। এই আদর্শের বিভিন্নতা লইয়া আমাদের মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন নাই। আমরা আদার ব্যাপারী—আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি? যদি নিজের আন্তরিক চেষ্টায় ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে আদর্শের নিকট যাইবার

যোগ্য হই তখন যাঁহার উপর ব্রহ্মাণ্ডের ভার তিনিই ঐ আদর্শের গোল চুকাইয়া দিবেন ও যেরূপে আশ্রয় দিলে আমার জন্মজন্মান্তরীণ চেষ্টার সফলতা হইবে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী ব্রজগোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া "আমিই কৃষ্ণ" এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন। পথ বিভিন্ন হইলেও গতি এক। ফলতঃ, আমরা দেখিলাম যে পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদই আমার গন্তব্য স্থান, কিন্তু কথা এই যে মৃত্যুর পরেই কি আমরা সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইব? আমি পুণ্যাত্মাই হই অথবা পাপীই হই, চিরজীবন সৎপথে চলিয়া ভগবদাদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া আসি অথবা কুপথে চলিয়া জগতের পীড়াদায়ক কর্ম্ম করিয়া আসি আমার কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কি আমি আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই ব্রহ্মপদের অধিকারী হইব! যদি তাহা হয় তাহা হইলে ত সংসারনিয়মের বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে—নৈতিক রাজ্য লোপ পায়—কিন্তু তাহা নহে। এই সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন—"মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ঐ ব্যক্তি যেরূপটি ছিল—মৃত্যুর পরবর্ত্তী দিনেও সে ঠিক সেইরূপটিই থাকে। একটুও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। জীবিতকালে যদি ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, ভক্তি-মান বা অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন থাকেন তবে মৃত্যুর পরেও উঁহার ঐ সকল গুণরাশি বিদ্যমান থাকিবে। অপরঞ্চ যদি উনি, পার্থিব জীবনে নীচ ও সঙ্কীর্ণহৃদয়, কুচিন্তা ও ইন্দ্রিয়সেবাসংক্রান্ত বাসনায় বিব্রত থাকেন তবে মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করিয়া গেলেও ঐ সকল অসদ্‌গুণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। প্রকৃত কথা এই যে, মৃত্যু হওয়ায় প্রকৃত মানুষটির কোনরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটে না। পরিচ্ছদাবৃত ব্যক্তির বহিরাবরণটি উন্মোচনের ন্যায় স্থূল দেহ পরিত্যাগে দেহীর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তনই হয় না।" তবে কখন কি প্রকারে সেখানে যাওয়া যায়? জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তথায় পৌঁছিতে হয়। নিজ কর্ম্মফলে কখনও উচ্চলোকে কখনও বা নিম্নলোকে বসতি করিতে হয়, কখনও বা সুখ কখনও বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"

জীবগণ পুণ্যকায়রূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ সকল ভোগ করেন। পরে পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমাদের কর্ম্মফলেই আমাদিগকে বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। মায়াধীন আমরা মায়ার বশে কত না কামনা করিয়া থাকি—এবং কামনার ফলে আমরা বদ্ধ হইয়া এই দশা প্রাপ্ত হই। জন্মজন্মান্তরের চেষ্টা দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মফলে সৌভাগ্যবশতঃ যখন আমাদের কর্ম্মের ও ভোগের শেষ হয় তখনই আমরা সেই ব্রহ্মপদ বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হই—

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥

প্রযত্ন সহকারে উত্তরোত্তর যোগী যোগে অধিক যত্নশীল হইয়া ও তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

বহু জন্মের পর বাসুদেবই সব এই ধারণ হয়। তবেই ত আমার গন্তব্য স্থান বহুদূর!

৪। সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্বল সংগ্রহ চলে কিনা—যদি চলে তাহা কি?

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ প্রশ্নের ত অতি সহজ উত্তর পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুই ত লইয়া যাওয়া চলে না। আমি ধনকুবের আমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই; সুধাধবলিত অট্টালিকা, দুগ্ধফেননিভশয্যা, অসংখ্য দাসদাসী, দেবদুর্লভ আহারীয় ও পানীয়, প্রিয়তমা অশেষগুণের আধারভূতা পত্নী, আদর্শ-স্থানীয় সন্তানগণ আমার হৃদয়ে অতুল আনন্দের প্রবাহ ছুটাইতেছে আমার কোন দুঃখ নাই, ভগবানের অনুগ্রহে আমি এই সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি কিন্তু বিধির বিধানে সংসারের নশ্বরতাপ্রযুক্ত একদিন আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, আমি মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলাম। আমার অবস্থা কি হইল? এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য ইহার অণুমাত্র কি আমি সঙ্গে লইতে পারিলাম! আমার আত্মীয়-স্বজন কি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমার সুখ বিধানের জন্য আমার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও দিতে পারিলেন? সকলের যে অবস্থা আমারও সেই অবস্থা হইল। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমান আশ্রয়দাতা শ্মশানভূমির মৃত্তিকাই আমার শয্যা হইল ও স্নেহের পুত্র-প্রদত্ত অগ্নিশিখা আমার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিল। আমার সযত্নরক্ষিত দেহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হইল—সব ফুরাইল কিছুই আমার সঙ্গে গেল না। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? সাধারণ দৃষ্টি ছাড়া আমাদের শাস্ত্রদৃষ্টি আছে। শাস্ত্র বলেন—তাহা নহে, আমাদের স্থূলদেহ ভস্মীভূত হইল বটে কিন্তু আমাদের সূক্ষ্মদেহ আমাদের আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে।

> মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
> মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥
> শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
> গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
> শ্রোত্রংচক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
> অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥
> উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
> বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ মায়াবশতঃ সদাসংসারিরূপে

প্রসিদ্ধ জীব প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে জীবলোকে সংসারে উপভোগার্থ আকর্ষণ করে।

দেহী কর্ম্মবশে যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ করেন, প্রাপ্ত শরীর পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া যান; যেমন বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল প্রচার করিয়া গমন করে সেইরূপ।

এই দেহী কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্‌, রসনা, নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন।

দেহান্তর-গমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয়-ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট দেহীকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না; কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান।

জীবাত্মা নিজ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফল ভোগ জন্য দেহান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ও সেই দেহ গ্রহণকালে পূর্ব্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে লইয়া যায় ও পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতি ও সংস্কারানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। মৃত্যুর পরও তাহা হইলে আমরা আমাদের সঙ্গে কিছু লইয়া যাই, আমরা একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় আমাদের গন্তব্য স্থানে যাত্রা করি না। এখন যাহার যেমন সম্বল তাহার তেমনই ভোগ। ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পার—সুখভোগ করিবে, মন্দ জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাও—দুঃখভোগ করিবে। সেইজন্য এমন জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে যাহার ফলে এই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত নিবারণ হয় যাহার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয়। কি উপায়ে এই কল্যাণকর পদার্থ সংগ্রহ হইতে পারে? গীতা বলিতেছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তাহারা সেই সেই ভাবই পায়।

মৃত্যুকালে যিনি যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিবেন তিনি সেই চিন্তানুরূপ দেহ পাইবেন; সূক্ষ্মশরীর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ভাবোপযোগী দেহ অবলম্বন করিবেন। শুনা যায় ভরতরাজা মৃগশিশুর চিন্তাপরায়ণ হইয়া দেহত্যাগ করায় মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুষ্য মৃত্যুকালে যদি বিষয়সম্বন্ধে ধ্যানপর হইয়া শরীর হইতে বহির্গত হয় দেহান্তরে সে বিষয় ভোগের সুবিধা পাইতে পারে কিন্তু মুক্তি তাহা হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিবে, কারণ বন্ধন মোচনের নামই ত মুক্তি। যদি মরণ-সময়ে সে বাসনার বন্ধন লইয়াই চলিল তবে আর তাহার বাধন খুলিবে কি করিয়া। হিন্দু এই জন্য "মহাপ্রস্থানের মহামন্ত্র" উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন; হিন্দুশাস্ত্রের হিন্দু-আচার-ব্যবহারের বিশিষ্টতা এই যে নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাহার ধর্ম্ম-প্রবণতাকে সরস করিয়া দেয়, ধর্ম্ম-প্রাণকে সজীব করিয়া থাকে। ধন্য আমরা যে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাই "মহাপ্রস্থানের মহামন্ত্র"—"অন্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম"। অন্তকালে পথিককে পতিতপাবনী কলুষনাশিনী গঙ্গামাতাকে স্মরণ করিতে হইবে; যদি তাঁহার ধারণায় কুলায় তাহা হইলে যাঁহার পাদপদ্ম হইতে সেই কলুষনাশিনী গঙ্গাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে ও যাঁহা হইতে তিনি কলুষনাশকারী শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ভবভয়হারী নারায়ণ হরির চিন্তা করিতে হইবে; তাঁহার চিন্তাশক্তি, ধারণাশক্তি যদি আরও অগ্রসর হইতে পারে, যদি তিনি সাকার ছাড়িয়া নিরাকারে পৌঁছিতে পারেন তবে তাঁহাকে অন্তিমকালে একবার বিষয়বাসনা ছাড়িয়া দিয়া সংসারের জন্য অজস্র অশ্রুবর্ষণ না করিয়া সেই আদি পুরুষ পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে; যদি প্রকৃতই সেই চিন্তা করিতে পারেন তবে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সূক্ষ্মদেহ সেই চিন্তা ও ধারণার অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার কলুষ নাশ হইবে, ভবভয় দূর হইবে, তিনি ব্রহ্মপদ বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন। যিনি যে পদবীর বা অধিকারের লোক হউন না কেন সকলের অভীষ্টসিদ্ধির উপায় করিবে

একমাত্র—"অন্তে গঙ্গা নারায়ণব্রহ্ম"। * তাই অন্তিম শয্যাশায়ী পুরুষ যদি ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নিজমুখে নাম উচ্চারণ করিতে না পারেন তবে তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহার কর্ণকুহরে নামমন্ত্র শুনাইয়া যেন তাঁহার বিষয়-জ্বালা দূর করিবার পথ করিয়া দেন—তাঁহার পথের সম্বল করিয়া দেয়—তিনি এই সম্বল লইয়া মহাযাত্রায় বহির্গত হন। এখন মনে করিতে পারেন যে, উপায় বড় সহজ দেখা যাইতেছে; মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া শিশুকাল হইতে মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাজই করি না কেন একবার মরণের পূর্ব্বে হরিচিন্তা করিলেই ত খালাস—তবে আর ভয় কি? ভাবনা কিসের? সত্য বটে মরণের পূর্ব্বে জীব যদি একবার হরিচিন্তা করিতে পারে, সেই পরব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে তবে দেবদূতগণ তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়—তাহার ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাহার গতাগতি শেষ হয়—কিন্তু জীব প্রকৃতই কি তাহা পারে? না, তাহা পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মন জড়ধর্ম্মী—অভ্যাসের দাস। আমি নিত্য যাহা করিতেছি মন তাহাই করিতে চাহিবে। চির জীবন আগ্রহসহকারে "কামিনীকাঞ্চনের" সেবা করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত-পূর্ব্বেই সেই চিরাভ্যস্ত, চিরসঙ্গী, চিরপ্রিয় "কামিনীকাঞ্চনের" আসক্তি ভুলিয়া নূতন প্রেমাস্পদের সন্ধান ও তাঁহার প্রেমে ভাবিত হওয়া অসম্ভব; তাই সময় থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মরযুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥
"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"

অতএব সর্ব্বদা আমার স্মরণ কর (এবং যুদ্ধ কর) আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে।

* শ্রীমান হরচন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ স্মরণ।

হে পার্থ অভ্যাসযোগ দ্বারা একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা দিব্যপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সকল সময়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে হইবে; অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা পরমপুরুষের চিন্তা অভ্যাস করিতে হইবে, তবে মৃত্যুকালে পূর্ব্ব-অভ্যাসবশতঃ জিহ্বাগ্রে আপনা হইতে হরিনাম স্ফুরিত হইবে, মন পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে, শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার নাম শুনিতে, গুণগ্রাম শুনিতে ব্যস্ত হইবে এবং উৎক্রমণোন্মুখ সূক্ষ্মদেহ এই সংস্কার সঙ্গে লইয়া যাইবে ও জন্মান্তরে ভগবৎচিন্তার অনুকূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তায় পরমানন্দ লাভ করিবে ও শেষে বিষ্ণুপদাখ্য পরমধাম প্রাপ্ত হইবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে—আর একটি কথা বলিয়াই ইহার উপসংহার করিব।

এই পরব্রহ্মের চিন্তা দুই উপায়ে হইতে পারে। শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গের পথিকেরা "নেতি নেতি" বিচার করিয়া অসত্য ও অবস্তু পরিহারপূর্ব্বক নিত্য সত্য সর্ব্বজ্ঞকে প্রাপ্ত হন। ভক্তিমার্গের পথিকেরা ভগবানের নাম করিয়া, সেবা করিয়া সেই 'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। জ্ঞানমার্গ বড় কঠিন কলিযুগে স্বল্পায়ু মানবের জ্ঞানমার্গে গন্তব্য স্থানে যাওয়া বড়ই দুরূহ; তাই করুণার অনন্ত সাগর প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু আচণ্ডালে ভক্তি বিতরণ করিয়া ভক্তিরস প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' কেমন ক'রে বোধ হবে? সে বোধ দেহ বুদ্ধি না গেলে হয় না। আমি দেহ নই, আমি মন নই, আমি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখদুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ? —এসব বোধ

কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার কর, কোনখান থেকে দেহ-বুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে করিলে মূল শুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখ—গাছের একটী ফেকড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে সহজ।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন--

"আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড় ক'রে বলেছিলাম—মা এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

এই শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণ মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় বলিয়াছেন -"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম। আনুকূল্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

এই শুদ্ধা-ভক্তির গুণে বৃন্দাবনে গোপীরা কৃষ্ণধন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তহৃদয়বিহারী ভক্তমনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগেরভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাত্যায়নীব্রতকালে রমণী-হৃদয়-সর্ব্বস্ব লজ্জা পর্য্যন্ত ত্যাগরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভেদজ্ঞানরহিতা গোপীগণ সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। ভগবানকে ভক্তের অদেয় কিছুই নাই—শুদ্ধসত্বময়ী গোপীগণ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। মায়াময় জগতে যে আবরণ জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখে—গোপীদের শুদ্ধা-ভক্তির বলে সেই আবরণ উন্মোচন হইয়াছিল; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও তাহারই পুরস্কার স্বরূপ "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" রজনীতে ভগবান্ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন-- সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ

'যোগেশ্বরেশ্বর' 'আত্মারাম', পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধাভক্তিময়ী গোপীদিগের সহিত রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হইয়াছিল—জগৎ ধন্য হইয়াছিল।

এখন, এই ভক্তির সাধন কি? কি উপায়ে আমরা ভক্তি লাভ করিতে পারি? একমাত্র হরিনামই ভক্তির সাধন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।' নামজপ করিলেই হৃদয়ে ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইবে। নামরূপ মহামন্ত্রে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। জীবের উদ্ধার জন্য প্রেমের পাগল শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই নামামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই নামের অপূর্ব্ব মহিমা, তুমি অন্ধ হও; খঞ্জ হও, একবার বিশ্বাস করিয়া নামরূপ যষ্টি গ্রহণ কর। ঐ একমাত্র যষ্টির সাহায্যে তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। এই নামের এমনই আশ্চর্য্য গুণ যে ইহারই প্রভাবে নামে অরুচিরূপ বিকার পর্য্যন্ত দূর হইয়া যায়। তাই বলি বন্ধুগণ, একবার সময় থাকিতে, প্রাণ ভরিয়া হরিনামামৃত পান করিতে থাকুন। বহুপুণ্য-ফলে—ভারতবর্ষে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণার্থে মহাজনগণ ভবপারের তরণীস্বরূপ এই নাম রাখিয়া গিয়াছেন—একবার সেই তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করুন—সেই শ্রবণমঙ্গল নামের গুণে কলুষ দূরে যাইবে, তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখ মন্দাকিনীর প্রবাহ বহিতে থাকিবে, প্রেমাস্পদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। * অতএব প্রাণ ভরিয়া একবার বলুন—হরিবোল! উহাই একমাত্র পথের সম্বল।

---

* "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর। নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

সৃষ্টি বা সামান্য অধ্যারোপ।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

এই বিশ্বের বিচিত্র রচনা, অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা, তদুপরি এক অজ্ঞাত-শক্তির অদ্ভুত বিকাশ—এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোথাও তুষারাবৃত অসংখ্য পর্ব্বতমালা, কোথাও উত্তাল তরঙ্গ সমাযুক্ত বিশাল সমুদ্র, কোথাও বৃক্ষহীন, তৃণহীন, জলহীন শত শত ক্রোশব্যাপী শুষ্ক মরুভূমি, কোথাও বা নানা ফল ফুল ভারে অবনত নিবিড় বিটপীশ্রেণী সমাচ্ছন্ন বহু শস্যে পরিপূর্ণ সুজলা গ্রাম্যদেশ—তন্মধ্যে আবার কীটাণু-কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র প্রকার জীবের বসবাস অবলোকনে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে, এই সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল, কে ইহার সৃজন করিল, ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিতে যাইয়া বিভিন্ন-ভাবের ভাবুকগণ বিভিন্ন প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন; এস্থলে তাঁহাদের মতামতের আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ভারতের অরণ্য নিবাসী ভিক্ষোপজীবী, যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যালব্ধ জ্ঞানরত্নের অধিকারী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সম্বন্ধে যেরূপ মত তাহাই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া আমি ক্ষান্ত হইব।

শ্রুতি বলিতেছেন:—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"—যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা এই উৎপন্ন ভূত সকল জীবিত থাকে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ" হে সৌম্য ইহার অগ্রে সৎ ছিলেন—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন:—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"

—আমিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" হে পার্থ! আমাকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে।

এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বরই এই সৃষ্টির কর্ত্তা। এবং পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বর-চৈতন্যই যে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তাহা "ঈশ্বর ও জগৎ" প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

পরমেশ্বর কিরূপভাবে সৃষ্টি করিলেন?

পরমেশ্বর সৃষ্টি-কল্পের আদিতে প্রাণী সকলের বৈচিত্র্য ও অনাদি কর্ম্মসংস্কাররূপ বীজ এবং অনির্ব্বচনীয়া মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎ বুদ্ধিতে প্রতিভাত করিয়া 'ইদং করিষ্যামি' —"এই প্রকার করিব"—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। শ্রুতিতে আছে:— 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়'—তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।

স্বামিজী গাহিয়াছেন:—"তথা হতে বহে কারণ-ধারা,
ধরিয়া বাসনা বেশ উজালা।
গরজী গরজী উঠে তার বারি—
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ॥

পরমেশ্বরের ঐরূপ ইচ্ছা হওয়া মাত্রই সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্চীকৃত তম প্রধান ত্রিগুণাত্মক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। এই পঞ্চভূত পরস্পর মিশ্রিত নহে বলিয়া ইহাদিগকে 'অপঞ্চীকৃত' বলা হইয়াছে; এই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম 'ভূত'কেই 'তন্মাত্রা' বলে। এই পঞ্চভূতের কারণ যখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তখন তাহার কার্য্য আকাশাদি তন্মাত্রা যে ত্রিগুণাত্মক ইহাতে কোনও সংশয় নাই, যেহেতু কারণের গুণ কর্য্যে থাকেই থাকে। কিন্তু এই আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও উহা তম প্রধান, কারণ সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাদি ধর্ম্ম আকাশাদিতে দেখা যায় না বরং তমগুণের ধর্ম্ম জড়ত্বাদিই দেখা যায়।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হইল, এই আকা-

শের গুণ শব্দ। বায়ুর সৃষ্টি তৎপরে হইল, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শটি বায়ুর নিজের গুণ এবং শব্দ উহার কারণ যে আকাশ তাহার গুণ ক্রমে বায়ুতে আসিয়াছে।

তৎপরে তেজের সৃষ্টি হইল, এই তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। রূপ তেজের নিজ গুণ এবং শব্দ ও স্পর্শ উহার কারণের গুণ ক্রমে তেজে আসিয়াছে।

তাহার পর জলের সৃষ্টি হইল। এই জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। রস জলের নিজ গুণ এবং শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ উহার কারণের গুণ ক্রমে জলে আসিয়াছে।

সর্ব্বশেষে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। গন্ধ পৃথিবীর নিজ গুণ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস উহার কারণের গুণ ক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছে এই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূত হইতে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। পঞ্চপ্রাণ মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় লইয়া সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে। দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে নাসিকা ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। প্রকাশাত্মক বলিয়া ইহারা আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশের কার্য্য, কারণ প্রকাশাদি সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম (এই সকল ইন্দ্রিয়ের আবার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে)।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন আকাশাদির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আকাশের রজাংশ হইতে বাক্, বায়ুর রজাংশ হইতে পাণি, তেজের রজাংশ হইতে পাদ, জলের রজাংশ হইতে পায়ু ও পৃথিবীর রজাংশ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

(পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে) কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রিয়াত্মক বলিয়া রজাংশের কার্য্য। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি যেমন পঞ্চ তন্মাত্রার যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পঞ্চ প্রাণ কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রার মিলিত রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চ প্রাণ বায়ুর নাম—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। ইহারাও ক্রিয়াত্মক বলিয়া রজাংশ হইতে উৎপন্ন বলা হইল।

এই পঞ্চ প্রাণের কার্য্য ও স্থান বলা হইতেছে—

প্রাণবায়ু	উর্দ্ধগমনশীল	নাসিকাগ্র স্থানবর্ত্তী
অপান	অধোগমনশীল	পায়ুস্থানবর্ত্তী
ব্যান	সর্ব্বতোগমনশীল	সমগ্রদেহবর্ত্তী
উদান	উৎক্রমণশীল	কণ্ঠস্থানবর্ত্তী
সমান	পরিপাকসম্পাদনশীল বা সমীকরণশীল	নাভিস্থানবর্ত্তী

সমান বায়ু সাহায্যে ভুক্ত অন্ন, পীত জল দুইটি বিভিন্ন হইলেও এক বস্তু রক্তে পরিণত হয়, এইরূপ করাকেই সমীকরণ বলে। প্রাণাদি বায়ুরূপে এক হইলেও ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন পঞ্চ তন্মাত্রার পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অন্তঃকরণ সেরূপ নহে, উহা ঐ পঞ্চ তন্মাত্রার মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহারা প্রকাশাত্মক বলিয়া সত্ত্বাংশ।

অন্তঃকরণ বলিতে কেবল মন ও বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। উহার কারণ এই যে ঐ দুইটি মন ও বুদ্ধির অন্তর্গত বলিয়া আর পৃথক্ উল্লেখ করা হইল না। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে। ইহারা অন্তর্বিষয়ের প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ বলা হয়। এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বহির্বিষয়ের প্রকাশ করে বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ বলে।

অন্তঃকরণ যদিও এক কিন্তু বৃত্তিভেদে ইহার চারিটি ভাগ করা হইয়াছে—যেমন একই পুরুষকে পাচক ও পাঠক উভয়ই বলা হয়। এক্ষণে অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ অনুসারে তাহার চারিটি ভাগ দেখান হইতেছে :—

"আমি ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে।

"আমি চিদ্রূপ কি দেহ" এইরূপ সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন বলে।

স্মরণাত্মিকা ও অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চিত্ত বলে।

অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে অহঙ্কার বলে।

এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত হইতে ভোগ সাধনের উপযোগী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন :—"পঞ্চ প্রাণ মনো বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥"

এই সূক্ষ্ম শরীরের তিনটি কোষ আছে, যথা, বিজ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ ও প্রাণময় কোষ।

সত্ত্বাংশের কার্য্য বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে প্রকাশের আধিক্য হয় বলিয়া উহাকে বিজ্ঞানময় বলা হইল ও আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া কোষ বলা হইল। চৈতন্য বস্তুতঃ অকর্ত্তা, অভোক্তা, নিত্যানন্দময়, অপরিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইলেও বিজ্ঞানময় কোষ দ্বারা অধ্যারোপিত হইয়া আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, পরিচ্ছিন্ন এবং ক্রিয়ামান এই সকল অভিমানবশতঃ ইহলোক পরলোক-গামী ব্যবহারিক জীবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন ও রজগুণ হইতে উৎপন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনময় কোষ হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা জাড্যাধিক্য-বশতঃ ইহাকে মনময় কোষ বলা হইল। পুনরায় ইহা সত্ত্ব ও রজ মিলিত বলিয়া সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বা ইচ্ছাশীল।

পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ হইয়াছে। ইহারা উভয়েই রজ প্রধান সুতরাং ক্রিয়াশীল।

এই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষ তিনটির মধ্যে

বিজ্ঞানময় কোষের শক্তি জ্ঞান, মনোময় কোষের শক্তি ইচ্ছা ও প্রাণময় কোষের শক্তি ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। তিনটি কোষের শক্তিভেদে ও যোগ্যতা হিসাবে বিজ্ঞানময় কোষকে কর্ত্তা বলা হইল—কারণ কর্ত্তারই কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। প্রথমে জ্ঞান ও তৎপরে কার্য্যের ইচ্ছা হইয়া থাকে এবং ইচ্ছাই কার্য্য করায় এই ইচ্ছাশক্তি মনোময় কোষের সুতরাং উহা করণরূপ। কিন্তু কেবল জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা কার্য্য হয় না, কার্য্য করিবার শক্তির আবশ্যক এই ক্রিয়াশক্তি প্রাণময় কোষের সুতরাং উহা ক্রিয়ারূপ কার্য্য।

এই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষত্রয় মিলিত সেই সমষ্টিকে সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়।

যেমন বন বৃক্ষের সমষ্টি, জলাশয় জলের সমষ্টি, ঐরূপ এক বুদ্ধিতে সমস্ত সূক্ষ্ম-শরীর-সমষ্টি সম্ভব এবং যেমন বৃক্ষ বনের ব্যষ্টি ও জল জলাশয়ের ব্যষ্টি সেই প্রকার বহু বুদ্ধিতে সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীর ব্যষ্টি হয়। এই সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর রূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ বা মহাপ্রাণ বলে। যেমন একখানি পটের সূত্র সেই পটের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকে ঐরূপ হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে সূত্রাত্মা বলা হইল অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সকল প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অনুস্যূত আছেন বলিয়া সূত্রাত্মা। এবং তিনি সূক্ষ্ম শরীর বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিবিশিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের অভিমানী। হিরণ্যগর্ভের শরীর বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় এবং উহা স্থূলপ্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহার শরীর সূক্ষ্ম স্বপ্নের ন্যায় বাসনাময় বলিয়া স্বপ্নস্থান, কারণ স্বপ্নটি জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত বিরাট্‌রূপ স্থূল প্রপঞ্চের বাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে এবং যেহেতু স্বপ্নাবস্থাটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান অতএব হিরণ্যগর্ভও স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান।

ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীর উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলে এবং তেজোময়

অন্তঃকরণ উহার উপাধি বলিয়া তৈজস বলা হইল। এই তৈজসেরও স্বপ্নস্থান বা স্থূল প্রপঞ্চ লয় স্থান স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ঈশ্বরও প্রাজ্ঞ অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল মাত্র আনন্দ অনুভব করেন সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ তৈজস স্বপ্নাবস্থায় বাসনাময় শব্দাদি বিষয় অনুভব করেন শ্রুতিতেও আছে ঃ—'প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস' তৈজস সূক্ষ্ম বস্তুর উপভোগকর্ত্তা।

স্বরূপতঃ সমষ্টি বন ও ব্যষ্টি বৃক্ষ যেমন এক, সমষ্টি জলাশয় ও ব্যষ্টি জল যেমন এক বস্তু সেইরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর ও ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরও এক এবং ব্যষ্টি বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ ও সমষ্টি বনাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন এক, সমষ্টি জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ ও ব্যষ্টি জল প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন এক ঐরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর অবচ্ছিন্ন চৈতন্য তৈজস এক।

সূক্ষ্ম শরীরের যে প্রকারে উৎপত্তি হয় তাহার কথা বলা হইল। এক্ষণে স্থূল প্রপঞ্চ ও স্থূল শরীর কি প্রকারে সৃষ্টি হইল তাহা বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চীকৃত হইলে পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকরণের নিয়ম এইরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেককে প্রথমে দুইটি সমান অংশে ভাগ করিয়া পরে আকাশাদি এক একটির অর্দ্ধভাগ অপর কয়টি ভূতের প্রত্যেকটির অষ্টমাংশ যোগ করিয়া এক একটি স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। যে ভূতে যে ভূতটি অর্দ্ধ পরিমাণ আছে উহাই সেই স্থূল ভূত হইয়াছে। ঐ পঞ্চীকরণ প্রথাটি আরও পরিষ্কাররূপ দেখান হইতেছে ঃ—

পঞ্চীকৃত বা স্থূল আকাশ = $\frac{1}{2}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$ম + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$পৃ

ঐ ঐ বায়ু = $\frac{1}{2}$বা + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$জ + $\frac{1}{8}$ পৃ

ঐ ঐ তেজ = $\frac{1}{2}$তে + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$ম + $\frac{1}{8}$ পৃ

ঐ ঐ জল = $\frac{1}{2}$জ + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$ পৃ

ঐ ঐ পৃথিবী = $\frac{1}{2}$পৃ + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$ জ

এই পঞ্চীকরণটি শ্রুতি বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন।

কারণ শ্রুতিতে আছে—"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকং করবাণি" তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ বা তিন বিশিষ্ট করিব। এখানে এই ত্রিবৎকরণ কথাটির দ্বারা পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্নি, জল, পৃথিবী এই তিনটি ভূতের কথা আছে বলিয়া এইরূপ নহে যে ঐ তিনটি মাত্র ভূত কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে অগ্নি জল ও পৃথিবী ছাড়া বায়ু ও আকাশের উল্লেখও আছে। ছান্দোগ্যে তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখবশতঃ ত্রিবৃৎকরণ বলা হইয়াছে সুতরাং সেই ত্রিবৃৎকরণ অর্থে পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রুতির সহিত আর বিরোধ থাকিবে না। স্থূল আকাশাদিতে বায়ু জল ইত্যাদিরও অংশ যখন আছে তখন উহাকে আকাশ বলিব কেন? আকাশের অংশ বেশী আছে বলিয়া উহার নাম আকাশ হইল অন্যান্য ভূতগুলিরও ঐ হেতু অনুসারে নাম হইয়াছে।

এইরূপে পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণ হইলে আকাশাদি স্থূলরূপ ধারণ করে, স্ব স্ব কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি হয় এবং অব্যক্তরূপে আকাশস্থিত শব্দগুণ ব্যক্ত হইয়া পড়ে; ঐরূপ স্থূলবায়ুতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যক্ত হয় অর্থাৎ এই সকল গুণ ঐ সকল ভূতের স্থূলত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই।

পঞ্চীকৃত ভূত হইতে উপর্য্যুপরি সাতটি উর্দ্ধলোক সমুৎপন্ন হয় যথাঃ—

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

অধোদিকেও যথাক্রমে নিম্নে নিম্নেস্থিত সাতটি অধোলোক উৎপন্ন হয়। যথা—

অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

এই পঞ্চীকৃত স্থূলভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ড ও চারপ্রকার স্থূলশরীর ও তাহাদের ভোগের উপযুক্ত অন্নপানাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থূলশরীর চারপ্রকার, কি কি তাহাই বলা হইতেছে যথাঃ— জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য পশু প্রভৃতির শরীর

জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে "জরায়ুজ বলে। পক্ষী পন্নগ ইত্যাদির শরীর অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অণ্ডজ বলে। উকুণ মশক ইত্যাদির শরীর স্বেদ বা ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের স্বেদজ বলে এবং বৃক্ষাদির শরীর ভূমি ভেদ করিয়া উঠে বলিয়া উহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে।

জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ এই তিনপ্রকার স্থূলশরীর সম্ভবপর—কিন্তু বৃক্ষত জড়ের ন্যায়, উহাকে এক প্রকার শরীর বলা হইল কেন? উহাতে শারীর ধর্ম্মের ত কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না?

মনুসংহিতায় আছে "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" অর্থাৎ পাপফল ভোগের নিমিত্ত বৃক্ষাদি দেহ উৎপন্ন হয়। অতএব বৃক্ষাদিরও শরীর আছে বিশ্বাস করিতে হইবে; কারণ শরীরের অভাবে ভোগ সম্ভবপর নহে। ইহাত শাস্ত্রের কথা বলা হইল, কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বৃক্ষাদির সহিত অন্যান্য জীবশরীরের ধর্ম্মাদির অতি নিকট সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং জীবদেহে যেরূপ কোনও আঘাত লাগিলে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা হয় বৃক্ষ শরীরেও তদ্রূপ হয়, ইহা তিনি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব বৃক্ষও যে একপ্রকার শরীর ইহাতে আর সন্দেহের কিছু নাই।

স্থূলশরীর চারিপ্রকার হইলেও "শরীর" এইরূপ এক বুদ্ধিতে বনের ন্যায় শরীরের সমষ্টিত্ব হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক শরীর বিষয়ে পৃথক পৃথক বুদ্ধিতে বৃক্ষের ন্যায় শরীরের ব্যষ্টিত্ব হয়। এক্ষণে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত চারপ্রকার স্থূল শরীরের সমষ্টি উপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বানর এবং বিরাট্ বলা হয়। তিনি সকল প্রাণির দেহেই 'অহম্' এইরূপ অভিমান করেন বলিয়া তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা হয় এবং নানাপ্রকারে প্রকাশমান হয়েন বলিয়া বিরাট্ বলা হয়। স্থূল শরীর অন্নের বিকার বলিয়া ও আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া অন্নময় কোষ, স্থূল বিষয় দ্বারা সুখ দুঃখাদি অনুভব করে বলিয়া স্থূল এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধি করে বলিয়া বা বাহ্য

জগতের সহিত ব্যবহার করিতে পারে বলিয়া জাগ্রৎস্থান বলা হইল কারণ জাগ্রৎ অবস্থায়ই কেবল ঐ প্রকার সম্ভব।

ব্যষ্টি-শরীর-উপহিত-চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। 'তিনি সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান পরিত্যাগ না করিয়া স্থূল শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই প্রত্যেক স্থূল শরীরেই "অহম্" এই প্রকার অভিমান করেন বলিয়া তাহাকে বিশ্ব বলা হইয়াছে। ইহাও ইঁহার স্থূল শরীর। অন্নের বিকার ঐ স্থূলদেহ এবং আত্মার আচ্ছাদক এই হেতু অন্নময় কোষ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপলব্ধি করে বলিয়া জাগ্রৎ-স্থান।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটির সাহায্যে বাহ্য বিষয় অনুভব হয় বলিয়া ইহারা বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ এবং বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটির সাহায্যে অন্তর্বিষয় অনুভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃকরণ বলে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই দশটি বহিঃকরণ ও চারিটি অন্তঃকরণ সহিত সর্ব্বশুদ্ধ মোট চতুর্দ্দশ-ইন্দ্রিয় আছে। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতৃদেবতা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া চতুর্দ্দশ প্রকার স্থূলবিষয় অনুভব করে। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চতুর্দ্দশটি অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং সেই সেই ইন্দ্রিয় ও তাহাদের অনুভবসমূহ একটি তালিকা দ্বারা দেখান হইতেছে ঃ—

অধিষ্ঠাতৃদেবগণ	ইন্দ্রিয়সকল	উহাদের অনুভব
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—দিক্	কর্ণ	শব্দ
বায়ু	ত্বক্	স্পর্শ
সূর্য্য	চক্ষু	রূপ
বরুণ	জিহ্বা	রস
অশ্বিনীকুমার	ঘ্রাণ	গন্ধ
পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়—অগ্নি	বাক্	বাক্য
ইন্দ্র	পাণি	গ্রহণ
উপেন্দ্র	পাদ	গমন
যম	পায়ু	ত্যাগ
প্রজাপতি	উপস্থ	আনন্দ

চার অন্তঃকরণ—চন্দ্র	মন ,,	সংশয়
ব্রহ্মা	বুদ্ধি	নিশ্চয়
শঙ্কর	অহঙ্কার	অভিমান
বিষ্ণু	চিত্ত	অনুসন্ধান বা স্মরণ

বৈশ্বানর ও বিশ্ব জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয় অনুভব করেন। ইহা শ্রুতিতে আছে যথাঃ—"জাগরিত স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ"।

যেমন সমষ্টি বন ও ব্যষ্টি বৃক্ষ বাস্তবিক এক, যেমন সমষ্টি জলাশয় ও ব্যষ্টি জল এক সেইরূপ সমষ্টি স্থূল শরীর ও ব্যষ্টি স্থূলশরীর বস্তুতঃ এক এবং যেমন বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ এক যেমন জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জল প্রতিবিম্বিত আকাশ বাস্তবিক একই বস্তু সেইরূপ সমষ্টি স্থূল শরীর-উপহিত-চৈতন্য বৈশ্বানর ও ব্যষ্টি স্থূল-শরীর-উপহিত-চৈতন্য বিশ্ব এক।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার শরীরের কথা বলা হইয়াছে এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে, বৈশ্বানর বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এবং ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের চৈতন্যের কথাও বলা হইয়াছে এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে বৈশ্বানর ও বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এবং ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ চৈতন্য এক। এক্ষণে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ইত্যাদি নানা প্রপঞ্চ উপহিত সমষ্টি ও উপহিত ব্যষ্টিভেদে বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, তৈজস, ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ ইত্যাদি নানা চৈতন্যও যে এক তাহাই দেখান হইতেছে। যেমন খদির, পলাসাদি উপহিত বিভিন্ন বনকে সমষ্টিভাবে এক মহাবন বলা হয়, যেমন বাপী কূপ তড়াগাদি বিভিন্ন জলাশয়কে এক করিয়া এক মহাজলাশয় বলা হয় সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন বিভিন্ন প্রপঞ্চকে এক করিয়া মহাপ্রপঞ্চ বলা হয়, খদির ও পলাস ইত্যাদি বিভিন্ন বন ও মহাবন যেমন এক, বাপী কূপ তড়াগাদি বিভিন্ন জলাশয় ও মহাজলাশয় যেমন এক সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চ ও মহা প্রপঞ্চ এক এবং খদির ও পলাস বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মহাবনাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন এক, বাপী, কূপ তড়াগাদি প্রতিবিম্বিত আকাশ

ও মহাজলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন এক সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং ঐ মহাপ্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্য এক।

কিন্তু শ্রুতিতে মহাবাক্য আছে যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' সুতরাং মহাপ্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্য ও বিভিন্ন প্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্য এক হইলেও মহাপ্রপঞ্চ যখন চৈতন্য নহে তখন উহা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে। অতএব শ্রুতি বিরুদ্ধ বাক্য কিরূপে গ্রহণ করিব?

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য ও লক্ষ্য বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উহাতে ঐ শ্রুতি বাক্যের বিরোধ হয় নাই। যেমন অগ্নি ও লৌহপিণ্ড। এক করিয়া যদিও উভয়টি এক বস্তু নহে অর্থাৎ অন্যোন্য অধ্যাস বা তাদাত্ম্য অধ্যাস করিয়া আমরা বলি "অগ্নিময় লৌহপিণ্ড", তেমনি মহাপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এক করিয়া অর্থাৎ তাদাত্ম্য অধ্যাস দ্বারা আমরা বলি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ইহাই এই মহাবাক্যের বাচ্য। এবং যেমন লৌহপিণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অগ্নি হইলেও সেই অগ্নিঃ 'ঐ লৌহপিণ্ড জ্বলিতেছে' এই বাক্যের দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন সেইরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যেরও লক্ষ্য হইতেছে অনবচ্ছিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম।

ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব পর্য্যন্ত সমস্তই এক অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে অধ্যারোপমাত্র। বস্তুতঃ এই সমস্তে অধ্যারোপের অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্ম—তিনিই সৎবস্তু। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ একমাত্র ঈশ্বর, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং ঈশ্বরচৈতন্য ও ব্রহ্ম যখন এক তখন সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। এইরূপে সামান্য অধ্যারোপের কথা বলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার)

(১০)

উদ্ধবকে সন্ন্যাসের অনুমতি।

যদুকুল ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইলে শাপবিমোচনের জন্য যদুগণ প্রভাস-তীর্থ-যাত্রা সঙ্কল্প করেন। ভগবানের প্রভাস যাত্রার উদ্‌যোগ দেখিয়া উদ্ধব বুঝিলেন, ভগবান্ এইবার অন্তর্দ্ধান হইবেন।

উদ্ধব ভগবানকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, বিপ্রশাপের প্রতি-বিধান করিতে সমর্থ হইয়াও যখন আপনি প্রতিবিধান করিলেন না, তখন আমার বোধ হইতেছে আপনি যদুকুল সংহার করিয়া এইবার অন্তর্দ্ধান হইবেন।

নাহং তবাঙ্ঘ্রি কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধামনয়মামপি॥

হে কেশব! আমি তোমার পাদপদ্ম ক্ষণার্দ্ধও ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আমি তোমার ভক্ত, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। ভাবিও না, মায়ার ভয়ে আমি এ কথা বলিতেছি—

উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি—আমি তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস আমি মায়াকে নিশ্চয় জয় করিয়াছি।

ভগবান্ বলিলেন,—হাঁ আমি এইবার অন্তর্দ্ধান হইব। আমি চলিয়া যাইবা মাত্র কলির অধিকার হইবে।

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
মষ্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্॥

তুমি স্বজন বন্ধুতে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন আবিষ্ট করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর।

উদ্ধব বুঝিলেন ভগবান্ সন্ন্যাস লইতে অনুমতি করিতেছেন। উদ্ধব বলিলেন,—

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।

বিষয়-চিত্ত লোকের কাম ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর। তবে তুমি "যোগেশ" অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তির আধার তুমি যদি শক্তি দাও তবেই সন্ন্যাস লইতে পারগ হইব। তৎপরে উদ্ধব ভগবানকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং বলিলেন "অনুশাধি ভৃত্যম্"—এই ভৃত্যকে শিক্ষা দিন।

(২)

অবধূতের ২৪টি গুরু।

ভগবান্ বলিলেন ঠিক জ্ঞানদ গুরু এক বটে এবং গুরুকরণ আবশ্যক কিন্তু ইহা জানা উচিত প্রধান গুরু নিজ বুদ্ধি বা মন। "আত্মনো গুরুরাত্মৈব" আত্মা আত্মার গুরু—অর্থাৎ নিজেই নিজের গুরু হইতে হয়। তাহার পর ভগবান্ এই প্রসঙ্গে অবধূত শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়ের ইতিহাস বলিলেন। দত্তাত্রেয়ের ২৪টী গুরু ছিল। উপদেশ মত সব গুরু তিনি অবলম্বন করেন নাই কিন্তু নিজ বুদ্ধিমত গুরু অবলম্বন করিয়াছিলেন।

২৪টী গুরু—(১) পৃথিবী (২) বায়ু (৩) আকাশ (৪) জল (৫) অগ্নি (৬) চন্দ্র (৭) রবি (৮) কপোত (৯) অজগর (১০) অর্ণব (১১) পতঙ্গ (১২) মধুকর (১৩) করী (১৪) মধুহা (১৫) হরিণ (১৬) মীন (১৭) পিঙ্গলা (১৮) কুরর (চিল) (১৯) বালক (২০) কুমারী (২১) শরনির্ম্মাতা (২২) সর্প (২৩) ঊর্ণনাভ (২৪) সুপেশকৃৎ (কুমুরে পোকা)।

(১) পৃথিবী গুরু। পৃথিবীর নিকট ক্ষমা শিখিবে। কেহ আক্রমণ করিলেও ক্ষমা হইতে বিচলিত হইবে না।

(২) বায়ু গুরু। বায়ু যেরূপ গন্ধ দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ মুনি দেহের ভাল মন্দে লিপ্ত হইবে না।

(৩) আকাশ গুরু। আকাশ মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট

হইলেও কিছুতেই যেরূপ লিপ্ত হয় না, মুনিও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ হইবে।

(৪) জল গুরু। জল যেরূপ মধুর, স্বচ্ছ ও পবিত্রকারী মুনি সেইরূপ সকলের তীর্থ স্বরূপ হইবে।

(৫) অগ্নি গুরু। অগ্নি যেরূপ জলদাহক মুনি সেইরূপ শ্রেয়াভিলাষী মানুষের মন-দাহক হইবে।

(৬) চন্দ্র গুরু। চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ দেহের জন্ম ও নাশ হয়, আত্মার জন্মও নাশ হয় না।

(৭) রবি গুরু। সূর্য্য যেরূপ জল আকর্ষণ করিয়া পুনরায় পৃথিবীকেই দান করেন, মুনিও সেইরূপ হইবে।

(৮) কপোত গুরু। কপোত শাবক ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কপোত কপোতী স্নেহাতিশয্য হেতু স্বয়ং জালে গিয়া পড়ে এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সেই জন্য,—

নাতি স্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।

কোথায় কাহাকেও অতিস্নেহ বা উপলালনাদি করিবে না।

(৯) অর্ণব গুরু। মুনি অর্ণবের ন্যায় প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগাহ্য ও দুরত্যয় হইবে।

(১০) অজগর গুরু। অজগর যেরূপ আহারের চেষ্টা করে না—মুনি সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

(১১) পতঙ্গ গুরু। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে মুগ্ধ হইয়া পুড়িয়া মরে সেইরূপ মানব যোষিৎ ও হিরণ্যাভরণে মুগ্ধ হইলে নষ্ট হইবে।

(১২) মধুকর গুরু। মধুকর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ মুনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবে। মক্ষিকারা সঞ্চয় করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সঞ্চয় মুনির নাশের হেতু।

(১৩) করী গুরু। করীকে করিণী দেখাইয়া গর্ত্তে ফেলা হয়। সেইরূপ যুবতী স্পর্শে মৃত্যু হইবেই হইবে। এমন কি দারুময়ী যুবতীকে পদের দ্বারাও স্পর্শ করিবে না।

(১৪) মধুহা গুরু। মধুহা যেরূপ সঞ্চিত মধু হরণ করে, যতি সেইরূপ কল্যাণেচ্ছু হইয়া গৃহস্থের দুঃখোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিবে।

(১৫) হরিণ গুরু। গ্রাম্য নৃত্যবাদিত্রগীত সেবা করিবে না। করিলে হরিণের ন্যায় বদ্ধ হইবে—ব্যাধ বাঁশী বাজাইয়া হরিণ ধরে।

(১৬) মীন গুরু। রসজয় না করিলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। আমিষযুক্ত বড়িশ দ্বারা মৎস্য ধৃত হয়। রস জয় না করিলে মৃত্যু ঘটে।

জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।

রসনেন্দ্রিয় জয় করিলে সব ইন্দ্রিয় জয় করা হয়।

(১৭) পিঙ্গলা গুরু। এক দিন পিঙ্গলা বেশ্যা নাগরের আশায় বেশভূষা করিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। পথে মানুষ দেখিলেই ভাবে যে অর্থপ্রদ নাগর আসিতেছে, কিন্তু সে রাত্রে কেহ আসিল না। সে একবার ঘরে ঢোকে একবার বাহিরে আসে। এইরূপ দুরাশায় অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর বিরক্ত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল ও নিদ্রা যাইল।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ।

(১৮) কুরর গুরু। কুরর (চিল) একটু মাংস মুখে করিলে অপর পক্ষীরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে—সে মাংস ফেলিয়া দিলে তবে নিশ্চিন্ত হয়। পরিগ্রহ দুঃখের কারণ।

(১৯) বালক গুরু। বালক যেরূপ চিন্তামুক্ত সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ মুনি চিন্তামুক্ত হইবে।

(২০) কুমারী গুরু। এক কুমারীর হাতে কয়েকগাছি কঙ্কণ ছিল। কুমারী ধান্য কুটিতে ছিল। হাতে কঙ্কণ থাকা হেতু শব্দ হইতেছিল। তাহাতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিতেছিল যে কুমারী ধান্য কুটিতেছে। কুমারী দুগাছি রাখিয়া অবশিষ্ট চুড়ি খুলিল।

তাহাতেও শব্দ হইতে লাগিল; পরে একগাছি রাখিয়া সব খুলিয়া ফেলিল। আর শব্দ হইল না।

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ।

বহুজন একত্র বাস করিলে কলহ হয়, দুইজন একত্র থাকিলেও কথাবার্ত্তা হয়। অতএব মুনি একাকী ভ্রমণ করিবে, যেরূপ কুমারীর কঙ্কণ।

(২১) শরনির্ম্মাতা। শরনির্ম্মাতা যখন এক মনে শর সরল করে তখন সম্মুখ দিয়া ভেরীঘোষ সহিত রাজা যাইলেও টের পায় না।

(২২) সর্প গুরু। সর্প যেরূপ পরের গৃহে বাস করে, মুনি সেইরূপ পরনির্ম্মিত গৃহে বাস করিবে।

(২৩) ঊর্ণনাভি গুরু। ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) যেরূপে নিজের মুখ হইতে জাল নির্ম্মাণ করে ও সেই জালে বিহার করে, আবার জাল গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন, সংহার করেন।

(২৪) কুমুরে পোকা গুরু। আরসোলা যেরূপ ভয়ে কুমুরে পোকার আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্নেহ, দ্বেষ ও ভয় হেতু যাহার চিন্তা করা যায়, তাহারই আকার প্রাপ্ত হইতে হয়।

অবধূতের এই চব্বিশটি গুরু ছাড়া আর একটি গুরু ছিলেন—নিজ দেহ। এই গুরুটি বড় বিচিত্র চরিত্র। এই গুরুকে ভাল রকম সেবা করলে ইনি অধঃপাতিত করেন কিন্তু ইহাকে মাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী ভোগ দিলে ইনি জ্ঞান বৈরাগ্য দেন।

(৩)

গুরুকরণ।

তাহার পর ভগবান্ বুঝাইলেন,

মদভিজ্ঞং গুরু শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।

আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য গুরুকরণ প্রয়োজন কিন্তু গুরু যেন ব্রহ্মজ্ঞ ও সমতাগুণ প্রাপ্ত হন। গুরুকে মৎস্বরূপ জ্ঞানে উপাসনা করিবে।

(৪)

আত্মার স্বরূপ।

বিলক্ষণঃ স্থূল সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥

স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ। আত্মা দ্রষ্টা—স্বপ্রকাশ। যেরূপ দারু দাহ্য ও অগ্নি দাহক সেইরূপ দেহ প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক। দেহ জড়, আত্মা চৈতন্য।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা কর্ম্ম করেন ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন। ভগবানের মতে আত্মা কর্ম্ম ভোগ করেন না, সুখদুঃখও ভোগ করেন না।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥

ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করে। সত্ত্ব রজ তম গুণ ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে। জীব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে কর্ম্মফল ভোগ করে। ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমান হইলে জীবের ইন্দ্রিয়সংযোগ বলা যায়। ভগবানের মতে আত্মা কর্ত্তা নহেন বা ভোক্তা নহেন কিন্তু আত্মা দ্রষ্টা সাক্ষী।

(৫)

আত্মার বন্ধ নাই—মোক্ষ নাই।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, আত্মা একস্বভাব, বদ্ধ ও মুক্ত হইলেন কিরূপে ?

ভগবান্ বলিলেন—

বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়া মূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥

[ঠাকুর বলিতেন, মনেই বদ্ধ—মনেই মুক্ত]

“বদ্ধ” ও “মুক্ত” (মনের) উপাধিহেতু বলা যায়, বস্তুতঃ নহে। (মনের) উপাধি মায়িক, অতএব আত্মার মোক্ষও নাই বন্ধও নাই। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

(৬)

বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ।

তৎপরে ভগবান্ বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ বলিলেন—

যে নিজেকে সুখদুঃখের ভোক্তা মনে করে, সে বদ্ধ। যে নিজেকে কেবল দ্রষ্টা দেখে সে মুক্ত। মুক্ত দেহস্থ হইয়াও জানেন, তিনি দেহস্থ নন। বদ্ধ দেহস্থ না হইয়াই ভাবে, সে দেহস্থ। মুক্ত শরীরে থাকিয়াও ভাবেন তিনি কর্ত্তা নন—বদ্ধ জানে আমি কর্ত্তা।

ভারতীয় শিক্ষা।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

Buddhism must be right! Re-incarnation is only a mirage!, But this vision is to be reached, by the path of Advaita alone!

—Vivekananda.

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ও 'বৈদিক ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মেরই একটি শাখামাত্র এবং বুদ্ধদেব হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলেন না। তবে বিষয়টি যেরূপ গূঢ় তাহাতে উহা আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা নামক বৌদ্ধগ্রন্থান্তর্গত জীমূতবাহনাবদানাদি পাঠে বেশ বুঝা যায় যে ভগবান্ বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত "ধর্ম্ম" সনাতন আর্য্য ধর্ম্মেরই একটি সুপ্রশস্ত নির্ব্বাণ-লাভোপযোগী ধর্ম্মমার্গ মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধই পূর্ব্ব জন্মে জীমূতবাহন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি

যে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনার বিরোধী ছিলেন না তাহা ঐ গল্পপাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। মলয়বতীর গৌরীপূজা এবং শঙ্কর কৃপায় সুধাসেকের দ্বারা জীমূতবাহনের পুনর্জ্জীবন লাভ, তাঁহার পরম সাত্বিকভাব দর্শনে তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক এবং প্রচুর ধনরত্ন দান প্রভৃতি কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

গ্রন্থান্তরে 'বিশাখা' চরিত্র পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ বলিতে ইদানীং আমাদের হৃদয়ে যে এক বিজাতীয় ভাবের উদয় হয় তখন তাহার কিছুমাত্র ছিল না, উপরন্তু কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ সকলেই তথাগতের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে বিবাহাদি কার্য্য চলিত এবং সকলে পুরাতন প্রথারই অনুসরণ করিতেন। আমরা দেখিতে পাই বিশাখার পিতা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া যে তিনি কোনও নূতন আচার-পদ্ধতি মানিয়া চলিতেন তাহা নহে উপরন্তু তিনি নিজ কন্যাকে হিন্দুর ঘরেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীবুদ্ধ নির্ব্বাণকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন এবং জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে সকলকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দান, প্রজ্ঞা, ক্ষমা, শীল, বীর্য্য ও সমাধি প্রভৃতি পারমিতা বিষয়ে উপদেশ করিতেন। তাঁহার দর্শন যে শুধু সাংখ্য দর্শনের 'ত্রিতাপ' এবং 'প্রমাণাভাব বলিয়া ঈশ্বর-বস্তু সিদ্ধ হয় না' প্রভৃতি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন নহে, উহার অন্তস্থলে পূর্ব্ব মীমাংসা, বৈশেষিক এবং ন্যায়-দর্শনের গুপ্ত নিরীশ্বর-বাদ যে ক্রীড়া করে তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঐ দর্শনত্রয়ের মধ্যে কোথায় আছে? কেবলমাত্র শব্দই যদি ব্রহ্ম হয় বা মন্ত্রই যদি দেবতা হয় তাহা হইলে ইদানীং আমরা ভগবান্ বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান মীমাংসা-দর্শনে কোথায়? হস্তী চড়িয়া ইন্দ্রদেবতা ঘটের উপর অধিষ্ঠিত হইলে ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা ইত্যাদি যাহাদের প্রমাণ তাহাদের তুলনায় বৌদ্ধেরা ত যথেষ্ট আস্তিক। টীকাকারেরা যদি আত্মা বলিতে

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই দুই অর্থ টানিয়া বাহির না করিতেন তাহা হইলে জড়াত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। কিম্বা বৈশেষিক বা ন্যায় দর্শনের মধ্য দিয়া জীব জগৎ বুঝিতে, অন্ততঃ কনাদ ও গৌতমের কোনও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইত না। বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনের পদার্থগুলি যদি মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জীব জগৎ বুঝিতে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের মধ্য দিয়া বেদান্ত দর্শনের চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হয়। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছে কারণ উহা বেদব্যাস প্রণীত এবং গীতাতেও উহার উল্লেখ আছে—তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ঐ দর্শন-সূত্র কখনই সকলের পরিচিত ছিল না, উপনিষদের ন্যায় উহা অরণ্যেই লুক্কাইত ছিল। আচার্য্য শঙ্করই উহার প্রথম ভাষ্য করেন এবং শ্রীবুদ্ধকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যেরা যে অবৈদিক মতসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া ভগবান্ দত্তাত্রেয় এবং শ্রীবুদ্ধের "শূন্যম" এবং "গম্ভীর" কেই "পূর্ণম্" বা "সৎ" বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লোকসমাজে বেদান্তসূত্র, ন্যায় ও সাংখ্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় দার্শনধারা ন্যায় ও সাংখ্যের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ দর্শনে পর্য্যবেসিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধদর্শনের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইলেও ভারতীয় ধারাবাহিক দর্শনের সহিত ইহার প্রথম মিলন শারীরক ভাষ্যের সময় অর্থাৎ ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে পর্য্যবেসিত হয়, সেইরূপ আবার বৌদ্ধ দর্শনও শঙ্করের অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বেদান্ত দর্শনের কোন কোন সূত্রে (বেদান্তসূত্র ২ অ, ২ পা, ২৮, ২৯ ও ৩০ সূ ইত্যাদি) বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাষ্যকারেরা ও টীকাকারেরাও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনেরও কোন কোন স্থলে (ন্যায় সূত্র—৪অ, ১৪ সূ ইত্যাদি) শূন্যবাদ দেখা যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম

শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েই শূন্যবাদটি পরিস্ফুট দেখা যায়। নাগার্জ্জুন, মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎসর পরে এবং হীনযান বৌদ্ধদিগের মতে ঐ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে জন্ম-গ্রহণ করেন। পালি গ্রন্থানুসারে শাক্যমুনি খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। সেই অনুযায়ী নাগার্জ্জুন খ্রীষ্টাব্দের ১৪৪ অথবা কেবল ৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। তাহা হইলে নাগার্জ্জুন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শূন্যবাদ এবং ন্যায় ও বেদান্তসূত্রের উল্লিখিত স্থল-সমুদয়কে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত মত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।* অশ্বঘোষ হইতে মহাযান সম্প্রদায় আরম্ভ হয়। এই সময়ে "অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে; মাধ্যমিক যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক মতে (নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রচারিত) কোন পদার্থই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই; সকলই শূন্যময়। যোগাচার (অসঙ্গ কর্ত্তৃক প্রচারিত) মতও ইহার অনুরূপ; এই মতস্থ ব্যক্তিরা অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অপরাপর সমুদয় পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে কেবল বিজ্ঞানই আছে; জল, বায়ু, পৃথিব্যাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। ইঁহারা ঐ বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান বলে ও সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয় বিজ্ঞান। অপর দুই সম্প্রদায়ীরা বাহ্য পদার্থ ও অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহ্য পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; ভূত ও ভৌতিক। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটির নাম ভূত এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নদী, পর্ব্বতাদি বিষয় সমুদয়ের নাম ভৌতিক। সমুদয়ই সেই পরমাণু সমষ্টি। এই জগৎ ও জগতের সমুদয় পদার্থই পরমাণুপুঞ্জ বই আর কিছুই নয়।

শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতে পরস্পর কিছু বিশেষ আছে। এক সম্প্রদায়ীরা বলেন, বাহ্যবস্তু সমুদয় কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাঁহাদের নামে বৈভাষিক। অপর সম্প্রদায়ীরা বলেন বাহ্য বস্তু সত্য বটে, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ; একেবারেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। চিত্ত-মধ্যে বাহ্য বস্তু সমুদয়ের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই প্রতিরূপ-জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের জ্ঞান জন্মে। এই সম্প্রদায়ের নাম সৌত্রান্তিক। উভয় মতেই যে সময়ে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ব থাকে। প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ-বৈনাশিক অথবা সর্ব্ব-বৈনাশিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা হিন্দু বৈদান্তিকের ন্যায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং চিত্ত ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।"* শ্রীশঙ্কর এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন।

যাহা হউক বেদান্ত ও ন্যায়-সূত্রের কিয়দংশ আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিলেও আমাদের অভিলষিত নিগমনের কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হয় না। এইবার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া আলোচনা করিব। জগতের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে কনাদ তাঁহার নিজ দর্শন সূত্রে পরম পদার্থ পরমেশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই। আস্তিক মাত্রেরই স্বীকৃত যে পরমেশ্বরের নাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথায় ও ব্যক্ত করেন নাই। বৈশেষিকের ভাষ্য ও টীকাকারেরা দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত 'আত্মা' শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন; 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা'। একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে—শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রান্তর্গত 'তৎ' শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন,—

তদিত্যনুপক্রান্তমপি প্রসিদ্ধি সিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি ॥

"'তৎ' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বর' ইহা প্রসিদ্ধিই আছে, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।"

* Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol. I. 1873. pp. 413—425

কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রে যখন ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন ঐ "তৎ" শব্দের অর্থ ধর্ম্মই বলিতে হইবে। এখন উভয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই পাঠক সূত্রকারের কি অভিপ্রায় তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥

১অ, ১ আ, ২ সূ ॥

"যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম।"

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" । ১অ, ১ আ, ৩সূ ॥

"বেদে তদ্বচন অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ক বচন আছে বলিয়া, বেদ প্রামাণিক।"

কিন্তু জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শন-শাস্ত্রের যখন একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারণ বলিয়া তিনি স্থির জানিতেন, তাহা হইলে সে বিষয়ের বিশেষ ভাবে বিবৃতি তিনি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিম্বা সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "যাঁহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের নাম ত অল্প কথা; তাঁহারা 'গোপবধূটীদুকূল চৌরায়' ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেষিত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন।"

আবার দেখিতে পাওয়া যায় ন্যায়-দর্শনে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর পদার্থটির উল্লেখ নাই। ঠিক বৈশেষিকের ন্যায় ন্যায়ের টীকা এবং ভাষ্যকারেরা উহার অন্তর্গত আত্মা শব্দটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ার্থ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিশ্ব কারণ নিরূপণ করিতে যাইয়া একটি প্রধান প্রয়োজন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমেয় পদার্থের বিশেষ ভাবে উল্লেখ না দেখিলে লোকের মনে কিরূপ সন্দেহ আসিয়া অধিকার করে।

কেবল একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই তৎক্ষণাৎ পরসূত্রেই আবার মনুষ্যকৃত কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন ঐ উভয় সূত্র পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিলেই বিষয়টি পাঠকের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ এবং পর সূত্রটি সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বপক্ষ,—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ

ন্যায় সূত্র। ৪অ, ১৯ সূ ॥

"ঈশ্বর কারণ; কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না।"

সিদ্ধান্তপক্ষ,—

ন, পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

ন্যায়সূত্র। ৪অ, ২০ সূ ॥

"না, তাহা নয়। মনুষ্যকৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না।"

গোতম অন্য সূত্রে লিখিয়াছেন,—

পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। ৩।১৩২ ॥

"পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে জীবের শরীরোৎপত্তি হয়।" বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপরোক্ত দুই সূত্রের টীকায় ঈশ্বর ও পুরুষ উভয়কেই জগত কারণ বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু এ ঈশ্বরের কতটুকু মূল্য?—যিনি পরমাণু প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের স্রষ্টা নন, জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না? ফলতঃ উভয় সূত্রের কেবল সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, গোতমকে নিরীশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় তাঁহার ন্যায় দর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"গোতমের গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য কি বিজ্ঞেয়, তাহা গোতমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। এতদীয় দর্শনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞাসূত্র, তন্মধ্যে প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের উল্লেখ আছে; পরন্তু ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয় বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথা জীবাত্মপর। গোতমের মতে জীবাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ।

ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মোক্ষপ্রদ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থদ্বারা জানা যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ উল্লেখ মাত্র। সে উল্লেখ কেবল পরমত খণ্ডনের জন্য, স্বমত বিধানের জন্য নহে।"

কপিল, গৌতম এবং কনাদের দর্শনাদি পাঠ করিয়া এবং অপর-দিকে বেদ সকলেরই পরমশিরধার্য্য বস্তু দেখিয়া, অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করে যে এই সকল দার্শনিকেরা বেদ-বস্ত্র আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় বেদই বল, দর্শনই বল, পুরাণতন্ত্রই বল, সকলই ভারতীয় মনীষীদিগের গভীর চিন্তা-সমুদ্রের মুক্তাস্বরূপ। তবে সে অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর হইতে সকল ধর্ম্ম-রাজ্যের ডুবুরীই যে সকল রত্নের সন্ধান পাইয়া উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এমত নহে। যিনি যতটুকু পাইয়াছেন তিনি ততটুকু জগৎ সমক্ষে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এখন দেখা যায়, বৈদিক, অবৈদিক, নাস্তিক, আস্তিক সকল শাস্ত্রেই কতকগুলি বিষয় সকলেই মানিয়াছেন যথা—কর্ম্ম-ফলে জন্মগ্রহণ ও নানাবিধ যোনি ভ্রমণ হয়; জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার নরক ও সুখসম্পদ প্রভৃতি দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; জন্মগ্রহণ, নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়; এবং মুক্তি বা পরমপুরুষার্থ জ্ঞানোদয় হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীবুদ্ধ ঈশ্বর মানিতেন না ইহা মানিয়া লইলেও তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলি যে মানিতেন ইহা একেবারে সুনিশ্চিত। জ্ঞানাচার্য্য কপিল এবং তদনুচরেরা যদি ঈশ্বর না মানিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচিত এবং দেবতা-জ্ঞানে পূজিত হইতে পারেন তখন শ্রীবুদ্ধেরও তাঁহার ধর্ম্মের, সর্ব্ব-ধর্ম্মাশ্রয় বেদান্ত-ধর্ম্মে এবং হিন্দু সমাজে স্থান নির্দ্দেশ কেন না হইবে?

পূর্ব্বমীমাংসা পাঠ করিয়া শ্রীজৈমিনি কিরূপ ঈশ্বর এবং কিরূপ দেবতা মানিতেন তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা, আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা

বুঝি তাহা যেন এক প্রকার অস্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম সূত্রের ভাষ্যে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত কি না, তাহা বিচার করিবার জন্য শবরস্বামী বৃত্তিকারের অভিপ্রায় বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন,—

'অপৌরুষেয়ঃ এষঃ সম্বন্ধঃ' ইতি পুরুষস্য সম্বন্ধাভাবাৎ।

কথং সম্বন্ধোনাস্তি। প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্যাভাবাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চেতরেষাম্।

"এই শব্দার্থের সম্বন্ধ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নয়। কেন না ঐরূপ সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। যদি বল সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই 'যে সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।' প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, অন্যান্য প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকে না।" সর্ব্বশেষে এই দর্শনের মতে যাবতীয় দেবতা মন্ত্রস্বরূপ, শরীর বিশিষ্ট নয়। কেন না যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বানে ঘটে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভারে ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত।

এই সকল হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন একদিনে হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা হিন্দুর বহুকাল ধ্যানপরায়ণতার ফল স্বরূপ। কত মীমাংসা, কত সাংখ্য, "কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূত, যোনি, পুরুষ বা ইহাদের সংযোগ" প্রভৃতি বিশ্ব কারণ, কত ঋষি কত যুগ-যুগ ব্যাপী ধ্যানের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরে সকল ভারতীয় চিন্তার সার্থকতা করিতে ভগবান্ উপনিষদ্-খনি প্রাপ্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত শূন্যবাদের মুকুট পরিয়া আসিলেন এবং নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ প্রভৃতি সে মুকুটে নানা রত্ন খচিত করিয়া দিলেন, কিন্তু শ্রীশঙ্কর তাহাতে অদ্বৈত কোহিনুর সংযুক্ত করিয়া সে মুকুটের সমধিক শোভা বর্দ্ধন করিলেন।

এখন শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্করের মতে প্রভেদ কি? শ্রীবুদ্ধ কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ মানিতেন, কিন্তু শ্রীশঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ ত মানিতেনই তাহা ছাড়া সগুণ ব্রহ্ম ও লীলাও মানিতেন এবং উভয়

মার্গই মুক্তি লাভের উপায় ইহাও স্বীকার করিতেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যখন জীব, জগৎ ঈশ্বর কিছুই থাকে না তখন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রয়োজন কি ?—ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর মানিতেন না এরূপ নহে। কারণ, তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "মহাশয়! ঈশ্বর আছেন ?" তিনি বলিতেন, "আমি কি বলিয়াছি আছেন ?" পুনশ্চ যদি জিজ্ঞাসা করিত "মহাশয় তবে কি ঈশ্বর নাই ?" তিনি বলিতেন, "আমি কি বলিয়াছি নাই"। ঈশ্বর-প্রশ্ন প্রসঙ্গে আবার হয় ত বলিতেন "বৃক্ষ হইতে পাতা লইয়া আইস।" যদি কেহ একটি পাতা লইয়া আসিত তখন তিনি বলিতেন যে বৃক্ষে কি মাত্র একটি পাতা আছে ? সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের সকল খবর আমি কি প্রচার করিয়াছি ? বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিতেন বটে কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানপথাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাহার প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

আর একটি প্রশ্ন এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যদি শ্রীবুদ্ধ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য তথা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি সকলই প্রচলিত ছিল এবং তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠাসন দিতেন তবে তিনি স্ত্রী ও শূদ্রকে সন্ন্যাসের অধিকারী করিলেন কেন ? ইহার উত্তরে আমরা বলি—কারণ তিনি উপনিষদের শেষ ঋষি—ব্যাকরণের তীক্ষ্ণ খড়্গে "শূদ্রকে" ছেদ করিয়া তাহার মোক্ষ পথ অবরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ শব্দে বেদান্তের ঋষিরা কি বুঝিতেন তাহা একবার বজ্রসূচিকোপনিষদের আলোচনার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ঋষি বলিতেছেন,—

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি—বজ্রসূচী উপনিষদ্ বলিব।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি—বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।

বেদবচনানুরূপং—কারণ ইহা বেদবচনানুরূপ।

কো বা ব্রাহ্মণো নাম—ব্রাহ্মণ এই নাম কাহার ?

জীবো ব্রাহ্মণ ইতি—জীবই কি ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ—

অতীত এবং অনাগত চাণ্ডালাদি বহুবিধ দেহ জীব ধারণ করিয়াছে এবং করিবে, কিন্তু সকল দেহতেই জীব একই প্রকার থাকে।

কর্ম্মবশাদনেকদেহ সম্ভবাৎ

কারণ পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল হেতু তাহাকে নানা দেহ ধারণ করিতে হয়

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে দেহই ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ—

কারণ সকল দেহই একই প্রকারের পঞ্চভূত নির্ম্মিত।

জরা মরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ—

এবং জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণ বিকার সকল দেহতেই সমান।

ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ

শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ইতি—

শাস্ত্র যে বলিতেছেন ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ।

নিয়মাভাবাৎ—কিন্তু বাস্তবিক এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষসম্ভবাৎ।

দেহই যদি ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র যদি সে দেহের সৎকার করে তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবার কথা।

তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি জাতি ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

জাত্যন্তরজন্তুষনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি—

নানা জাতি এবং জন্তু হইতে বহু ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো

বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াম, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ—

যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বুক শৃগাল হইতে, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, খরগোশ পৃষ্ঠ হইতে গোতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য জাত হইয়াছেন।

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি শাস্ত্রীয় জ্ঞানই ব্রাহ্মণের লক্ষণ?

ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি।

কারণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অনেক পরমার্থদর্শী, অভিজ্ঞ এবং পণ্ডিত আছেন।

তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি—তবে কি বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়?

ন—না।

সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামি কর্ম্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ—

কারণ সকল প্রাণিতেই তাহার প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ?

ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি—

কারণ হিরণ্যদাতা ধার্ম্মিক বহু ক্ষত্রিয় আছেন।

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম—

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝা যায়?

যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি গুণ ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং কর-

তলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নোভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহংকরাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ—

যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতি গুণ ক্রিয়াহীন, জন্মাদি ষড়ূর্ম্মি, কামাদি ষড়্ভাব প্রভৃতি দোষ রহিত এবং সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপেত্যাদি বলিয়া হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কামরাগাদি দোষ বর্জ্জিত, শমদমাদি সম্পত্তি ষটক্ সম্পন্ন প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

ইতি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ—ইহাই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাসের অভিপ্রায়।

এখন একবার শ্রীবুদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক,—

"হে দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার জটাকূটে, এবং মৃগচর্ম্মে ফল কি? তোমার অভ্যন্তর রাগাদি ক্লেশরূপ হনন দ্বারা পরিপূর্ণ, তুমি বাহ্যশরীর পরিমার্জ্জিত করিতেছ।"

"যিনি ধূলি ধূসরিত জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করেন, যিনি কৃশ এবং ধমনী সন্তত গাত্র এবং যিনি একাকী বনে (নির্জ্জনে) বিচরণ করেন এবং ধ্যান সমাধি রত তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণ ঔরসজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহা হইলে কেবল ভোবাদী হইবে (অর্থাৎ হে মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল হইবে); কিন্তু (যিনি) আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপী তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

যখন যুগ প্রবর্ত্তকেরা আসেন তখন তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অবস্থাচক্রে পড়িয়া আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজ বেদাধিকার লইয়া "শূদ্র" শব্দের বোধ হয় অযথা অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দেশের শাস্ত্র বলেন সত্যই ব্রাহ্মণের লক্ষণ, কারণ—নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি—ব্রাহ্মণ না হইলে সত্য কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সমর্থ হয় না, অতি

নীচ-যোনি হইলেও যে দেশের আচার্য্য বলেন—সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা—হে সৌম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব, কারণ, তুমি সত্য হইতে স্খলিত হও নাই, যে দেশের নারী মন্ত্র-দ্রষ্টা বাক্, জনক সভায় বিচারপরায়ণা গার্গী, শঙ্কর-মণ্ডন তর্কযুদ্ধে মধ্যস্থা উভয়ভারতী, যে দেশের অবতার রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, যে দেশের মহাপুরুষ কবির, রুহিদাস, হরিদাস—সে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যদি, শূদ্র অপবাদ লইয়া চিরকাল ব্যস্ত থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে করজোড়ে বলি—নিদ্রোত্থিত বেদান্ত-কেশরীর গর্জ্জন শ্রবণ কর—পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের সর্ব্বধ্বংসী করাল করবালের ভীম-আস্ফালন হইতে—"নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।"

(ক্রমশঃ)

গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

"আমরা সবিতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণা করিতেছেন।"

এখানে সবিতা শব্দের অর্থ ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বর জগৎ প্রসব বা সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্থষ্ট্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা স তু কীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্যতে ॥

সবিতা শব্দের অপর অর্থও আছে। সে অর্থ সূর্য্য। কারণ এই

জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ সূর্য্য (আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও এই মত)। কিন্তু গায়ত্রীতে ব্যবহৃত সবিতা শব্দের অর্থে সূর্য্যকে না বুঝিয়া আদি কারণ—যিনি সূর্য্যেরও কারণ—সেই পরব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। কারণ গায়ত্রীতে আছে—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করেন। এ কথা সূর্য্যদেব সম্বন্ধে বলা যায় না। সূর্য্যদেব আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করেন না, ভগবান্ করেন। এই বুদ্ধিপরিচালক অর্থে শ্রুতিতে "অন্তর্য্যামী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "অন্তর্য্যামী" অর্থাৎ যিনি 'অন্তরে' থাকিয়া আমাদিগকে 'যমন' বা শাসন করেন। এই অন্তর্য্যামী পুরুষ যে সূর্য্যদেব হইতে ভিন্ন তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো
যম্ আদিত্যো ন বেদ
যস্য আদিত্যঃ শরীরং
য আদিত্যম্ অন্তরো যময়তি
এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।—বৃহদারণ্যক।

'যিনি সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও সূর্য্য হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে সূর্য্য জানেন না, সূর্য্য যাঁহার শরীর, যিনি সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকে শাসন করেন,—ইনিই তোমার আত্মা; ইনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত।'

পাছে কেহ মনে করেন যে, এখানে আদিত্য শব্দের দ্বারা সূর্য্যের গোলককে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই গোলকের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেবকে অন্তর্য্যামী পুরুষ বলা হইয়াছে, এই জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

বেদিতুরাদিত্যাদ্বিজ্ঞানাত্মনোঽন্যোঽন্তর্যামীতি
স্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে। (১।১।২১ সূত্রের ভাষ্য)

অর্থাৎ আদিত্য শব্দের অর্থ সূর্য্যের গোলক নহে, কারণ

আদিত্যকে জ্ঞানবান বলিয়া বলা হইয়াছে (যম্ আদিত্যো ন বেদ), অতএব আদিত্য শব্দের অর্থে জ্ঞানবান সূর্য্যদেবকে বুঝিতে হইবে এবং অন্তর্য্যামী পুরুষ যে সূর্য্যদেব হইতে ভিন্ন শ্রুতিতে তাহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। যে ভাবে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। এবং আমার মনে হয় এই জন্য গায়ত্রীমন্ত্রের এতদূর প্রতিষ্ঠা।

আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করিতেছেন। যে শক্তি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতেছে, তাহা কত মহৎ আমাদিগকে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে শক্তি নিখিল জগৎ পরিচালনা করিতেছে, যে শক্তির কোনও সীমা নাই, যে শক্তির পক্ষে কিছু অসম্ভব বা দুরূহ নহে, সেই সর্ব্বলোকগামী, অপ্রতিহত, অপরিসীম শক্তি আমাদের বুদ্ধির পরিচালক। আমাদের প্রতিব্যক্তির মধ্যে কত অসীম কৃতিত্বের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। যে বুদ্ধির পরিচালক স্বয়ং ভগবান্ তাহার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। কবি তাহার ধীশক্তি প্রভাবে পৃথিবীর সকল মানবের মন আলোড়িত করিতে পারে। অসীমের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সে সকলকে বিস্মিত করিয়া দিতে পারে। কালিদাস ও শেক্সপিয়র যে প্রতিভাবলে মানব মন বিমুগ্ধ করিয়াছেন সে প্রতিভা পরিচালনা করিয়াছিলেন ভগবান্। যে বুদ্ধি প্রভাবে উপনিষদের ঋষিগণ তুষারমণ্ডিত শৈলশিখরের ন্যায় মহীয়ান্ সত্য-সকল উপলব্ধি করিয়াছিলেন সে বুদ্ধিরও পরিচালক ভগবান্। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস—শেক্সপিয়র, নিউটন, গেটে ইঁহাদের বুদ্ধি যিনি পরিচালনা করিয়াছিলেন, আমাদের বুদ্ধিরও পরিচালক তিনি।

কেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশ লাভ করে না? কেন আমরা মনে করি, আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমরা ইহা করিতে পারিব না, ইহা বুঝিতে পারিব না?—ইহার কারণ এই যে ভগবানের সহিত আমাদের যে যোগ তাহাতে অনেক

প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়িয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি এই প্রতিবন্ধক। সংসারের ক্ষুদ্র বস্তুগুলি আমাদের চাঞ্চল্য জন্মায়। কাহারও প্রতি আসক্তি হয়, কাহারও প্রতি বিরক্তি বা ভয় হয়। এই সকল ভাব আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশে বাধা জন্মায়। কোনও বিষয়ে বুদ্ধি পরিচালনা করিবার সময় এই সকল শতবিচ্ছিন্ন চিন্তা আমাদের বুদ্ধির প্রবাহ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। এ সকল বাধা সরাইয়া ফেলিতে হইবে। আমাদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়গুলি উপেক্ষা করিতে হইবে। প্রতিবন্ধক সরাইয়া ফেলিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক যে ভগবৎ শক্তি তাহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

তাই গায়ত্রীমন্ত্র উদ্বোধনের মন্ত্র। আমাদের চিত্ত সকল মলিনতা, সকল ক্ষুদ্রতা, সকল দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া, যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক সেই নিখিলশক্তির আধার অন্তর্য্যামী ভগবানের প্রতি উন্মুখ হউক। তাঁহার শক্তির প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল বাধা অতিক্রম করিবে। তাঁহার জ্ঞানলোকে আমাদের চিত্ত সমুদ্ভাসিত হইবে। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমরা ধন্য হইব।

ব্রাহ্মণ ও সমাজ। *

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কোন্ সুদূর অতীত হইতে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছি, পথে কতই বিলম্ব হইয়াছে, নানা লক্ষ্যভ্রংশকর প্রলোভনের কবলে পড়িয়া জন্মজন্মান্তরের বিড়ম্বনার পর এবার ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভে ধন্য হইয়াছি। তাই আজ এই মহান্ ব্রাহ্মণসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া মনের কথা বলিবার অধিকার পাইয়াছি। এ কেবল

* হুগলি জেলায়, শ্যামবাজার ব্রাহ্মণ সভায় পঠিত।

করুণাময়ের করুণাতেই সম্ভবপর হইয়াছে—নিজের কোন যোগ্যতায় নহে। অতএব যাঁহার সদাজাগ্রত চক্ষুগোচরে, যাঁহার অভ্রান্ত বিচারফলে ক্ষুদ্র মানবের অধিকার হয় বা যায়, প্রথমে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা লইয়া প্রণত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করি। পরে এই মহতী সভার গুরুজনকল্প বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে যথাজ্ঞান অভিবাদন করি। বন্ধুস্থানীয় সমবয়স্কগণকে প্রীতিনমস্কার করি। কনিষ্ঠগণকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি এবং শ্রোতা ও দর্শকরূপে আগত শূদ্রভ্রাতৃগণকে আশীর্ব্বাদ করি।

প্রথমেই বলি, আমি ব্রাহ্মণ বলিতে ব্রহ্মপরায়ণ অতএব ত্যাগশীল ও সত্যনিষ্ঠকেই বুঝি। ধর্ম্ম ও সত্যই যাঁহাদের জীবন তাঁহাদিগের নিকট সত্য কথা অবশ্যই বক্তব্য—নতুবা সত্যের তথা ব্রাহ্মণত্বের অবমাননা করা হয়। অতএব আজ সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট, যাঁহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু বলিয়া বিধিনির্দ্দিষ্ট, তাঁহাদিগেরই নিকট সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের প্রসঙ্গ তুলিব। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উপর উচ্ছৃঙ্খল কর্তৃত্বে ও মাত্র যজ্ঞসূত্রের দাবীতে স্থাপিত নহে—স্থাপিত আত্মগৌরবে, ধর্ম্মপ্রাণতায় ও শ্রীভগবৎ-প্রসাদে। অতএব এ সমিতিতে তুচ্ছ আচারমূলক বিষয় পরিহার করিয়া ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্বরূপ ও বর্ত্তমান সমাজের দিকে দায়িত্ব নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব শ্রীভগবান্ আমায় শক্তি দিন।

যদি কেহ বলেন, 'বর্ত্তমানকালে অতীত যুগের উচ্চ আদর্শের অভাবে খাঁটি সত্য কথা অপ্রিয় হইয়া উঠিবে ও শূদ্রসমাজে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদার লাঘব হইবে।' তাঁহার উত্তরে বলি 'ভাই, ব্যাধি গোপন করিয়া আসাতেই রোগটী দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, আর ক্ষতের উপর বৃথা আত্মাভিমানের প্রলেপ দিয়া সমাজদেহে শোষের সংখ্যা বাড়াইও না।' আমাদের আসল ধাত (অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা ও নিবৃত্তিপরায়ণতা) ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাই কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে আমাদের সকল প্রচেষ্টাই রোগীর প্রলাপের ন্যায় হইতেছে। ভ্রাতৃগণ, ধাত ফিরিয়া আসিলেই সব উপসর্গ দূর হইবে,

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-সমাজ পুনরায় সুস্থ হইয়া বিপুল উৎসাহে ও মহা আনন্দে জীবনপথে চলিবে। উভয় সমাজই জগৎপিতার প্রেমাবদ্ধ সন্তানরূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিবে।

প্রত্যেক মানবজীবনের দুইটা দিক আছে—(১) ভিতরের দিক বা স্বরূপের দিক, (২) বাহিরের দিক অর্থাৎ সমাজের দিক।

সমাজের দিক। সমাজের দিক আবার দুই রকম;—(১) নিজের স্বার্থ বা সংসার, (২) পরের স্বার্থ বা সমাজ। মানুষ অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের পথে যতই যাইতে থাকে ততই নিজের সংসার হইতে সমাজের এবং সমাজ হইতে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হয়। স্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল স্বভাবে অর্থাৎ চিদানন্দময় অবস্থাতে ফিরিতেই মানুষ জন্মের পর জন্মগ্রহণ করে।

তিন চারি বৎসরের শিশু কোন খাবার জিনিষ পাইলে কাহাকেও ভাগ দিতে চায় না, নিজের লালসা বড়ই প্রবল, আত্মতৃপ্তিই তাহার মূলমন্ত্র। পরে সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের তাপে দগ্ধ হইয়াও নিজের ভোগেচ্ছা সংযত করিয়া ভাইভগিনী স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে সুখী করিবার চেষ্টা করে। তখন নিজের সংসারকে সুখী করিয়াই তাহার আত্মতৃপ্তি। এখানে শিশু প্রথমে "আমি আমার" করিয়া পরে নিজেকে প্রসারিত করিয়া আত্মতৃপ্তির প্রথম ক্রমবিকাশ লাভ করে। তদ্রূপ মানব যখন অন্যান্য জীবযোনি পরিভ্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম মানব জন্ম পায়, তখন সে নিজের সংসার, টাকা কড়ি, জমি জমা, খামার মরাই প্রভৃতি ভোগবাসনার তীব্র জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে, পরের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। পশুর ন্যায় অজ্ঞান লইয়া জন্মায় ও মরে। প্রভেদ মাত্র মনুষ্যের আকৃতি। ছয়টা রিপুর খেলনা ইহারাই। এইরূপে আপন-সর্ব্বস্ব হইয়া জন্মজন্মান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে যখন প্রচ্ছন্ন স্বরূপ-চৈতন্যের ঈষদ্বিকাশ হয় তখন মানব পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বার্থের মোহ সম্পূর্ণ না কাটাইলেও পরের দিকে চাহিয়া ফেলে, পরের জন্য ভাবিয়া

ফেলে, এবং তাহাতে সুখও পায়। মার্জ্জিত-বুদ্ধি সহায়ে তখন সে বুঝে যে পাঁচজনকে লইয়াই তাহার জীবন, পাঁচজনের সুখদুঃখে, সম্পদবিপদে তাহারও অংশ আছে। সমাজের নিকট হইতে সে নানাভাবে সেবা বা উপকার পাইতেছে, তখন তাহারও অপরকে সেবা করিবার প্রবৃত্তি জাগে। নিজের সুখের বা স্বার্থের বাসনা কমিয়া যায়, কেবল পরার্থসাধনে আত্ম-নিয়োগেই তাহার তৃপ্তি হয়। ইহাই আত্মতৃপ্তির দ্বিতীয় ক্রমবিকাশ। পরের সেবা করিতে করিতে বিবেকের প্রেরণায় তাহার স্বরূপ-চিন্তা ঘনীভূত হয়, চৈতন্যের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্তপ্রায় হয়, তখন তাহার প্রকৃত বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ইতর-রসবিতৃষ্ণা তাহাকে আত্মানন্দ লাভ করায়। ইহাই আত্মতৃপ্তির তৃতীয় বা শেষ ক্রমবিকাশ।

পুণ্যভূমি ভারতের ব্রাহ্মণ ক্রমবিকাশের পথে উক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। সংসার ও সমাজ উভয়েই মায়ার লীলাভূমি। তাই মায়া বা শাশ্বতঃ অজ্ঞান অতিক্রম করাই ব্রাহ্মণের লক্ষ্য ও ও সাধনা ছিল। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, গুরুগৃহে বিদ্যাবলে সংসারের অনিত্যতা জানিয়া রাখিতেন। সংসার হইতে ফিরিবার চাবিকাঠি হাতে লইয়া যৌবনে গুরুর অনুমতিক্রমে সংসারে প্রবেশ করিতেন ও সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও মায়াপাশের কাঠিন্য উপলব্ধি করিতেন। বানপ্রস্থে ও সন্ন্যাসে প্রথম আশ্রমের অর্জ্জিত বিদ্যার আলোকে ও ধ্যানধারণাসহায়ে স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইতেন। এবম্বিধ স্বরূপ-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণ ঋষি নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের সংযম, সত্যনিষ্ঠা, পরার্থপরতা, তপঃশীলতা ও স্বরূপাববোধ তাঁহাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু করিয়া রাখিয়াছিল। এবং সেই পূত ব্রাহ্মণপ্রভাব এমনি অটল আসন পাতিয়াছে যে আজও আধুনিক ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাচার সে আসনকে সরাইতে পারে নাই। প্রাচীন ব্রহ্মবীর্য্য আজও তাঁহাদিগের অযোগ্য' বংশধরগণকে হিন্দুসমাজে গুরুস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মধ্যমযুগের ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ নিবৃত্তি ও তপস্যার মার্গ ছাড়িয়া

প্রবৃত্তি ও ভোগের মার্গ ধরিলেন—জন্মগত ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্রভাবাপন্ন হইলেন। নিজেদের হীনতা পাছে প্রকাশ পায় তজ্জন্য স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদে অনধিকার ঘোষণা করিয়া শূদ্রসমাজকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন রাখিয়া নিজেদের প্রতিপত্তির ভিত্তি শিথিল করিলেন। তাহারই ফলে আমাদের এই দুর্দ্দশা। কারণব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। শুধু কালপ্রভাবকে দোষী করিয়া নিজেরা নির্দ্দোষ বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে শূদ্রের উপর স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণের অত্যাচার আজ ধনী শূদ্রযজমানের নিকট নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে।

সংসারে যাঁহার গতি আগের দিকে না থাকে তাহাকে পিছাইতে হইবেই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হীন হইয়াছে তাই আমাদের সামাজিক জীবন নির্বীর্য্য ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মচর্য্যশীলতা ও অন্তর্মুখীনতা পুনরবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা সংসারের প্রতিপত্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন অথচ সমাজ তাঁহাদেরই পদতলে ছিল। এক্ষণে আমাদিগকে শূদ্রোচিত ভোগাকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির বাসনা দূর করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবন প্রাচীন আদর্শে গড়িতে হইবে। নিজেদিগকে শুদ্ধ ও যোগ্য না করিয়া অপরকে শাস্ত্রের শ্লোক দ্বারা আক্রমণ করিলে এবং দৃষ্টান্ত বিরহিত আদেশ দিলে উপহাসপাত্র হইতে হয়। আত্মশাসন না করিলে লাঞ্ছনা, দুদিন আগেই হোক্ আর পরেই হোক্ অনিবার্য্য।

এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আমাদিগকেই করিতে হইবে। শুধু আচারবিচারের খুঁটিনাটি লইয়া নয়—প্রকৃত অন্তঃশুদ্ধি, সংযম ও ও পরার্থপরতা লইয়া। সমাজ নদীস্বরূপ. ধর্ম্ম নদীর জল, আচার জলের ঢেউ। তরঙ্গের ন্যায় আচার পরিবর্ত্তনশীল, একবার উঠিয়া কালগর্ভে বিলীন হয়। সেই বিলীন তরঙ্গের বৃথা অনুসন্ধানে শক্তিক্ষয় না করিয়া নূতন ভাবে প্রাচীন আদর্শে চলিলে নবীন ঢেউ উঠিবেই। ঢেউএর জন্য ততটা ব্যস্ততা না রাখিয়া জলের

বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখুন।—নদীকে কানা না করিয়া স্রোতস্বতী রাখুন। সমাজের এবং জগতের উন্নতির আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে শুধু বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়াও ফল নাই, আর ব্যাকরণ স্মৃতির কচ্‌কচিতেও তৃপ্তি নাই। অধীত বিদ্যাকে ক্রিয়ামুখী করুন। সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সমবেত শক্তি ও চেষ্টা প্রযুক্ত করুন দেখিবেন, আবার সুদিন আসিবে, আবার অক্রোধ, অহিংসা, অলোভ, সত্য ও তপঃরূপে ব্রাহ্মণত্ব ফুটিয়া সজীব হইবে। ব্রাহ্মণত্ব আসিলেই সমাজে শক্তিসামঞ্জস্য ঘটিবে, শান্তি, সৌখ্য, সমৃদ্ধি সব আসিবে। ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আসিবে, নতুবা ভ্রমরের গলায় ধরিয়া কাঁদিলেও সে আসিবে না।

কথা হাজার মিষ্ট ও সরস হইলেও তাহাতে চিঁড়ে ভিজে না। আর কত কত যুগের সঞ্চিত পাপে যে হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠোর সে হৃদয় যে শুধু কথায় ভিজিবে, অনুতপ্ত হইবে, তমঃ পরিহার-পূর্ব্বক নিজের এবং দেশের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিবে তাহা অনেকেই আশা করে না। আমি কিন্তু ব্রাহ্মণশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, তাই বলিতেছি যে, আহূত শতাধিক গ্রামের মধ্যে কোন কোন গ্রামে এ শক্তির উদয় হইবে এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ যুবক তাসপাশা, মাছধরা ও রঙ্গরস পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা আত্মোন্নতি ও সমাজোন্নতি করিতে প্রয়াসী হইবেন।

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই লজ্জাজনক তামসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশ করা মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্যাতীত। রোগ জটিল ও উপসর্গবহুল। এ স্থলে আমি উপসর্গসমূহের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া রোগের কারণ নির্ণয় ও কারণ ধ্বংসের ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করি। নতুবা গ্রামে গ্রামে যে সংখ্যাতীত উপসর্গ দেখা যাইতেছে তাহা কেবলমাত্র সামাজিক শাসন দ্বারা দূর করিতে হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের জন্য একটি সমাজ-দণ্ডবিধি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি-উদ্ভাবিত বিশেষ ব্যবস্থা সকল স্থানে সকল অবস্থায় খাটে না। ব্রাহ্মণসমাজের উদ্দেশ্য

ও গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ-কাল ও অভাব অনুযায়ী ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নতুবা এক সময়ের বা স্থানের পক্ষে যাহা প্রতীকার তাহা অন্যত্র রোগের কারণ হইয়া উঠিবে। সেইজন্য এখানকার অভাব বিবেচনা করিয়া নবজীবন সাধনার অন্তরায়ের ও ব্যবস্থার কথা মোটামুটি ভাবে বলিব। সুধীজন প্রয়োজনমত বিস্তৃত করিবেন।

সমাজের এই নূতন সাধনার পথে বাধাগুলি স্থূলতঃ দুই প্রকারের:—(১) বাহিরের, অর্থাৎ সামাজিক (২) ভিতরের বা মানসিক।

(১) সামাজিক—

(ক) দলাদলি:—বসিতে হইলে স্থানটা ঝাঁট দিয়া বসিতে হয়, পূজা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আসনশুদ্ধি করিতে হয়। সমাজ জীবনের সংস্কার করিতে হইলে অগ্রে গ্রামশুদ্ধি করিতে হইবে। গ্রামে দলাদলি, পুরোহিত-যজমান কোন না কোন পক্ষের নির্য্যাতন, ধনমত্ত ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল প্রভুত্ব থাকিলে গ্রামে শান্তি থাকে না, কোনও সদালোচনা হইতেই পারে না। পূর্ব্বে মুনিঋষিগণ শান্তি-নিকেতন তপোবনে সাধনাতৎপর থাকিতেন, হিংস্র জন্তুগণও তপোবনের বাধা জন্মাইত না। এখন আমাদের সেদিন—সে ভাগ্য নাই; এখন আমাদিগকে নিজ নিজ গ্রামকেই তপোবনের ন্যায় শান্তিভবন করিয়া লইয়া তবে জীবনস্রোত ফিরানরূপ সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে দলাদলি, দলসূত্রে দ্বেষবশতঃ মামলামোকদ্দমার সৃষ্টি, যজমান-পুরোহিতের বীভৎস অভিনয়, ধনীর দাম্ভিকতা, দরিদ্রের লাঞ্ছনা প্রভৃতি দর্শনে কাহার না দুঃখ ও লজ্জা হয়? ঘরে আগুন লাগিলে ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনা বন্ধ রাখিয়া আগে আগুন নিবাইতে হয়। গ্রাম্য দলাদলিরূপ অগ্নিনির্ব্বাণের বর্ত্তমানের অব্যর্থ উপায়—ব্রাহ্মণসমাজের একতা। প্রত্যেক গ্রামের দলাদলি বন্ধ হইলেই আমাদের নূতন সাধনায় আসনশুদ্ধি হইবে।

(খ) দারিদ্র্য ও জীবিকাসঙ্কট:—লেখাপড়া কিছু থাকিলে

জীবিকাসঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার কতকটা সম্ভাবনা থাকে, উপায়ের পথ নানাদিকে খোলা থাকে। কিন্তু লেখাপড়া না থাকিলে, যাজন-কার্য্য বা পাচনকার্য্য ব্যতীত অন্য উপায়ের পথ প্রায় রুদ্ধ থাকে। সে ক্ষেত্রে কেবল শূদ্রই (অধিকাংশ স্থলে) বেচারা পুরোহিতের ভাগ্য-বিধাতা হন। অন্নের সংস্থান বন্ধ হইবার ভয়ে বা দারিদ্র্য-জনিত লোভের বশে শূদ্রের উৎকোচের আশায় পুরোহিত শূদ্রের অনুগত থাকেন। গামের ষোল আনা ব্রাহ্মণের পূর্ণ সহানুভূতিলাভে যদি এই পুরোহিত নিশ্চিন্ত থাকিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবিকার জন্য যজমানের কৃপা-ভিখারী হইয়া থাকিতে হয় না। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান হয় না।

(গ) সৎসঙ্গের অভাব ও সদনুষ্ঠানের বিরলতা:—অলস ব্যক্তির মাথা শয়তানের বৈঠকখানা। গ্রাম এইরূপ লোকেই পূর্ণ। হীনবুদ্ধি, হীনচরিত্র ব্যক্তির বা সমাজের সংশ্রবে নিয়ত থাকিলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিও মলিন হয়, চরিত্রবানও নষ্ট হন। কাজকর্ম্মসূত্রে যতটা সংশ্রব না রাখিলে নয় মাত্র ততটা রাখিয়া অবশিষ্ট সময় নিজে নিজেই সদ্ব্যবহার করিতে হয়। সৎপ্রকৃতির লোক, তা তিনি শূদ্রই হোন্ আর ব্রাহ্মণই হোন্, বন্ধু ও সঙ্গী হইলে উভয়েরই কল্যাণ। সদনুষ্ঠান বলিতে গাছপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি ছাড়া গ্রাম্য ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে আর ধারণাই হয় না। নিজের স্বার্থ না রাখিয়া পরের কাজ দেখা, সেবা করা—এ সব গ্রামে বড় বিরল।

(২) মানসিক বা ব্যক্তিগত।

(ক) মনের অকৃপা—শুনি তো অনেক, হয় কই? হয় না, কেবল মনের উপর আধিপত্য নাই বলিয়া। এ আধিপত্য লাভ বহুদিনের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের দ্বারা ঘটে। একদিনের, এক মুহূর্ত্তের কল্পনাটা, বাসনাটা চেষ্টা নয়। মন স্বতঃই বহির্ম্মুখ ও চঞ্চল। এই বহির্ম্মুখ মনকে বশ করা, পরিশেষে নাশ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া আধুনিক ব্রাহ্মণজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। * * মনের

গোলামই যদি রহিলাম, তবে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কেন? মনই ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা, ইহাকে শাসনে আনিতে পারিলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় আয়ত্তে আসিবে। বিবেক আশ্রয় দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির জীবন পবিত্র হইতে থাকিলে, মন শুদ্ধ ও সবল হইতে থাকিলে সমাজও সজীব হইতে থাকিবে। বিদ্যাশিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যানুশীলন ও লব্ধসমাধি সদ্‌গুরু আশ্রয় ব্যতীত মনকে স্ববশে আনিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা আকাশকুসুম মাত্র।

(খ) বুদ্ধির জড়তা—তপস্যা ব্যতীত আধ্যাত্মিক বা প্রকৃত বুদ্ধির নির্ম্মলতা আনিতে আর কিছুই পারে না।

বি এ, এম এ, পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ, প্রভৃতি কোন উপাধিরই শক্তি নাই যে বুদ্ধিকে চিন্ময়ী করে, ঠিক ভাবে সত্যাভিমুখী করে। তবে মনুষ্যজীবনের অধিকাংশ ভাগই যখন সামাজিক, তখন সমাজে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই আবশ্যক। শিক্ষাবিস্তারের উপর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর সাংসারিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাশিক্ষায় চক্ষু ফুটে, নতুবা চোখ থাকতেও কাণা, বিদ্যাহীন মানব পশুর সমান। কুয়োর ব্যাঙ্ যেমন কুয়োটিকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনে করে, ভাবে কুয়ো ছাড়া আর স্থান নাই, আর উচ্চতর জীব নাই। তেমি বিদ্যা না থাকিলে দেশের এবং বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায়, মানুষ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও একঘেয়ে হয়, মূর্ত্তিমান্ কুসংস্কার-সমষ্টি হয়। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণশিরোমণি, যাঁহার জিহ্বা বেদাদি শাস্ত্রালোচনায় রত ছিল, আজ তাঁহারই বংশধর অধিকাংশ গ্রামে এমনই মূর্খ যে সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে কালঘাম ছুটে। দেবভাষা সংস্কৃত ভাষা তো দূরের কথা, মাতৃভাষা বাঙ্গালা বুঝাই সাধ্যাতীত। অতএব শিক্ষাপ্রচারের জন্য এ ব্যবস্থা বোধ হয় সঙ্গত হয় যে, গ্রামে গ্রামে অথবা সুবিধামত ২।৪ খানা গ্রাম একত্রে সকল বর্ণের শিশুদের জন্য নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা খোলা হোক, নির্লোভ, সত্যপ্রিয় কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত হোক্। পাঠশালাগুলি যেন দায় এড়ান না হয়। সমিতি হইতে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী খোলা হোক্। সমিতির কোন

ব্যবস্থামতে সেই সেই পাঠশালাকে বা চতুষ্পাঠীকে মাসিক সাহায্য দেওয়া হোক। আর ব্রাহ্মণ যুবকগণকে বলি, ঐরূপে সুবিধামত পাঠাগার (Library) খুলিয়া সদ্‌গ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধুপুরুষ কর্ম্মীদিগের জীবনী, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রাখা হোক। নাটক নভেল বাদ দেওয়া হোক্। রঙ্গরস, তাস্, পাশা, মাছধরা প্রভৃতি তামসিক কার্য্যে কালক্ষেপ আমি আত্মহত্যার সদৃশ অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি।

(গ) সৎসাহসের অভাব—সত্যকে আশ্রয় করিলে ও সৎকার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে সাহস আসে, বৃথা ভয় নষ্ট হয়।

উপসংহারে বলি, অনেক কথাই বলিলাম, দুটো কড়া সত্য কথাও বলিয়াছি, কেহ মনে আঘাত পাইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। তবে আমি যাহা বলিয়াছি, ঘরে ফিরিয়া একবার পাঁচজনে ধীরভাবে আলোচনা করিলে আমি কৃতার্থ হইব। প্রত্যেক গ্রামের দলাদলি মিটাইতে, গ্রামের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য ও নিজের মনের গতি ফিরাইতে আমি হাতজোড় করিয়া কাতরভাবে সকলকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ যুবক মহাশয়গণকে অনুরোধ করি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবার আন্তরিক চেষ্টা করিলে, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে ভগবৎ-শক্তি খেলা করে, তাঁহার কর্ম্মে লোকের কল্যাণ হয়। নতুবা কদাচাররত, মদগর্ব্বিত ব্রাহ্মণের আস্ফালনে সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না। যুবক মহাশয়গণ, জ্ঞানচর্চ্চায় আত্মোন্নতিবিধানে ও লৌকিক কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন। তমোগুণ বর্জ্জন করিয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইবার চেষ্টা করুন। যদি সংসারের বশে, কুশিক্ষার ফলে, কালধর্ম্মের দোহাই দিয়া নূতনভাবে প্রাচীন আদর্শে জীবনগঠনরূপ সাধনায় নিরস্ত থাকিয়া তৃপ্ত হন, তাহা হইলে 'হরিবোল' দিয়া এইরূপ সভাসমিতিকে অচিরে তীরস্থ করুন। আমরা যে সমবেত হইয়াছি ইহা যেন নাট্যাভিনয়ের মত না হয়।

অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে বিদায় গ্রহণ

করিবার পূর্ব্বে আমি আন্তরিক কামনা করি, ব্রাহ্মণসমাজের কুম্ভকর্ণের ন্যায় এই দীর্ঘনিদ্রা ত্বরায় ভাঙ্গুক। যুবকগণ, অক্লান্ত থাকিয়া এই নবজাগরণের সূচনা করুন।

আন্তরিক আশা করি, এই সমিতি সর্ব্ববিষয়ে স্বশ্রেণীর মুখ উজ্জ্বল রাখুন ও আন্তরিক প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান্ অমোঘ কৃপাকটাক্ষে এই বার্দ্ধক্যজীর্ণ মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ-সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া নবোৎসাহে স্বকর্ত্তব্যপালন করিতে সমর্থ করুন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

লক্ষ্মণ-চরিত—শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত বি এ, প্রণীত, প্রকাশক শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত। মূল্য ।৵০ আনা, ডবল ক্রাউন ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

পুস্তকখানি পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-চরিত বাস্তবিকই মহামুনি বাল্মীকির অদ্ভুত বিশ্লেষণ। ভাবরাজ্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন চরিত্র মহর্ষি ব্যতীত কেহ এ পর্য্যন্ত চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না জানি না। আদর্শের প্রতি, ইষ্টের প্রতি কিরূপ দেহাভিমানশূন্য ভালবাসা সাধককে সর্ব্বশেষে পূর্ণত্যাগীতে পরিণত করে তাহাই লক্ষ্মণ চরিত্রে মহর্ষি দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণের বাল্য-চরিত্রে আমরা উক্ত ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাই এবং সেই ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁহাকে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' শেষে স্বীয় ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রকেও—যাঁহাকে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই, ত্যাগ করিতে সক্ষম করিয়াছিল। এই মূল সূত্রটীর সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়াই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেইজন্য গ্রন্থকার লক্ষ্মণের শৈশবের, যৌবনের এবং বনবাসান্তর অযোধ্যা-জীবনের দুই চারিটী করিয়া ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টায় তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে লক্ষ্মণ-চরিত্র যেরূপ সুন্দর ত্যাগোদ্দীপক তাহাতে শুধু আমাদের কেন, যিনিই

এই পুস্তক পাঠ করিবেন তাঁহারই মনে হইবে গ্রন্থকার যদি চরিত্র-বিশ্লেষণের দিকে অত ঝোঁক না দিয়া লক্ষ্মণ চরিত্রের আরও দুই চারিটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া চরিত্র স্ফুটনের দিকে নজর দিতেন তাহা হইলে গ্রন্থখানি আরও সুখ-পাঠ্য হইত। সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই পুস্তকের ভাষা অতি সুললিত এবং সুসংস্কৃত হইলেও উহা যদি কথঞ্চিৎ সমাস এবং সন্ধিহীন হইয়া বালকবালিকাগণেরও উপযুক্ত হইত তাহা হইলে পুস্তকখানি আরও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইত। কারণ আজকাল আমরা দেখিতে পাই, বালকবালিকাগণ কৃত্তিবাস, কাশিরাম দাস প্রভৃতির পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, সুভদ্রাদি চরিত্র পাঠ করিতে ভালবাসে না কিন্তু চরিত্রগুলি তাহাদিগকে যে মুগ্ধ করে না এরূপ নহে। আমরা কিন্তু চাই বালক বালিকাগণ ঐ চরিত্র সকল পাঠ করিয়া, তাহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিণত বয়সে তাঁহাদের ন্যায়ই আদর্শ পুরুষ বা রমণীতে পরিণত হউক। এরূপ ক্ষেত্রে রুচি বদলাইয়া যাওয়ার জন্য আক্ষেপ না করিয়া তাহাদেরই রুচি অনুযায়ী ভাষায় লিখিয়া চরিত্রগুলি তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। যাহা হউক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি কাহারও হৃদয়ে লক্ষ্মণের ন্যায় একনিষ্ঠ ত্যাগী হইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে গ্রন্থকারের সকল শ্রম সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

উপাসনা-তত্ত্ব—'অর্থাৎ হিন্দু উপাসকগণের অনুষ্ঠেয় তথ্য নির্ণয়'। শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বৰ্দ্ধমান, দাইহাট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ১ টাকা।

আধুনিক বঙ্গদেশের প্রচলিত পূজা, অর্চ্চা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পদ্ধতির আলোচনা করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী বা উপাসনা পদ্ধতিই বঙ্গদেশের সকল প্রকার অনুষ্ঠানাদিকেই অনুপ্রাণিত করিয়া রহিয়াছে এবং এমন কি, সমগ্র বঙ্গদেশকে একরূপ তন্ত্র-প্রধান দেশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তন্ত্র নামটী কতকগুলি

অপধর্মী, কদাচারী সম্প্রদায়বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় উহা অনেকের মনে বিজাতীয় ভাব আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র যে বাস্তবিকই ঐ সকল কদাচারিগণের সমর্থনকারী নহে—ঐ সকল অসৎব্যক্তিগণ আপনাদিগের অসৎ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই যে তন্ত্রোপদেশ সমূহের কুঅর্থ করিয়া আপনাদের কাজে লাগাইতেছে এবং তন্ত্রোপদিষ্ট সাধন সহায়েও যে বেদ এবং উপনিষদ্ লক্ষিত পরমপদ পাওয়া যায় এই সকল বিষয় পুস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে। তন্ত্র যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের মস্তকোত্থিত নহে, উহা যে প্রাচীন বেদবিহিত উপাসনাপদ্ধতিরই ক্রমবিকাশ এবং মূলতঃ বেদোপদেশের সহিত তন্ত্রোপদেশের যে কোনও পার্থক্যই নাই তাহাও নানাবিধ প্রমাণোল্লেখের দ্বারা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকারের এই সকল অভিমতের সহিত আমরাও একমত। পুস্তখানির একটী বিশেষ বিশেষত্ব এই যে উহা অতি সরল এবং সুবোধ্য ভাষায় লিখিত। আশা করি পুস্তকখানি পাঠে বহু সাধক আপনাদের সাধনতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় অভীষ্টের প্রতি সমধিক নিষ্ঠাসম্পন্নই হইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

বঙ্গে বস্ত্র-সঙ্কট।

আবেদন।

বস্ত্রের জন্য ভারতবাসীকে মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্য সওদাগরী জাহাজসমূহ যুদ্ধের কার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় আমদানীকারী জাহাজের অভাববশতঃ এদেশে বস্ত্র আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই আজকাল বস্ত্র এইরূপ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধ এইরূপ আরও কিছুদিন চলিলে বস্ত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। বস্ত্র মহার্ঘ্য হওয়ায় ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশবাসীকেই সমধিক দুরবস্থায়

পতিত হইতে হইয়াছে। কারণ বঙ্গের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই মিলে প্রস্তুত বস্ত্র পরিধেয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

কিন্তু শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক বঙ্গবাসী দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত। ইহারা চিরকালই নিজেদের অন্নের ব্যবস্থা অতি কষ্টেই সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মহার্ঘ্যের দিন প্রায় সকল নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ তাহাদের আয় পূর্ব্ববৎ স্বল্পই থাকায় তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের সংস্থান তাহারা এখনও কোনরূপে করিতেছে, কিন্তু আচ্ছাদন ক্রয় করিবার জন্য আর আয়ের কড়িতে কুলাইতেছে না। অথচ বস্ত্র না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, ও জন-সমাজে বাস করা চলে না। উক্ত কারণের জন্যই বর্ত্তমান বস্ত্রাভাব দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরেই প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

বস্ত্রাভাববশতঃ লোকের এরূপ কষ্ট হইতেছে যে, অনেককেই ছেঁড়াকাঁথা, ছেঁড়া মশারি, চট ইত্যাদি পরিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। দুই এক স্থলে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত হীন-অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দুই চারি জন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে—রাস্তা ঘাটে একাকী পাইলে বস্ত্র কাড়িয়া লওয়া ত আছেই। বহু ভদ্রগৃহস্থ পরিবারের এইরূপ দুরবস্থাও হইয়াছে যে, সমগ্র পরিবারের হয় ত একখানি কি দুইখানি গোটা কাপড় আছে উহা কেবল পুরুষেরাই কার্য্যান্তরে যাইবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে—একেবারে দুই তিন জনকে বাহিরে যাইতে হইলে বস্ত্রে কুলায় না। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁহাদিগকে ২৪ঘণ্টা ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি পরিয়া, একরূপ বিবস্ত্রা হইয়াই অন্তঃপুরের মধ্যেই থাকিতে হয়। হঠাৎ কোন পুরুষমানুষ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবস্ত্রা অবস্থায় তাঁহাদের না দেখিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়! এইরূপ সংবাদ আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি এবং সংবাদপত্রাদির স্তম্ভে প্রকাশিত হইতেছে। সাধারণেরও বোধ হয় এই সকল

সংবাদ অবিদিত নাই। আমরা নিজেরাও এই সকল সংবাদের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য জেলায় জেলায় খবর লইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংবাদই আসিয়াছে।

এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আমরা সাধারণের হইয়াই দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গবাসীর সেবায় অগ্রসর হইব স্থির করিয়াছি। ভারতবাসী আবহমানকাল জাতি ও দেশ নির্ব্বিশেষে দুঃস্থের ও অভাবগ্রস্তের সেবা করিয়া আসিয়াছে। ইহাই ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। আজ কি তাঁহারা স্বীয় দেশবাসীর দুঃখের দিনে সেই সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইবেন? দেশবাসীর দুঃখে কি তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিবে না?

ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বরাজ হুকুমচাঁদ নামক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সহৃদয়তায় মিশনের হস্তে ১৭০ জোড়া নূতন বস্ত্র আসায় আমরা তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। যথা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা), ধপতারা (ঢাকা), গুটিয়া (বরিশাল), মহেশপুর (যশোহর), পাকুরা (ময়মনসিং), বাঁকুড়া, কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া), গড়বেতা (মেদিনীপুর), দ্বারহাটা (হুগলী) শিলচর,(কাছাড়), এবং বেলুড় (হাওড়া)। ভবিষ্যতে অন্যান্য স্থানেও সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। এখন এই ব্রত উদ্‌যাপনের ভার সাধারণের উপর।

সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই, অভাব যেরূপ সর্ব্বব্যাপী ও ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি আশু সাহায্য দানে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। সেই জন্য আমরা সকলের নিকট হইতেই নূতন বা পুরাতন বস্ত্র বা অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে সক্ষম তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও স্বীকৃত হইবে। সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার, কলিকাতা; অথবা প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ, হাওড়া।

(স্বাঃ) সারদানন্দ,
সেক্রেটারী, — শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।
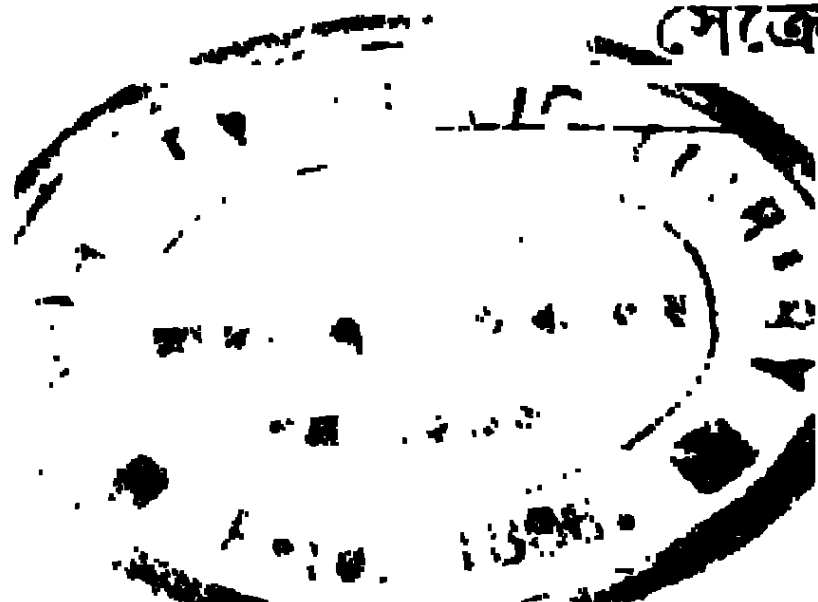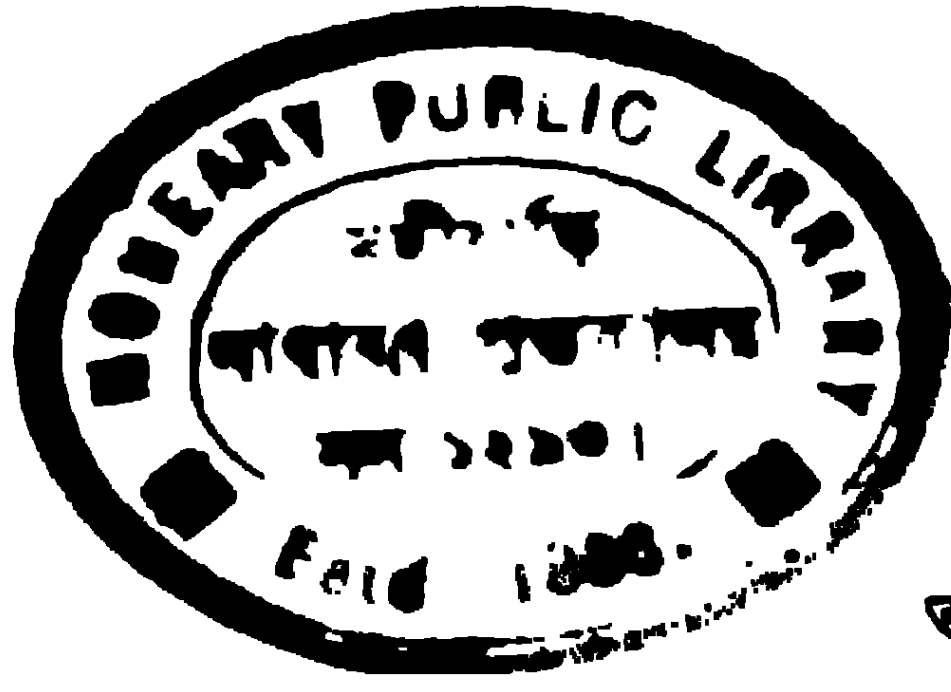
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(৬)

(স্বামী সারদানন্দ)

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাহার গলার সংযোগ স্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন নানারূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাঁহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণ সাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে, এখন ঐ বিষয় আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না, এবং উহাতে তাঁহার অপার করুণার কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর

পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোন নূতন লোক আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম না করে তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের—বিশেষতঃ যুবক ভক্তদিগের মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল এবং ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার পূর্ব্বজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা স্মরণ পূর্ব্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিলেন। আবার নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্যকৃতকর্ম্মের জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারূপ যে মতবাদ খৃষ্টান বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন।

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'চেষ্টা করিতেছ কর, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে—কারণ, উনি (ঠাকুর) যে, ঐ জন্যই দেহধারণ করিয়াছেন।' ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ অপরিচিত, লোক সকলকে নিষেধ করিতে পারিলেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তি সকলকে নিবারণ করা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তি সকলকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

ঐরূপ নিয়ম লইয়া একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিশ চন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্ম্মমূলক নাটক বিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল তাহার অভিনয়দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐ দিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ বন্দনা

করিবার সৌভাগ্যেরও অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং আর এক দিবস তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশ চন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করায় দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে' তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইবে একথায় আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাঁহার মনে কোনও রূপ দ্বিধা বা ভয় আসিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় হাট কোটে সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলী দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা পূর্ব্বক তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই চারিটি তত্ত্ব কথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক কালীপদর সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদর উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং তাঁহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও এক বিষয়ে তাহাদিগের মনের গতি বিপদ সঙ্কুল বিপরীত পথে যাইবার সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছিল। কঠোর ত্যাগ এবং কষ্টসাধ্য সংযমের আদর্শ অপেক্ষা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসই তাহাদিগের নিকটে এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক উদিত না হইলে ঐ প্রকার ভাবোচ্ছ্বাসসকল ধর্ম্মমূলক হইলেও যে, মানবকে কাম ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার সামর্থ্য দিতে পারে না একথা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না। ঐরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম সহজ বা সুখসাধ্য পথ ও বিষয়কে অবলম্বন করিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ প্রকৃতি। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়াও সে ঐজন্য সংসার ও ঈশ্বর—ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগ্যবান কোন কোন ব্যক্তিই তদুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া ছাঁটিয়া অনেকটা কমাইয়া না আনিলে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব, একথা বুঝিয়া ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরূপে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শেরদিকে এতটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া বসে। ঠাকুর ঐজন্য কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন সে ঐরূপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং ঐরূপ করিয়াছে বুঝিলে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন। ঐজন্যই দেখা যাইত অধিকারীভেদে তাঁহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হইতেছে, অথবা তাঁহার গৃহী ও যুবকভক্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। ঐজন্যই আবার, সর্ব্ব-

সাধারণকে উপদেশ দিবার কালে তিনি বলিতেন, 'কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন ও নারদীয়ভক্তি।' সাধারণের মধ্যে তখন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চর্চ্চা এতটা লুপ্ত হইয়াছিল যে, 'নারদীয় ভক্তি' কথার অর্থও শতের মধ্যে একজন বুঝিত কি না সন্দেহ। উহাতেও যে, ঈশ্বর প্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে একথা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইত না। সুতরাং ঠাকুরের অনভিজ্ঞ ভক্তগণ যে দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে, সময়ে সংসার ও ধর্ম্ম উভয় বজায় রাখিবার ভ্রমে পতিত হইবেন না এবং সুখসাধ্য ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই ধর্ম্মলাভের চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইবেন না একথা বলা যায় না।

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্যাদি আমরা তাঁহার নিকটে যাইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার অলৌকিক ভাবুকতা কোন্ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে না পাওয়া ভক্তগণের ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যখন গিরিশ চন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া স্থির ধারণা পূর্ব্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সম্মুখে ঐকথা হাঁকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা ইতিপূর্ব্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহারা সকলে তাঁহার নিষেধ মানিয়া ঐ বিষয় প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল—কারণ ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার দেহরক্ষার অনতিকাল পূর্ব্বেই বহুলোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতে পারিবে। গিরিশ চন্দ্রের মনের গঠন অন্যরূপ ছিল, তিনি দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম যাহা কিছু করিতেন আজীবন কখনও লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনাবলীপূর্ণ বিচিত্র জীবন এবং প্রাণের অসীম উৎসাহ ও বিশ্বাসই যে, তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনন্ত প্রভাবের কথা বুঝাইয়া তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে একথা ভুলিয়া যাইয়া তিনি

স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার জন্য সকলকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে আন্তরিকতার পরিবর্ত্তে লোকে মুখে বকলমা দিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া সাধন, ভজন, ত্যাগ ও তপস্যাদির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভ ব্যাপারটাকে সুখসাধ্য করিয়া লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশ চন্দ্রের অসীম ভালবাসা ঐরূপে ঐবিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, যুগযুগান্তের গ্লানি দূর পূর্ব্বক অভিনব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য যাঁহার দেহধারণ এবং ত্রিতাপে তাপিত জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্যই যিনি জন্মজরাদি দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, অভীষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহাবসান কখন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক লোকে তাঁহার ন্যায় শান্তি ও দিব্যোল্লাসের অধিকারী হইবে বলিয়া তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দূষণীয় কিছুই নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রখর বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সম্মুখে রামচন্দ্র প্রমুখ অনেক প্রবীণ গৃহীভক্তের বুদ্ধি তখন ভাসিয়া গিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি রামচন্দ্র বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং দিব্যশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু গিরিশ চন্দ্রের প্রচারের পূর্ব্বে তিনি উহা অনেকটা রাখিয়া ঢাকিয়া লোক সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। এখন গিরিশ চন্দ্রের সহায়তা পাইয়া তাঁহার উৎসাহ ঐ বিষয়ে সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি এখন ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণাবতারে কে কোন্ সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তদ্বিষয়ের জল্পনাও করিতে লাগিলেন এবং বলা বাহুল্য, ভাবুকতার সাময়িক উচ্ছ্বাসে যাহাদিগের এখন শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইতেছিল তাহারা তৎকৃত সিদ্ধান্তে উচ্চস্থান লাভ করিতে থাকিল।

ঠাকুরের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তগণের অনেকে যখন ঐরূপে ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিতেছিল তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও তিনি (বিজয়) তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছিলেন*—অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় ফলদ হইয়াছিল। ঐরূপে নানাপ্রকারে ভাবুকতার বৃদ্ধিতে ভক্তগণের মধ্যে পাঁচ সাত জনের তখন ভজন সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র বাহ্য সংজ্ঞার আংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছিল এবং অনেকেই সহজ বুদ্ধি ও জ্ঞান বিচারের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুরের দৈবশক্তি প্রভাবে কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছিল।

ঐরূপে ভাবুকতার বৃদ্ধিই যখন ধর্ম্মের চূড়ান্ত বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইতেছিল তখন ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠাদির তুলনায় উহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু এবং উহার নির্বাধ প্রশ্রয়ে ভবিষ্যতে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে—একথা ঠাকুর যাঁহাকে ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন সর্ব্বদা প্রদান করিতেন সেই সূক্ষ্মদর্শী নরেন্দ্র নাথের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি ঐবিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তগণের ঐরূপে বিপথে যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুর নিশ্চেষ্ট ছিলেন কেন? উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই, তাহাকে ঈশ্বরলাভের অন্যতম পথ জানিয়া ঐসকল ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঐপথের যথার্থ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ঐ পথে চালিত করিবার সময় ও সুযোগ

* গুরুভাব (উত্তরার্দ্ধ) ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

অন্বেষণ করিতেছিলেন—কারণ তাঁহাকে আমরা বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, 'ইচ্ছা করিলেই সহসা কোন বিষয় সংসিদ্ধ হয় না, কালে হইয়া থাকে,' অথবা ঐ বিষয়ের সিদ্ধি উপযুক্ত কালের আগমন প্রতীক্ষা করে। হইতেও পারে, ভক্তগণের ঐ ভ্রম দূর করিতে নরেন্দ্র নাথকে বদ্ধ পরিকর দেখিয়া ঠাকুর উহার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন, অথবা নরেন্দ্রনাথকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঐ বিষয় সংসিদ্ধ করাই তাঁহার অভীপ্সিত ছিল।

দৃঢ়বদ্ধ শরীর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মন বিশিষ্ট ঠাকুরের যুবক ভক্তমণ্ডলীই তাঁহার কথা সহজে ধরিতে বুঝিতে পারিবে ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ নানা যুক্তিতর্ক সহায়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা বলিতে লাগিলেন, যে ভাবোচ্ছ্বাস মানবজীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কামকাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি যথা অশ্রু পুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্য সংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও তাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রসূত। মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র বলিতেন, "ঐরূপ অঙ্গবিকার এবং বাহ্য সংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশির প্রবলতায় উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া ঐরূপ সংযমের বাঁধকেও অতিক্রম পূর্ব্বক অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপ রূপে প্রকাশিত হয়। নির্বোধ মানব ঐকথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বসে। সে মনে করে ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য ঐ সকল যাহাতে

তাহার শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐরূপে স্বেচ্ছা প্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহার স্নায়ু সকল দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিকৃতি সকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশীজন জুয়াচোর, এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচ জন মাত্র পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়া থাকে। অতএব সাবধান।"

নরেন্দ্র নাথের পূর্ব্বোক্ত কথা সকল সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে ঘটনা চক্রে যখন জানিতে পারা গেল নির্জ্জনে বসিয়া ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অনুরূপ অঙ্গবিকৃতি সকল আনয়নের জন্য জনৈক চেষ্টা করিয়া থাকে—ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক বিলোপ হইলে অপর জনৈক যেরূপ মধুর নৃত্য করে সেইরূপ নৃত্য সে পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিল—এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্পকাল পরে অপর এক ব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহার (নরেন্দ্র নাথের) কথার সত্যতা আমাদিগের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আবার, জনৈকের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে দেখিয়া যেদিন তিনি তাহাকে বিরলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ভাবসংযম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল ঐরূপ করিবার ফলে সে যখন অনেকটা সুস্থ ও সংযত হইতে পারিল তখন নরেন্দ্র নাথের কথায় অনেকে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের ন্যায় ভাবাবেশে অঙ্গবিকৃতি ও বাহ্যসংজ্ঞাবিলুপ্তি হয় নাই বলিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবান বলিয়া আর ধারণা করিতে পারিল না।

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ঐবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতার সন্ধান পাইলে ঐ বিষয় লইয়া সকলের সমক্ষে ব্যঙ্গ পরিহাসে তাহাকে সময়ে সময়ে

বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার পুরুষের স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ যথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত সখীভাবাদি সাধনাভ্যাস কখন কখন কিরূপ হাস্যাস্পদ আকার ধারণ করে তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে কখন কখন হাস্যের রোল তুলিতেন এবং আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঐরূপ ভাবপ্রবণতা ছিল তাঁহাদিগকে সখীশ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেন। ফল কথা, ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নিজ পুরুষকার, তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্তি, ওজস্বীতাদি বিসর্জ্জন দিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ, বৈষ্ণবপদাবলী ও রোদন মাত্র অবলম্বন করিবে ইহা—পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না—তজ্জন্য ঠাকুরের পুরুষ ভাবাশ্রয়ী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদিগকে 'শিবের ভূত অথবা দানাশ্রেণীভুক্ত' বলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেন এবং তদ্বিপরীত সকলকে পূর্ব্বোক্তরূপে 'সখী শ্রেণীভুক্ত' বলিতেন।

ঐরূপে যুক্তিতর্কে এবং ব্যঙ্গ পরিহাস সহায়ে ভাবুকতার গণ্ডী ভগ্ন করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন নাই। কাহারও কোনরূপ ভাব ভঙ্গ করিয়া তাহার স্থলে অবলম্বনস্বরূপে অন্য ভাব যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় ততক্ষণ প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন ও ফলদ হয় না—একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং তজ্জন্য ঐবিষয়ে এখন হইতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবসরকালে যুবকভক্ত-সকলকে দলবদ্ধ করিয়া তিনি সংসারের অনিত্যতা বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরভক্তিমূলক সঙ্গীত সকল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ বৈরাগ্য এবং ভক্তি ভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া অনেকে তখন তাঁহার, মধুর স্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত 'কেয়া দেলুমান তামিল পেয়ারা আখের মাট্টিমে মিল যানা'—অথবা 'জীবন মধুময় তব নাম গানে, হয় হে অমৃতসিন্ধু চিদানন্দ ঘন হে' অথবা,

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং
ন চ ব্যোম ভূমির্ণতেজোনবায়ু
চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্—

প্রভৃতি সঙ্গীত ও স্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের উত্তেজনায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন! ঠাকুরের জীবনের গভীর ঈশ্বরানুরাগ প্রসূত সাধন কথা সকল বিবৃত করিয়া কখন বা তিনি তাহাদিগকে তাঁহার মহিমা জ্ঞাপনে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 'ঈশানুসরণ' গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, 'প্রভুকে যে যথার্থ ভালবাসিবে তাহার জীবন সর্ব্বতোভাবে শ্রীপ্রভুর জীবনের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে, নিশ্চয়—অতএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসি কি না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে।' আবার 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর'—ঠাকুরের ঐকথা তাহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহার সকল প্রকার ভাবুকতা ঐ জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে—অতএব ঐজ্ঞান যাহাতে সর্ব্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

নূতন তত্ত্বসকলের পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণে তিনি তাহাদিগকে অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে আপনার ও অপরের শারীরিক ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে, ঐকথা শুনিয়া তিনি একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত করিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দূর করিবার মানসে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপ আবার অযুক্তিকর বিষয় সকল হইতে ভক্তগণ যাহাতে দূরে অবস্থান করে তদ্বিষয়েও তিনি সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রাস্তার সহিত সংযুক্ত

হইয়াছে তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর বাটি ছিল। নানা সদ্‌গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্ত্তী-মহাশয় লোকমান্যের জন্য নিরন্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্য পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিসে লোকে তাঁহাকে ধনী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণশালী বলিবে এই ভাবনা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকটে হাস্যাস্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'প্রাচ্য-আর্য্য শিক্ষা-পরিষৎ', তাঁহার এক মাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'মৃগাঙ্কমৌলী পূততুণ্ডী", বাটিতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'কপিঞ্জল'—কারণ, তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোট খাট সরল নাম রাখা কি শোভা পায়? তাহার ইংরাজী, সংস্কৃত নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্র নাথের সহিত তাঁহার বাটিতে যাইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনি এত গ্রন্থ সব পড়িয়াছেন?' উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যাস্থিত কতকগুলি গ্রন্থ বাহির করিয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'কি জান ভায়া লোকে আমার পড়া পুস্তকগুলি লইয়া যাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তাহার স্থলে এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিয়া রাখিয়াছি, এখন আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দি না।' নরেন্দ্র নাথ কিন্তু স্বল্প দিনেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত যাবতীয় পুস্তকেরই পাতা কাটা নাই! সুতরাং ঐসকল গ্রন্থ যে তিনি কেবলমাত্র লোকমান্য লাভ ও গৃহশোভা বর্দ্ধনের জন্য রাখিয়াছেন তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রের একরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল।

আমাদিগের সহিত আলাপ হইবার কালে ধর্ম্মসাধনার কথা-

প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞান মার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী ভক্ত সকলের ঠাকুরের নিকটে যাইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং কোন কোন পর্ব্বদিবসে পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, রুদ্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণ পূর্ব্বক আড়ম্বর করিয়া সাধনায় বসিতেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাঘ্রাজীন খানি ঠাকুরের ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'এক আঁচড়েই' চিনিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, ঐ ব্যাঘ্রাজীনখানি কাহার একথা আমাদিগের একজন' এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, 'ওখানি মহিম চক্রবর্ত্তী রাখিয়া গিয়াছে, কেন জান? লোকে উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ওখানি কার এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণা করিবে মহিম চক্রবর্ত্তী একটা মস্ত সাধক।'

দীক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠিলে মহিম বাবু কখন বলিতেন 'আমার গুরুদেবের নাম আগমাচার্য্য ডমরুবল্লভ' আবার কখন বলিতেন, ঠাকুরের ন্যায় তিনিও পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত তোতাপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। 'পশ্চিমে তীর্থ পর্য্যটন কালে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম এবং দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ঠাকুরকে তিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং আমাকে জ্ঞান মার্গের সাধক হইয়া সংসারে থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন'। বলা বাহুল্য ঐকথা কতদূর সত্য তাহা তিনি স্বয়ং এবং সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষই জানিতেন।

সাধনার মধ্যে দেখা যাইত মহিম বাবু যখন তখন এবং যেখানে সেখানে একতারার সুরের সহিত গলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, মধ্যে মধ্যে এক আধটি উত্তরগীতাদি পুস্তকের শ্লোক পাঠ ও হুঁকার ধ্বনি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাই সনাতন জ্ঞানমার্গের সাধনা, উহা করিলে অন্য কোনও সাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। উহাতেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া

উঠিবে ও ঈশ্বর দর্শন হইবে। মহিম বাবুর বাটিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি বৎসর ৺জগদ্ধাত্রী পূজাও হইত—উহা হইতে অনুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্তসাধনপ্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তখন ইঁহাকে একখানি ছোট বগি গাড়িতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনা যাইত 'তারা তত্ত্বমসি, ত্বমসি তৎ'। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অল্প স্বল্প জমীদারী ছিল, তাহার আয় হইতেই তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু দুই তিন বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের সহিত কুশল প্রশ্নাদি করিবার পরে তিনি সাধারণের নিমিত্ত যে ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে আসিয়া বসিতেন এবং একতারা সংযোগে মন্ত্রসাধনে এবং উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার গৈরিক পরিহিত সুন্দর কান্তি, বিশাল বপু এবং বাক্য ছটায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে তখন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতে থাকিত। ঠাকুরও কখন কখন তাঁহাকে বলিতেন, তুমি পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগকে কিছু উপদেশ দাওগে। কারণ কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা একথা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না।

শ্যামপুকুরে আসিয়া মহিম বাবু এক দিন ঐরূপে নানা কথা কহিতেছেন এবং অন্য সকল প্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়া তাঁহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবক ভক্ত সকলে তাঁহার ঐকথা সকল বিনা প্রতিবাদে শুনিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্র নাথের আর সহ্য হইল না। তিনি বিপরীত তর্ক উত্থাপিত করিয়া মহিম বাবুর কথা অযুক্তিকর দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনার ন্যায় একতারা

বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বর দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার প্রমাণ কি? উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, নাদই ব্রহ্ম ঐ স্বরসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই'। নরেন্দ্র বলিলেন, 'ঈশ্বর আপনার সহিত ঐরূপ লেখা পড়া করিয়াছেন না কি? অথবা ঈশ্বর মন্ত্রৌষধি-বশঃ সর্পের ন্যায়—সুর চড়াইয়া হুম্ হাম্ করিলেই অবশ হইয়া সুড় সুড় করিয়া সম্মুখে নামিয়া আসিবেন'। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্র নাথের তর্কের জন্য মহিম বাবুর প্রচার কার্য্যটা সেদিন বিশেষ জমিল না এবং তিনি ঐ দিবস শীঘ্র শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত যথার্থ সাধক সকলে যাহাতে ঠাকুরের ভক্ত-দিগের নিকটে বিশেষ সম্মান পায় তদ্বিষয়েও নরেন্দ্র নাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে যেরূপে অপর সকলের নিন্দা এবং কেবল মাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাধক সকলকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে, ঐরূপ করিলে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' রূপ মতবাদের উপরে—সুতরাং ঠাকুরের উপরেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে ঐরূপ একটি ঘটনার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে—

প্রভুদয়াল মিশ্র নামক জনৈক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য এক দিন উপস্থিত হইলেন। গেরুয়া পরিহিত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে প্রথমে খৃষ্টান বলিয়া বুঝিতেই পারি নাই। পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি যখন তাঁহার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খৃষ্টান হইয়া গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেবতা রূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে আমার পিতৃপিতামহাগত চাল চলনাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ইষ্টদেবতা রূপে অবলম্বন করিয়া নিত্য যোগাভ্যাস করিয়া থাকি। জাতিভেদে আমার বিশ্বাস না থাকি-

লেও যাহার তাহার হস্তে ভোজনে যোগাভ্যাসের হানি হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিত্য স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাইয়া থাকি। উহার ফলে খৃষ্টান হইলেও যোগাভ্যাসের ফল যথা, জ্যোতিঃ দর্শনাদি আমার একে একে উপস্থিত হইতেছে। ভারতের ঈশ্বর প্রেমিক যোগীরা সনাতন কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং উহাপেক্ষা আমার নিকটে অন্য কোন প্রকার বসন কি প্রিয়-তর হইতে পারে'? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্র নাথ তাঁহার প্রাণের কথা সকল ঐরূপে একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশিষ্ট সাধু ও যোগী বলিয়া জানিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনেকেও উহাতে তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একত্রে ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিল। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ঈশা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঐরূপে নরেন্দ্র নাথ যখন ঠাকুরের ভক্তগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ প্রয়োগে স্বল্লাধিক ফল পাইয়াছিলেন ঐ সকল ঔষধে এখন আর কোন উপকার হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতায় রুদ্ধ দূষিত বায়ুর জন্য ঐরূপ হইতেছে স্থির করিয়া সহরের বাহিরে কোন বাগান বাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরূপ বাগানবাটির অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পূর্ব্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটি ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য

ভাড়া করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীনিবাসী সুরেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটিভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

বাটি স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্যামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইয়া উক্ত বাটিতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিবস পূর্ব্বে অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্যামপুকুরের বাসা চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুরকে কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ধর্ম্ম জিনিষটা কি ?*

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

রেল লাইনের উপর দিয়া একখানা প্রকাণ্ড রেলগাড়ী সশব্দে চলিতেছে—একটা ক্ষুদ্রকীট রেল লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল—গাড়ী আসিতেছে জানিতে পারিয়া সে আস্তে আস্তে রেল লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাচাইল। ঐ ক্ষুদ্র কীটটী যদিও এতই নগণ্য যে, রেলগাড়ীর চাপে যেকোন মুহূর্ত্তে তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা—তথাপি সে একটা জীবন্ত পদার্থ, আর রেলগাড়ীটা এত বৃহৎ, এত প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু উহা একটা যন্ত্রমাত্র, একটা জড় এঞ্জিনমাত্র। আপনারা বলিবেন, একটীর জীবন আছে, আর একটী মৃত জড়মাত্র—উহার যতই শক্তি থাক্, উহার গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক না কেন, উহা মৃত জড় যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর ঐ ক্ষুদ্র কীটটী যে রেলের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং এঞ্জিনের স্পর্শমাত্রই যাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে ঐ প্রকাণ্ড রেল-

* What is Religion নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।

গাড়ীটীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও মহিমাসম্পন্ন। উহা যে সেই অনন্ত স্বরূপেরই একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সেই কারণেই অত শক্তিশালী এঞ্জিন হইতেও উহার শ্রেষ্ঠত্ব। কেন উহার এই শ্রেষ্ঠত্ব হইল? জীবিত প্রাণ সম্পন্ন বস্তু হইতে মৃত জড় পদার্থের পার্থক্য বুঝিতে পারি কিসে? যন্ত্রকর্ত্তা যন্ত্রকে যেরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, উহা সেইটুকু মাত্র কার্য্যই সম্পাদন করে, উহার কার্য্যগুলি জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় নহে। তবে জীবিত ও মৃতের ভিতর কিরূপে প্রভেদ করা যাইবে? জীবিত প্রাণীর ভিতর স্বাধীনতা আছে, তাহার জ্ঞান আছে, আর মৃত জড় বস্তুর ভিতর স্বাধীনতা নাই, কারণ, তাহার জ্ঞান নাই, উহা কতকগুলি জড় নিয়মের গণ্ডীতে বদ্ধ। এই যে স্বাধীনতা, যাহা থাকাতে কেবল যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব—সেই স্বাধীনতা পূর্ণভাবে লাভের জন্যই আমরা সকলে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের যত প্রকার চেষ্টা আছে, তাহাদের সকল গুলিরই উদ্দেশ্য—কিসে আমরা অধিকতর স্বাধীন হইব; কারণ, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইলেই কেবল আমরা পূর্ণত্ব পাইতে পারি। আমরা জানি বা না জানি, স্বাধীনতা লাভ করিবার এই চেষ্টাই সর্ব্বপ্রকার উপাসনাপ্রণালীর ভিত্তি।

জগতে যত প্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, সেইগুলিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা দেখিব, অতি অসভ্যজাতিসকল ভূতপ্রেতাদির উপাসনা করিয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, সর্পপূজা, জাতীয় দেববিশেষের উপাসনা—এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে? কারণ লোকে যেরূপেই হউক এইটী বুঝিয়া থাকে যে, উক্ত দেবাদি পুরুষগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী এবং তাহারা আমাদের স্বাধীনতায় বাধা দিতেছে। সেই জন্য উাহারা এই সকল পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহারা তাহাকে কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহারা অধিকতর স্বাধীনতালাভ করিতে পারে। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষের পূজা করিয়া,

তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের বরস্বরূপ নানাবিধ কাম্যবস্তু লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করে। যেগুলিকে মানুষের নিজ পুরুষকার সহায়ে উপার্জ্জন করা উচিত, সেইগুলিকেই তাঁহারা দেবতার অনুগ্রহবলে লাভ করিতে চাহে!

যাহা হউক, মোটের উপর এই সকল উপাসনাপ্রণালীর আলোচনায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপারের আশা করিতেছে। এই আশা আমাদিগকে একেবারে কখনই পরিত্যাগ করে না, আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা সকলেই অদ্ভুত আজগুবির দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছি। জীবনের অর্থ ও উহার রহস্যের অবিরাম অনুসন্ধান ছাড়া আমাদের মন বলিতে আর কি বুঝায়? আমরা বলিতে পারি, অশিক্ষিত লোকেই এই আজগুবির অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে, এ প্রশ্নের হাত ত আমরা সহজে এড়াইতে পারিব না। বাইবেলে দেখা যায় সমগ্র য়াহুদী জগত যীশুখ্রীষ্টের নিকট নিদর্শন স্বরূপ একটা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। কিন্তু শুধু য়াহুদীরা কেন, সমগ্র জগৎই যে হাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিবারই প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছে। আবার দেখুন. সমগ্র জগতে সকলেরই ভিতর একটা অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটা আদর্শ ধরিলাম, জীবনের একটা লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু উহার দিকে অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথ পঁহুছিতে না পঁহুছিতে নূতন একটা আদর্শ ধরিয়া বসিলাম। নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তার পর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সময়ে সময়ে আমাদের এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি এই অসন্তোষের শান্তি না হয়, তবে আমাদের এই সকল মানসিক চেষ্টা সমূহের পরিণাম কোথায়? এই সর্ব্বজনীন অসন্তোষের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, স্বাধীনতা লাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য—যতদিন না সে এই স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, ততদিন কিছুতেই

তাহার অসন্তোষ দূর হইবার নহে। মানব সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অনুসন্ধান করিতেছে, মানবের সমগ্র জীবনটাই এই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া থাকে। জন্মিবা মাত্রই যে শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে, উহার অর্থ আর কিছুই নহে—সে জন্মাইয়াই দেখে, সে নানা অবস্থাচক্রে বদ্ধ—তাই সে যেন ক্রন্দন করিয়া উক্তাবস্থার প্রতিবাদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। মানবের এই স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হইতেই তাহার এই ধারণা জন্মিয়া থাকে—এমন একজন পুরুষ অবশ্যই আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্তস্বভাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরধারণা মানবমনের স্বভাবসিদ্ধ। বেদান্তে মানবমনের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সর্ব্বোচ্চ ধারণাকে সচ্চিদানন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা চিদ্‌ঘন ও স্বভাবতঃই আনন্দঘনস্বরূপ। আমরা অনেক দিন ধরিয়া ঐ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমাদের অভ্যন্তরীণ বাণীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, আমরা নিয়মের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ মানবস্বভাবসুলভ সহজ সংস্কার প্রকৃতির নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। আমরা ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের নিম্নস্তরের মনের সঙ্গে উচ্চতর মনের সংগ্রাম চলিয়াছে আর এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার সংঘর্ষে নিজের একটা পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, যাহাকে আমরা আমাদের আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলি, তাহাকে বজায় রাখিবার একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়।

এমন কি, নরকের অস্তিত্বও যে মানুষ কল্পনা করিয়াছে, তাহাতে এই অদ্ভুত ব্যাপারটী দেখা যায় যে, আমরা জন্ম হইতেই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি—আমাদিগকে জন্মমাত্রই নানারূপ নিয়মে বাঁধিতে চেষ্টা করে—আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া

বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়মে আমরা চলিব না'। যখনই আমরা জন্মাই, জীবন প্রবাহের প্রথম আবির্ভাবেই, জীবনের প্রথম ঘটনাই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। যতদিন আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন আমরা যন্ত্রের মত—ততদিন জগৎপ্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে—উহার শৃঙ্খল আমরা ভগ্ন করিতে পারি না। নিয়মই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া যায়। কিন্তু যখনই আমাদের ভিতর প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙ্গিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা হয়, তখনই উচ্চস্তরে জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মুক্তি—স্বাধীনতা—আত্মার অন্তস্তল হইতে সদা সর্ব্বদা এই সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কিন্তু হায়, অনন্ত নিয়তিচক্রে সে বদ্ধ-প্রকৃতির শত-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এই যে নাগপূজা—ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সাধনা সহায়ে—অতিপ্রাকৃতিক শক্তিলাভের চেষ্টা দেখা যায়, এগুলির অর্থ কি ? কোন বস্তুতে জীবনীশক্তি রহিয়াছে, উহার ভিতর একটা যথার্থ সত্তা আছে,—একথা আমরা কেন বলি ? অবশ্য এই সকল অনুসন্ধানের ভিতর, জীবনীশক্তিকে বুঝিবার, যথার্থ সত্তাকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার ভিতরে নিশ্চিতই একটা অর্থ আছে। উহা কখন নিরর্থক, উহা কখন বৃথা হইতে পারে না। ঐগুলি মানবের মুক্তি-লাভের—পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রতিনিয়ত চেষ্টারই ফলমাত্র। আমরা যে বিদ্যাকে বিজ্ঞানশাস্ত্র নামে অভিহিত করি, তাহা এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকেই সদাই এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির ভিতর ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। উহার ভিতর নিয়ম—কেবল নিয়ম, কিন্তু তথাপি মুক্তির ঐ চেষ্টা চলিয়াছে। বিশাল সূর্য্যমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পরমাণুটী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রকৃতিরই নিয়মাধীন—এমন কি মানবের পর্য্যন্ত স্বাধীনতা নাই। কিন্তু আমরা একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা অনাদিকাল হইতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলির আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মানুষ

আমরাও যে নিয়মের অধীন—একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, বিশ্বাস করিতে চাহি না—কারণ, আমাদের আত্মার অন্তস্তল হইতে প্রতিনিয়ত মুক্তি! মুক্তি! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! এই অনন্ত সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। মানুষ যখন নিত্যমুক্ত পুরুষস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণা লাভ করিয়াছে, তখন সে অনন্তকালের জন্য এই বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া শান্তি পাইতে পারে না। মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা যদি তাহার নিজের জন্য না হইত, তবে সে ইহা এক অতি কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। মানব নিজের দিকে তাকাইয়া বলিয়া থাকে, 'আমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ক্রীতদাসস্বরূপ, আমি বদ্ধ; তাহা হইলেও একজন এমন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নহেন—যিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু।' সুতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন আমার মনের অচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ, ঈশ্বরধারণাও তদ্রূপ আমাদের প্রকৃতিগত, আমাদের মনের অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। এই স্বাধীনতার ভাব হইতে উভয়টীই আসিয়াছে। এমন কি, এই স্বাধীনতার ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতর পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না। উদ্ভিদে অথবা কীটের ভিতর ঐ জীবনীশক্তি বিকশিত হইয়া ব্যষ্টিগত ভাবে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞাতসারে ঐ মুক্তির চেষ্টা উহাদের ভিতর কার্য্য করিতেছে—উদ্ভিদ্ যে জীবনধারণ করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য উহার নিজ বিশেষত্ব, নিজের বিশেষ রূপটীকে, নিজের নিজস্বকে রক্ষা করিবে—ঐ মুক্তির অবিরাম চেষ্টাই উহার ঐ চেষ্টার প্রেরক, প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি যে আমাদের উন্নতির প্রত্যেক সোপানটীকে নিয়মিত করিতেছে, এইরূপ ধারণা করিলে মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাবটীকে একেবারে উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু যেমন আমাদের নিয়মে বদ্ধ জড়জগতের ধারণা চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও চলিয়াছে। 'এই দুই ধারণার ক্রমাগত সংগ্রাম চলিয়াছে। আমরা নানা মতমতান্তরের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্তু বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্যায় বা অস্বাভাবিক

নহে—উহারা থাকিবেই। শৃঙ্খল যতই দীর্ঘ হইতেছে, ততই স্বভাবতঃই দ্বন্দ্বও বাড়িতেছে, কিন্তু যদি আমরা বুঝি যে, আমরা সকলই সেই এক রকম লক্ষ্যে পঁহুছিবারই চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে বিবাদের আর প্রয়োজন থাকে না।

মুক্তি বা স্বাধীনতার এই মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ প্রকৃতির প্রভুকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া থাকি। আপনারা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ আপনারা এই স্বাধীনতার ভাবকে কখন তাড়াইতে পারেন না, ঐ ভাব ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে পারা যায় না। যদি আপনারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তবে কি কখনও এখানে আসিতেন? খুব সম্ভব যে, প্রাণিতত্ত্ববিৎ আসিয়া এই মুক্ত হইবার প্রতিনিয়ত চেষ্টার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেনও। এ সবই মানিলাম, কিন্তু তথাপি ঐ স্বাধীনতার ভাবটা আমাদের ভিতর হইতে যাইতেছে না। যেমন 'আমরা প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির বন্ধন কোনরূপে কাটাইতে পারি না', এই ভাবটা আমাদের ভিতর রহিয়াছে, এই স্বাধীনতার ভাবটাও তদ্রূপ আমাদের মধ্যে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ—সর্ব্বত্র এই দুই দুইটী করিয়া জিনিষ রহিয়াছে। বুঝিতে হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে। একটা যদি সত্য হয়, তবে অপরটাও অবশ্য সত্য হইবে। সর্ব্বত্রই এই মুক্তির ধারণা অবশ্য থাকিবেই। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর যে প্রকার বন্ধনের ধারণা দেখিতে পাই, তাহাকে আমরা মুক্তির চেষ্টা বলিয়া এখন বুঝিতে না পারি, কিন্তু তথাপি ঐ ভাব তাহার ভিতর রহিয়াছে। অশিক্ষিত বর্ব্বর মানবের মনে পাপ ও অপবিত্রতার বন্ধন রূপ ধারণা অতি অল্প, কারণ, তাহার প্রকৃতি পশুস্বভাব হইতে বড় অধিক উন্নত নহে। সে বাহ্য প্রকৃতির বন্ধন হইতে বাহ্যবস্তুসম্ভোগের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু এই নিম্নতর ধারণা হইতে ক্রমে তাহার মনে মানসিক ও নৈতিক বন্ধনের ধারণা

ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে। এখানে আমরা দেখিতে পাই, সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ আবরণ অতিশয় ঘন থাকে এবং সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ একরূপ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা—সেই মুক্তি ও পূর্ণতারূপ উজ্জ্বল অগ্নি—সদা শুদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত ভাবেই বর্ত্তমান থাকে .মানব উহাতেই ব্যক্তিধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা একমাত্র মুক্ত পুরুষ বলিয়া ধারণা করে। সে তখনও জানে না যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড বস্তু—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, ধারণার তারতম্যে।

সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপাসনা স্বরূপ। যেখানেই কোনপ্রকার জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং এই মুক্তিই ঈশ্বরস্বরূপ। এই মুক্তিলাভ হইলে নিশ্চিতই সমগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ হয় আর জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব। আমরা যতই অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হই, ততই আমরা প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারি। আর যতই প্রকৃতি আমার বশীভূত হইতে থাকে, ততই আমরা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, অধিকতর ওজস্বী হইতে থাকি, আর যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু, তাঁহার অবশ্য প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। মুক্তি বা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি অবশ্য থাকিবে আর কেবল যে পুরুষ এইগুলি লাভ করিবেন, তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন।

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল তত্ত্ব পড়া যায়, তাহাদের মূলে পূর্ণ মুক্তি বা স্বাধীনতা হইতে জাত পরমানন্দ ও নিত্যশান্তিরূপ ধর্ম্মের উচ্চতম ধারণা রহিয়াছে। সম্পূর্ণ মুক্তভাবে অবস্থান—কিছুতেই উহাকে বদ্ধ করিতে পারে না—যেখানে প্রকৃতি নাই, কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাতে কোন পরিণাম উৎপাদন করিতে পারে। এই মুক্তভাব আপনার ভিতর

রহিয়াছে, আমার ভিতর রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ স্বাধীনতা।

ঈশ্বর সদাই নিজ মহিমাময় অপরিণামী স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাঁহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার, ধন, নামযশ, মানবীয় প্রেম প্রভৃতি পরিণামী প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। কিন্তু এই যে সমগ্র প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, উহার প্রকাশ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে সূর্য্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নহে।

যেখানে যে কোন বস্তু প্রকাশ পায়, সূর্য্যের আলোকেই হউক বা আমাদের অন্তরাত্মার আলোকেই হউক, উহা তিনিই। তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, ইনি ব্যক্তি নহেন, অথচ সর্ব্বজ্ঞ, প্রকৃতির জ্ঞাতা ও প্রভু, সকলের ঈশ্বর। সকল উপাসনার মূলেই তিনি রহিয়াছেন আর আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তাঁহারই উপাসনা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই। একথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বলি, যাহাকে অশুভ বলে, তাহাও তাঁহার উপাসনা। তাহাও সেই মুক্তিরই একটা দিকমাত্র। শুধু তাহাই নহে—আপনারা হয়ত আমার একথা শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন, ঐ মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষাই প্ররোচক শক্তিরূপে উহার পশ্চাতে রহিয়াছে। উহা হয়ত ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু উহা রহিয়াছে বলিতে হইবে আর পশ্চাতে ঐ মুক্তির ঐ স্বাধীনতার প্রেরণা না থাকিলে কোনরূপ জীবন বা কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় শিক্ষা।

(ভারত বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child, and Christianity, with all her pretensions, only a distant echo.

—Vivekananda.

উপরোক্ত মতটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত স্বামীজির সহিত ঐ বিষয় লইয়া জনৈক পাশ্চাত্য বিদুষীর সহিত যে আলাপন হয় তাহা অগ্রে উদ্ধৃত করিব।

প্রশ্ন—বৌদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজি—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে।

প্রশ্ন—অথবা, ইহা দক্ষিণ ইউরোপে প্রচলিত ছিল বলিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সকলই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত?

স্বামীজি—না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি জাতি বিভাগের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুই বলে নাই। অবশ্য, জাতি বিভাগ তখনও কোন নির্দ্দিষ্টরূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটীকে পুনঃ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—কিন্তু ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের

পূজাপদ্ধতির যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্ম্মে তাহার নাম গন্ধও নাই!

স্বামীজি—নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও Mass আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed Sacrament আমাদের প্রসাদ-স্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে।

প্রশ্ন—কিন্তু ঈশাহী ধর্ম্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?

স্বামীজি—না; আর ঈশাহী ধর্ম্মেও কোন কালে ছিল না। এ ত ছাঁকা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম, এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম মুসলমানের নিকট হইতে সম্ভবতঃ মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরাণ পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এই ভাবটীই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। এমন কি, tonsure পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাষ্টিনিয়ান্ দুই জন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত বিধিনিষেধ করিতেছেন, আমি এইরূপ একখানি চিত্র দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত বৌদ্ধ যুগের প্রাক্কালীন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুইই বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপ নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি থিবেইড হইতে পাইয়াছে।

প্রশ্ন—এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডকে আর্য্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?

স্বামীজি—হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহী ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল

না। আমার ক্রীটদ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন * দেখা অবধি বরাবর এই সন্দেহ! অলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ হয়; এবং উহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্ম্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহী নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জানইত যে, 'কার্য্যকলাপ' এবং 'পত্রাবলী' Acts and Epistles 'জীবনীচতুষ্টয়' (Gospels) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেণ্টজন একটা মিথ্যা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্টপল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই, এবং তিনি নিজে কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বকধার্ম্মিকত্বেরও (Jesuitry) অসদ্ভাব ছিল না—'যেমন করিয়া পার আত্মার উদ্ধার কর'—এইরূপ নহে কি?

রেঁণার ঈশাজীবনী ত শুধু ফেণা। ইহা ষ্ট্রসের কাছে ঘেঁসিতে পারে না, ষ্ট্রসই সাঁচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটী জিনিস

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারত প্রত্যাগমনের পথে নেপল্‌স হইতে পোর্ট সৈয়াদ আসিবার সময় স্বামীজি স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "এই ক্রীটদ্বীপ" এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটী স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত স্বপ্নের মর্ম্ম এই ছিল যে, ঈশাহী ধর্ম্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং তৎসম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটা ইউরোপীয় শব্দ শুনাইল, তাহাদের মধ্যে একটি থেরাপাউটা + (Therapeutae)– এবং বলিল, উভয়ই সংস্কৃত শব্দজ। থেরাপাউটী শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ, ভিক্ষুগণের পুত্রগণ (পিউটা, সংস্কৃত পুত্র শব্দজ)। ইহা হইতে স্বামীজি যেন বুঝিয়া লন, যে ঈশাহী ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের একদল প্রচারক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে. ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এই খানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে।" লেখিকা (নিবেদিতা)

+ It is my own belief that the second word was Essene. But alas, I cannot remember the Sanskrit derivation! N.—Vide, The Master As I saw Him—Historic Christianity—His Dream—P.P. 351 (1910)

জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপপার্শ্ববর্ত্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সুসঙ্গতি! একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। তাহার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসীগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে যাইল, সেই অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়া পালাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোটের উপর আমার মনে হয় বুড়ো হিলেল ঠাকুরই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলীর উদ্ভবকর্ত্তা, আর নাজারীন নামধারী এক বহু প্রাচীন (কিন্তু স্বল্প জানিত) য়াহুদী সম্প্রদায় সহসা সেণ্টপল কর্ত্তক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পূজাস্পদ বস্তু বলিয়া জোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিসটা ত বসন্ত-দাহ (Spring, Cremation) প্রথারই রূপান্তর মাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহ প্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল আর সূর্য্যঘটিত নব উপাখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে রহিত করিয়া থাকিবে।*

এখন Alexandria এবং Palestine এ বর্দ্ধমান Therapeuts (থেরা পুত্ত বা স্থবির পুত্র) এবং Essenes দের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

* Vide Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda by Sister Nivedita, as translated by Swami Madhavananda—'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' পৃঃ ৯৫—১০০।

আলোচনার প্রয়োজন। Renan তাঁহার Life of Jesus নামক গ্রন্থে বলেন যে এই Essene শব্দটী Therapeut শব্দটীর গ্রীক অনুবাদ। † তিন জন প্রাচীন ঐতিহাসিক হইতে আমরা ইহাঁদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারি—Flavius Josephus, Philo এবং Pliny. Therapeutsরা Alexandriaতে বাস করিতেন। তাঁহাদেরই একটি শাখা Palestine এ আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারাই পরে তদ্দেশীয় ভাষায় Essene বলিয়া পরিচিত হন। John the Baptist এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

ইঁহার নিকট হইতে শ্রীযীশুখ্রীষ্টের অভিষেক ক্রিয়া (Baptism) সম্পাদিত হয়। প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই Essene সম্প্রদায়ের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে এই Essene শাখা খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতেই মিশিয়া যায়। কিন্তু ইহার কিয়দংশ মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। যাহাদের এক সম্প্রদায় Sabaeanism বলিয়া পরিচিত এবং যাহাদের অন্তর্গত Hanifite দের নিকট শ্রীমহম্মদ ধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং পরে ঐ Sabaeanismও ইসলাম ধর্ম্মে মিশিয়া যায়। নির্জ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার ব্রত, অহিংসা, বর্ণবিভাগ, স্ত্রীজাতির হীনত্ব, অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে অগমন এবং পশু বধের বিরোধিতা, আত্মার অমরত্ব, বহুজন্মবাদ, সজ্ঞ ও ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্পর্শ দোষ ভোজনকালে মৌনাবলম্বন, সাধারণ ভাণ্ডার, ক্ষেত্রে কার্য্য, নিরামিষ ভোজন, আলখেল্লা পরিধান, আহারের পূর্ব্বে ও পরে জয় উচ্চারণ। মলত্যাগের পর তদুপরি মৃত্তিকাদ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্য্যা প্রভৃতি মতবাদ, একত্রোপাসনা, মদ্য ও মাংস ত্যাগ, ঔষধ বিতরণ

† Gr. Essenoi and Essaion, literally physicians, because they practiced medicine, from chald, asaya, from Heb, asa, to heal: Webster.

প্রভৃতি ব্যাপার Essene এবং Therapeuts দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।*

এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে এই Therapeuts এবং Essenera বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কারণ তাৎ-কালিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোথায়ও ঐরূপ আচার পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না বরং উহাদের আচার পদ্ধতির সহিত ভারতীয় আচার পদ্ধ-তির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা একে একে লিপিবদ্ধ করা যাউক। "এলেকজিন্দ্রিয়া নগর নিবাসী ক্লেমেন্স নামক গ্রীক পণ্ডিত ন্যূনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান। তিনি শ্রমণ ও শ্রমণার উল্লেখ করিয়া কহেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসনা করে ও তাহার মধ্যে দেবতা বিশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই পিরামিড বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্তূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক পণ্ডিত ন্যূনাধিক তিন শত খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি লিখেন, ব্রাহ্মণেরা একটি জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণেরা একত্র বিমিশ্রত নানাজাতীয় লোক। শ্রমনেরা মস্তক মুণ্ডন এবং বহির্বসনের অভ্যন্তরে একরূপ আলখেল্লা ব্যবহার করে; গৃহ-সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রালাপ করিয়া কালক্ষেপ করে এবং নিত্য রাজ-সন্নিধানে তণ্ডুল-দান প্রাপ্ত

* For better studies vide the Religion of Israel by Dr. Kuenen Vol. III. p. 126—136, 203—4. Also vide History of the Jews by Henry Hart Milman D. D. or Vide Renan's Life of Jesus. See also Bunsen's Angel Messiah of Buddists, Essenes and Christians p. 149.

For original studies Vide The Jewish historian, Flavius Josephus' Antiquities and Philo's Judæus, quod omen. prob. liber

হইয়া আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রমণ যে বৌদ্ধ পরিব্রাজক অর্থাৎ ভিক্ষু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে"*।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম তুলনা করিলে দেখা যায় —উভয় অবতারের জন্মোপলক্ষে একই নক্ষত্র (পুষ্যা বা 8 of cancer) ও মহাপুরুষাগমন প্রসঙ্গ (অসিত এবং Simeon), উভয়ের জননীই অলৌকিক-ভাবে গর্ভধারণ করেন, শিশুক্রোড়ে ম্যাডোনা ও করুণাদেবীর ক্রোড়ে বুদ্ধের একই প্রকার প্রতিকৃতি, উভয়েরই বেশ্যা ও দুর্দ্দান্তের উপর কৃপা, একই প্রকারের নৈতিক উপদেশ প্রচার, উভয়েরই মার বা সয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হওন, দ্বাদশ শিষ্য, দান দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রাধান্য, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফলভোগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, নিজ নিজ দেবালয়ে

* Wheeler's History of India, Vol. III. P. 240.

| The discovery of Asoka's inscription at Girnar, which tells us that, that enlightened emperor of India made peace with five Greek Kings, and sent Buddhist missionaries to preach his religion in Syria explains to us the process by which the ideas were communicated. Researches into the doctrines of the Therapeuts in Egypt and of the Essenes in Palestine leave no doubt even in the minds of such devout a Christian thinker as Dean Mansel that the movement which those sects embodied was due to Buddhist missionaries, who visited Egypt and Palestine within two generations of the time of Alexander the Great. Some moderate Christian writers admit that Buddhism in Syria was a preparation, a 'forerunner' (to quote the word used by Professor Mahaffy) of the religion preached by Jesus over two centuries later.—A History of Civilization in Ancient India Vol. II. by R. C. Dutt

দীপদান, লোবানাদি দাহ, গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উভয়ের অতিশয় সন্নিকট সম্বন্ধ। *

পুরাতত্ত্বের ফলে যে সকল অপূর্ব্ব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় একটি অতি গুপ্ত কথা বঙ্গভাষার প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ বিষয়টি নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

* A Roman Catholic Missionary, Abbe Huc, was much struck by what he saw in Thibet. "The crosier, the mitre the dalmatic, the cope or pluvial, which the grand LLamas wear on a journey, or when they perform some ceremony outside the the temple, the service, with a double choir, psalmody, exorcisms, the censer swinging on five chains and contrived to be opened or shut at will, benediction by the LLama, with the right hand extended over the heads of the faithful, the chaplet, sacerdotal celibacy, lenten, retirements from the world, the worship of saints, fasts, processions, litanies, holy water, these are the points of contact between the Buddhists and ourselves" Mr. Arthur Lillie, from whose book the above passage is quoted, remarks, "The good Abbe, has by no means exhausted the list, and might have added confessions, tonsure, relic worship, the use of flowers, lights and images before shrines and alters, the sign of the cross, the Trini in unity, the worship of the Queen of Heaven, the use of religious books in a tongue unknown to the bulk of the worshippers, the aureole or nimbus, the crown of saints and Buddhas, wings to angels, penance, flagellations, the flabellum or fan, popes, cardinals, bishops, abbots, presbyters, deacons, the various architectural details of the Christian temple.—Buddhism in Christendom, p. 202. as quoted by R. C. Dutt in A History of Civilisation in Ancient India, p. p. 377.

"লাবুলে ও লিএবরেখ্‌ট্ (Prof Liebrecht) নামে দুইটি ফরাসী ও জার্ম্মান্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে রোমান্ ক্যাথলিকেরা একজন সাধুকে খৃষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে প্রমাণ হইল তিনি আর কেহই নহেন আমাদের বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধ।" ঐ সিদ্ধ পুরুষের নাম জোসফট্। প্রথমে ফরাসী লাবুলে, পরে, জর্ম্মেন্ লিএবরেখ্‌ট্, তদন্তর ইংলণ্ড-বাসী বীল, নিজ নিজ ভাষায় এ বিষয়টি প্রতিপাদন করেন। ম্যাক্সমূলর ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।* দমসক্-নিবাসী জোঅন্নস্ নামে একটি গ্রীক গ্রন্থকার বার্লাম্ ও জোঅসফ্ নামে দুই ব্যক্তিবিষয়ক একখানি উপাখ্যান রচনা করেন। উহা অবিকল বুদ্ধ চরিত। জোসফটও বুদ্ধের ন্যায় রাজপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণ হইলে, একটি জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলেন, জোসফট মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নয়, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রাদায়ের অভিনব ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখদ সামগ্রী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ-শোক জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন, তদর্থ যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ বহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক এক দিবস একটি অন্ধ ও অপর একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর একদিন ঐরূপে বহির্গত হইয়া একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান; তাহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে গৃহ প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটি

* Chips from a German Workshop by Max Muller, Vol. IV. p. p. 176—189.

সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুদ্ধ ও জোসফটের অন্য অন্য বিষয়ও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট্ বলিয়া পরিগণিত হন।

"অতএব জোঅনুস যে, ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। মক্ষমূলর মনে করেন যে ললিতবিস্তর হইতেও উহার অনেক স্থল গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ ও জোসফট যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই বিশেষণ গুলির সাতিশয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"মসৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম-* প্রবর্ত্তকের নাম যুদস্ফ এবং কিতাব ফিহ্রিস্ত্ নামক আরবীয় গ্রন্থের লেখক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম যুঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেঁনো এ দুইটি নাম পার্সী বুদ্সৎফ্ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ † স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেবর (Weber) বলেন যে ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ ও বুদ্ধদেবের অভেদ-প্রতিপাদনের মূলসূত্র।"§

* কেলডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ প্রচলিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এবং সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপাসনা। পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।— The faith of the world, Vol. II, 1881, Sabians.

† Memoire Sur l'Inde. par Renaud p. 91

§ Weber's History of Indian Literature, p. 307

— ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. [illegible]।

অপরদিকে জগতে যত নীতিমূলক গল্প দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ বলিয়াই বোধ হয়। নানা যুগে ঐ সকল গল্প নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিয়াছে *। সকলেই জানেন যে নীতিযুক্ত গল্পের খনি হইতেছে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ। এ সকল গল্প ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। শ্রীবুদ্ধ সেই গুলিকে নীতিযুক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। সে যাহাই হউক, পাশ্চাত্য গল্পের সহিত ঐ সকল গল্পের অত্যধিক মিল এবং ঐ সকল গল্প প্রাচ্যঢংয়ে লেখা—যেমন প্লেটোর ক্রাটাইলাসের (Cratylus) অন্তর্গত সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ + এবং ষ্ট্রাটিস (Strattis 400 B. C.) বর্ণিত নউলের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ‡ প্রভৃতি গল্প বৌদ্ধ জাতকে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সোলেমানের (Solomon) বিচারের মধ্যে যক্ষিণী জাতক * কি প্রকারে প্রবেশ করিল ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মক্ষমূলর ইহার কোনও সমাধান খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতবাসীদের সহিত ইহুদিদের সমাগম ফলে বাইবেলের মধ্যে ভারতবর্ষীয় নানা বিষয় প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলের অন্তর্গত 'রাজমালার' † সময় ভারতবর্ষের যে ঐ সকল দেশের সহিত নানা ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা বাইবেলের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ (যথা হস্তীদন্ত, বানর, ময়ূর এবং চন্দন কাষ্ঠ বাচক) হইতে বুঝা যায় ‡। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যিশুখৃষ্টকে অপ্রতিপাদন করা। আমাদের প্রতিপাদ্য এই, যে খৃষ্ট ধর্ম্ম হিন্দু চিন্তাধারাই পরিপুষ্ট

* See Selected Essays, Vol. I, p. 500. 'The Migration of Fables.'

+ Cratylus, 441 A, on a similar fable in Æsop, see Benfey, Pantschatantra vol. i, p. 463 M. M. Selected Essays, Vol. I. p. 513.

‡ See Fragmenta Comic (Didot) p. 302; Benfey, l. c. vol. i. p. 374

লাভ করিয়াছিল। যিশু খৃষ্ট ভারতবর্ষীয় নীতি ও সঙ্ঘের সহিত তদ্দেশীয় নানা বিশ্বাস ও সেশ্বরবাদ একত্র করিয়া জগতের সমক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পারসিক আহিরম্যান ও অহুরমেজদা খৃষ্টধর্ম্মের ভগবানের সহিত সয়তানের চিরবিরোধ স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যুর পর বহুকাল পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবে ইত্যাদি মিশরীয় চিন্তা অথবা মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্তস্থলে গৃহাবদ্ধ জীবাত্মা প্রভৃতি পারসিক চিন্তা খৃষ্ট ধর্ম্মের Day of Judgment এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Neo-Platonic সম্প্রদায়ের Tripple Triad of Jamblicus এর মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি God the Father, God the Son, God the Holy Ghost লুক্কাইত ছিল। কিন্তু আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে এই Neo-Platonic সম্প্রদায় ভারতীয় Gymno-Sophist দের দ্বারা অতিমাত্র অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বেবরের (Weber) কথায় বলিতে গেলে,—

"Buddhists and Jews, Greeks and Egyptians, mingled together, bringing with them the most diverse forms of religion. These conditions led to the development of comparative theology, on the one hand, and to the fusion of beliefs or a kind of Religious eclecticism, on the other, and paved the way for Catholic unity."

এ যাবৎ আমরা উদীচ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছি এখন একবার পৃথিবীর অপর পারস্থ ভূখণ্ডের সহিত ভারত-সম্বন্ধী ধর্ম্মেতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সিংহল

* See some excellent remarks on this subject in Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, vol. i, pp. xiii & xliv.

† 1 Kings iii 25

‡ Science of Language, vol 1 p. 186

শ্যাম, নেপাল, তিব্বত, কাবুল, গান্ধার, চীন, মঙ্গলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও মধ্যএসিয়ায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা খণ্ডও যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্কার" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রমান হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুশের উত্তর সীমা কামসকাটকা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহা অতিক্রম করিয়া, কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায় মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎ সন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন সকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নামক এক পূর্ব্ব দেশের উল্লেখ আছে, সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে', যে বৃক্ষ জন্মে তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

"চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে হুইসেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু আন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসং হইতে কিঙ্চেন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী

নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ফুসং হইতে কৌতুক জনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে কোন ভারি জিনিষ ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। Mexicoর 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটি সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন। তাহার অনুরূপ দর্পণ Mexico অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাঁহার কথা মত লিখিয়া লওয়া হয় তাহার সারাংশ এই:—

"পূর্ব্বে ফুসং বাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুই জানিত না ৪৫৮ খৃঃ সুংবংশীয় তামিং সম্রাটের রাজত্ব কালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতি নীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামাস্কাটকা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্ পথ কতদূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ঐ গ্রন্থে সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সে দেশে এক প্রকার রাঙ্গা পিয়ারা জন্মে ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানর কথা আছে যাহা Mexico দেশের ফলের সহিত ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা-রূপার ব্যবহার নাই, জিনসের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকদের রাজতন্ত্র, রীতি নীতি বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, নগর, দুর্গ, সেনা ও অস্ত্র শস্ত্রের অভাব এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণন আছে তাহা আর আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ Mexico অঞ্চলে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

"Mexico বাসীদের মধ্যে এইরূপ শ্রুতি আছে যে একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন, তার উপর এক আলখাল্লা, এই

বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায়, সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধুপুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থ Magdalina গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাঁর নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ "হুই-সেন-ভিক্ষু" নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে Pacific Ocean তীরে আসিয়া নামেন। হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। Spanish জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয়কালে তাহারা Mexico ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন, তাহাদের শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণ-কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন Asiaর ধর্ম্মের ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে তাহা দুই দেশের পরস্পর লোক সমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

"আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্ম নাম 'গৌতম এবং জাতীয় নাম 'শাক্যই' প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ Mexico প্রদেশ সমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্য ব্যঞ্জক।

"গ্বাতে মালা—গোতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতে মোট্ জিন-গৌতম হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্কো, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা পুলাস এই সকলের আদিপদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্স্ টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্চে "তায়া-সাকা" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালঙ্কে একটি বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার

"শাক-মোল" (শাক্যমুনি) নাম। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন তাঁর নাম গৌতুশাক্যা (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন Mexico র পুরোহিতের নাম তলামা। আর এক কথা—মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে; হুইসেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণস্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুমূর্ত্তি হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোনও জন্তু ছিল না), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ, বিহার, অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।"*

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে Prof. Fryer স্থির করিয়াছেন যে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচারকার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

* The Buddhist Discovery of America—Harper's Magazine.

—বৌদ্ধধর্ম্ম— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার এম্, এ, বি, এল্)

(৭)

সাধুর লক্ষণ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড় গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

কৃপালু, কাহারও দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যই তাঁহার বল, অসূয়া জন্য হর্ষবিষাদ-রহিত, সকলের উপকারক, বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না, তাঁর বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত, মৃদুবিত্ত. সদাচার, অপরিগ্রহ, ক্রিয়াশূন্য, মিতভোজী, তাঁর অন্তকরণ সংযত, স্বধর্ম্মে স্থির, মদেকাশ্রয়, মননশীল, সাবধান, নির্ব্বিকার, বিপদেও অকৃপণ, তিনি ক্ষুৎপিপাসা শোক মোহ জরামৃত্যু জয় করিয়াছেন, মানাকাঙ্ক্ষী নহেন, অন্য লোককে মানদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক, সম্যক্ জ্ঞানী ইত্যাদি। এগুলি সাধুর লক্ষণ।

---

(৮)

ভক্তের লক্ষণ।

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনং।
পরিচর্য্যাস্তুতি প্রহ্বগুণ কর্ম্মানুকীর্ত্তনং॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনং॥

মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনং। * * * *
* * * * বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। * * * *
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্। * * * *

আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শনার্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও প্রণত হইয়া গুণকর্ম্মের অনুকীর্ত্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার ধ্যান, লব্ধবস্তুর সমর্পণ, দাস্য ভাবে নিজেকে নিবেদন, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, আমার জন্মকর্ম্মকথন, আমার পর্ব্বানুমোদন, আমার ব্রত ধারণ। নিজে কিম্বা সকলে মিলিত হইয়া আমার অর্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, কৃতকর্ম্মের পরিকীর্ত্তন না করা—ইত্যাদি। এগুলি ভক্তের লক্ষণ।

(৯)

সৎ সঙ্গ।

তার পর ভগবান বুঝাইলেন যে ভক্তিযোগ সাধুসঙ্গ দ্বারা লাভ হয়। ভগবানের মতে সাধুসেবার মত ফলপ্রদ উপায় আর কিছুই নাই।

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়োবিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজ ভক্তিযোগ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ আমি সন্তদের পরম আশ্রয়।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এবচ।
ন স্বধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গাপহো হি মাং॥

আসন প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্ববিবেক অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদরূপ, কৃচ্ছ্রতপঃ, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট, কূপারামাদিনির্ম্মাণ পূর্ত্ত, দান, একাদশী উপবাসাদি ব্রত, যজ্ঞ অর্থাৎ দেবপূজা, ছন্দ

অর্থাৎ রহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম, ইহারা কেহই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ সর্ব্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

তাহারা বেদ পাঠ করে নাই, আচার্য্যের উপাসনা করে নাই, তাহাদের ব্রত ছিল না, তপস্যা ছিল না, কেবল সাধুসঙ্গ হেতু আমাকে পাইয়াছিল।

———

(১০)

কর্ম্মত্যাগ কখন?

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রং॥

গুরূপাসনালব্ধ একভক্তি দ্বারা ও শাণিত জ্ঞানকুঠার দ্বারা জীবোপাধি ত্রিগুণাত্মক নিজ শরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে "অস্ত্র" অর্থাৎ সাধন ত্যাগ কর।

(১১)

ভক্তি কিসে হয়?

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্‌ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তি লক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে আমার ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হয়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা করিলে হয়। তাহা হইতে ধর্ম্ম হয়।

দশটী সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা করা উচিত।

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥
* * * * সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্‌ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে। * * * *

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য স্বাত্বিক আগম, অপ, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান মন্ত্র সংস্কার এই দশটী সেবা করা উচিত, কারণ এই দশটীতে সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণের বৃদ্ধি হয়।

(১) আগম—পুরাণ বেদান্ত প্রভৃতি নিবৃত্তি সাত্ত্বিকশাস্ত্র সেবা করা উচিত। রাজসিক পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিশাস্ত্র ও তামসিক পাষণ্ড বৌদ্ধ শাস্ত্র সেবা করা উচিত নহে। করিলে রজ-গুণ ও তমঃগুণের বৃদ্ধি হইবে।

(২) অপ—স্বাত্বিক তীর্থাপ গঙ্গোদকাদি সেবা করা উচিত। রাজস, গঙ্গোদক ও তামস সুরাদি সেবা করা উচিত নহে। করিলে রজঃ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৩) প্রজা—স্বাত্বিক নিবৃত্ত জন সেবা করিবে। রাজস প্রবৃত্ত ও তামস দুরাচার জন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৪) দেশ—স্বাত্বিক বিবিক্ত দেশ সেবা করিবে, রাজস রথ্যাদি দেশ ও তামস দ্যূতসদন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৫) কাল—ধ্যানাদির জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তাদি কাল সেবা করিবে, রাজস প্রদোষ কাল ও তামস নিশীথ কাল সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। প্রদোষ কালের ধ্যান লোকরঞ্জনার্থ ও নিশীথ কালের ধ্যানে নিদ্রার ব্যাঘ্যাত হেতু মন স্থির হয় না।

(৬) কর্ম্ম—সাত্বিক নিত্য কর্ম্ম সেবা করিবে, রাজস কাম্য কর্ম্ম ও তামস অভিচারাদি কর্ম্ম সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৭) জন্ম—সাত্বিক শৈব ও বৈষ্ণব দীক্ষা সেবা করিবে, রাজস শাক্ত দীক্ষা ও তামস ভূতপ্রেতাদি দীক্ষা সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। [শাক্ত দীক্ষা মাত্রই রাজস নহে, কাম্য হইলেই রাজস, নিষ্কাম হইলেই সাত্বিক।]

(৮) ধ্যান—সাত্ত্বিক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান সেবা করিবে, রাজস কামিনী ধ্যান ও তামস শত্রুধ্যান করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৯) মন্ত্র—সাত্ত্বিক প্রণব মন্ত্র সেবা করা উচিত। রাজস কাম্য মন্ত্র ও অভিচার তামস মন্ত্র সেবা করিবে না, করিলে রজ তম বৃদ্ধি হইবে।

(১০) সংস্কার—সাত্ত্বিক আত্মার "সংস্কার" অর্থাৎ শোধক সেবা করিবে। রাজস দেহসংস্কার ও তামস গৃহসংস্কার সেবা করিবে না, করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(১১)

বিষয় ও বাসনা ত্যাগ হয় কিরূপে।

বিষয় গুণজ, বাসনাও গুণজ।

* * * * জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥

বিষয় ও বাসনা ব্রহ্মস্বরূপ জীবের "দেহ" অর্থাৎ অধ্যস্থ উপাধি জীবের স্বরূপ নহে।

* * * * ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্॥

তুরীয়, আমাতে অবস্থিত হইয়া সংসৃতি বন্ধ ত্যাগ করিবে। তাহা হইলেই বিষয় ও বাসনার ত্যাগ হইবে।

সিদ্ধ ব্যক্তির দেহ মাতালের কাপড়।

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধ॥

দেহ আসনে অবস্থিতি করুক বা আসন হইতে উত্থিত হউক সিদ্ধ তাহা দেখেন না। যে দেহ দ্বারা আত্মার স্বরূপ অধিগত হওয়া যায়, সেই দেহ দৈবাৎ মৃত হউক বা দৈববশতঃ জীবিত থাকুক, সিদ্ধ খোঁজ রাখেন না, যেরূপ মদিরামদান্ধ অর্থাৎ মাতালের পরিহিত বাস কোমরে আছে বা নাই, তার হুঁস থাকে না।

(১৩)

উর্জ্জিতা ভক্তি।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য।

কর্ম্মমীমাংসক বলেন, ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কার-প্রণেতা বলেন, যশই উদ্দেশ্য। বাৎসায়নাদি বলেন, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকৃৎরা বলেন, সত্য শম দমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎরা বলেন, ঐশ্বর্য্যই উদ্দেশ্য। চার্ব্বাকেরা বলেন, আহার ও মৈথুনই উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, দেবপূজা, তপ, দান, ব্রত, নিয়ম, যমই উদ্দেশ্য! কিন্তু এসব তুচ্ছ ফল।

ভক্তিই মুখ্য।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ॥

অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা, আমার দ্বারা সন্তুষ্টমনা ভক্তের সকল দিক সুখময়।

ভক্ত মুক্তিও চায় না।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্র লোক চায় না, সার্ব্বভৌম চায় না, পাতালের আধিপত্য চায় না, যোগসিদ্ধি চায় না, মুক্তিও চায় না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কিছু চান না।

উর্জ্জিতা ভক্তিতে ভগবান লাভ হয়।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

যোগ, সাংখ্য, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস দ্বারা সেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ আমার উর্জ্জিতা ভক্তি আমাকে বশীভূত করে।

উর্জ্জিতা ভক্তিতে জাতিদোষ নাশ হয়।

* * * * ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ। জ্ঞান ও ভক্তি এক জিনিষ ॥

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তং ॥

আমার পুণ্যগান শ্রবণ ও বর্ণন দ্বারা যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয় তেমন তেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, যেরূপ চক্ষু অঞ্জন সম্প্রযুক্ত হইলে, সূক্ষ্ম বস্তু দেখা যায়। অতএব জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার পৃথক নহে।

(১৪)

উন্নতির প্রধান অন্তরায় যোষিৎ।

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গত ॥

স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গিদের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিয়া নির্ভয় দেশে, বিজনে থাকিয়া অতন্দ্রিত হইয়া আমাকে চিন্তা করিবে। পুরুষের যোষিৎ সঙ্গ দ্বারা ও যোষিৎ সঙ্গীদের সঙ্গ দ্বারা যেরূপ ক্লেশ ও বন্ধ হয়, সেরূপ অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গেতে হয় না।

শিখগুরু ।*

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

গোবিন্দসিংহ।

বাস্তবজগতে আমরা এরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তি দেখিয়া থাকিব, যাহারা আপনাপন দৈনন্দিন জীবনধারণোপযোগী জীবিকা অর্জ্জন মানসে প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াও উদরপূর্ত্তির উপযুক্ত আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না—যাহারা এই বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে যাইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, যাহাদিগের মানবজন্মের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও বিফল করিবার জন্য শত্রু সর্ব্বদা লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রাণে আতঙ্ক ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে, যাহারা জীবনে সাফল্য ও সিদ্ধি-লাভোদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ বিপজ্জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যাহাদিগের জগতে আপন বলিবার কেহ নাই, নৈরাশ্যে প্রবোধ দিবার কোন সুহৃৎ, শোকে সান্ত্বনা দিবার কোন সহায়ক নাই—এরূপ শোচনীয় ভাবে জীবনযাপন করিলেও তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবনে এমন এক শুভ মুহূর্ত্ত আইসে যখন বিধাতার আশীষ-বারি অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদিগের মস্তকে বর্ষিত হয়। তাঁহার অপার করুণা ও অনুগ্রহ তাহাদিগকে অবশ্যম্ভাবী পতন

* 'শিখগুরু' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী লিখিতে যাইয়া আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। এস্থলে ঐ সকলের রচয়িতাগণের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

1. History of the Sikhs (in 2 Vols.) By W. L. M'Gregor, M.D. (published by James Madden & Co.)
2. Guru Govind ('The Saints of India' series published by Mr. Nateson & Co.) By K. V. Ramaswami, B.A., B.L.
3. আর্য্যকীর্ত্তি...শ্রীরজনীকান্ত সেন।
4. গুরু গোবিন্দসিং—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

হইতে রক্ষা করে, কোন্ এক অজ্ঞেয় স্থান হইতে সহায় ও সাহায্য তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়—তখন আবার তাহাদিগের নিরাশপ্রাণে নব আশার সঞ্চার হইতে থাকে, তাহারা অভীপ্সিতলাভে মানবজীবন ধন্য জ্ঞান করে। জাতীয় জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখি, বিশ্বেতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় উহা লিখিত রহিয়াছে। যখন কোন দুর্ব্বলজাতি অত্যাচার-অবিচারে উত্যক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে শত্রু-সমাবৃতভাবে আতঙ্কময় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ও বীর্য্যহীন হইয়া প্রতিক্ষণেই আপনাদিগের অস্তিত্বলোপভয়ে ভীত হয়, সেই সময়েই তাহাদিগের রক্ষাকল্পে শ্রীভগবান উপযুক্ত সহায়ক ও রক্ষক প্রেরণ করিয়া থাকেন - যিনি ঐশী শক্তিতে বলীয়ান হইয়া জাতীয় মহাতরণীর কর্ণধাররূপে বিরাজ করিতে থাকেন এবং সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া তরী পার করাইয়া দেন। উহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ জাতি আবার আপন বৈশিষ্ট্য ফিরিয়া পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ফরাসীদিগের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করুন; ঐ সময়ে গৃহবিবাদ, বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে সমগ্র ফরাসী-রাজ্য পরিপূর্ণ—উহার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিশক্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। দুর্ব্বল ও অসহায় নৃপতি সপ্তম চার্লস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পুত্তলিকাবৎ ফরাসী-সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন—স্বজাতির সকল অস্তিত্ব বুঝি বা লোপ পায়, কিন্তু তাঁহার কোন যোগ্যতা নাই! এদিকে বহিঃশত্রু আসিয়া রাজ্যাধিকারে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে কয়েকটী বিখ্যাত নগরী অধিকার করিয়া বসিল। এইরূপে ফরাসীজাতি যখন আন্তর্জাতিক কলহে মরণোন্মুখ, যখন বহিঃশত্রু আসিয়া উহার স্বাধীনতা-হরণের জন্য উদ্যত—সেই নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইল—ভগবানের দয়ায় ফরাসী আবার আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইল। কোন্ এক সুদূর, অপরিচিত, নির্জ্জন পল্লী হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, বীরাঙ্গনা জোয়ান (Joan of Arc) আসিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন—ফরাসী-জাতি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল।

জগতের ইতিহাসে ফরাসীর অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া জোয়ান চলিয়া গেলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপখণ্ডে আবার ইহারই পুনরভিনয় দেখিতে পাই। ধর্ম্মপ্রাণ ইউরোপীয়গণ যখন যথেচ্ছাচারী, লম্পট পোপদিগের অমানুষিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইতেছিল, যখন ইউরোপের আকাশ উঁহাদিগের অনুশোচনা ও হাহাকারধ্বনিতে বিদীর্ণ হইতেছিল, সেই সময়ে মহামতি লুথারের (Martin Luther) ন্যায় একজন অসামান্য মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল ; সকলে তাঁহাকে ভগবানের শ্রেষ্ঠদান বলিয়া সাদরে নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। ধর্ম্মজগতে স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া আসিল।

শিখদিগের জাতীয় জীবনে ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই। পাঠক দেখিয়াছেন, হরগোবিন্দের পরবর্ত্তী গুরুত্রয়ের সময়ে নানারূপ দুর্ব্বলতা আসিয়া জাতীয় জীবনে ব্যর্থতা আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্বের তেজস্বিতা ও পরাক্রম হারাইয়া উপযুক্ত নেতার অভাবে শিখগণ নানা উপায়ে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, তাহাদিগের প্রাণে আশঙ্কা হইল, বুঝি বা মুসলমানদিগের ভীষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধঘোষণা করিতে সক্ষম না হইয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এইরূপে জীবন-মরণের মহাসমস্যা আসিয়া শিখদিগের প্রাণে প্রবল অস্থৈর্য্যের সৃষ্টি করিল। বিশেষতঃ কিরূপভাবে সামান্য একজন মুসলমান-প্রহরী আসিয়া তেগ্‌বাহাদুরকে তাহার অনুগামী হইতে দৃঢ় আজ্ঞা করিয়াছিল,—তৎপরে গুরু কিরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সশস্ত্র রাজানুচরের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রাজদরবারে সভাসদ্‌পরিবেষ্টিত হইয়া আওরঙ্গজেব তৎপ্রতি কিরূপ নীচতাজ্ঞাপক কটূক্তি ও বিদ্রূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার অপমৃত্যু ! সে কি ভীষণ দৃশ্য ! সেই সকল ঘটনা সর্ব্বদাই শিখদিগের মনে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল এবং আপনাদিগকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া তাহারা উন্নতির সকল আশা- ভরসা জলাঞ্জলি দিল। তাহাদিগের সেই ঘুমঘোর বিনষ্ট করিয়া গোবিন্দসিংহ আবিভূ‌ত হইলেন—শিখ লুপ্ত সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া পাইল।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে শিখ-জাতি জীবিত থাকিলে মোগলশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে না ; এই আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বলপ্রয়োগ ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণাই ভারতে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করিল। মৃত্যুকালে পিতা তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন—

"হিন্দু ধরমকো নহি বিগাড়ো।
একে দুনহো কো প্রতিপালো॥"

শিখ পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে যায় নাই, কিন্তু মোগল নৃপতিদিগের অমানুষিক অত্যাচার, অত্যধিক সঙ্কীর্ণতা ও অবিচারে তাহারা আর ধৈর্য্যধারণে সক্ষম হইল না—তাই অপর কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে উঠে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ প্রশ্নচ্ছলে নৃপোত্তম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন —'মহারাজ! দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপূর্ব্বক পীড়িত করেন না?' এই সামান্য নারদীয় উপদেশের মধ্যে রাজ্যপালনের মূলমন্ত্রটী নিহিত রহিয়াছে এবং দেখিতে পাই উহার প্রতি অমান্য প্রকাশ করিয়া অনেক শাসনকর্ত্তা উপযুক্ত ফলভোগ করিয়াছেন। এই দোষেই স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ হলাণ্ডদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও প্রায় ঐরূপ ফল হইয়াছিল।

খৃষ্টাব্দের ১৬৬৬ বর্ষে পাটনায় গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। তদীয় পিতা ধূর্ত্ত রামরাওয়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ঐস্থানে আশ্রয় লন। বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দ শারীরিক ব্যায়াম ও নানা-প্রকার দুঃসাধ্য ক্রীড়ায় রত থাকিত এবং কতকগুলি সহচর-সমভি-ব্যাহারে অতি দূরবর্ত্তী নির্জ্জনকানন প্রদেশে শীকার করিয়া বেড়াইত। শৈশবে গোবিন্দ কিরূপ অদ্ভুত সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিল তাহার বিবরণ 'সূর্য্যপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। কথিত আছে, একদা গোবিন্দ কয়েকজন সঙ্গী লইয়া পথের উপর নানা-

রূপ ক্রীড়া করিতেছিল। বাদশার অধীনস্থ জনৈক শাসনকর্তা সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানা আড়ম্বরে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ কতিপয় বালককে গতিরোধ করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ উহাদিগকে তিরস্কার করিল এবং শেষে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিল। গোবিন্দ দলের নেতা—সকলে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিল। আপনাদিগের আনন্দোল্লাসে অকস্মাৎ এরূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলকে ডাকিয়া গোবিন্দ বলিল—'আয় ভাই! আমরা খুব হাসিতে থাকি।' এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া নবাবের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রহিল না—তিনি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঁদরের মত মুখ করিয়া তোমরা কি করিতেছ?" সাহসী গোবিন্দ উত্তর করিল—

> "বদন বিলোচন।
> সমান জিন বাদরকে॥
> ল্যায় হৈঁ রাজ সোই ভয়ো।
> হৃদয় তব খামেও॥
> যয়হে তেজ ঠারো।
> কোই হোয় নারাখ বারো॥
> তব হয়রো হৌঁয়ে ভারো।
> বনে সম বিধ বামে য়ো॥

অর্থাৎ—"মুখ দেখ, বাঁদরের মত নহে। এই তোমার রাজ্য লইবে; তোমার হৃদয় কাঁচা হইবে, কিন্তু তোমার এ তেজ চলিয়া যাইবে। রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। এখন যে হালকা আছে, তখন সে ভারি হইবে। সে সময়ে বিধি বাম হইবে।" সামান্য একটী বালকের মুখ হইতে এরূপ উত্তর শ্রবণে নবাব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর কিছু করিবার ক্ষমতা রহিল না। বাল্য-জীবনের এই সামান্য ঘটনা তাঁহার ভবিষ্য-উন্নতির পূর্ব্বাভাস প্রদান করিল। এ উক্তির সত্যতা তিনি নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল ঐ স্থানে কাটাইবার পর গোবিন্দ আনন্দপুর নামক স্থানে পিতার নিকট গমন করেন। যাহাতে পুত্র ভবিষ্যতে উন্নতি-লাভ করিতে সক্ষম হয়, তেগ্‌বাহাদুর তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় কোন দিন দেন নাই। সবিশেষ কঠোর শাসনের মধ্যে থাকিয়া গোবিন্দসিংহের শরীর-মন উভয়ই সমভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী জনকের এইরূপ সুশিক্ষার প্রভাবেই তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির রক্ষাকর্ত্তা ও মুখোজ্জ্বলকারী হইতে সক্ষম হন। যাহা হউক, তৎপরে মানব-জীবনের কর্ম্ম-কোলাহল ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে দিন দিন গোবিন্দ নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্য হইতেই শিখদিগের অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধীয় সকল প্রকার তথ্য সঞ্চয় করেন এবং সবিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ঐ সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ভবিষ্যতে জাতীয় জীবন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি তাঁহার পথপ্রদর্শকরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাঁহার সময়ে শিখগণ উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হয়। যাহা হউক, গোবিন্দের সমক্ষেই মোগলসৈনিক আসিয়া নির্দ্দোষ ও নিরভিমান তেগ্‌বাহাদুরকে দরবারে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। উহাদিগের নৃশংসতা ও অমানুষিক অত্যাচার সন্দর্শনে যুবক হৃদয় ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ হইল কিন্তু কি করিবে উহার যে কোন ক্ষমতা নাই!

ঐ ঘটনার পর কিয়ৎকাল অতীত হইল। দিল্লীর কোন সংবাদাদি না পাইয়া গোবিন্দের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইল—তিনি পিতার জীবনসম্বন্ধে সন্দীহান হইলেন। এদিকে যতই দিন যায় তেগ্‌বাহাদুর ততই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হন। তদানীন্তন প্রথানু-সারে অগত্যা তিনি নারিকেল ও পয়সা দিয়া একজন শিখকে গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া সমুচিত

সম্ভ্রমের সহিত গোবিন্দসিংহের পাদবন্দনা করিয়া বলিল—"আপনার নিকট মহাত্মা তেগ্‌বাহাদুরের ইহাই শেষ অনুরোধ—

বিনা দের তুরকণ্‌ প্রহারে, সেবকন্‌ রচ্ছো বলঠান্‌।"

অর্থাৎ অবিলম্বে মুসলমান সংহার করিবে এবং সেবকগণের বলরক্ষা করিবে। এই ঘটনার অব্যবহিতকাল পরে পিতার অপমৃত্যুর বার্ত্তা তাঁহার নিকট পৌঁছিল। উহা শ্রবণ করিয়া সমগ্র শিখসমাজ ক্ষোভে ও অনুতাপে একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আপনাদিগকে অসহায় জ্ঞান করিয়া শোকাভিভূত হইল। যাহা হউক, কিয়ৎকালের জন্য উহারা আপনাদিগকে সংযত রাখিয়া তেগ্‌বাহাদুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানে ব্যাপৃত রহিল। মোগলের হস্ত হইতে গুরুর ছিন্নমুণ্ড উদ্ধার করা যে কিরূপ দুরূহকর্ম্ম তাহা শিখগণ উত্তমরূপেই বুঝিত। সেই জন্য গোবিন্দসিংহ সেবকগণকে একত্র আহ্বান করিয়া উক্ত কঠিন কার্য্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইতে বলিলেন। জনৈক নির্ভীক তেজস্বী শিখ উহার দায়িত্ব লইতে স্বীকৃত হইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। রাজপ্রহরীদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া হউক, বা অপর কোন উপায়ে হউক, ঐ ব্যক্তি তেগ্‌বাহাদুরের ছিন্নমুণ্ড অবিলম্বে গোবিন্দসিংহের নিকট পৌঁছিয়া দিয়া সমগ্রজাতির সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিল। শিখগণ একত্র সমবেত হইয়া মুণ্ডটী কিরাতপুরে প্রথিত করিয়া তদুপরি উপযুক্ত সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিল। তৎপরে নতজানু হইয়া সকলে একবাক্যে তৎসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল—এই প্রবল অন্যায় ও অত্যাচারের সমুচিত প্রতিশোধ লইতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া উহার জন্য প্রাণপাত করিতে হয়, সেও স্বীকার!

অতঃপর তেগ্‌বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দসিংহকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইবার জন্য সকলে মিলিয়া আয়োজন করিতে লাগিল। নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্যসম্ভার লইয়া চারিদিক হইতে ভক্তগণ সমবেত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে, গোবিন্দের নিকট যখন কেহ কোন প্রকার উপঢৌকনাদি লইয়া যাইত, তিনি উহার মধ্যে

অস্ত্র ও ঘোটক পাইলে অতীব সন্তুষ্ট হইতেন এবং বলিতেন—"আয়ুধ ঘোড়া যে লেয়াহে সে শিখ খুসী গুরুকী লেইহঁ। মন বাঁছত সকল ফল পাইহেঁ।" যে শিখ আয়ুধ ও ঘোড়া লইয়া আসিবে, সে গুরুর আশীর্ব্বাদ লইবে এবং মনোবাঞ্ছিত ফল পাইবে। অভিষেকের সময় সকলকে নানারূপ দ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়া লাহোরনিবাসী হরযশ নামক সভিখী বংশোদ্ভব জনৈক ক্ষত্রিয়শিখ ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণত হইয়া করযোড়ে বলিল—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু হীনজনের মান, সহায়, সম্পদ সকলই গুরুর নিকট। আমার প্রার্থনা এই যে আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া দাসীরূপে গ্রহণ করুন—তাহার জীবন ধন্য হইবে।" ঐ ব্যক্তির সহৃদয় প্রার্থনায় গোবিন্দ কর্ণপাত করিলেন এবং ঐ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে নানা আড়ম্বরের সহিত ঐ শুভ-উপলক্ষেই 'মাতা জিতোজীর' সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না কিন্তু মাতার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। জনৈক শিখ আপন ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ গুরুকে আপন কন্যাদান করিল—ইঁহার নাম সুন্দরী। গোবিন্দের চারিটী পুত্রলাভ হয়—জিতোজী হইতে জোরায়র সিংহ এবং জুঝার সিংহ, সুন্দরী হইতে অজিৎসিং ও কলাটসিং। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম দুইজন যুদ্ধে নিহত হয় এবং অপর দুইজন সিরহিন্দে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারায়।

যুবক গোবিন্দসিংহ নিজ অনুচরবর্গের সহিত শক্তিসঞ্চয়ের সকল প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উহা দেখিয়া তদীয় প্রতিবেশী পার্ব্বত্য নৃপতিবৃন্দ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল এবং উহাতে যে তাহাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী তাহা স্থির বুঝিতে পারিল। অবশেষে উহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে বলিয়া স্থির করিল। তাই উহার কারণানুসন্ধান করিতে লাগিল। কুলহরের রাজা ভীমচাঁদের সহিত গুরুর সামান্য একটী হস্তী উপলক্ষ্য করিয়া বিবাদ বাধে। উহার একটী

স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। গোবিন্দসিংহ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিত। কামরূপের রাজাও নানা উপহারদ্রব্যের সহিত একটী কর্ম্মপটু সুন্দরকায় হস্তী প্রদান করেন। গুরু উহার পৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া বন্যপ্রদেশে মৃগয়া করিতে যাইতেন। একদা তাঁহার হস্তী ভীমচাঁদের এলাকাস্থ ভূমিতে যাইয়া কিয়ৎপরিমাণ ক্ষতি করিল। ঐ ব্যপদেশে দুইদলে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। শেষে যুদ্ধ ঘোষিত হইলে ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সৈন্যসমাবেশ করিয়া সমবেত হইল। এই ভীষণ বিগ্রহে শিখসৈন্য অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত বিপক্ষীয়গণকে সংহার করিয়াছিল এবং অবশেষে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আপনাদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে 'ওয়া গুরু জী কী ফতে' রব উত্থিত হইতে লাগিল। ইহার পর শিখগণ যে মোগলশক্তির শত্রু, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রচারিত হইয়া গেল। তখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে শিখ ও মোগলের, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি বহুবর্ষের জন্য প্রজ্বলিত হইল। শ্রীগুরু তদ্দর্শনে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—কিসে তিনি আবার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইবেন অনুক্ষণ তাহাই ধ্যানমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতেন।

গোবিন্দসিংহ নিজে অসামান্য শক্তিশালী পুরুষ হইলেও আপন অভীপ্সিতলাভের পথে যে কত বাধাবিঘ্ন ও অন্তরায় বর্ত্তমান তাহা সম্যক্ অবধান করিয়াছিলেন—তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে ঐ ব্রত সুসিদ্ধ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত, দৈবশক্তির সহায় না লইলে তিনি কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। দেবতা ও মানব উভয়ের শক্তি একত্র সমবেত করিতে হইবে। তাই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র অস্ত্রশিক্ষার প্রচলন করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই—বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার অনুপ্রেরণাতেই জাতীয়-জীবন উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাতে শিখসৈন্যগণের মনে সাহস ও বীর্য্য জাগরূক হয় তজ্জন্য তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে কতিপয় স্বধর্ম্ম-

নিষ্ঠ ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে সমাহূত করিয়া হিন্দুর মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতির অংশবিশেষ অনূদিত করাইয়া শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে প্রাত্যহিক আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দেবচরিত্রের এক একটি ঘটনার বিবরণ আবৃত্তি করিতে করিতে উহাদিগের মনপ্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত। যখন তাহারা শুনিত,

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! ॥"

তখন তাহাদিগের হৃদয়ে নূতন উদ্যমের উন্মেষ হইত। চণ্ডিকাদেবীর আরাধনা করিতে মনস্থির করিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যজ্ঞে পৌরহিত্যের উপযুক্ত, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। উঁহারা বারাণসীনিবাসী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কেশবদাসকে ঐ কার্য্যের জন্য আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরু সংবাদ লইয়া জ্ঞাত হন যে, কেশবদাস ঐ সময়ে জ্বালামুখী নামক স্থানে তীর্থদর্শন-মানসে অবস্থান করিতেছেন—তাঁহার শিষ্যেরা তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়া উঁহাকে সাদরে শ্রীগুরুসকাশে লইয়া গেল।

আনন্দপুর হইতে সপ্তক্রোশ উত্তরে চণ্ডিকা নয়নাদেবীর মন্দির অবস্থিত—উহা পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যপীঠরূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত। কেশবদাসের সহিত গোবিন্দসিংহ যজ্ঞ করিবার জন্য ঐস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রায় চারিমাস এই নির্জ্জনপ্রদেশে নিয়মিতভাবে দেবীর পূজা, ধ্যান ও আরাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। আত্মীয় স্বজনদিগের সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই একনিষ্ঠ সাধক আরাধ্যদেবীর করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন—যেন তাঁহার জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি সক্ষম হন, যেন শিখজাতি আবার উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে! এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেবীর উদ্দেশ্যে যে সকল স্তবস্তুতি রচনা করেন তাহার বিশেষ বিবরণ 'সূর্য্যপ্রকাশে' লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এস্থলে পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য

একটিমাত্র উপহার দিব? দেবী অষ্টভূজার সমক্ষে শ্রীগুরু তদ্‌গত-প্রাণ হইয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—

। ওঁ সৎগুরু প্রসাদ।

॥ শ্রীভগবতীজী সহায় ॥

ভগবতীচ্ছন্দ ছকাপাত সাহি ॥

নমো উগ্রদন্তী অনন্তি সবইয়া।
নমো যোগ যোগেশ্বরী যোগ মায়িয়া ॥ ১

নমো কেহরী বাহনী শত্রুহন্তি।
নমো শারদা ব্রহ্ম বিদ্যা পঢ়ান্তি ॥ ২

নমো ঋদ্ধিদা সিদ্ধিদা বুদ্ধিদায়িনী।
নমো কাল্‌কে কাল্‌কো কালছেনী ॥ ৩

নমো কাল আজাল হয়েহের তেরো।
নমো তিনহুঁ লোক কিনো আহে রো ॥ ৪

নমো জ্যোতি জ্বালা তোমে বেদ গায়ে।
সুরাসুর ঋষীশ্বর মাহি ভেদ পায়ে ॥ ৫

তুহি যোগ যুগ তেনি তুহি খড্যা পারে।
তুহি জয় করন্তি অসুর গহি পছারে ॥ ৬

তুহি যোগনি খপ্রভরণী অদোখং।
রক্তবীজকে প্রাণকো পাকড় সোখং ॥ ৭

তুহি জল থলে পব্বতে গিরি নিবাসী।
তুহি সভ ঘট্‌নমো নিরালম্ব প্রকাশী ॥ ৮

তুহি দুষ্ট দাহনী তুহি সব্বপালী।
তুহি বৃদ্ধ পোহপা তুহি আপ্‌ বালী ॥ ৯

তুহি বিশ্বভরণী তুহি জন্‌ প্রকাশি।
তুহি অলখবরণী তুহি ভূ আকাশী ॥ ১০

নমো জালপা দেবী দুর্গে ভবানী।
তিলুলোক নব খণ্ডমৈ তুম প্রধানী ॥ ১১

অটল ছত্র ধারণী তুহি আদি দেবং।

সকল মুনী জনা তোহি নিশ দিন সরেবং ॥১২

তুহি কাল আকাল কি জ্যোতি ছাজৈ।

সদাজয় সদাজয় সদাজয় বিরাজৈ ॥ ১৩

নিএহি দাস মাঙ্গৈ কৃপাসিন্ধু কি জৈ।

স্বয়ং ব্রহ্মকি ভক্তি সদএ দিজৈ ॥ ১৪

তুহি জাগত জ্যোতি জ্বালা স্বরূপং।

তুহি জগ সকলমৈ রমন্তি অনুপং ॥ ১৫

মহামূঢ় তাও দাস দাসন্তেহারা।

পকড় বাহ ভব জল করো বেগ পারা ॥ ১৬

ফতেহি ডঙ্ক বাজে কৃপা ইএ ও করাজে।

এহি বারতা দাস কি নিৎ শুনিযে ॥ ১৭

করহু হুকুম্ আপনা সকল দুষ্ট খায়্।

তুরক হিন্দকা সকল ঝগ্‌রা মিটায়্ ॥ ১৮

আগম সুর বারে উঠে সিংহ যোধা।

পাকড়্ তুর্কনকো কারবৈ নিরোধা ॥ ১৯

সকল জগৎমো খালিসা পন্থা গাজে।

জগে ধর্ম হিন্দু তুরক দুন্দ্‌ ভাজে ॥ ২০

জপো জাপ একা হরে হরি অকালং।

হয়ৈ খেবজ্ঞান সব্‌ ছিন্‌কমে নেহালং ॥ ২১

শুনো তুম ভবানী এমন কি পুকারে।

কর দাসোপর মেহর আপ্‌ রম্ অপারে ॥ ২২

ভগবতী দোহরা।

দ্বার তোমারে ঠাঢ হোঁ একবর দিজে মোয়।

পন্থ চলে ত জগতমে দুষ্ট খেপাবহ তোঁয় ॥ *

* অর্থাৎ সৎগুরু প্রসাদে প্রাপ্ত একমাত্র ওঁকার মঙ্গলা-চরণরূপে ব্যবহৃত। শ্রীভগবতী দেবী সহায়। দশম গুরুর লিখিত ভগবতী সম্বন্ধীয় এই ছয় ছন্দ।

ভক্তের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

হে উগ্রদপ্তি! (তুমি) অনন্ত অপেক্ষাও অধিক, তোমাকে নমস্কার।

হে যোগমায়া। তুমি যোগ যোগেশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। হে কেশরীবাহিনী! শত্রুসংহারিণী! তোমাকে নমস্কার। হে সারদা! তুমি ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশকারিণী, তোমাকে নমস্কার! হে সিদ্ধি ঋদ্ধি ও বুদ্ধিদায়িনী! তোমাকে নমস্কার! হে কালিকে! তুমি কালের কালকে ক্ষয় কর, তোমাকে নমস্কার; তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তকাল দেখিতে পাও, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোক-ব্যাপিনী তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যোতির প্রকাশক, বেদ তোমার গান করে, তোমায় নমস্কার। সুর অসুর ঋষিগণ তোমার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। তুমি অসুরগণকে ধরিয়া পরাজয় পূর্ব্বক জয়লাভ কর। তুমি যোগযুক্ত, তুমি খড়্গধারিণী। তুমি যোগিনী, খপ্রধারিণী, দোষ-শূন্যা (পবিত্রা)। তুমি রক্তবীজকে ধরিয়া তাহার প্রাণ শোষণ করিয়াছিলে। তুমি জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত নিবাসিনী। তুমি সর্ব্বঘটকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছ। তুমি দুষ্টকে দমন কর। তুমি সকলকে পালন কর। তুমি বৃক্ষ, পুষ্প, তুমিই স্বয়ং মালী। তুমি বিশ্ব ভরিয়া আছ। তুমি জগতকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি অলক্ষাবরণী— অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমিই পৃথিবী, তুমিই আকাশ। হে সারদা দেবি! দুর্গে! ভবানি! তোমায় নমস্কার। তিনলোক নবখণ্ডে তুমিই প্রধানা। অটল ছত্রধারিণী তুমিই আদিদেব। সকল মুনিগণ নিশিদিন তোমায় স্মরণ করিতেছে। তুমি কাল অকালের জ্যোতি, তোমাতেই শোভা পাইতেছে। জয় সমূহ তোমাতেই বিরাজ করিতেছে। এ দাস এই প্রার্থনা করিতেছে যে প্রভু ব্রহ্মভক্তি (ভগবদ্ভক্তি) সর্ব্বত্র প্রদান করুন। তুমি জাগতিক জ্যোতিঃ প্রকাশ স্বরূপ। সমস্ত জগতে অনুপম ভ্রমণ করিতেছ। আমি তোমার দাসানুদাস অতি মূঢ়। আমার বাহু ধরিয়া সত্বর ভববারি হইতে উদ্ধার কর। এমন কৃপা কর যে জয়ডঙ্কা বাজুক। দাসের এই নিবেদন—সর্ব্বদা শুন। তুর্ক হিন্দুর সকল ঝগড়া মিটুক। স্বয়ং হুকুম কর সকল দুষ্টকে নাশ কর। মহাসুর বীর যোদ্ধা সিংহগণ উঠুক, তুর্কগণকে নিরোধ করুক। সমস্ত জগতে খালসাপন্থ (শিখধর্ম্ম) বিরাজিত হউক হিন্দুধর্ম্ম জাগুক, ভ্রম-অন্ধকার ঘুচুক। অকাল পুরুষের একমাত্র হরি হরি নাম জপদ্বারা সকল জগৎ ক্ষণমাত্রে তৃপ্তিলাভ করুক। হে ভবানি! তুমি আমার নিবেদন শুন, দাসের প্রতি এই অপার দয়া বিতরণ কর।

ভগবতী দোহরা (ভগবতী শব্দ মঙ্গলার্থ ব্যবহৃত। দোহরা—ছন্দবিশেষ) তোমার দ্বারে আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমায় এক বর দাও। জগতে (শিখ) পন্থ চালাও— তুমি দুষ্ট নাশ কর। (শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত।)

অতঃপর গোবিন্দের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন—তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া দেবী 'করদ' নামক অসি প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে খালসা গঠনে আজ্ঞা দিলেন। কথিত আছে গোবিন্দ তন্ময়মনে মুদ্রিত নয়নে চিন্তারত থাকাতে দেবীর প্রথম আহ্বানে নয়ন উন্মিলন করেন নাই। সেইজন্য দেবী বলেন—"যেহেতু তুমি প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিলে তখন তোমার জীবদ্দশায় খালসাগণ বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিবে না, পরে হইবে।" তৎপরে গোবিন্দ আপন অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া বলি প্রদান করেন। উহাতে সম্যক্ সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন আপনার চারিটি পুত্রের মধ্যে একটি উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর প্রবল অনিচ্ছা-বশতঃ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন এই সময় শ্রীরামচন্দ্র সেবক মহাবীরস্বামী তাঁহাকে দেখা দেন এবং আপনার 'কাছ' (ছোট পাজামা) প্রদান করিয়া বলেন উহা পরিধান করিলে তিনি অল্পায়াসেই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। শিষ্যদিগকেও ঐরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে বস্ত্র-সঙ্কট।

আবেদন ও কার্য্যবিবরণী।

গতবারের বিবরণীতে বঙ্গের ভীষণ বস্ত্র-সঙ্কটের বিষয়ে আমরা সহৃদয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম এবং উক্ত অভাব মোচনার্থ সাহায্য ভিক্ষাও করিয়াছিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা অভাব ভীষণতর আকার ধারণ করিলেও আমরা এপর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিক হইতে বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রত্যহ সাহায্য-প্রার্থনার পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণকেই যখন বস্ত্র-ভিক্ষা করিতে হইতেছে তখন গরীবের অবস্থা কিরূপ হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ আমরা এপর্য্যন্ত পাইয়াছি, তাহা অভাবের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইলেও বিশেষ অনুসন্ধানের পর নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে বিতরণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। নিম্নে কেন্দ্রগুলির নাম ও বিতরিত বস্ত্রের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।—মৈমনসিংহ ২০; নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) ১০; ধ্রুপতারা (ঢাকা) ১০; বারহাটা (হুগলী) ৩৪; মহেশপুর (যশোহর) ১০; বাঁকুড়া ৩২; গড়বেতা (বাঁকুড়া) ১০; পারুরা (মৈমনসিংহ) ১৪; কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া) ৪২; গুটিয়া (বরিশাল) ২০; কোটালপাড়া (ফরিদপুর) ২০; সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) ৪০; এবং বেলুড় (হাবড়া) ১০০খানি।

প্রত্যেক কেন্দ্রেরই সেবকগণ পুনঃ পুনঃ বস্ত্র পাঠাইতে লিখিতেছেন কিন্তু আমাদের নিকট অতি অল্পসংখ্যক বস্ত্র থাকায় তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র পাঠাইতে পারিতেছি না। যদিও আমরা বুঝিতেছি, আশু সাহায্যদান প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা ধনী-ব্যক্তিগণের নিকট, ও মাড়োয়ারী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট বিশেষতঃ যাহারা বস্ত্র-ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং সহৃদয় সাধারণের

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে তাহাদের গরীব এবং দুস্থ ভ্রাতৃবৃন্দেরই সেবা করা হইবে।

আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বস্ত্র-সঙ্কটের মূলোচ্ছেদ করিতে চরকার প্রচলনের এবং কার্পাস তুলার চাষের চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক, এই উপায়েই বস্ত্র-সমস্যার কথঞ্চিৎ মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু সাধারণের নিকট আমাদের নিবেদন,—বর্ত্তমান বস্ত্র-কষ্টের—যাহার জন্য দু'চার জনকে আত্মহত্যাও করিতে হইয়াছে, অপনয়নার্থ সমবেত চেষ্টা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে বস্ত্র-সঙ্কট নিবারণকল্পে যিনি বস্ত্র বা অর্থ দান করিয়া সাহায্য করিতে চান, তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন বাগবাজার, কলিকাতা, অথবা প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ আঃ, হাওড়া।

(স্বাক্ষর) স্বামী সারদানন্দ।
সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।
১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫
কলিকাতা।

ধর্ম্ম জিনিষটা কি?

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এই মুক্তির—এই স্বাধীনতার স্পন্দন হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের অণুরেণুম প্রদেশে যদি একত্ব না থাকিত, তবে আমরা বহুত্বর ধারণাই করিতে পারিতাম না. উপনিষদে ঈশ্বর ধারণা এইরূপ। সময়ে সময়ে এই ধারণা আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে—উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, যাহাতে আমাদিগকে প্রথমতঃ একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়—সেই আদর্শ এই যে, স্বরূপতঃ আমরা ভগবানের সহিত অভিন্ন। তিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ তিনিই কুটন্ত গোলাপকলিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের অভ্যন্তরে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার তেজ হইতেই জীবনের আবির্ভাব আবার কঠোরতম মৃত্যুও তাঁহারই শক্তি। তাঁহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাঁহার ছায়াই অমৃতত্ব। আরও এক উচ্চতর ধারণার কথা বলি। আমরা সকলেই ভয়ানক যাহা কিছু তাহা হইতেই ব্যাধানুসৃত শশকবৎ পলায়ন করিতেছি, তাহাদেরই মত নিজেদের মাথা লুকাইয়া আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতেছি। সমগ্র জগতই এইরূপ ভয়াবহ যাহা কিছু, তাহা হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এক সময়ে আমি কাশীতে এক জায়গা দিয়া যাইতেছিলাম উহার এক পাশে একটা মস্ত জলাশয় ও অপর পার্শ্বে একটা উচ্চ দেয়াল। ঐ স্থানে অনেকগুলি বানর থাকিত কাশীর বানরগুলা বড় দুষ্ট। এখন ঐ বানরগুলার মাথায় খেয়াল

উঠিল যে, তাহারা আমাকে তাহাদের সেই রাস্তা দিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পায়ে জড়াইতে লাগিল। যখন তাহারা অতি নিকটে আসিল, তখন আমি দৌড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু আমি যত দ্রুত দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম ততই তাহারা আরও দ্রুত আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। শেষে সেই বানরদিগের হাত এড়ান অসম্ভব বোধ হইল। এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল—'বানরগুলার সম্মুখীন হও।' আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি তাহারা পাছু হটিয়া গেল, শেষে পলাইল। সমগ্র জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা করিতে হইবে—যাহা কিছু ভয়ানক তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে—সাহসপূর্ব্বক উহার সাম্নে দাঁড়াইতে হইবে। যেমন বানরগুলার সম্মুখ হইতে না পলাইয়া তাহাদের সম্মুখীন হওয়াতে তাহারা পলাইয়াছিল, তদ্রূপ আমাদের জীবনের যাহা কিছু কষ্টকর ব্যাপার, তাহাদের সম্মুখীন হইলেই তাহারা পলাইয়া যায়। যদি আমাদিগকে মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই আমরা উহা লাভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলাইয়া নহে। কাপুরুষ কখন জয়লাভ করিতে পারে না। আমাদিগকে ভয়, কষ্ট ও অজ্ঞানের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, এবং আমাদের আশানুযায়ী তাহারা আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাইবে।

মৃত্যুটা কি? ভয় কিসের? ঐ সমুদায়ের ভিতর কি ভগবানের প্রেমানন দেখিতেছেন না! দুঃখ, ভয়, কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন করুন—দেখিবেন, সেগুলি আপনার অনুসরণ করিতেছে। তাহাদের সম্মুখীন হউন, তাহারা পলাইবে। সমগ্র জগৎ সুখ ও আরামের উপাসক; খুব অল্প লোকেই যাহা কষ্টকর তাহার উপাসনা করিতে সাহস করে। যে মুক্তি চায় তাহাকে এই উভয়ই অতিক্রম করিতে হইবে। মানব এই দুঃখরূপ দ্বারের মধ্য দিয়া

না যাইলে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের সকলকেই এইগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ এই প্রকৃতি তাঁহার ও আমাদের মধ্যে উঠিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে কঠোর বজ্র-মধ্যে, লজ্জামলিনতা, দুঃখদুর্ব্বিপাক, পাপতাপের ভিতর তাঁহাকে উপাসনা করিতে, তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগৎ ধর্ম্মময় ঈশ্বরকে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। আমি এমন ঈশ্বর প্রচার করিতে চাই, যিনি একাধারে ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় উভয়ই বটেন। যদি সাহস হয়, তবে এই ঈশ্বরকে গ্রহণ করুন—ইহাই মুক্তির একমাত্র উপায়—তাহা হইলেই আপনি সেই একত্ব-রূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তবেই একজন অপর হইতে বড়—এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই আমরা এই মুক্তিতত্ত্বের সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে আসিয়া থাকি, ততই আমাদের দুঃখকষ্ট চলিয়া যায়। তখন আমরা আর নরকের দ্বার হইতে স্বর্গদ্বারকে পৃথকভাবে দেখিব না, তখন আমরা আর মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব না যে, 'আমি জগতের কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।' যতদিন না আমাদের এমন অবস্থা হয় যে, আমরা—জগতে সেই প্রভুকে ব্যতীত—স্বয়ং সেই প্রভুকে ব্যতীত—আর কাহাকেও দেখি, ততদিন এই সব দুঃখকষ্ট আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, ততদিন আমরা এই সকল ভেদ দেখিব। কারণ, আমরা সেই ভগবানে—সেই আত্মাতেই সকলে অভিন্ন, আর যতদিন না আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, ততদিন আমরা সমগ্র জগতের একত্বানুভব করিতে পারিব না।

একই বৃক্ষে দুইটী সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখাস্বরূপ পক্ষী রহিয়াছে—তাহাদের মধ্যে একটী বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটী নিম্নে রহিয়াছে। নীচের সুন্দর পক্ষীটী বৃক্ষের স্বাদুকটু ফল ভক্ষণ করিতেছে—একবার একটী স্বাদু পর মুহূর্ত্তে আবার কটুফল ভক্ষণ করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে সে কটু ফল খাইল, তাহার কষ্ট হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটা

ফল খাইল—কিন্তু তাহাও যখন কটু লাগিল, তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—চাহিয়া সেই অপর পক্ষীটীকে দেখিতে পাইল যে, সে স্বাদু কটু কোন ফলই খাইতেছে না, নিজমহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধীর ভাবে বসিয়া আছে। কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়াও আবার ভুলিয়া গেল, আবার স্বাদুকটু ফল খাইতে লাগিল—অবশেষে এমন একটী ফল খাইল যাহা অতিশয় কটু, তখন সে ফলভক্ষণে বিরত হইয়া আবার সেই উপরিস্থিত মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। সে অবশেষে ঐ উপরিস্থ পক্ষীটীর কাছে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইল—যখন সে তাহার খুব সন্নিহিত হইল, তখন সেই উপরিস্থ পক্ষীর অঙ্গজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার অঙ্গে লাগিল ও ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল—তখন সে দেখিল, সে সেই উপরিস্থ পক্ষীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে তখন শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইল—দেখিল—দুটী পক্ষী বৃক্ষে কোন কালেই ছিল না—এক পক্ষীই বরাবর রহিয়াছিল। নিম্নস্থ পক্ষী উপরিস্থ পক্ষীটীর ছায়ামাত্র। এইরূপ আমরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; কিন্তু যেমন এক সূর্য্য লক্ষ লক্ষ শিশির-বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরূপে প্রতীত হয়; তদ্রূপ ঈশ্বরও বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিম্ব দূর হওয়া আবশ্যক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পারে না। সেই জন্যই কৃপণ অর্থের উপর অর্থসঞ্চয় করিতে থাকে, সেই জন্যই চোরে চুরি করে, পাপী পাপাচরণ করে; সেই জন্যই আপনারা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। এই সমুদয় গুলিরই একই উদ্দেশ্য। এই মুক্তিলাভ করা ছাড়া আমাদের জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই পূর্ণতালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি আর প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা এক দিন না একদিন লাভ করিবেই করিবে।

যে ব্যক্তি পাপতাপে মগ্ন যে ব্যক্তি নরকের পথ বাছিয়া লইয়াছে,

সেও এই পূর্ণতালাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে পারি না। যখন ঐ পথে চলিতে চলিতে সে কতকগুলি শক্ত ঘা খাইবে, তাহাই তাহাকে ভগবানের দিকে ফিরাইবে। পরিশেষে সে ধর্ম্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে। আর ধর্ম্মের অর্থ এই যে, সকলে যাহা অজ্ঞাতসারে করিতেছে, আমরা তাহা জ্ঞাতসারে করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেণ্টপল্ এই ভাবটা একস্থলে বেশ সুষ্ঠভাবে বলিয়াছেন—"তোমরা যে ঈশ্বরকে অজ্ঞাতসারে উপাসনা করিতেছ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি।" সমগ্র জগতকে এই শিক্ষা শিখিতে হইবে। এই সব দর্শনশাস্ত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি উহারা জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছিতে সাহায্য না করিতে পারে? আসুন, আমরা বিভিন্ন বস্তুতে ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সর্ব্বত্র অভেদদর্শন করি—মানুষ নিজেকে সকল বস্তুতে দেখিতে শিখুক। আমরা যেন আর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সঙ্কীর্ণ ধারণাবিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়সমূহের উপাসক না থাকিয়া তাঁহাকে জগতের সকলের ভিতর দর্শন করিতে আরম্ভ করি। আপনারা যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন; তবে আপনার হৃদয়ে যে দেবতার দর্শন করিতেছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিবেন।

প্রথমতঃ, সব সঙ্কীর্ণ ধারণাগুলি ত্যাগ করুন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে ঈশ্বর দর্শন করুন্—দেখুন, তিনি সকল হাত দিয়া কায করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিতে তিনি বাস করিতেছেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করিতেছেন, তিনি স্বতঃপ্রমাণ—আমাদের নিজেদের অপেক্ষা তিনি আমাদের নিকটবর্ত্তী। ইহা জানাই ধর্ম্ম—ইহাই বিশ্বাস, প্রভু আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন। আমরা যখন সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিব, তখন আমরা অমর হইয়া যাইব। ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমরা অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক। যত দিন এ জগতে এক জনও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, আমি

তাহার মধ্যে জীবিত রহিয়াছি। আমি এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব নহি, আমি সমষ্টিস্বরূপ। অতীতকালে যত প্রাণী হইয়াছিল, আমি তাহাদের সকলের জীবনস্বরূপ; আমিই বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদের আত্মাস্বরূপ। আমি সকল আচার্য্যগণের আত্মাস্বরূপ, আমিই চৌর্য্যবৃত্তিকারী সকল চোরস্বরূপ এবং যত হত্যাকারী ফাঁসি গিয়াছে, তাহাদেরও স্বরূপ—আমি সর্ব্বময়। অতএব উঠুন—ইহাই পরা-পূজা—আপনি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন। ইহাই যথার্থ বিনয়—হামাগুড়ি দিয়া হাতজোড় করিয়া কেবল আমি পাপী, আমি পাপী বলার নাম বিনয় নহে। যখন এই ভেদের আবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখনই সর্ব্বোচ্চ উন্নতি হইল বুঝিতে হইবে। সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব—ইহাই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মমত। আমি অমুক—ব্যক্তি-বিশেষ—এত অতি সঙ্কীর্ণভাব—যথার্থ পাকা 'আমি'র পক্ষে ইহা সত্য নহে। আমি সমষ্টিস্বরূপ—এই ধারণার উপর দণ্ডায়মান হউন—সেই পুরুষোত্তমকে উচ্চতম অনুষ্ঠানপ্রণালী সহায়ে উপাসনা করুন; কারণ, ঈশ্বর জড় বস্তু নহেন, তিনি আত্মা ও চৈতন্য পদার্থ, সুতরাং তাঁহাকে ভাবের সাহায্যে যথার্থভাবে উপাসনা করিতে হইবে। প্রথমে উপাসনার নিম্নতর প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে করিতে মানবে জড় বিষয়ের চিন্তা হইতে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আধ্যাত্মিক উপাসনার রাজ্যে উপনীত হয়, তখনই অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বরের ভাবসহায়ে উপাসনা সম্ভব হয়। যাহা কিছু সান্ত, তাহা জড়। চৈতন্যই কেবল অনন্ত স্বরূপ। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনন্ত—মানব চৈতন্যস্বরূপ—মানবও অনন্ত—আর অনন্তই কেবল অনন্তের উপাসনায় সমর্থ। আমরা সেই অনন্তের উপাসনা করিব—উহাই সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনা। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিতে পারা খুব বড় কথা—কিন্তু বড় কঠিন। আমি মতমতান্তরের কথা বলিতেছি—দার্শনিক বিচার করিতেছি, কত বকিতেছি—এমন সময় কোন কিছু আমার প্রতিকূলে ঘটিল—আমি অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। তখন ভুলিয়া

গেলাম যে—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আর কিছু আছে। আমি তখন বলিতে ভুলিয়া গেলাম যে, 'আমি চৈতন্য স্বরূপ—এ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে আমার কি হইবে—আমি যে চৈতন্য স্বরূপ।' আমি তখন ভুলিয়া যাই যে, এ সবই আমারই লীলা—আমি ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, আমি মুক্তির কথা ভুলিয়া যাই।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

পণ্ডিতেরা বার বার বলিয়াছেন,—

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ—দীর্ঘ ও কঠিন—ইহা অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু হউক কঠিন—শত শত দুর্ব্বলতা আসুক, শত শত বার উদ্যম বিফল হউক, কিন্তু তাহাতে আপনাকে যেন সেই মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে নিরুৎসাহ না করে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উঠ—জাগো, যত দিন না সেই লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদিও ঐ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—যদিও উহা দীর্ঘ, দূরবর্ত্তী ও কঠিন, কিন্তু আমরা ঐ পথ অতিক্রম করিবই করিব। মানুষ সাধনাবলে একদিন দেবাসুর উভয়েরই প্রভু হইতে পারে। আমাদের দুঃখের জন্য আমরা ব্যতীত আর কেহই দায়ী নহি। আপনারা কি মনে করেন, মানুষ যদি অমৃতের জন্য চেষ্টা করে, সে তৎ পরিবর্ত্তে বিষ লাভ করিবে? প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমরা এ বাণী, জগতের সকল শাস্ত্রই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে শুনিতে পাই। সেই বাণীই আমাদিগকে বলিতেছে,—

"স্বর্গে যেমন, মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; কারণ, সমুদয়ই তোমার রাজত্ব, সবই তোমার শক্তি, তোমারই মহিমা।" কঠিন—বড় কঠিন কথা। এই বলিলাম—"হে প্রভু, আমি এখনই তোমার শরণ লইলাম—প্রেমময় তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিলাম—তোমার বেদীতে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পুণ্য—সবই স্থাপন

করিলাম। আমার পাপ তাপ, আমার ভাল মন্দ কার্য্য সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি—তুমি সব গ্রহণ কর—আমি আর তোমাকে কখন ভুলিব না।” এই বলিলাম—“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক,” পর মুহূর্ত্তেই একটা পরীক্ষায় পড়িলাম—তখন আমার সে জ্ঞান লোপ হইল, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িলাম। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সকলেরই চেষ্টা এই মিথ্যা ‘আমি’ কে—কাঁচা ‘আমি’ কে মারিয়া ফেলা—তাহা হইলে সত্য ‘আমি’—পাকা ‘আমি’ স্বরূপ সেই প্রভুই একমাত্র বিরাজ করিতে থাকিবেন। হিব্রু শাস্ত্র বলেন,—“তোমাদের প্রভু আমি ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর-তোমরা অন্য কোন ঈশ্বরের উপাসনা করিলে চলিবে না।” আমাদের হৃদয়ে এক মাত্র ঈশ্বরই যেন রাজত্ব করেন। আমাদের বলিতে হইবে—“নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।” তখন কেবল সেই প্রভুকে ব্যতীত আমাদিগকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; তিনি, কেবল তিনিই রাজত্ব করিবেন। হয় ত আমরা খুব কঠোর সাধনা করিলাম—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমাদের পা পিছলাইয়া গেল—আর তখন আমরা মায়ের নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিলাম—বুঝিলাম, নিজ চেষ্টায় অকম্পিতপদে দাঁড়াইবার যো নাই। আমাদের জীবনটা যেন বহু অধ্যায়সমন্বিত গ্রন্থস্বরূপ—তার এক অধ্যায় এই যে—“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।” কিন্তু যদি ঐ জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়গুলির মর্ম্মগ্রহণ না করি, তবে সমুদয় জীবনটাকে উপলব্ধি করা হইল না। ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।” প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী মন ঐ ভাবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে, কিন্তু যদি আমাদিগকে ঐ কাঁচা ‘আমি’ জয় করিতে হয়, তবে বার বার ঐ কথার আবৃত্তি করিতে হইবে। আমরা একজন বিদ্রোহীর সেবা করিব অথচ পরিত্রাণ পাইব—ইহা কখন হইতে পারে না। সকলেরই পরিত্রাণ আছে—কিন্তু বিদ্রোহীর পরিত্রাণ নাই—আর আমাদের অঙ্গে ত বিদ্রোহের ছাপ লাগিয়া রহিয়াছেই—আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আমরা যখন

আমাদের 'পাকা আমি'র বাণীর অনুসরণ করিতে অসম্মত হই, তখন আমরা সেই জগন্মাতার মহিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করি। অতএব যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের দেহ মন সেই মহান্ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিলাইয়া দিতে হইবে। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, যদি মানুষ—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' একথা দুবার উচ্চারণ করে, সে পাপাচরণ করে। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—আর কি প্রয়োজন? উহা দুবার বলিবার আবশ্যক কি? যাহা ভাল, তাহা ত ভালই। একবার যখন বলিলাম—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক,' তখন ত ঐ কথা ফিরাইয়া লওয়া চলিবে না। "স্বর্গের ন্যায় মর্ত্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ, তোমারই সমুদয় রাজত্ব, তোমারই সব শক্তি, তোমারই সব মহিমা—চিরদিনের জন্য।"

পত্র।

(স্বামী প্রেমানন্দ)

বেলুড় মঠ
৫।২।১৭

পরম স্নেহভাজনেষু,

———,তোমার চিঠি ক'দিন হইল পেয়েছি। স্বামীজির উৎসব বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ওখানকার আশ্রমটী বদ্ধমূল না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার থাকিবার ইচ্ছা, ইহা অতি সুন্দর সঙ্কল্প। যদি তুমি ইহা করিয়া যাইতে পার তবে তোমার মানব-দেহ-ধারণ সফল।

সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিও যে, তুমি প্রভুর সন্তান, তাঁর দাস। তোমার মধ্যে যেন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা স্থান না পায়। সহ্য করাই

যেন তোমার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন এই সহ্য গুণের এক অপূর্ব্ব আদর্শ। ঠাকুর তাঁর সহিষ্ণুতার কত কথাই শুনাইয়াছেন। শেষে কহিতেন, "শ, ষ, স—যে সয় সে রয় যে না সয় সে নাশ হয়। তিনটে শ, ষ, স কেন জানিস?—হে জীব, সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর. আর না সইলে নাশ নিশ্চয়।" আমরা ঠাকুরের সংসারে শিখ্‌তে এসেছি। এই,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

নারায়ণ বোধে জীবের সেবা কত্তে আমাদের জন্ম; এই আমাদের সাধন, ভজন, ত্যাগ, তপস্যা। লোকের ভাল মন্দ দেখ্‌বার আমাদের সময় কই? উহা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

সকলের সুবিধাজনক স্থান একটা চাই। দরিদ্র, দুর্ব্বল, পতিত, মূর্খ—এদেরই আপনার কত্তে হ'বে। এও বলি, এক দলকে ভালবাস্‌তে গিয়ে অন্য বড় লোকদের ঘৃণা না করিয়া বসি, এদিকেও দৃষ্টি রাখিবে—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়"
——বিবেকানন্দ

সকলের সঙ্গে মিশে ঘুরে চল্‌তে হবে বাবা, এই শ্রীশ্রীপ্রভুর ও বিবেকানন্দ স্বামীর শিক্ষা।

স্থায়ী স্থান দেখে যেতে তোমার ইচ্ছা, ইহার নাম দৃঢ় নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা না থাক্‌লে মানুষ নিজের ও দেশের উন্নতি কর্‌তে পারে না। আমাদের দেশ কি রকম হবে জান? "স্বদেশোভুবনত্রয়ম্।" এই একটা দেশ আমাদের নয়, সারা পৃথিবীই আমাদের জান্‌তে হবে। সমস্ত জীবের জন্য প্রার্থনা কত্তে হবে। 'আমি আমার' অজ্ঞান মোহ, ইহা দূর করা চাই। প্রভু তুমি, তোমার জগৎ, আমি তোমার এক জন সেবক মাত্র!

কথায় উদার নয় কাজে দেখাতে হবে। আবার ঠাকুরের 'পাতকো কাটার' নিষ্ঠা চাই—এক জায়গায়।

তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও, ইহা আমার অন্তরের প্রার্থনা জানিবে। আধা করে ছাড়া ভাল নয়। তোমাদের দেখে লোকে অবাক হয়ে থাক্‌বে না? তা না হ'লে ঠাকুরের নাম গ্রহণের বিশেষত্ব কি?

যখন ভয় পাবে তখন ঠাকুরকে প্রাণ ভ'রে ডাক্‌বে, তিনিই দয়া করে শক্তি, ভক্তি, সাহস ও বল দিবেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ঢাকা যাবার এখন সম্ভাবনা নাই। তিনি আছেন মান্দ্রাজে। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

স্মৃতি।*

ভৈরবী—একতালা।

আজি কেন কার তরে ভাসে আঁখি নীরে,
বাজে হৃদয়ে করুণ বেদনা!
বুঝি, হারায়েছি তায়, স্মৃতিটুকু হায়!
রয়েছে দিতে সান্ত্বনা॥
কিবা, দিব্যমধুর প্রেমকান্তি, দরশে জাগিত বিমল শান্তি
মোহিত মন, ভুলিয়া আপন,
যাচিত চরণে করুণা॥
করুণার খনি, সে যে গুণমণি
সমদরশন সবে,

* পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজীর মহাসমাধির পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপনার্থে ঢাকা রামকৃষ্ণমঠে ভক্তসম্মিলনে গীত।

হেন মনের মতন আপনার জন,
কে দেখেছে কোথা কবে ?
সদা মাতোয়ারা. "প্রভু"র নামেতে,
ঢল ঢল অঙ্গ প্রেমভরেতে,
পূরব বঙ্গে হেরি' কৃপাঙ্গে
ক'রে নিল সবে আপনা ॥
আজি. আসি নাই শুধু কাঁদিতে কাঁদাতে
জানা'তে বাসিত ভালো,
হবে, নূতন ছাঁচেতে ঢালিতে জীবন,
হৃদে জ্বালিতে প্রেমের আলো ॥
শুন "রামকৃষ্ণ" নামে তাঁহারি আহ্বান
"জাগো বীর্য্যবান্, হও আগুয়ান্"
তাঁরে বাসো যদি ভালো, অনুরাগে চলো,
কেন আছ ব'সে আনমনা ?

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

শাস্ত্রে ত বড় বড় কথা আছে, তাতে হবে কি ? জীবনে প্রতিপন্ন করা চাই—ইহাই সাধনা।

সৎসঙ্গের এমনি মাহাত্ম্য যে কীটও নারায়ণের মাথায় উঠে, কারণ সে ফুলের সঙ্গে থাকে। তাই ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, সৎসঙ্গ কর, সৎসঙ্গে ভগবানের দয়া হয়।

আপন আত্মার কল্যাণ কর। সৎসঙ্গ, বিগ্রহ দর্শন এ সব কি বৃথা যায় ?

রোগীর সেবা করা, দুঃস্থকে খেতে পর্‌তে দেওয়া—এই সব হলো ধর্ম্ম। এর চেয়ে আর কি ধর্ম আছে?

ঠিক ঠিক ডাক্‌লে ভগবান প্রকাশ হন। লোক দেখান যেন না হয়।

গুরুবাক্যই হলো প্রধান; গুরুবাক্য সাধন কর্‌তে কর্‌তে বস্তুর প্রকাশ।

গীতা হলো ভগবানের বাক্য, গীতা পাঠ করা উচিত—

সৎবুদ্ধি চাই, সৎবুদ্ধি হ'লে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিশ্চয়ই হবে।

যে নিঃসংশয় হয়েছে, সে কত বড় ভাগ্যবান!

ত্যাগী পুরুষের উপদেশ পেয়েও সংযমী না হলে কিছুই বুঝবার সাধ্য নাই।

ভগবান্‌কে ঠিক ঠিক ডাক্‌লে নিঃস্বার্থ ভাব আস্‌বেই।

সাচ্চা কাজ কর্‌লে সে কাজ চল্‌বেই চল্‌বে, জুয়াচুরি কোন কালেই চল্‌বে না।

কর্ম্মেতেই জীব হয়, কর্ম্মেতেই দেবতা হয়।

গুরু এবং ইষ্টের প্রতি খুব নিষ্ঠা রাখা চাই। তা না হ'লে নিজেও ভগবানের নাম কর্‌বে না, অপরকেও কর্‌তে দেবে না,—একে বলে জীব ভাব, এভাব তাড়িয়ে দেওয়া ভাল।

সরলতা হ'লে ভগবানের দয়া বুঝ্‌তে পারা যায়। যার সরলতা নেই সেই হায় হায় কর্‌বে। যা জুঠলো তাতেই সন্তুষ্ট থাক, যার সরলতা নেই, সেই দুঃখ পাবে ও অপরকে দুঃখ দেবে। ভগবান সরল লোককে ভালবাসেন।

যার প্যাঁচোয়া বুদ্ধি সে একটা কথার উপর বিশটা মানে করে।

জপ ধ্যান করে কি হয়?—সরলতা।

কর্ম্মেতে—রাজা হয়,—কর্ম্মেতে প্রজা হয়।

যে সাধু হবে সে কখন পরনিন্দা পরচর্চ্চা করবে না।

জগতে কি কেহ ছোট হ'তে চায়?

কার দ্বারা ভগবান কি কর্ম্ম করান তার কি কিছু ঠিক আছে?

ভগবানকে প্রাণ ভরে ডাকলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। বাজে গল্প না করে ভগবৎ চর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা কর, নিজেরই কল্যাণ হবে।

ভিক্ষা করে কত লোক খাচ্চে সকলেরই কি উন্নতি হয়? সংসারীদের মধ্যেও অনেক মহৎ লোক আছেন।

কোন বিষয় জোর করে ত্যাগ হয় না।

উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে ডাকা, কিন্তু মান সম্ভ্রম পেয়ে আমরা তাঁকে ভুলে যাই, এই তাঁর মায়া।

এ সংসারে কাকেও বিরক্ত করা মহাপাপ।

হিংসা যদি হয়, তবে ভগবানের উপরই হওয়া ভাল।—অমুককে দয়া করিলেন, আমায় কেন করিলেন না—এটা ভাল।

ভগবান যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, ততটুকু সৎ কাজ কর—কাহারও যেন অনিষ্ট না হয়।

যত দিন বাঁচিতে হইবে, তত দিন কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই। সাধুরা ভগবানের কর্ম্ম করেন, গৃহস্থেরা সংসারের কর্ম্ম করেন; তবে যদি ভগবানে মন থাকে, তা হলেই বাঁচোয়া।

গুরুর কাছে, ভগবানের কাছে, কাম ক্রোধ দমনের জন্য খুব প্রার্থনা করিতে হয়। গুরুকে ভগবান মনে হ'লেই কাজ হইল।

নিজেকে বড় বলিয়া মনে হইলেই যত গোল। যার ছোট বলিয়া মনে ধারণা, তাহার আর কিসের গোল?

পণ্ডিত আর কাহাকে বলে? যে লেখা পড়া শিখে ভগবানের স্তব স্তুতি করে, প্রার্থনা জানায়, দুঃখ জানায়, সেই পণ্ডিত।

ভাগ্যবান কে? যে ভক্ত, যে ভগবানকে বুঝতে পারে।

খালি মন্ত্র নিলে কি হবে? মন্ত্র নিয়ে গুরুর উপদেশমত কাজ করিতে হয়, তবে তো গুরুর মহিমা বুঝা যায়।

এমন কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাতে ভগবান খুসী হন।

ঈশ্বরের দাস ভিন্ন আবার কাহার দাস হব? ঈশ্বরের দাস হইলে হিংসা চলে যায়, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব হয়।

জীবের সঙ্গ করিয়া কি হইবে?—দুর্দ্দশা হইবে। নিজেও সাধন ভজন করে না, অন্যকেও করিতে দেয় না।

পরকে কেন মানি? নিজের দুঃখ যায় না বলিয়া, নিজের উপর বিশ্বাস নাই বলিয়া।

দু' রকম বুদ্ধি—সাধু বুদ্ধি আর ভগবৎ বুদ্ধি।

যত দিন ভগবান সাক্ষাৎকার না হন, তত দিন ঠকানো বুদ্ধি যায় না।

ভগবানকে ডাকিলে শক্তি আসিবেই আসিবে।

যে ছোট খাটো একটি সংসারের হিসাব রাখিতে পারে না, সে ভগবানের বিরাট সংসারের হিসাব রাখিবে কি করিয়া?

ভগবান যাঁহাকে বড় করিয়াছেন, তিনিই বড়। লোকের বড় ছোট বলায় কি আসে যায়?

যিনি সৎ—তিনি গুরু। ইষ্টের উপর বিশ্বাস ভক্তি বাড়িয়ে দেন।

শাস্ত্রে মন্ত্র তো অনেক লেখা আছে। তাতে কি হবে? মহা-

পুরুষের নিকট হইতে ঠিক ঠিক উপদেশ গ্রহণ করিলে জীবন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

মানুষ সবই এক, কেবল কর্ম্মে পৃথক্ করেছে।

ভগবানকে যতটুকু দিবে, ততটুকু পাবে। চারি আনা দেও, চারি আনা পাবে, ষোল আনা দেও, ষোল আনাই পাবে।

ধ্যান জপ কর্‌বার যে ইচ্ছা, সেও তাঁর দয়া বুঝিতে হইবে।

ভগবানই বাপ মা, ভগবানের সন্তানের অন্য কোন বাপ মা নাই।

ঈশার প্রতি মরিয়ম।*

(দয়া)

আই প্রভু তাই
জীবনের অতীত দিনের পরে
যতবার
ফিরে ফিরে চাই
শুধু মনে পড়ে সেই সুমধুর প্রফুল্ল বয়ান
সেই দুটি আঁখি ঢল ঢল
সেই পুণ্য, অনবদ্য, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, চির দ্যুতিমান
ভাবে ভোর পাগল বিভোল।
আমি ছিনু প্রমোদে মাতিয়া, অকস্মাৎ
তোমার বারতা

* বাইবেলের New Testament এ বর্ণিত যীশু খ্রীষ্টের পতিতা নারীর পুনরুদ্ধার ঘটনা অবলম্বনে রচিত: এই নারীরই নাম Mary Magdalene (St)—"the patron saint of penitents,"

বিলাসের কলহাস্য হতে, আচম্বিতে
 উঠিল দেবতা।
শুধু স্বপনের মত টুটে গেল মোহ
 চকিতে জাগিনু আমি চেয়ে
জীর্ণ দল পত্র টুটি ধীরে ধীরে ধীরে
 শুভ্র জ্যোতি নেমে এল বেয়ে।
আলোকের পরশনে অসিতের রেখা,
 প্রমোদের বিভীষিকা যত
আমারে ঘেরিয়া নিত্য ছিল চিরদিন
 শূন্যে মিলি হইল বিরত।
তখনও পাই নাই পরশ তোমার
 তখনও বুঝি নাই প্রভু
অভাগীর পাপ তাপ লবে সব হরি
 হে দয়াল, বুঝি নাই কভু।
'ফরিসীর' ভোজগৃহমাঝে ছিলে যবে
 পতিত-পাবন
লুটাইয়ে পড়িলাম পায়ে দিনু মোর
 কুঙ্কুম চন্দন।
বিসর্জ্জিনু অশ্রুবারি পদপ্রান্তে তব
 যাচিনু মাগিয়া দুই কর
ওগো সদাশয় প্রভু, দয়া কর আজ
 পাপে মোর তনু জর জর।
মুক্ত কেশপাশ দিয়ে সযতনে তব
 মুছানু চরণ
হৃদিভোর স্নেহ মোর, দিনু পদে ঢালি
 করিয়া বরণ।
তবুও বুঝিনি মনে তুমি কি রতন
 হে প্রভু আমার,

শুধু গুণমুগ্ধা নারী —হলো আকর্ষণ,
দিনু উপচার।
গৃহস্বামী কোপভরে কি ভাবিল মনে
—ঈশা একি ভ্রষ্টাচারী জন !
তাহারে সুধায়ে বাণী, অমৃত-সিঞ্চিত
মুক্ত হোল অবিশ্বাসী মন—
"দুই ঋণী আছিল একদা, দুই দীন,
উত্তমর্ণ যার
শত মুদ্রা, দ্বিশত অপরে, দিয়াছিল
পায়নিকো আর।
তবে সেই ধনী মহাশয়, শান্ত মনে
ডাকিয়া তাদের
শুধালেন—'করিলাম ক্ষমা, এঋণের
নাহি আর ফের।'
সেই মতো জেন হে শ্রীমান, সেই মতো
এরে আমি করেছি যে ক্ষমা
ঋণ যার গুরুতর তার কৃতজ্ঞতা
হয় নাকি বহীন উপমা ?
কৃতকৃত্য একেবারে তার প্রেম তাই
উপছি উঠেছে আর সব
হে শ্রীমান্, দেখ চেয়ে, দেখ এর প্রীতি
এর পূজা কিবা অভিনব।"
ওগো প্রভু, এ কি লজ্জা দিলে তুমি আজ !
পাপীর যে বাড়ালে গরিমা
দীনের এ ক্ষুদ্র অর্ঘ্য ঢেলে দিতে পায়
বরষিলে আপন মহিমা।
করুণায় সেই দিন করে নিলে মোরে
চিরদাসী পাদপ্রান্তে তব

হে আর্ত্ত-উৎসৃষ্ট প্রাণ, হে দেব-মানব,
হে মহান্, ওহে ভব-ধব।
জ্বালা ঘুচে গেছে আজ, ভোগ বহ্নি ধুম
প্রসুপ্ত ও নির্ব্বাপিত সব
শুধু তব প্রেম আছে বক্ষ মাঝে জাগি
সুগভীর, নিভৃত, নীরব।
অলক্ষ্যে পথের পাশে যেথা তুমি আছ
দাঁড়াইয়া, ওহে অপ্রকাশ,
ক্রুশভরে অবনত মাথা, দেহযষ্টি
লুটাইয়া, বহে ঘন শ্বাস।
অচঞ্চল, অপলক আঁখি, তাই শুধু
হেরি একমনে
বিস্ময়ে হয়েছি আমি হত, ভাবি লীলা
এ ক্রুশ-মরণে!
চিহ্ন তার বক্ষমাঝে লয়ে দ্বারে দ্বারে
ঘুরেছি অশেষ
ফিরে এস প্রভু আজ মোর, ফিরে এস
ওগো পরমেশ।
ক্ষুব্ধ চিত ব্যগ্র আজি হিয়া, পেতে ঠাঁই
পদসন্নিকটে
আলোকের অবতার প্রভু, ফিরে এস
এস হে সঙ্কটে।
কোন্ নিশিভোরে পুনঃ মিলিবে হে দেখা
শুনিব সে মধুময় বাণী
"ওগো বাছা, আমি আছি নিতে পাপ তাপ
বহিতে যে জগতের গ্লানি।"
তাই প্রভু তাই
জীবনের বিগত দিনের পরে

যতবার
ফিরে ফিরে চাই
শুধু মনে পড়ে তব অতুলন অনুপম রূপা,
—অভাগীর অনন্য সম্বল
সেই ভালবাসা প্রীতি, পরাণের অপার করুণা
রক্তমাখা চরণকমল।

ভারতীয় শিক্ষা।

সাহিত্যের প্রসার।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

The debt which the world owes to our motherland is immense. Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patient-Hindu.

Hence again must start the wave which is going to spiritualise the material civilisation of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire of materialism, which is burning the core of the hearts of millions, in other lands.

—Vivekananda.

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের জগৎ ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই। ইদানীং ভারতবাসীর সাগরপারে গমন করিলে জাতি যায় কিন্তু কৌতুক দেখ, এই ভারতীয়

সাহিত্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভিন্ন দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে বিদেশীয়েরা তাহা আত্মসাৎ করিয়া নিজ প্রচেষ্টায় তাহার উপর মহিমময় জ্ঞানের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর অধুনা অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল সারা জীবন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষদের নামানুকীর্ত্তন ও চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া ক্ষান্ত আছেন। তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার কিম্বা কতকগুলি অসম্বদ্ধ আচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত। দুই এক জন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ মাত্র। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সমাজ যদি একবার ভারতের গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করিয়া বেড়ান তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের জনসমাজ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকেই কলিকাতার বৈদ্যুতিক আলোক দেখিয়া মনে করেন যে গ্রাম সকলও বুঝি ঐ প্রকার আলোকিত। বঙ্গ ও বঙ্গেতর প্রদেশে বহু পণ্ডিত আছেন কিন্তু তাঁহারা হিন্দু দর্শন বিজ্ঞানের কেবল ভাষ্য ও তটিকা, তটিকা তটিকার গিলিত চর্ব্বন করিতেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের বাস্তব জীবন তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কাজে কাজেই কণাদের পরমাণুবাদ, কপিলের ক্রমবিকাশ, আর্য্যভট্টের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বাগভট্টের নরশরীর বিজ্ঞান, নাগার্জ্জুনের রাসায়ণ প্রভৃতির আলোচনায় এবং ভিন্নদেশ হইতে তথ্য সঞ্চয় করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন এবং পাশ্চাত্যের সহিত জ্ঞানক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে একেবারে অক্ষম—কেবল ত্ব, তা প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়, অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি কল্পিত শব্দের উপর নির্ভর করিয়া ছল ও বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন।

যাহা হউক এখন বিদেশীয় নীতিকথার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে Æsop's Fableএর কথাই উঠে। কিন্তু ইদানীং বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর বিশ্বাস যে ঈশপ নামে প্রকৃত কেহ কখনও ছিল না। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হইয়াছে, যে সকল গল্প ঈশপ রচিত বলিয়া পরিচিত আছে তাহাদের অধি-

কাংশই জাতকের রূপান্তর মাত্র এবং অপর কতকগুলি বিভিন্ন লোকের রচনা। খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকদেশে কতকগুলি কথা দেখিতে পাওয়া যায়; উহা ডেমিক্রিটাস বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং Plato বর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা। এই দুইটী গল্পই বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ডেমিক্রিটসের কুক্কুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল ইহা কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। জাতকে এবং পরবর্ত্তী যুগের পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত আছে যে শৃগাল তটভূমে মাংসখণ্ড রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল—ইহাই স্বাভাবিক।—Platoর গর্দ্দভ কি করিয়া সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত হইল?—বরং জাতকে গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত করিয়া অপরের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত—ইহাই খুব স্বাভাবিক। আবার সিংহ যেমন ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল, গ্রীকদিগের নিকট তেমন ছিল না। আর এ সকল গল্পের উৎপত্তি, সাধারণ জনসমাজে, সাধারণ ভাষায় এবং সচরাচর যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা হইতেই হয়। ইহা হইতেই বেশ প্রতীয়মান হয় যে এ সকল কথা ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল দেশে গমন করিয়াছিল। তাহা ছাড়া হেরোডোটাস ও একটি আখ্যায়িকাকে পারস্য হইতে সংগ্রহীত বলিয়া স্বীকারই করিয়াছেন। Solomonএর বিচার সম্বন্ধেও যক্ষিনী জাতকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র লইয়া মাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, বালকটীকে দুই ভাগ করা অপেক্ষা বলপূর্ব্বক যে গ্রহণ করিতে পারে তাহারই প্রাপ্য ইহাই স্বাভাবিক।

কথা দুইটি যে জাতক হইতেই গ্রীসে গমন করিয়াছে, এমন নহে। জাতকের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে এ সকল কথা প্রচলিত ছিল—তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি বহু প্রাচীন গ্রন্থ। জাতকে সেইগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল মাত্র। আর জাতকের গল্পমালা এক সময়ে বা এক পুরুষের দ্বারা সংগৃহীত বা কথিত হয় নাই ইহা ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস যে Pythogorus, Socratis, Plato প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র যেরূপে প্রবেশ লাভ করে ইহারাও সেই ভাবে বৌদ্ধ পূর্ব্ব যুগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র নামক গ্রন্থখানি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খসরু নসীরবানের রাজত্বকালে পাহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পরে উহা খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়ক এবং আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। সিরিয়ক 'কলিলগ ও দমনগ' এবং আরবী 'কলিলা ও দিমনা' ইহা পঞ্চতন্ত্রের 'করটক ও দমনক' নামক শৃগালদ্বয়ের নামের অপভ্রংশ মাত্র। আরবীরা 'কলিলা ও দিমনার' রচয়িতাকে 'বিদপাই' বলিতেন। উহা সংস্কৃত 'বিদ্যাপতি'। এই 'বিদপাই' শেষে 'পিলপাই' বা 'পিল্প' হইয়া ইউরোপে পঞ্চতন্ত্র 'পিল্পের গল্প' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কথাসরিৎসাগর নামক অপর একখানি গ্রন্থও ঐরূপ ভাবে পাশ্চাত্য জগতে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আরব্য উপন্যাস ঠিক ঐ পুস্তকের ধাঁজে লিখা। অধিক কি, আরব্য উপন্যাসের শাহরিয়ার ও শাহজেমানের কথাই সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর হইতে গৃহীত। উহা শেষোক্ত গ্রন্থের দুই যুবা ব্রাহ্মণ ও এক যক্ষের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহা ছাড়া সিন্দিবাবাদ, রাজা, রাজপুত্র, যুবতী ও সপ্তমন্ত্রী এ বিষয় স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।*

শুধু তাহাই নহে শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশীয় ভাষায় রামচরিত্র, সীতাহরণ, রাবণ যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাত্ম্য কথন, বালীবৃত্তান্ত, কামধেনু, নাগকন্যা, যক্ষ রাক্ষসাদির বর্ণনা দেখিয়া ঐ সকল দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই আধিপত্য নির্দ্দেশ করে। আর ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক গ্রন্থ সকল মধ্যআসিয়ায় এবং মহাচীনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা ত সকলেই জানেন।

"ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক আরব ও পারসীক দেশের ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই সেই দেশে

* Jatak Tales Collected by Fousbal as Translated by T. W. Rhys David vol 1. Introduction.

British & Foreign Review, No xxi. p. 266.

প্রচারিত হয়। উমুন্ অল্ অম্বা ফি তল্‌কাতুল্ আত্বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও নাম কঙ্কঃ কাহারও নাম বা বাখর বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব রাজ্যেশ্বর হারুন্ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোনওরূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্কঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসাগুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন ঐ আরবী পুস্তকে দাহর, জবহর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল্, জারি, জওদর্, সানাক্, সনজহল্ এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে আরবদেশে নীত সিরক্, মসর্দ্দ ও যেদান্ নামে তিনখানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নহে। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে অলমনসুর নামক আরবী নরপতির অনুমতি ক্রমে আরবী ভাষায় একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুবাদিত হয়; উহার আরবী নাম সিন্দ্‌হিন্দ্। কোলব্রুক উহাকে সুসংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। যাকুব নামে একটি গ্রন্থকার ঐ সিন্দ্‌হিন্দ্ পুস্তক অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন।* অল্-মামূন্ নামক বাদসাহের সময় একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনুবাদিত হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই নয় অঙ্ক মূর্ত্তি এবং একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনায় যেরূপ

* Asiatic Researches, vol xi. pp 161—164.

প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই তাহা উদ্ভাবন করেন। আরবী ও পারসীক পাটীগণিত প্রণেতারা সকলেই এক বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন †। আরবীরা হিন্দুদের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা বোগদাদ নগর হইতে স্পেনের অন্তর্গত কর্‌-ডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান। খুলাসৎ-উল্‌-হিসাব্‌ নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাঁহাদের ঐ অঙ্ক প্রণালী শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস একখানি গ্রন্থে অঙ্ক গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে যাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একটী ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত (Chasles) বিচার করিয়া দেখাই-য়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খৃষ্টানেরা আরবীদের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী অবগত হইয়াছিলেন। ৭৮৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরবী নৃপতি হারুণ-অল-রসীদের আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চাণক্য কৃত বিষচিকিৎসাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মঙ্কঃ কর্ত্তৃক পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। চাণক্য কৃত বলিয়া লিখিত পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রও আরবী ও পারসীক উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে সুশ্রুতগুরু কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। আলবীরুণী নামক আরবী পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিবরণাত্মক অন্য একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যান। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে আবু সালেহ্‌

† A. R. vol. xii, pp 183—184.

রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিশর দেশীয় এলেকজেন্দ্রিয়া নগরের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়, এবং মুসলমানেরা স্পেন্ দেশ অধিকার করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে, তাহাতে আরবী ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সমস্ত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হইয়া যায়। পীজা নগর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে একজন পণ্ডিত বার্ব্বারি দেশে গিয়া আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাহা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া যান। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মেন্ পণ্ডিত হুম্বোল্ট্ বলিয়া গিয়াছেন, আরবীদের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষীয় উভয় দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণিতাংশের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, তেজোবিজ্ঞান ও চুম্বক-বিজ্ঞানের দুরূহতর ভাগ সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বদিকেও ভারতবর্ষীয় গণিত বিদ্যা প্রচলিত হয়। শ্রীমান রেনো নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। মোগল সম্রাট আকবর রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্ব্ববেদ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ সকল অনুবাদ করেন এবং পশ্চাৎ আঁকেতীই দুপেরঁ (Anquetil Duperron) কর্ত্তৃক ঐ পারসীক অনুবাদের লাটিন ও ফারসী অনুবাদ সম্পন্ন হয়।"*

---

* উপাসক সম্প্রদায়—H. H. Wilson's remarks in the Journal of the Rayal Asiatic Society, vol 6 pp 105—119—Max Muller's Lectures on the Science of Language, first series, 1862, pp 145—153—Colebrooke's disertation on the Arithmetic and Algebra of the Hindus.

শ্রীযুক্ত আমির আলি তাঁহার History of the Saracenes নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে আরবেই প্রথম চিকিৎসাবিদ্যার উন্মেষ হয় এবং এখান হইতেই জগতে উহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ মত বিলুপ্ত হইয়া ভারতেই যে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকাশ হয় ইহাই স্থিরিকৃত হইয়াছে। ভারতে খৃষ্টের জন্মিবার বহু পূর্ব্বেই যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমধিক পুষ্টিসাধন হইয়াছিল তাহা যাঁহারা শ্রীবুদ্ধদেবের চিকিৎসক জীবকের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তক্ষশীলা (Taxila) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ শেষ হইলে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃপার্শ্বে যে সকল বৃক্ষৌষধি গুল্ম প্রভৃতি আছে তাহাতে এমন কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না যাহা চিকিৎসাশাস্ত্রে অব্যবহার্য্য। জীবক কিছুকাল অন্বেষণ করিয়া এমন একটিও বৃক্ষ বা ঔষধি বা গুল্ম পান নাই যাহা তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না। তখন যে শল্যবিদ্যারও অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহাও তিনি মগধে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া যে অপূর্ব্ব চিকিৎসানৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন তাহা হইতেই বেশ বোধগম্য হয়। তিনি জাতিতেও যে খুব উচ্চবংশ ছিলেন তাহাও নহে। জীবক বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে এবং শালবতী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।*

পরে ভারতবর্ষ হইতে যে কেবল দর্শন বিজ্ঞানাদিই অপর দেশে গমন করিয়াছে এমন নহে। তারী খুল হোকৃমা নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীরা ভারতবর্ষ হইতেই সঙ্গীতশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে তাহার প্রচার ও উৎকর্ষ সাধন করেন। উহার নাম 'বিয়াফর্' অর্থাৎ 'বিদ্যাফল' বলিয়া কথিত হইয়াছে। পারসীক গ্রন্থকারেরা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড হইতে শতরঞ্চ খেলাটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত পারস্থানে আগমন করে। উহার সংস্কৃত প্রতি শব্দ চতুরঙ্গ। পার-

* জাতক ১ম খণ্ড পরিশিষ্ট—২৮২ পৃঃ—শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

গ্রীকরা উহাকে চতুরঙ্গ বলিতেন এবং আরবীরা তাঁহাদের ভাষায় ঐ শব্দটির আছন্ত অক্ষর না থাকায় উহাকে শতরঞ্চ বলিয়া উল্লেখ করেন †। আর আজকাল যাহাকে Lantern Lecture বলে তাহার যে মূল প্রথা অর্থাৎ ছবির দ্বারা উপদেশ ও গল্পগুলি শ্রোতা ও দর্শকদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ইহাও ভারতবর্ষ হইতে আরবের মধ্য দিয়া ইউরোপে গমন করে। বেরুট স্তূপের ছবিগুলিই ইহার প্রমাণ। পূর্ব্বে আরবীরা বিদপাইয়ের গল্পের সহিত ছবিও ব্যবহার করিতেন। ইউরোপীরা যখন ঐগুলি সংগ্রহ করেন তখন গল্পের সহিত ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন। Rhys David আর একটি ব্যাপার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "উষ্ণস্নান" ভারতবর্ষ হইতেই বোধ হয় তুরস্কবাসীরা গ্রহণ করেন। কারণ ঐ স্নানের বিষয় বিনয় পিটকের ৩য় খণ্ডে ১০৫—১১০, ২৯৭ শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা আছে ‡। আর ইদানীং যাহাকে Polo খেলা বলে উহাও ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। উহা ভারতবর্ষে "চোগান" নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট আকবর উহার সমধিক উন্নতি সাধন করেন ¶।

কিন্তু নবযুগে উদীচ্য খণ্ডে ভারতীয় শিক্ষার প্রথম উদ্বোধন হয় আঁকেতীই দুপের কর্তৃক উপনিষদ যেদিন হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই বীজ নিক্ষেপের পরেই সে ক্ষেত্রে সোপেনহাওয়ার (Schopenhaur), মক্ষমূলর (Max Muller) ডুসন (Deussen) প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদান্তিকদের উদ্ভব হইল। এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ দর্শনও ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া উহার সমধিক উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছে। ভারতও সে দর্শনোদ্যানের উৎকর্ষ সাধন করিবার

† Asiatic Researches. London vol 11. pp. 159—165.

‡ Buddhist India p. 74—Rhys David.

¶ 'Akbar'—Colonal Malleson.

জন্য তাহার রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দকে পাঠাইলেন। ধীরে ধীরে উদ্যানটী ফলফুল সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এখনও উহা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিই হয় উহার পল্লব গ্রহণ করিয়া নিজ চিন্তাগৃহের সৌন্দর্য্য সাধন করিতেছেন, কেহ বা গুপ্ত ভাবে সে উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া উহার স্তবক জন সমাজে বিক্রয় করিতেছেন আর কেহবা গোপনে উহার ফল ভোক্ষণ করিয়া মনের ক্ষুধা মিটাইতেছেন।

বেদান্ত প্রচার হইতেছে বটে কিন্তু ইহার এক বিষম অন্তরায় আছে, তাহা ঐ শাস্ত্রান্তর্গত ভোগনিরাসবাদ। এতদিন ধরিয়া যে ভোগরাজ্য নির্ম্মাণ করিলাম, তাহাতে কত ইন্দ্রপুরী, কত বিদ্যুৎ-বাষ্পের সরঞ্জাম, তাহা এক মুহূর্ত্তে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিতেও মহাতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু বল দেখি এত দিন ধরিয়া ত ভোগ করিলে, প্রকৃতিকে ত নানারূপে বশীভূত করিয়া নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে কিন্তু ভোগ পিপাসা কি এক বিন্দুও মিটিয়াছে। আমরা ত দেখিতেছি ভোগরাজ কালিয় তাহার সহস্র ফণা উত্তোলন করিয়া তোমায় দংশন করিতেছে; জড় বিজ্ঞানের নিকট যে, সোডম ফল (Apples of Sodom) লাভ করিয়াছ উহা যে ওষ্ঠের নিকট আনিলেই ছাই হইয়া যায়। প্রকৃতিকে মন্থন করিয়া যেমন অমৃত লাভ করিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে যে ভীষণ গরল উঠিয়াছে তাহা কণ্ঠে ধারণ করিবার অখিল জীব-জ্বালা নিবারণকারী সর্ব্বত্যাগী, মহাযোগী শঙ্কর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন? সর্ব্বধ্বংসী হিংসাদ্বেষের গরলে জগৎ যে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! Frederation of the World, One Parliament of Man প্রভৃতি কবি বাক্য, কেবল কি কথার কথা থাকিবে? আধুনিক রাজনীতিসহায় কতকগুলি মানব উহা বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে গিয়া Anarchism, Nihilism, Socialism প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কতটুকু

উপকার হইয়াছে? আমাদের বিশ্বাস রাজনীতি সহায়ে Universal Brotherhood জগতে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। উহা যদি কখনও কোনও প্রকারে সম্ভবপর হয় তাহা ধর্ম্মের দ্বারা। কিন্তু সে ধর্ম্ম কিরূপ?—যে ধর্ম্ম কখনও মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক জীবকে তাহার নিজ নিজ আত্মশক্তি বিকাশের অবসর দেয়—যে ধর্ম্ম ভাব ও বিচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের বিরোধী—যে ধর্ম্ম নিজ প্রেম ও উদারতা বলে বর্ণ ও জাতির কঠোর শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীবক্ষ হইতে কাফের, যবন, হিদেন প্রভৃতি অতি জঘন্য কলঙ্ক একেবারে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ—সেরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন। হে মানব! চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখ, ভক্তপ্রাণ শ্রীভগবান তোমাকে তাহার অভাবগ্রস্থ দেখিয়া সকল যুগের সকল ধর্ম্ম কঠোরতার মহোর্ম্মি গঙ্গাধরের ন্যায় তপঃরূপ নিজ জটাকলাপে ধারণ করিয়াছেন—পরে ভগীরথের ন্যায়, নামমাত্র স্মরণে হিংসাদ্বেষ ধ্বংসকারী 'যত মত তত পথ' ধর্ম্মরূপ এক নব মন্দাকিনী ধারা শ্রীবিবেকানন্দ জীব সমক্ষে আনয়ন করিয়া ধরাতল পবিত্র করিয়াছেন। হে অমৃতের সন্তান! নিজ স্বরূপ চিন্তা কর, আলস্য জড়তা ত্যাগ করিয়া সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্তি তৃষ্ণা দূর কর।

(সমাপ্ত)

আমাদের সাধনা।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ)

রাত্রির অবসান হইয়াছে। নবোদিত অরুণের সুবর্ণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত। একদিকে বিহঙ্গের কলতান, কল্লোলিনীর সুধামাখা সঙ্গীত আর অন্যদিকে জীবন-সংগ্রামে নিয়োজিত বীর-বৃন্দের বিকট হুঙ্কার ও দুর্ব্বলদিগের কাতর আর্ত্তনাদ—উভয়ের মিলনে এক বিরাট ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে, সর্ব্বত্রই জাগরণের চিত্র পরিস্ফুট, শুধু আমাদের দ্বারে অর্গল রুদ্ধ—গবাক্ষ বদ্ধ—গৃহে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার—আমরা কোমল শয্যায় দেহসংরক্ষণ করিয়া স্বপ্নভরে প্রলাপ বকিতেছি! গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক, আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। হায়! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আত্মোন্নতি, দেশোন্নতি, সমাজোন্নতির জীবনপাতী চেষ্টা—আর ভারত নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট জড়প্রায়! সমগ্র জগৎ ক্রমোন্নতির দিকে বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইতেছে, দেশপুঞ্জ স্ব স্ব শক্তির যথাযথ পরিচালনা দ্বারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, যাহারা এই জ্ঞানভাণ্ডারের ক্রমবর্দ্ধনকল্পে সাহায্য করিতে পারে তাহারাই আধুনিক যুগে সভ্য জাতির সভায় আসন পাইতেছে! ভারতবাসী জড়প্রায় তাই সে মানবের এই মহা সাধনায় ব্রতী হইতে পারে নাই—জ্ঞানার্জ্জনের এই বিপুল চেষ্টায় তাহার শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে নাই—যুগযুগান্তসঞ্চিত কুসংস্কারের আবরণে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া এক পাশে পড়িয়া আছে। তাই সভ্যজাতির সভায় তাহার আসন নাই, তাই সে জগতের কাছে অতি হেয়, অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য!

সত্যই কি জগতের এই মহাসাধনায় সাহায্য করিবার আমাদের কোন সামর্থ্য নাই? সত্যই কি জ্ঞানভাণ্ডারে দান করিবার উপ-

যোগী কোন রত্নই আমাদের নাই? ' নিশ্চয়ই আছে। আমরা দেখিতেছি, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জ্ঞানের কিয়দংশ প্রদান করিয়া জগতে এক নূতন যুগের অবতরণা করিয়াছেন, জড়বাদী পাশ্চাত্যজগৎ আজ এই যুগাচার্য্যের সাহায্যে বেদান্তোক্ত বিশ্ব-ব্যাপী চৈতন্যের সত্ত্বা অবধারণ করিতে উদ্যত! ভারতে যাহা আছে তাহা আর কোথাও নাই—ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ—ভারত বহু শতাব্দি ধরিয়া জগৎকে বহু প্রকারে শিখাইতে পারে। ভারতবাসীর তুলনায় জগতের অন্যান্য জাতি তরুণ। ভারত এক সময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল। কালের অলঙ্ঘ্য আবর্ত্তনে যদিও ভারত আজ গভীর গহ্বরে নিপতিত তথাপি তাহার কষ্টসঞ্চিত জ্ঞানরাশি এখনও তাহার অঞ্চলে রক্ষিত। তাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের সমাজে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র উদ্ভিদের চৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আজ যাহা বলিতে আসিয়াছি—ইহা নূতন কিছুই নহে। এ তত্ত্ব আমার গবেষণার মৌলিক আবিষ্কার নহে। এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিগণের উক্তি হইতে আমি সংগ্রহ করিয়াছি। আমি মাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে এই তত্ত্বের প্রমাণ করিতে আসিয়াছি, তাই বলিতেছিলাম অতি অপূর্ব্ব অতি অমূল্য রত্নরাশি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তথাপি সভ্যসমাজে আমরা নগণ্য!" ইহার কারণ আমাদের জড়তা। এখন ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে চাই প্রত্যেক ভারত-বাসীর অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম। চাই তাহার ত্যাগ, বীর্য্য, সাহস। তাহাকে ভারতীয়জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, আর উহার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংমিশ্রণ করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে। শুধু মস্তিষ্কের শক্তির প্রসার দ্বারা জীবন গঠিত হয় না—হৃদয়ের বিস্তার চাই। অর্জ্জিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেকের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যক্তিগত জীবন গঠিত হইলে সমষ্টিগত জীবন স্বতঃই গঠিত হইবে। তখন আমাদের চিন্তা, বাক্য

ও কার্য্যের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হইবে। আর আমরা সত্য সত্যই জগতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার অধিকারী হইব।

এই জাতীয় জীবন গঠিত করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখিতে হইবে, এই জাতির বিশেষত্ব কি। যেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষত্ব আছে সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও একটি বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরই জাতির সত্বা প্রতিষ্ঠিত। ইহাই জাতির মেরুদণ্ড। ইহা হারাইলে জাতির লোপ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। একটু বিচার করিলেই দেখা যায়, ভারতবাসীর বিশেষত্ব তাহার আধ্যাত্মিকতা। কারণ প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভারতবাসীর জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ। ভারতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই ধর্ম্মতত্ত্বে ন্যূনাধিক ব্যুৎপত্তি আছে। ইংলণ্ডে যেরূপ রাজনীতি সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান-গোচার, ভারতে সেইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ ভারতে ধার্ম্মিকেরাই (যথা সাধু, সন্ন্যাসী) সর্ব্বসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মের জন্যই ভারতবাসী অধিক ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। চতুর্থতঃ, ভারতের সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকলই ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিবাহে, সম্পত্তির অধিকারে—ধর্ম্মগ্রন্থেরই প্রাধান্য। ভারতবাসী সমাজের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দান করেন না—নিজের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তাহার দানব্রত অনুষ্ঠিত হয়। যতই বিচার করা যায় ততই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের বিশেষ আদর্শ ধর্ম্ম। ধর্ম্মলাভের জন্যই ভারতবাসীর সমুদায় শক্তি নিয়োজিত। ধর্ম্মানুরাগই ভারতবাসীর বিশেষত্ব। অতএব ভারতে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মরূপ ভিত্তি দৃঢ় করিতেই হইবে। ভারতবাসীর ধর্ম্মানুরাগ শিথিল হইলে, তাহার যুগযুগান্তগঠিত বিশেষত্ব লোপ পাইলে সে ক্রমেই জড় হইয়া পড়িবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ধর্ম্ম কি,—স্থূলতঃ জীবের অনন্ত জীবন, অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত জ্ঞান লাভ করিবার যে চেষ্টা প্রণালী

তাহাই ধর্ম্ম। এই অবস্থালাভ করিবার জন্য তিনটী মৌলিক বাসনার প্রেরণাতেই জীবের সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই বাসনাত্রয়ই সৃষ্টি সংরক্ষণ করিতেছে, তাই ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি—ধৃ + মন। যাহা হউক উদ্দেশ্য এক হইলেও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; কেহ আনন্দ লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত, আবার কেহ বা আনন্দ লাভ করিবার জন্য বহির্জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যানস্থ। বারাঙ্গনা-সঙ্গীত-মুগ্ধ মদিরাসক্ত ভোগী যে বস্তুর অভিলাষী, গিরিগুহাস্থিত কঠোর তপস্যানিরত যোগীও তাহারই অভিলাষী। অভিলাষ এক—আনন্দ লাভ। ইহা সকল জীবের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইতেছে—ইহারই প্রবল আকর্ষণে জীবপ্রবাহ অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। মানব মন স্বভাবতঃ বহির্মুখী। তাই সে বহির্জগতেই আপনার প্রিয়তম বস্তুর অন্বেষণ করে। কিন্তু ভ্রান্ত মানব একবারও তাহার প্রিয়তমের স্বরূপ চিন্তা করে না। তাহার প্রিয়তম যে অনন্ত। অনন্ত জীবন, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞানকেই যে সে প্রিয়তম বলিয়া পূর্ব্বেই হৃদয়ে আসন পাতিয়া দিয়াছে, কেবল তাহা তাহার স্মরণ নাই; বহির্জগৎ যে অতি সঙ্কীর্ণ উহা মানবের শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ; মানবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ মাত্র এই পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, তাই বহির্জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ ব্যতীত আর কিছুই তাহার জ্ঞানগোচর নহে। তাহার কোটী ইন্দ্রিয় থাকিলেও বহির্জগৎ সসীমই হইত, অনন্ত হইত না। অতএব এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ-রচিত সসীম জগতে মানুষ কিরূপে অনন্তের সন্ধান পাইবে? ইহা অসম্ভব। সর্ষপের ভিতরে হিমালয়ের সন্ধান যেরূপ ভ্রান্তিমূলক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সঙ্কীর্ণ বহির্জগতে অনন্তের অনুসন্ধান তদপেক্ষাও ভ্রান্তি-মূলক।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

অমৃতত্বের অধিকারী দু' একজন মাত্র। বিবেকী ইন্দ্রিয়গুলিকে

বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই অমৃতত্বের স্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সন্ধান বলিতে পারেন। যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকে অমৃতের পন্থা দেখাইতে মহাপুরুষ অবতারাদির আবির্ভাব হয়। তাঁহারা জীবের উদ্দেশ্যসিদ্ধি কল্পে যে পন্থা নির্ব্বাচিত করেন, তাহাও ধর্ম্মনামে অভিহিত। বেদের ঋষিগণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, নানক, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি অবতার ও মহাপুরুষগণ যে পথে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই পথ মানুষকে দেখাইতে গিয়া একটি একটি ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্ম্মগুলি বিভিন্ন হইলেও ইহাদের উদ্দেশ্য এক এবং ইহাদের নির্দ্দিষ্ট "সাধ্যপ্রণালীর" ভিত্তিও এক। সকল ধর্ম্মেই জীবের মৌলিক বাসনার তৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সকল ধর্ম্মই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, ত্যাগের দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নহে। অতএব পূর্ণত্বে জ্বলন্ত বিশ্বাস ও তল্লাভে বৈরাগ্য অভ্যাসই সকল ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ—ইহাই ধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন।

বুঝিলাম, বহির্জগতে অনন্তের সন্ধান নিষ্ফল, তবে কোথায় তাহার সন্ধান করিব? যেখানেই আমার প্রিয়তম থাকুক না আমি তাহাকে লাভ করিব কিরূপে? আমার শরীর যে ক্ষুদ্র, সসীম, ক্ষণস্থায়ী। এই শরীরের দ্বারা পূর্ণত্ব সম্ভোগ অসম্ভব। আমার মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং অপূর্ণ সসীম,—ইহাঁর দ্বারাও অনন্ত আনন্দ, সত্বা ও জ্ঞানের সম্ভোগ অসম্ভব। অতএব যতক্ষণ শরীর ও মনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমার আমিত্ব বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ পূর্ণত্ব সম্ভোগ হইবে না, এই আমিত্ব বোধটি মন ও শরীরের গণ্ডি হইতে সরাইয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণত্বে ডুবাইতে পারিলেই জীবের মৌলিক বাসনা তৃপ্ত হয় নচেৎ নহে। তাই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইলে যখন সমুদয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তখনই মানব তাহার চিরবাঞ্ছিত পূর্ণত্বের স্বাদ পায়, অতএব ক্ষুদ্র শরীর ও মনের গণ্ডিমধ্যস্থ "ছোট আমিটি"কে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতে হইবে।

এই "ছোট আমি"টিকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে—শরীর ও মনের ভোগচিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তবেই অমৃতত্বের অধিকারী হইব, নচেৎ নহে।

কিন্তু আমাদের মন স্বার্থ লইয়া বিব্রত। তাই পরার্থে অনুষ্ঠান অভ্যাস করিয়া এই স্বার্থচিন্তার লয় সাধন করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াকেই শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশোধন বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথমে চিত্তশুদ্ধি চাই অর্থাৎ মন হইতে স্বার্থচিন্তার দূরীকরণ আবশ্যক। অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান ইত্যাদি পরার্থ অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ের বিস্তার হইবে। স্বার্থচিন্তা দূরীভূত হইবে। চিত্তশুদ্ধ হইবে আর ক্রমেই জীব সমগ্র বিশ্বকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইবে। এইরূপে যখন তাহার প্রেম কোটিকর প্রসার করিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিবে তখনই এক শুভ মুহূর্ত্তে সে দেখিতে পাইবে যে তাহার "বিশ্ব" ও তাহার "আমি" মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উহা এক বিরাট আমিত্বের বোধ! এই ক্ষুদ্র শরীরে গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্রআমি বিশ্বব্যাপী এক বিরাটআমিতে পরিণত হইয়াছে। এই জীবের পূর্ণাবস্থা, এই জীবের ধর্ম্মলাভ। এই অবস্থা লাভের জন্যই জীবপ্রবাহ ছুটিতেছে—সকল গণ্ডি ভেদ করিয়া আপনাকে এক অসীমের মধ্যে হারাইতে হইবে। ইহাই তাহাদের সাধনা। এই সাধনা যতদিন অপূর্ণ থাকিবে ততদিন তাহাদের বিশ্রাম নাই। ততদিন সীমা লঙ্ঘন করিবার অবিরাম প্রেরণা তাহাদিগকে চালিত করিবে। ক্রম-বিকাশ-বাদ সম্বন্ধে যাঁহারা অবগত তাঁহারা জানেন যে কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কেবল শক্তিবৃদ্ধি করিবার, সীমা লঙ্ঘন করিবার এক বিরাট চেষ্টা বিদ্যমান। সকলেই বাধা অতিক্রম করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে স্ব স্ব শক্তি নিযুক্ত করিতেছে। মানব সমাজে এই চেষ্টা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ খেচর নহে কিন্তু তাহার আকাশ পথে বিচরণ করা চাই। মানুষ জলচর নহে কিন্তু তাহার মধ্যে বাস করা চাই। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় চতুর্দ্দিকে সীমা লঙ্ঘন

করিবার এক বিপুল আয়োজন'! আমরা সত্য সত্যই ভাগ্যবান্ যে আমরা এমন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে দেশে যুগযুগান্ত পূর্ব্বে এই সীমা লঙ্ঘনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চেষ্টার কোথায় পরিণতি তাহা ভারতবাসী স্বতঃই উপলব্ধি করিতে পারে এবং এই চেষ্টা কিরূপে সফল হইবে তাহা ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। যতই আমরা জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকি না কেন, আমাদের শরীর, আমাদের হৃদয় ঋষিবাক্য দ্বারা আমূল গঠিত। আর্য্যাবর্ত্তের জলে বায়ুতে এখনও উপনিষদের ভাব লহর তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। আর্য্যাবর্ত্তের আকাশ এখনও প্রণব ধ্বনিতে মুখরিত। আর্য্যাবর্ত্তবাসীর হৃদয় এখনও এই অদ্ভুত সঙ্গীতের সহিত তালে তালে স্পন্দন করিতেছে!

প্রত্যক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য-সমূহ আজ সংস্কারবদ্ধ হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে বর্ত্তমান। তাই আমাদের আদর্শও স্থির, উপায়ও নির্দ্দিষ্ট। পূর্ণত্ব-লাভ আমাদের আদর্শ, আর আত্মপ্রসারণ ইহার উপায়।

কিন্তু আমরা যেন উদ্যম হারাইয়াছি, উদ্দেশ্য স্থির থাকিলেও, উপায় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও আমাদের যেন ঐ উপায় অবলম্বন করিবার শক্তি নাই। আমরা যেন গন্তব্য পথ ভুলিয়া গিয়া "Lotus-eaters" দের মত এক ঐন্দ্রজালিক রাজত্বে, মুগ্ধ হইয়া আছি। সমগ্র ভারত যেন এক মোহনিদ্রায় আবিষ্ট, এক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু চাহিয়া দেখ, জাগরণের চিহ্ন যেন লক্ষিত হইতেছে। অমানিশার অন্ধকারে যেন আলোকের ক্ষীণ রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের শ্রেষ্ঠবীর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি একবার তাকাও। যেন আমাদের মোহনিদ্রা দূর করিবার জন্য তিনি সততই বলিতেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" তিনি যেন আরও বলিতেছেন, "একবার জাগ্রত হইলে, একবার আপনাকে চিনিতে পারিলে এই জাতি সমগ্র জগৎকে আদর্শ দেখাইতে পারিবে। সমগ্র জগৎ আজ জীবনের সমস্যা সমাহিত করিতে সচেষ্ট। তাহারা আদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছে না,

তাহারা দিশাহারা হইয়া এক অজ্ঞাত পূর্ণত্ব লাভের ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে ভারতের উত্থান প্রয়োজন, ভারতকে তাহার বহুকালসঞ্চিত সর্ব্বোচ্চ আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিতে হইবে। আর ঐ আদর্শলাভের উপায়ও শিখাইতে হইবে। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় থাকিলে শিখাইবে কে? জগতের সমস্যা মিটাইবে কে? "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" এস আমরা কর্ম্মের এই মাহেন্দ্রক্ষণে অনার্য্যোচিত জড়তা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হই। এস আমরা আমাদের "ক্ষুদ্র আমি"কে ভারতসমুদ্রের অতল তলে নিক্ষেপ করি, এস আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে সহস্র দিকে প্রসারিত করি। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত, এস আমরা সেবাধর্ম্মের এক বিরাট অভিনয় করি। ক্ষুদ্র নহে, সব বিরাট। ক্ষুদ্রে আমাদের পিপাসা দূর হয় না, প্রেমের বিস্তার, কলহ ত্যাগ ইহাই আমাদের কর্ম্ম। আত্মপ্রসারণই আমাদের উদ্দেশ্য, সিদ্ধির একমাত্র পন্থা। বৃথা শক্তির অপচয় না করিয়া যাহার যেদিকে রুচি সে সেই দিকে আত্মশক্তির ক্রমবিস্তার করিয়া জগতের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করি। জড়বাদী স্বার্থ লইয়া অপরের সহিত কলহ করুক। আর চৈতন্যবাদী আমরা, স্বার্থ ছাড়িয়া অপরকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হই। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, এই এক সর্ব্বজনীন উদার আদর্শে গঠিত করি। জগৎ দেখিয়া স্তম্ভিত হউক। আর একবার আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হউক। ভোগ, বিলাস, মানযশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হই। জগতে আর একবার এই সনাতন সত্য ঘোষিত হউক যে, ত্যাগের দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নহে;

মা

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি. এল্)

(১)

যুগযুগান্তর ধোরে মা তোমার পূজা হয়ে আস্‌ছে। যে যে ভাবে ডাক্‌ছে, তোমাকেই ডাক্‌ছে। উপাসনা পূজা, তোমা ছাড়া হোতে পারে না।

"দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ ॥"

তুমি পরম ব্রহ্মের শক্তি। বৈদিক ঋষি তোমাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

ব্রহ্ম শান্ত শিব অদ্বৈত—অশরীর। তুমি গুণময়ী অলৌকিকী শরীরী।

"পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে
জ্ঞানবল ক্রিয়াত্মিকা।"

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মা তোমার উর্জ্জিত জ্ঞান, উর্জ্জিত বল, ও উর্জ্জিতা ক্রিয়া।

শ্বেতাশ্বতর ঋষিও দেখেছিলেন,

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্ ॥

মা! তুমি উৎপত্তিরহিত ও সত্ত্ব-রজ-তম-ময়ী। স্মৃতিকারও বলেছেন,

"অস্য শক্তিঃ মায়া অগ্নি শক্তিবৎ ॥"

ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি।

(২)

চৈতন্যে ত্রিগুণ মিশ্‌লে তবে ব্যবহার হয়। শুধু অনিলে বা শুধু সলিলে তরঙ্গ হয় না। কেবল চৈতন্যে ব্যবহার হয় না, বা কেবল গুণে ব্যবহার হয় না। অভিমানশূন্য সুপ্ত দেহ দিয়া

কোন্ কাজ করা চলে? আবার তুরীয় অবস্থায়, কাকে, কি দিয়ে, কে দেখিবে? সেজন্য,—

"ব্রহ্মণি এবা স্থিতা মায়া সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী॥"

মা, তুমি পরমশিবের অঙ্কস্থা হ'য়ে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্‌ছ।

(৩)

তুমি ঈশ্বরী রূপেঃ ভুবন ও জীব নিয়মন কর্‌ছ। তোমার অন্তর্যামী শক্তি হেতু সমুদ্রবেলা অতিক্রম করে না, চন্দ্র সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয় না, জীব জন্মমৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না।

তুমি মনমালার মধ্যে সূত্ররূপে বিরাজ কো'রে সূত্রাত্মা হ'য়ে নানা রসাস্বাদ কর্‌ছ।

আবার সহস্রশীর্ষা হো'য়ে নানা মুখে খাচ্ছ।

আমি ক্ষুদ্র, কারণ আমার দেহ ক্ষুদ্র, আমার মন ক্ষুদ্র। তুমি মহান্ কারণ, তোমার দেহ বিরাট্, তোমার মন বিরাট্। আমার অভিমান এই ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র মনে। তোমার অভিমান সকলদেহে সকল মনে। অতএব তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। তোমার মন শুদ্ধসত্ব, আমার মন মলিন। অতএব তোমার শক্তি উৎকৃষ্ট, আমার শক্তি নিকৃষ্ট। সেজন্য তুমি নিয়ামক, আমি নিয়ম। কিন্তু পূর্ণ অংশ, নিয়ামক নিয়ম্য প্রভৃতি ভেদ দেহমনের মধ্য দিয়ে হয় তাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের সার্থকতা হয় চৈতন্যের দিক হ'তে। যে চৈতন্য সমস্ত ভুবন প্রকাশ কর্‌ছেন, সেই চৈতন্যই আমার এই ক্ষুদ্র দেহমনও প্রকাশ কর্‌ছেন। চৈতন্য অশরীর, সেজন্য তাঁর পূর্ণ অংশ নিয়ম নিয়ামক হয় না। তিনি শুদ্ধ প্রকাশস্বভাব।

(৪)

মৈত্রেয়ী উপনিষদে আছে, মা তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হয়েছ।

"অথ যো হ খলু বাব অস্য রাজসঃ
অংশঃ অসৌ সঃ যোঽয়ং ব্রহ্মা।"

তোমার রাজস্ অংশ হ'তে ব্রহ্মা হয়েছেন।

"অথ যো হ খলু বাব অসৎ তামসঃ
অংশঃ অসৌ সঃ সোঽয়ং রুদ্রঃ"।

তোমার তামস অংশ হ'তে রুদ্র হয়েছেন।

"অথ যো হ খলু বাব অস্য সাত্ত্বিকঃ
অংশঃ অসৌ সঃ যোঽয়ং বিষ্ণুঃ"॥

তোমার সাত্ত্বিক অংশ হ'তে বিষ্ণু হ'য়েছেন। মা! তুমি ব্রহ্মাণী রূপে সৃষ্টি কর, বৈষ্ণবী রূপে পালন কর, আর রুদ্রাণী রূপে সংহার কর।

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপ কবির কল্পনা নহে বা তথাকথিত পৌরাণিক যুগের বিকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

(৫)

আবার মা, দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনী, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি, চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ প্রমুখ অধিকারিক দেবতা হ'য়েছ। নরাবতার অর্জ্জুন প্রণাম করে বলেছেন,—

"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ।
প্রজাপতি স্বং প্রপিতামহশ্চ॥"
নমোস্তুতে সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমঃ নমস্তে॥"

এঁরা তোমার স্থিতিকাদির সহায় হয়েছেন। তুমি নাগলোক, মানুষলোক, পিতৃলোক, দেবলোক। ঋষিলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন ক'রে এবং সেই সেই লোকবাসী নানা শরীর সৃজন ক'রে তাদের নানা ভোগ দিতেছ।

(৬)

আবার মা যুগে যুগে অবতাররূপ দিব্য বিগ্রহ ধারণ ক'রে জীবকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছ। কখন বারাহী রূপে, কখন নারসিংহী রূপে, কখন রাম রূপে, কখন কৃষ্ণ রূপে, কখন শিব রূপে, কখন দুর্গা রূপে, কখন কালী রূপে—এইরূপ কত কত রূপে নব নব শিক্ষা দিতেছ। ব্যাসপ্রমুখ পুরাণকারগণ ভক্তিচিত্তে

তোমার সেই সব মহিমা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সিদ্ধ পুরুষও গিয়েছেন—

"মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষী
কালী কৃষ্ণ শিব রাম
সকল আমার এলোকেশী।"

(৭)

আবার তন্ত্রে আছে, মা তুমি বর্ণময়ী। তুমি বর্ণমালা প'রে আছে।

যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে॥

অকরাদি এক একটী বর্ণ এক একটী শক্তির মূর্ত্তি।

অ কীর্ত্তি, আ কান্তি, ই তুষ্টি, ঈ পুষ্টি, উ ধৃতি, ঊ শান্তি, ঋ ক্রিয়া, ৠ দয়া, ঌ মেধা, ৡ হর্ষা, এ শ্রদ্ধা, ঐ লজ্জা, ও লক্ষ্মী, ঔ সরস্বতী, অং প্রীতি অঃ রতি—এই ষোড়শ স্বরশক্তি। ক জয়া, খ দুর্গা, গ প্রভা, ঘ সত্যা, ঙ চণ্ডা, চ বাণী, ছ বিলাসিনী, জ বিজয়া, ঝ বিরজা, ঞ বিশ্বা, ট বিনদা, ঠ সুনন্দা, ড স্মৃতি, ঢ ঋদ্ধি, ণ সমৃদ্ধি, ত শুদ্ধি, থ ভক্তি, দ বুদ্ধি, ধ মতি, ন ক্ষমা, প রমা, ফ উমা, ব ক্লেদিনী ভ ক্লিন্না, ম বায়ুদা, য পরা, র পরায়ণা, ল সূক্ষ্মা, ব সন্ধ্যা, শ প্রজ্ঞা, ষ প্রভা, স নিশা, হ অমোঘা, ক্ষ বিদ্যুতা, এই ৩৪টী হল শক্তি—সমুদায়ে পঞ্চাশৎ শক্তি। এই সব মূর্ত্তি সর্ব্বকামফলপ্রদা। এই সমস্ত শক্তি মার সঙ্গিনী। মা এই সব শক্তিসমন্বিতা হ'য়ে বিরাজ করছেন।

(৮)

যোগশাস্ত্রে আছে, মা তুমি কুণ্ডলিনী শক্তি। তুমি গুহে শাকিনী-শক্তি, লিঙ্গমূলে কাকিনী শক্তি, নাভিতে রাকিনী শক্তি, হৃদয়ে লাকিনী শক্তি, কণ্ঠে ডাকিনী শক্তি, ভ্রূমধ্যে হাকিনী শক্তি। এই ষট্‌চক্রের উপর শিবচক্রে হংস শক্তি। অজপা 'হংস' সঙ্গে মা হংসীরূপে বিহার করছেন। তার উপর বোধিনীচক্রে মা সোঽহং শক্তি। তার উপর ওঁ বা বিন্দু চক্রে মা বিন্দুশক্তি। কোথায় বা

নিরাকারা বিন্দুবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী হ'য়ে রয়েছেন। মহাপুরুষ গেয়েছেন—"মনের বাসনা জননি ভাবি,—

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ'লো মা—ব্রহ্মরূপিণী ॥"

(৯).

মা সকল কালেই তোমার পূজা চলে আস্‌ছে। আদি গুরু ব্রহ্মা তোমার পূজা করেছিলেন। জগৎগুরু অবতার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূজা করেছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বলেছিলেন "মা আজ আমি রাজ্যভ্রষ্ট, আমাকে রক্ষা কর"। সুরথ রাজা প্রভৃতির পূজা পুরাণে বিখ্যাত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্যদেব তোমার পূজা কর্‌তেন। তুমি নিজ মুখেও বলেছ "যে আমাকে অবজ্ঞা করে সে হীন হয়ে যায়"। "অজানন্তঃ মাং হীয়ন্তে।"

অতএব যদি শোকদুঃখের হাত থেকে বাঁচ্‌তে চাও তো মায়ের শরণ লও।

"কালিকা জগতাং মাতা শোক দুঃখ বিনাশিনী।"

ইহা গল্প নয়, বাজে কথা নয়, ইহা প্রমাণবাক্য।—ভাবিও না কুসংস্কার। বেদ পুরাণ তন্ত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাস সুসংস্কার বল্‌ব। শিশ্নোদর পরিতৃপ্তির জন্য যা তা লৌকিক উপায় অবলম্বন কুসংস্কার, সুসংস্কারের ফল নিশ্চয় নহে।

(১০)

"কিং কিং দুঃখং সকল জননি।
ক্ষীয়তে ন স্মৃতায়াম্" ॥

হে বিশ্বজননি! এমন কি দুঃখ আছে, তোমাকে স্মরণ কর্‌লে নাশ হয় না।

কা কা কীর্ত্তিঃ কুলকমলিনি!
প্রাপ্যতে নার্চ্চিতায়াম্ ॥

হে কুলকমলিনি, এমন কি কীর্ত্তি আছে তোমাকে অর্চ্চনা করিলে পাওয়া যায় না।

"কিং কিং সৌখ্যং সুর বর স্তুতে।
প্রাপ্যতে ন স্তুতায়াম্ ॥"

হে সুরবর স্তুতে? এমন কি সুখ আছে, তোমাকে স্তুতি কর্‌লে লাভ হয় না।

"কং কং যোগং ত্বয়ি ন তনুতে চিত্তমালম্বিতায়াম্।"

এমন কি যোগসিদ্ধি আছে, তোমাকে চিত্তে অবলম্বন কর্‌লে পাওয়া যায় না!

"স্মৃতা ভবভয়ং হংসি।"

মা! তোমাকে স্মরণ কর্‌লে তুমি ভবভয় নাশ কর।

"পূজিতাসি শুভঙ্করি!"

তোমার পূজা করলে মঙ্গল কর।

"স্তুতা ত্বং বাঞ্ছিতং দেবি দদাসি করুণাকরে।"

করুণাকরে! দেবি! তোমাকে বন্দনা কর্‌লে তুমি মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

"অনুগ্রহায় ভূতানাম্ গৃহীত দিব্য বিগ্রহে।
তাপত্রয় পরিম্লান ভাজনং ত্রাহি মাং শিবে ॥"

জীবের অনুগ্রহ কামনায় মা "দিব্য বিগ্রহ" ধারণ করেছ। শিবে! আমি তাপত্রয়ে তাপিত, আমাকে রক্ষা কর।

"নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি।
নান্যং স্মরামি ন ভজামি নচ আশ্রয়ামি ॥
ত্যক্ত্বা তদীয় চরণাম্বুজমাদরেণ।
ত্রাহি মাং দেবি কৃপয়া ময়ি দেহিসিদ্ধিম্ ॥

আমি অন্য কিছু বল্‌তে চাই না, শুন্‌তে চাই না, ভাব্‌তে চাই না, মনে কর্‌তে চাই না, ভজ্‌তে চাই না, তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে, আর কিছু আশ্রয় কর্‌তে চাই না।

দেবি! আমাকে রক্ষা কর। কৃপা কোরে আমাকে সিদ্ধি দাও।

দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধামাত্রবিবর্জ্জিতম্ ॥
তৎ সর্ব্বং কৃপয়া দেবি ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে।

সত্য বটে আমার পূজা দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন, ও শ্রদ্ধা মাত্র বিবর্জ্জিত, কিন্তু দেবি! তুমি দয়ানিধি! সে সব অপরাধ ক্ষমা কর।

"যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম তন্মহৎ স্বল্পমেব বা
তৎ সর্ব্বং চ জগদ্ধাত্রিঃ ক্ষন্তব্যমযমঞ্জলি॥"

মা! আমি তোমার কর্ম্ম করে যাচ্ছি, যদি ঠিক ঠিক্ না হোয়ে কম হয়ে পড়ে, কি বেশী হয়ে পড়ে, জগদ্ধাত্রি! তার অপরাধ নিও না, ক্ষমা কর, ইহাই আমার অঞ্জলি!!!

বেদ-কথা।

[মর্ত্ত্যে সোমরস আবির্ভাব]

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত)

ঋষিগণ সোমের স্তব করিতেছেন, যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন। সোমরস বলবীর্য্যবিধায়ক। ইন্দ্র এই সোমরস পান করিয়া বীর্য্যশালী হইয়া বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।

আদিতে এই সোমরস মর্ত্ত্যে দেবগণপ্রিয় মনুষ্যকুলমধ্যে ছিল না। এই সোমরস বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগে ছিল।

অসুরগণ মনুষ্যকুলের বিরোধী, উহারা মর্ত্ত্যে মনুষ্যগণের শত্রু। মনুষ্যগণ দেবপ্রিয় হইয়াও অসুরগণের বলবীর্য্যের নিকট পরাভূত। অসুরগণ মনুষ্যগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের ধন, রত্ন, অশ্ব, গো, নারী—সকল সম্পদ কাড়িয়া লইত।

মনুষ্যকুলে যাঁহারা প্রধান, যাঁহারা মনীষী, তাঁহারাই ঋষি। এই ঋষিগণ শত্রুদিগকে পরাভূত করিবার মানসে দেবতাদিগের আরাধনা করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিতেন। দেবতারা প্রসন্ন হইলে সহজেই শত্রু-বিনাশ হইতে পারিবে।

তাই ঋষিগণের উপর অসুরকুলের অতিশয় ক্রোধ। একদা শত্রু অসুরগণ বামদেব নামক ঋষিকে শত-লৌহময় 'শরীরে' অবরুদ্ধ করিয়াছিল। অসুরদিগের কবলে লৌহময় গর্ভে ঋষি অবরুদ্ধ হইয়া অতীব ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। বামদেবের এই দুর্গতিতে অন্যান্য ঋষিগণ সাতিশয় ম্রিয়মান হইলেন, লৌহময় গর্ভ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অবশেষে দেবতাদিগের শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার মানসে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবগণ প্রীত হইলেন।

দেবতা এবং ঋষিগণ অসুরকুলের বিরুদ্ধে সমবেত হইলেন। যে উপায়ে হউক, অসুরগণকে পরাভূত করিয়া লৌহময় গর্ভ হইতে ঋষি বামদেবকে উদ্ধার করিতেই হইবে। কিন্তু দেব এবং ঋষিগণের প্রযত্ন বিফল হইল।

অতঃপর তাঁহারা দেবী গায়ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ ছন্দ গান করিয়াছিলেন। ছন্দের যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই গায়ত্রী। এই গায়ত্রী ছন্দ সকলের মাতা। ঋষিগণের ছন্দগানে ছন্দমাতা গায়ত্রী প্রীতা হইয়া ঋষিগণ-সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন! দেবী গায়ত্রী ঋষিগণকে বলিলেন,

"বৎসগণ, আমি প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাদিগকে এক অভিনব বার্ত্তা শ্রবণ করাইতেছি। এ সংবাদ পূর্ব্বে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কেহই অবগত ছিল না। আমি সেই অভিনব বস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতেছি।

"ঐ যে বৃহৎ অন্তরীক্ষ অবলোকন করিতেছ, উহা গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণের আবাস। অপ্সরাগণ গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী। ঐ গন্ধর্ব্বগণ সূর্য্যরশ্মিসম অন্তরীক্ষে বিচরণ করে। তাই, অন্তরীক্ষ গন্ধর্ব্বলোক

বলিয়াও কীর্ত্তিত হইতে পারে। ঐ বৃহৎ অন্তরীক্ষেরও উপরিভাগে সেই বাঞ্ছিত দিব্য বস্তু অবস্থান করিতেছে। সেই দিব্য বস্তু সোমরস নামে অভিহিত। এই সোম আলোকস্বরূপ, তেজোময়। এই সোম লোহিতমূর্ত্তি—বিচিত্রবর্ণ। সোম মদকর ও ইষ্টযুক্ত। সোমরস পান করিলে বিপুল বলবিক্রম লাভ হয়। সোমরসপায়ী ভুবনে অজেয়। তাঁহার শত্রু অচিরেই নিহত হয়।"

এইরূপে ছন্দমাতা গায়ত্রী সোমরস-মহিমা কীর্ত্তন করিলে ঋষিগণ উহা লাভ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু সেই দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোমরস মর্ত্ত্যে আনয়ন করা অসম্ভব ভাবিয়া অতীব চিন্তিত এবং দুঃখিত হইলেন। ঋষিগণ পুনরায় গায়ত্রী দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। যিনি সোমের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, তিনিই দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে উহা আনয়ন করিয়া মর্ত্ত্যে আমাদিগকে প্রদান করুন। দেবী গায়ত্রী এই দুষ্কর কার্য্যে অস্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু ঋষিগণের ব্যাকুল প্রার্থনায় সন্দিগ্ধমনে অবশেষে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মর্ত্ত্যে সোমরস আনয়ন করিতে হইবে। দেবী গায়ত্রী শ্যেন-পক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ আকাশে উড্ডীন হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের আবাস বৃহৎ দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া শ্যেন তদুপরি আরোহণ করতঃ সোম-সমীপে উপনীত হইল।

ঋষিগণ-অভীষ্ট সোমরস গ্রহণকরতঃ শ্যেন অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে গন্ধর্ব্বলোক অন্তরীক্ষে উপনীত হইলে গন্ধর্ব্বগণ শ্যেনকে সোমরস গ্রহণকরতঃ মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে দর্শন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অন্তরীক্ষে শ্যেন ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সংগ্রামকালে শ্যেন দ্যুলোক হইতে অধোমুখ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। সে শব্দে মর্ত্ত্যে মনুষ্যকুল ভীত ও চমকিত হইল। শ্যেন গন্ধর্ব্বযুদ্ধে অতীব কাতর হইয়া পড়িল। তাহার একটি পক্ষ প্রহৃত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্ত্যে পতিত হইল।

এইরূপ যুদ্ধে পরাভূত শ্যেন সোমরস রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে

গন্ধর্ব্বগণ সোমরস কাড়িয়া লইল। দেব ও মানবগণ শ্যেনের পরাজয়ে অতীব ম্রিয়মান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ সোমরস অপহরণ করিয়াছে, এই সোমরস উদ্ধারে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যুদ্ধে গন্ধর্ব্বগণকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। কোনরূপে উহাদিগকে মোহ উৎপন্ন করিয়া কৌশলে সোম উদ্ধার করিতে হইবে। গন্ধর্ব্বগণ অতীব নারীপ্রিয়। দেবগণ স্থির করিলেন, এই নারীর মোহেই উহা-দিগকে মোহিত করিয়া সোম উদ্ধার করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া দেবগণ বাগ্দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। বাগ্দেবী সোম উদ্ধারে সম্মতা হইলেন।

সোম উদ্ধারার্থ বাগ্দেবী অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বগণ সমীপে উপনীত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাগ্দেবীর সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সমবেত হইল। গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইলে বাগ্দেবী অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আপন দেব-পরিচ্ছদ স্বীয় দেবশরীর হইতে উন্মোচন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাগ্দেবীর নগ্নসৌন্দর্য্য দর্শনে মোহাভিভূত হইল। মোহমুগ্ধ গন্ধর্ব্বগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কে তাঁহাকে লাভ করিবে এই লইয়া পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। এই সুযোগে দেবী মোহাভিভূত পরস্পর পরস্পরের হিংসায় রত, গন্ধর্ব্বগণের কবল হইতে সোমরস কৌশলে হস্তগত করিয়া অন্তরীক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগণ-সমীপে উপনীত হইলেন।

সোমরস উদ্ধার হইল। দেবগণ মর্ত্ত্যে ঋষিগণকে সেই সোমরস প্রদান করিলেন। দেব ও ঋষিগণ এই সোমরস পানে বীর্য্যশালী হইয়া অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করতঃ ঋষি বামদেবকে শত লৌহময় কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শিখগুরু।

গুরুগোবিন্দ।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

এইরূপ অলৌকিক দৈবশক্তিতে মন-প্রাণ পূর্ণ করিয়া শ্রীগুরু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং শিখদিগকে বলেন যে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে তাহারাই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রকৃষ্ট সেবার অধিকার পাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবন দেবী চণ্ডিকা বলিরূপে গ্রহণ করিবেন। গোবিন্দ সিংহের চরিত্র সমালোচন করিতে গিয়া অনেকেই একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হইয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে কেবল একজন কায়িক বলশালী বা অসামান্য যোদ্ধপুরুষ বলিয়াই ক্ষান্ত হন—তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব কতদূর ছিল সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই উদাসীন থাকেন। তাঁহারা এই দেবোপম চরিত্রের একটি দিক দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন, সুতরাং সুবিচারে উপনীত হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অনেক সময়েই অসম্ভব হইয়া উঠে। গুরু নানকের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতার তুলনায় গোবিন্দ সিংহের স্থান হয় ত' বহু নিম্নে স্থাপিত হইবে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে একজন 'গোঁয়ার' বা 'গুণ্ডা' এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

যজ্ঞ শেষ হইয়া গেলে গুরু স্বীয় আবাসে ফিরিয়া দেখিলেন মসন্দ জাতি বড় অত্যাচার করিতেছে। তিনি অবিলম্বে উহাদিগকে বিদ্রোহিতার জন্য সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলেন এবং শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

অতঃপর আমরা তাঁহার সংস্কারকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মানবজীবনের ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হইতে দেখিয়া গুরু আর কালবিলম্ব করা বিবেচনা বোধ করিলেন না। সেই জন্য চির-

পোষিত সংস্কারগুলি একে একে কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। তিনি আনন্দপুরে এক সুবৃহৎ বৈশাখী মেলা আহ্বান করেন। ঐ উপলক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুসংখ্যক শিখভক্ত সমবেত হয়। শিখদিগের গুরুভক্তি মৌখিক মাত্র বা সত্য সত্যই আন্তরিক,স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য তাহারা কিরূপ উদ্‌গ্রীব ও একনিষ্ঠ তাহার সঠিক নিদর্শন গ্রহণ করিবার জন্যই গুরু স্বেচ্ছায় উহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিখদিগের জাতীয় জীবনে উহা এক বিশিষ্ট দিবস—যে দিন তাহাদিগের সত্যসঙ্কল্প ও স্বজাতি-নিষ্ঠা কষ্টিপাথরে সম্যক্‌রূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং কাহার কতদূর মূল্য তাহা শ্রীগুরু অনায়াসেই নিরূপণ করিয়াছিলেন।

সকলে সমবেত হইবার পূর্ব্বদিবসেই গুরু সেই স্থানের একাংশ কাষ্ঠ ইত্যাদির সাহায্যে উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন — বাহির হইতে উহার ভিতরে কি হইতেছে তাহা যেন কাহারও দৃষ্টি-গোচর না হয়। তিনি তৎপরে একজন ভক্তকে পাঁচটী ছাগ ক্রয় করিয়া উহার মধ্যে রাখিতে আদেশ দিলেন।

আজ বৈশাখী মেলার স্মরণীয় দিবস। অতি প্রত্যূষে শ্রীগুরুর নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে শত শত ভক্ত আসিয়া সমবেত হইল। তৎপরে যখন সেই বিশাল জনতা স্থিরভাব ধারণ করিল, সেই সময় শ্রীগুরু হস্তে একখানি উন্মুক্ত অসি ধারণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব বাণী শুনাইতে লাগিলেন। তদীয় উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল আজ এক স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত। জলদগম্ভীরস্বরে শ্রীগুরু ডাকিলেন—"কয়েকজন বিশিষ্ট শিখভক্তের মস্তক আবশ্যক হইয়াছে। স্বেচ্ছায় গুরুর কার্য্যোদ্ধারের জন্য আত্মবলিদানে তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রস্তুত আছ - আমি তাহাদিগকে সাদরে মৎসকাশে আহ্বান করিতেছি।" গুরুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ত্রস্ত ও চকিত হইল—আজ তাহাদের সমক্ষে জীবন-মরণের মহাসমস্যা উপস্থিত! প্রথম আবেদনে বিশেষ ফললাভ হইল না। গুরু দ্বিতীয়বার ডাকিলেন—বুঝি বা শিখ আত্মত্যাগে অনিচ্ছুক! সকলেই অপ্রতিভ হইয়া অপেক্ষা করিতে

লাগিল। তৃতীয় আবেদনের পর কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে উত্তর আসিল। সেই জনসমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে একজন উন্নতমনা নির্ভীক ভক্ত হৃদয়ের আবেগভরে গর্জ্জিয়া উঠিল—"ওয়া গুরুজী কী ফতে! প্রভো! এই দীনহীন অকিঞ্চনের মস্তক অর্পিত হইল।" নিস্তব্ধমণ্ডপে কোলাহল উঠিল—চতুর্দ্দিক হইতে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল—'ধন্য দয়াসিং! হে লাহোরনিবাসী ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য! তুমি আজ আমাদের মুখোজ্জ্বল করিলে!' ইহার পর গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগুরু সেই পুরুষপ্রবরকে সানন্দে অভিবাদন করিয়া বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিলেন—শিখ সেই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিয়ৎকাল পরে শ্রীগুরু সবেগে রুধিরহস্তে সভায় ফিরিয়া আসিলেন—সকলে স্থির জানিল দয়াসিং নিহত হইয়াছেন। উহার পর গুরু আবার আহ্বান করিলেন। প্রথমে সকলেই দ্বিধা করিতে লাগিল কিন্তু তৎপরে হস্তিনাপুরনিবাসী ধর্ম্মসিং নামক জনৈক জাঠ শ্রীগুরুর মহাকার্য্যে আত্মবলিদান করিলেন। সভাক্ষেত্রে পুনরায় কলরব উত্থিত হইল। গুরু এবারও পূর্ব্ববৎ আচরণ করিলেন। ইহার পরে একে একে অপর তিন জন সাহসী শিখ আপনাদিগকে শ্রীগুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইল—বিদর্ভপুর নিবাসী সাহেবসিং নামক নায়েন (নাপিত) শিখ—দ্বারকানিবাসী মহকম সিং নামক জনৈক ছীপা (যাহারা কাপড়ে ছাপ দেয়) শিখ এবং তৎপরে উড়িষ্যা জগন্নাথপুরী নিবাসী হিম্মৎ সিং নামক জনৈক ঝিবর (কাহার। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল শ্রীগুরু উক্ত পাঁচজন শিখ পরিবেষ্টিত হইয়া বীরদর্পে সেই বেষ্টিত স্থান হইতে বহির্গত হইতেছেন। তবে কি উঁহারা কেহই নিহত হন নাই?—না। শ্রীগুরু তাঁহাদিগকে উহার ভিতর বসাইয়া রাখিয়া প্রতিবারে এক একটী ছাগ হত্যা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেছিলেন।

তৎপরে গোবিন্দসিংহ ঐ পাঁচজন শিখকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উহাদিগের অদ্ভুত বীর্য্য ও গুরুগতপ্রাণতার ভূরি

ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগকে বহুবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া বলিলেন—"হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা আজ হইতে আমার আপনার হইলে। তোমরাই 'খালসা' (খাঁটী) বা শিখনামের উপযুক্ত—খালসা গুরুসে আউর গুরু খালসাসে হোই এক, দুস্‌রে কো তাঁবিদার হোই। শ্রীগুরু নানকের সময় একজন মাত্র খাঁটী লোক পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য আমি পাঁচজন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়াছি—ইহারাই আমার প্রধান সহায়।" এই বলিয়া গুরু উঁহাদিগকে মন্ত্রপূত করিয়া লই-লেন—একটী লৌহপাত্রে কিয়ৎপরিমাণ জল আনাইয়া দেবীদত্ত করদ তরবারি ডুবাইয়া দিলেন; উহা অমৃতরূপে সকলে পান করিয়া ধন্য হইল। এই উপলক্ষে প্রায় বিংশ সহস্রের উপর শিখ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীগুরু ঐ পাঁচজন দীক্ষিত শিষ্যকে বহুবিধ উপদেশ দেন। উহার সারাংশ শ্রীযুত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলাম—"মীনা, মসন্দিয়া ধীরমলিয়া এবং রামরিয়া দলভুক্তদিগের সহিত এবং কন্যাহত্যাকারিদিগের সহিত মিশিবে না। বেশ্যাগমন বা দ্যূতক্রীড়া করিবে না। গুরুবাণী নিত্য পাঠ করিবে, 'সেবা, ভক্তি প্রেম মন ধরিণা', অর্থাৎ মনে সেবা ভক্তি প্রেম ধারণা করিবে। জপজী (নানকের কৃত প্রধান মন্ত্র) জাপজী (গোবিন্দকৃত প্রধান মন্ত্র) আনন্দজী, রহরাস, আরতি এবং কীর্ত্তন এই ছয়টী প্রত্যহ পাঠ করিবে। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, কুতর্ক এবং জবাই-করা মাংস ত্যাগ করিবে। তামাক এবং যবনের হাতের মদ্য ও মাংস নিষেধ জানিবে। পাঁচ কক অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুণী) কচ্ছ (ছোট ঢিলে ইজের) এবং কড়া (লোহার বালা) সর্ব্বদা নিজ নিজ অঙ্গে রাখিবে। সৎপথে ব্যবসায়াদি করিবে। পরস্পর সহোদর ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি রাখিবে। গুরু-নিন্দুককে মারিয়া ফেলিবে। গুরুগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিবে এবং উহাকে গুরু স্বরূপ জানিবে। প্রত্যহ শস্ত্রাভ্যাস রাখিবে। তুর্ককে বিশ্বাস করিও না।

কোন শিখকে অর্দ্ধেক নামে ডাকিবে না, মন হইতে কাতরতা ত্যাগ করিবে। যোদ্ধার বাহুবলের উপর ইহ পরলোকের সুখ নির্ভর করে জানিবে। মত বা মনের আদর্শ উচ্চ, কিন্তু মন নম্র রাখিবে। কবরাদির পূজা করিবে না। তরবারিই প্রধান সহায় জানিবে।"

অনেকে বলেন গুরুগোবিন্দ জাতিভেদ প্রথার একান্ত বিরোধী এবং হিন্দু দেবদেবীতে একান্ত আস্থাহীন ছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটীর মীমাংসা আমরা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইবার প্রথম উক্তিটী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। গোবিন্দসিংহের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া ইহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল - একটী সামরিক জাতি গঠন করা; সুতরাং ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি সামাজিক জাতিভেদের কঠোরতা একটু শিথিল করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পহল বা সংস্কারের সময় জাতিভেদের কোন কথাই উঠে নাই। পরবর্ত্তী একটী ঘটনা হইতে ঐ প্রশ্ন উত্থিত হয়; এক সময়ে গোবিন্দসিংহের তরবারির কোষবন্ধনের নিমিত্ত সূতার প্রয়োজন হইলে গুরু নানা অনুসন্ধানের পর উহা না পাইয়া বড় ব্যস্ত হন। তাঁহার সম্মুখে দয়াসিং দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি গুরুর অসুবিধা বুঝিয়া আপন যজ্ঞসূত্র ছেদন করিয়া ঐ কার্য্যের জন্য প্রদান করেন। তৎপরে অন্য কর্ত্তৃক যজ্ঞসূত্র পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলেন—যাহা শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া লইব কিরূপে? ইহা হইতে কথঞ্চিৎ বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীগুরু দয়া-সিংহের অসামান্য ভক্তি ও অনুরাগ দেখিয়া উহাতে কোনরূপ দ্বিরুক্তি করেন নাই। প্রধান কথা এই—তিনি সর্ব্বদা অধিকারীভেদ মানিয়া চলিতেন। দয়াসিংহের ন্যায় পুরুষপ্রবরের জাতিভেদ মানিয়া চলার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই। এমন কি ম্যালকম প্রভৃতি

ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীগুরুর পুত্রগণ সর্ব্বদাই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকিতেন—পিতা উহাতে কোনদিনই আপত্তি তুলেন নাই। যাহা হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তিনি শিষ্যনির্ব্বাচনে জাতিবিচার মানিয়া চলিতেন না।

'দশম বাদ্‌শা কী গ্রন্থ' পুস্তকে শ্রীগুরুর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিমত এবং আত্মজীবনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা পূর্ব্ব-পুস্তকের ন্যায় ছন্দে লিখিত হয়। দুই তিন রকম ভাষার সংমিশ্রণে ইহা রচিত; প্রথমাংশ হিন্দীতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ যথাক্রমে,—পারশী ও গুরুমুখীতে। এই গ্রন্থ সর্ব্বশুদ্ধ ষোড়শ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গোবিন্দসিংহ বাল ও শ্যাম নামক তদীয় শিষ্যদ্বয় হইতে সাহায্য পান।

শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি বাবুর পুস্তক হইতে উহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।

(১ম) প্রথমাংশেই 'জাপজী' –ইহা প্রাতে ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন। ইহার প্রথম শ্লোকটী এই—

জাপ শ্রীমুখ বাক্ পাদশাহী দশ। ছপে ছন্দ। তৎপ্রসাদ।
চক্র চিহ্ন অর বরণজাত আরপাত নহিন যেঃ।
রূপ রঙ্গ অররেক ভেক কোউ কহ ন শকৎ কেঃ।
অচল মুরত অনুভত প্রকাশ অমিতোজী কহৎ যেঃ।
কোটি ইন্দ্র ইন্দ্রান সাহ সাহান গুনিজ্জে।
ত্রিভুবন মহীপ সুর নর অসুর নেত নেত বণতৃণ কহৎ।
তব সর্ব্বনাম কথে কোন কর্ম্মনাম বর্ণাৎ সুমৎ॥ *

* "দশম গুরু শ্রীমুখ-নিঃসৃত জাপ। ইহার ছন্দ ছপে। (হে ভগবান) তব কৃপা। যাহাতে চক্র চিহ্ন বর্ণ জাতি অথবা শ্রেণী নাই, রূপ রং নির্দ্দিষ্ট রেখা ও শ্রেণী যাহার কেহ বলিতে পারে না, (যাঁহার মূর্ত্তি) নির্ব্বিকার, (যিনি) অনুভব দ্বারা প্রকাশ, (যাঁহার) বল পরিমাণ করা যায় না, কোটি ইন্দ্রের ইন্দ্র, সম্রাটের সম্রাট যাঁহার গুণ গান করে, ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেব, মানব, অসুর, বন, তৃণ (অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম) যাঁহার গুণ-গান করিতেছে,—আর বলিতেছে কিছুই জানি না—তোমার কি কর্ম্ম কি বর্ণ বলিবার ক্ষমতা নাই।"

(২য়) 'অকালস্তুতি' অর্থাৎ ভগবানের স্তব। প্রাতে পাঠ্য—
ইহার প্রথমাংশ এইরূপ—

"প্রণমো আদি এক ও কারা। জল স্থল মই অল কিও পসারা॥
আদি পুরুখ অবগৎ অবনাশী। লোক চতুর্দ্দশ জ্যোৎপ্রকাশি॥
হস্তি কীটকে বিচ সমানা। রাও রঙ্ক যেহ একসর জানা॥
অদৈ অলখ পুরুখ অবগামী। সব ঘট ঘটকে অন্তরজামী॥
অলক্ষ্য রূপ অচ্ছ অনভেখা। রাগ রঙ্গ জেহ রূপ না রেখা॥
আদি পুরুখ অদৈ অবিকারা। বরণ চিহন সভহুতে নিয়ারা॥
বরণ চিহন জিহ জাত না পাতা। শত্রু মিত্র জিহ তাত-ন মাতা॥
সভতে দূর সভন তে নেরা। জল থল মহি অল জাহে বসেরা॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু অন্ত নহি পা এও। নেত নেত মুখ চার বতাএও॥" +

(৩য়) "বিচিত্র নাটক" (বা অদ্ভুত কথা)—ইহা চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। দুষ্ট দমনের জন্যই গুরুর আবির্ভাব—এই সঙ্গে আত্ম-পরিচয় সংক্ষেপে দিয়াছেন। চতুর্থ হইতে একাদশ,—এই আট অংশে পুরাণোক্ত প্রধান কথাগুলি শ্রীগুরু সহজ, সরল গুরুমুখী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

(৪র্থ) "চণ্ডী চরিত্র"—ইহার দুই ভাগ। প্রথমভাগ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। ইহাতে মধুকৈটভ, ময়াক্ষুর, ধূম্র-লোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ, তিতান প্রভৃতি দৈত্যবধের

+ "আদিতে আমি সেই এক ওঁকাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার করি, যিনি জল স্থল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন, চতুর্দ্দশ লোকে যাঁহার জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে; সেই অনাদি পুরুষ যাঁহার গতি বুঝা যায় না। হস্তী কীটমধ্যে যিনি একরূপে বিরাজমান আছেন, এবং প্রতি জীবের অন্তরের ভাব যাঁহার অবিদিত নাই। যাঁহার রূপ দৃষ্টি-গোচর হয় না, কেবল অনুভব দ্বারা কল্পনা করা যায়। যিনি বর্ণ চিহ্ন জাতি বা শ্রেণী রহিত এবং যাঁহার কেহ মাতা বা পিতা নাই, যিনি সকলের অতি দূরবর্ত্তী আবার নিকটেরও নিকট জল স্থল স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহার অন্ত পান না, চতুর্মুখে ব্রহ্মা নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন" ইত্যাদি।

"শিখেরা বলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তিনি কেবল নামের মহিমা দ্বারাই এই কলিযুগে জীবের উদ্ধারের কর্ত্তা বলিয়া নিজ শিষ্যগণকে প্রেমভক্তিযুক্ত মনে পর-ব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।"

কথাও আছে। (৫ম) "চণ্ডীচরিত্র"—প্রধানতঃ প্রথম ভাগেরই কথা—কেবল ছন্দের পার্থক্য। (৬ষ্ঠ) "চণ্ডী কি বার"—চণ্ডীর কথার শেষ ভাগ। ইহাও ভগবতী স্তুতি। (৭ম) "জ্ঞান প্রবোধ"—শ্রীভগবানের স্তব। (৮ম) "চৌপাইন চৌবিষ অবতারন্ কীয়ান্"—অন্যান্য অংশের তুলনায় ইহার কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিতে হইবে। তৎশিষ্য শ্যাম লিখিত। ইহাতে ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি চতুর্বিংশতি অবতার-লীলা বর্ণিত আছে। (৯ম) ইহাতে মেহেদী মীরের কথা আছে—ইনি কল্কি অবতারের সহিত আবির্ভূত হইবেন বলিয়া বর্ণিত। কাহারও মতে আখ্যান-ভাগ শিখরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। (১০ম) ইহাতে ব্রহ্মার বাল্মীকি, ব্যাস কুলদাস, ষড়ঋষি, কচ্ছপ, শূকর, বাচেস এই সাত অবতারের এবং মনু, পৃথি, সগর, বেন, মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু এবং উজ এই আটজন প্রাচীন নৃপতিদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। (১১শ) রুদ্রের দত্ত এবং পরেশনাথ এই দুই অবতারের কথা। (১২শ) "শস্ত্রমালা"—বিভিন্ন অস্ত্রগুলির নাম ও তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণকীর্ত্তন। (১৩শ) "শ্রীমুখ বাক্য সওয়া বত্রিশ"—ইহা বেদ, পুরাণ ও কোরাণ সম্বন্ধে লিখিত। তিনি ইহাতে আপাত ঐ সকল ধর্ম্মপুস্তক-গুলির নিন্দাবাদ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ অহঙ্কারি-দিগেরই নিন্দা করিয়াছেন। (১৪শ) "হাজারে শব্দ"—এক সহস্র শব্দের ছন্দ। প্রধানতঃ শ্রীভগবানের ও তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি-চাতুর্য্যেরই গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১৫শ) "স্ত্রীচরিত্র"—৪০৪টী গল্পের সমষ্টি। স্ত্রীচরিত্র বুঝাইবার জন্যই ইহা লিখিত হয়। একটী গল্প এইরূপ—এক রাজার দুই বিবাহ হয়। প্রথম পত্নী সপত্নীপুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা গ্লানি ও কুৎসা প্রচার করিয়া রাজার মনহরণ করেন। অবশেষে রাজাজ্ঞায় সেই নির্দ্দোষ যুবক নিহত হন। শিখেরা বলেন গোবিন্দসিংহ এই উপন্যাস লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দেন—যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র

বুঝিয়া উঠা ভার। তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন যেন স্ত্রীশক্তির কুহুকে তাহারা কখনও না পড়ে। এবং বলেন, স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।. (১৬শ) শেষাংশের নাম "হিকায়ৎ"—পারস্য ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে বারটী.গল্পের সমষ্টি। এগুলি সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্রূপোক্তি।

যাহা হউক, সংস্কারকার্য্য শেষ করিয়া অতঃপর শ্রীগুরু শক্তিসঞ্চয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি একটা আদেশ প্রচার করেন যে পাঞ্জাবপ্রদেশের কোন গৃহে চারিজন কর্ম্মপটু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকিলে অন্ততঃ দুইটীকে তদীয় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। এইরূপে প্রায় আশিহাজার সৈন্য সমবেত হয়। তিনি উহাদিগের সমুচিত শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন—তাহাদিগের দৈহিক উন্নতিবিধান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নৈতিক উৎকর্ষলাভের উপযুক্ত শিক্ষাও উহার সহিত প্রদান করেন। শ্রীভগবানের উপর যাহাতে তাহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে, যাহাতে তাহারা আপনাদিগকে তাঁহার যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই জন্য বিশেষ উপদেশ দেন। অধিকন্তু খালসার উপর যাহাতে তাহাদিগের আস্থা বলবতী থাকে তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন লন। খালসার প্রতি তাঁহার এইরূপ উপদেশ ছিল—

খানা খাওয়ে ধরমকো করে সারনে মেল।
তবে খালসা জাপে সোজানে ভারত পেল॥

অর্থাৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া পরিবার পোষণ করিবে এবং সারবান লোকের সহিত মিলিবে; তবে খালসার উন্নতি ভারতে প্রকাশ হইবে। এইভাবে তাঁহার সংস্কারের ফলে সমগ্র শিখজাতি এক অচ্ছেদ্য সাম্য ও মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ হয়। অবিলম্বে শিখসমাজে নূতন উদ্যম ও সাহসিকতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা চরিত্রবলে বলীয়ান হইয়া অনেক অদ্ভুত ও অসামান্য কার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইল। মধ্যযুগে নবোদ্ভূত ইউরোপীয় বীরসঙ্ঘের (Knights) ন্যায় ইহারাও অসহায় ও বলহীনের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন হইয়া সর্ব্বত্র আপনাদিগের মহিমা প্রচার করিতে লাগিল।

এইবার মোগলদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে শিখগুরুর বিবাদ বাধিল। এতদিন মোগল-সম্রাট্ পার্ব্বত্য নৃপতিবৃন্দকে গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন কিন্তু অধুনা গুরুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সন্দর্শনে আওরঙ্গজেবের হৃদয় ঈর্ষাভিভূত হইল—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথম প্রয়াসে বাদ্‌সা, সৈয়দখাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির সেনাপত্যে একটী বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি সম্রাটের সহিত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ করিল; সৈয়দখাঁ অবশেষে তাহার সাহায্যদাতাকে প্রতারিত করিয়া শিখদিগের দলভুক্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বিশেষ কুপিত হইয়া সম্রাট দ্বিতীয়বার সুদক্ষ সেনাপতি উজীর খাঁকে আনন্দপুর অধিকার এবং গুরুকে পরাজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। উক্ত আদেশ মত উজীর খাঁর সৈন্য আসিয়া অবিলম্বে আনন্দপুর অবরোধ করিল। এবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দ্বাবিংশসংখ্যক পার্ব্বত্যরাজ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া মোগলদিগের সহিত যোগদান করিল। গোবিন্দসিংহ উহা দেখিয়া অবিলম্বে আপন সৈন্যসমাবেশ করিলেন। অবরোধ কার্য্য বহুদিন চলিল—উভয় পক্ষই সবিশেষ বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা দেখাইল—কাহারা জয়বান হইবে তাহা প্রথমে কেহই নিরূপণ করিতে পারিল না। মোগলদিগের বিপুল বাহিনী প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। একপক্ষে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের সমবেত-শক্তি এবং অপর পক্ষে সামান্য একটী প্রদেশের ক্ষুদ্র শক্তি—উভয়ের তুলনা করিলে বহু পার্থক্য মিলিবে। অল্পসংখ্যক শিখসৈন্য অধিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না, অবশেষে শত্রু কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া আনন্দপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। গোবিন্দসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া অনুচরদিগের সহিত কীর্ত্তিপুর ছাড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তদীয় জননী ও অবশিষ্ট সন্তানদ্বয় একাকী পরিত্যক্ত হইয়া সিরহিন্দ সহরেই এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে

বিপদ-সঙ্কুল সর্পগৃহে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হইবে; ঐ নীচ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি উহাদিগের সহিত যাহা কিছু অর্থাদি ছিল তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইল অধিকন্তু মোগলের হস্তে উহাদিগকে সমর্পণ করিয়া দিল। তৎপরে যাহা হইবার—মুসলমান-দিগের হস্তে যুবকদ্বয়ের অপমৃত্যুর বিবরণ সকলেরই বিদিত আছে,—কিরূপে মুসলমানগণ বালকদিগকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে বলিল এবং তাহারা কিরূপ সাহসভরে ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করিল এবং পিতার খ্যাতি অকলঙ্ক রাখিয়া সহাস্যবদনে মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইল!

সির্‌হিন্দের এই লোমহর্ষক সংবাদ শ্রবণে গুরুর হৃদয় ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন জাঠপুর নামক গ্রামে বসবাস করিতেছিলেন; তৎপরে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দিনা নামক গ্রামে যান। তথায় বহুদিবস যাপন করেন। এইখানেই তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেব লিখিত 'পরওয়ানা' প্রাপ্ত হন—তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।—"কোরাণের দিব্য লইয়া বলিতেছি, এই পরওয়ানা দেখিয়া সত্বর আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে। নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। আমি সজোরে তোমায় ধরিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইব। যখন ধরিব তখন জিজিয়া দ্বিগুণ করিয়া বসাইব। তখন হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার ধর্ম্ম ধরিবে এবং ইহলোকের মধ্যে কলমা পরিবে। যে কোরাণ পড়িবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তাহার সাক্ষী দেখ কাশ্মীরের পণ্ডিতগণের কি দশা করিয়াছি। আমি এমন এক বাজপক্ষী পাঠাইব যে তুমি তাহার নিকট চড়াইপক্ষী হইয়া যাইবে।"

ঐ অবজ্ঞা-জ্ঞাপক পত্রের কিরূপ উপযুক্ত উত্তর গোবিন্দসিংহ দিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শ্রীগুরু লিখিতেছেন—

> সৎগুরু সচে পাদশা পড়েয়া পুরোয়ানা।
> লিখে জবাব এহে ভেজেয়া যোবি সব নামা॥
> লিখিয়া সব হকিকতা যে সমর নিদানা।
> তৈ কসম যো কিতি দাগোদামে দিলে দি জানা॥

তুকর হুঙ্কার যো বোলেয়া নাপাগ জবানা।
যে সাহেব কিড়ি বলধরে ফিল উসদা খানা॥
মত্র পাকৃড়ি ওট অকালদি কোই হোয়না জানা।
যে আয়া হুকুম অকালদা হাত বন্ধা গানা॥
মত্র পন্থ করা খালসা বিচ দোহা জাহানা।
সাধা গবে আকিয়া হাকিম সুলতানা॥
ছন্দ পবেগা মুলুক বিচ কেয়া আপন বেগানা।
আন্দাগে চলেন্‌গে মারা মোগল পাঠানা॥
দোহাই দেন অশনদি মোহে যায় নিধানা।
মার দুর কারঙ্গা সরান্‌ যায় সুন্নত এ মানা॥
চিঁড়িয়া মারণ গজনু কর খাত্তন তামা। ইত্যাদি।

অর্থাৎ—"সৎগুরু সচ্‌বাদসা গুরুগোবিন্দসিং উক্ত পরওয়ানা পাঠ করিয়া যথাযথ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, যথা—তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি যে শঠতা করিবার মানসে দিব্য গালিয়াছ, তোমার সে মনও জানিতে পারিয়াছি। তুমি অহঙ্কার-বশতঃ যে সকল বৃথা কথা বলিয়াছ, সে বিষয়ে জানিও, যদি ভগবান কীটকে বল দেন, তবে সে হাতীকে খাইতে পারে। আমি একমাত্র অকাল পুরুষের আশ্রয় লইয়াছি আর কিছু জানি না। যখন অকাল পুরুষের হুকুমে আসিয়াছি, তখন যুদ্ধের তাগা হাতে বাঁধিয়াই বসিয়া আছি। (তুমি যেমন ইহপরকালের মধ্যে কলমা পরাইতে চাও তেমনিই) আমি ইহপরলোকের জন্য খালসা পন্থ চালাইয়াছি। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে বৈরীদিগকে দণ্ড দিব। তখন আপন পরের মধ্যে সমস্ত দেশে একটা ধূম পড়িয়া যাইবে। তখন বারুদ না গাদিতেই গোলা চলিয়া মোগল-পাঠান মারিবে। তখন উহারা (মোগল পাঠানেরা) অকাল পুরুষের দোহাই দিবে। আমি তোমার সুন্নত কোরাণের ধর্ম্ম মারিয়া দূর করিব। তখন চড়াই বাজকে আপন ভক্ষ্য জানিয়া মারিবে।"

এই পত্রপাঠ করিলেই আমরা গোবিন্দসিংহের অপূর্ব্ব চরিত্রের অনেকটা আভাষ পাইতে পারি। তাঁহার অসীম সাহসিকতা ও

আত্মবলের ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা হউক, ঐ পত্র প্রেরণের পর বেশীদিন আর গুরু ঐ স্থানে সুস্থির ভাবে থাকিতে পারেন নাই। মোগলসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। উহা দেখিয়া তিনি আরও পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া যাইলেন। বাগুর নামক স্থানে পৌঁছিবামাত্র তিনি শুনিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইয়াছে। উহার পর তিনি কিয়ৎকাল নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে সম্রাটের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ সিংহাসন লাভের আশায় পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জেষ্ঠপুত্র বাহাদুর শাহই ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। হিন্দু মুসলমানে এতদিন যাবৎ যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল তাহা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে এবং বাহাদুরের পদপ্রাপ্তিতে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। নূতন নবাব দেখিলেন তিনি পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন, সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

বাহাদুরশাহ শিখগুরুর সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে উহাতে গোবিন্দসিংহ কোন প্রকার দ্বিধা বোধ না করিয়া সম্মতিদান করেন কারণ তিনি বাহাদুরশাহ কিরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিলেন তাহা জানিতেন। উহার পর বাদশা দাক্ষিণাত্যে শত্রু দমনার্থ প্রায় পঞ্চসহস্র অশ্বসৈন্যসহ গোবিন্দসিংহকে সেনাপত্যে বরণ করিয়া লইয়া যান। তৎপরে গোদাবরী তীরস্থ নান্দোর গ্রামে পৌঁছিলে একজন পাঠান দস্যুকর্ত্তৃক গুরু ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। উহাই অবশেষে তাঁহার জীবননাশ করে।

এইভাবে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জীবনের সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগুরু সবিশেষ মনক্ষোভে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশীয়দিগের মধ্যে সকলেই ইতঃপূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তিনিই কেবলমাত্র দীপাধারের শেষশিখার ন্যায় নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তদীয় মৃত্যুর পর কে আবার শিখদিগের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে, 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'রূপ মহামন্ত্র সাধনের সুযোগ্য ব্যক্তি কোথা হইতে মিলিবে, এই

সকল চিন্তায় তিনি একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, অবশেষে মাধবদাস বা বৈরাগী বান্দা নামক এক ব্যক্তি ঐ কার্য্যভার লইয়া তাঁহার নিরাশমনে কতকটা আশার সঞ্চার করিল। এই বান্দার প্রকৃত জীবনেতিহাস সম্বন্ধীয় সকল তথ্য অবগত হওয়া যায় না; প্রায় সকলেই ইঁহার জীবনের সহিত কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ইনি পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যাহা হউক উহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা একান্ত অজ্ঞ। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে বান্দা এক জন যোদ্ধনিপুণ প্রকৃত বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীগুরুর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন কিন্তু গোবিন্দসিংহের ন্যায় অসীম প্রভুত্বশক্তি না থাকাতে তিনি শিখ-জাতির পূর্ব্বতন ঐক্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই সেই জন্যই তাঁহার সময়ে শিখজাতি কয়েকটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যায় এবং উহা-দিগের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর একান্ত অভাব হইয়া উঠে। যাহা হউক, শ্রীগুরুর জীবদ্দশায় তিনি প্রথম প্রথম মোগলদিগের বহু গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে উহাদিগকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিলেন। সিঁধৌরা, সিরহিন্দ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অত্যাচারে সকলেই বিপর্য্যস্ত হইল। সকলে মিলিয়া সম্রাট বাহাদুরশাহের নিকট ঐ বিষয় উত্থাপন করিলে তিনি স্বয়ং উহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া গুরুর নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যাহা হউক এ বিষয়ে যখন আন্দোলন চলিতেছিল তখন শ্রীগুরুর জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শিষ্যদিগকে যে সকল অমূল্য উপদেশাবলী দান করেন তাহা শিখ ধর্ম্মগ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে।

আজ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। বোধ হইল যেন চারিদিক ঘোর তমসাবৃত, সকলই নিরর্থক, নিরানন্দময়। শ্রীগুরুর জ্বালা যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে দেখিয়া শিষ্যগণ বুঝিল তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। তজ্জন্য তাহারা একান্ত শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল—শিশু যেমন মাকে মরিতে দেখিলে আপনাকে

হতভাগ্য ভাবিয়া অনুক্ষণ ক্রন্দন করিতে থাকে—তাহার শোকাবেগ কিছুতেই উপশমিত হয় না, শিখভক্তগণও তদবস্থ প্রাপ্ত হইল। শ্রীগুরু ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতেছেন—তাহাদিগের ভাগ্যে কি হইবে? কাহার অমিয়-মাখা সান্ত্বনাবাক্যে তাহারা আশ্বস্ত হইবে? কে তাহাদিগকে বিপদে প্রফুল্লতা, কর্ত্তব্যে একাগ্রতা এবং দৈন্যে আত্মবিশ্বাস শিক্ষা দিবে? শ্রীগুরু বলিলেন—

শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং উপরে। শুন খালসা তুম মম প্যারে।
নেত রচি পরমেশর যৈ সে। ভূত ভবিশ্য মিটে সো কৈসে॥

—শুন খালসা! তোমরা আমার অতি প্রিয়; পরমেশ্বর যেরূপ নীতি রচিয়া ভূত ভবিষ্যত চালাইতেছেন সেইরূপ চলিবে।

যাহা হউক, মধ্যরাত্রে চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে—শ্রীগুরু চিতারোহণ করিলেন; অবিলম্বে তদীয় স্থূলদেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইল। ভক্তগণ সমস্বরে—"ওয়া গুরু জীকা খালসা।"

ওয়া গুরু জীকা ফতে"—ধ্বনিতে নভস্তল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ভারতজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মাতা সন্তানকে ভুলেন নাই—তাই তাঁহার গৌরব-স্মৃতি আজিও আপন অঙ্গভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন।

দশম গুরু শ্রীগোবিন্দসিংহের দেহাবসানের সহিত সেই যুগ যুগ স্থায়ী গুরুপদ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল। প্রথম কারণ—তাঁহার বংশলোপ; দ্বিতীয় কারণ সুযোগ্য, শক্তিশালী ব্যক্তির অভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতঃপর শিখজাতি কয়েক জন নেতার অধীনে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার ফলে পূর্ব্বের সেই সংহত, অতুল শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়—গৃহবিবাদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষ তাহাদিগের পতনের মূল কারণ। এইভাবে বহুবর্ষ যাপনের পর তাহারা আর একবার পাঞ্জাবকেশরী মহামান্য রণজিৎ সিংহের অধীনে আবার সেই লুপ্ত-সৌভাগ্য ফিরিয়া পাইয়াছিল কিন্তু ইহাও বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আসুন পাঠক! আমরা সভক্তিহৃদয়ে প্রাচীন ভারতের এই দশ জন গুরুর শ্রীচরণে প্রণত হই, ইঁহাদিগের

অপূর্ব্ব জীবনী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ক্রমশঃ কালের গতিতে কিরূপে সৈনিক-জীবন আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার বিবরণ যুগে যুগে ভারতেতিহাসের একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনারূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। অধুনা এই বিষয়টী আলোচনা করিতে যাইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম পন্থীরা বলিয়া থাকেন গুরু গোবিন্দসিংহ সামরিক শিক্ষার উপর অত্যধিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শিখজাতির প্রবল অনিষ্টসাধন করিয়াছেন—তাহাদিগের মহাপতন হইয়াছে। অপর দল বলেন—"তোমরা ভুল বুঝিতেছ। গোবিন্দসিংহ শিখদিগকে নৈতিকশিক্ষাও দান করিয়াছিলেন, ইহা ভুলিও না। তবে তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা কতকটা সত্য। তিনি শিখজাতিকে সামরিকশিক্ষাই মুখ্যতঃ দেন, তবে এটা মানিব না যে, এতদ্দ্বারা তিনি কোনরূপ দূষণীয় কার্য্য করিয়াছেন,—শিখজাতির পতন হয় নাই।" এ বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি—এ বিবাদ মিটিবার নহে। এতৎ সম্বন্ধে কোন মতামত দান করা বিচার সাপেক্ষ। তবে আমরা এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে গুরু নানকের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতারূপ মাপকাটী দিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে—শিখজাতির ক্রমোন্নতি না হইয়া ক্রমাবনতিই হইয়াছিল। পাঠক দেখিয়াছেন গুরু অর্জ্জুনের সময়েই উহার প্রথম ইঙ্গিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ কিরূপ আকার ধারণ করিল তাহাও আলোচিত হইয়াছে। ইহা বলিলে কেহ যেন না বুঝেন যে পরবর্ত্তী গুরুগণ সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি একান্ত উদাসীন ছিলেন, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারা পূর্ব্বের সেই উচ্চাদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই—উহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই মাত্র। গুরু গোবিন্দসিংহের নৈতিক ও সামরিক উভয় উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, আবার বলি, বিধাতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবে কে? শিখজাতি গোবিন্দসিংহের নেতৃত্বে সামরিক শিক্ষায় সবিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে তাহারা বৃটিশপতাকার অধীনে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া আপনাদিগের সেই অতীত সাহস ও পরাক্রম, তেজস্বিতা ও পারদর্শিতার পরিচয় প্রদানে সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতেছে।

(সমাপ্ত)

উত্তরবঙ্গে বন্যা।

কার্য্যবিবরণী ও আবেদন

আত্রেয়ী নদীর প্লাবনে রাজসাহী ও বগুড়া জেলার জনসমূহ যে দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রত্যহই সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের মিশনের যে সকল সেবকগণ তথায় সেবা করিতে গিয়াছেন তাঁহারা যে সংবাদ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আরও হৃদয়-বিদারক। রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা ও পার্শ্ববর্ত্তী বগুড়া জেলার কতক অংশ এই আকস্মিক বন্যা দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশ প্রায় একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামগুলি এইরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের পূর্ব্বসংস্থান নিরূপণ করা এখন অসম্ভব। শতকরা ৮৫ খানির উপর বসতবাড়ী বন্যার প্রকোপে জলমগ্ন হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এখনও ৩।৪ ফুটের উপর জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নৌকা ব্যতীত গমনাগমন করা যায় না -অথচ নৌকাও মেলে না। গ্রামবাসিগণ গৃহ গ্রামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবার পরিজন, গরু, বাছুর ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী উচ্চভূমি ও রেল লাইনের উপর আশ্রয় লইয়াছে। তথায় ঘাস প্রভৃতির চালা প্রস্তুত করিয়া কোনরূপে মাথা গুজিয়া দিনযাপন করিতেছে। স্থানীয় রিলিফ কমিটির জনৈক সেবক একস্থানে বিঘাপরিমাণ স্থানের উপর ৩০০ শত জন হিন্দু ও মুসলমানকে ১০০ শত গরুসহ আশ্রয় লইতে দেখিয়াছেন। ইহার উপর বস্ত্রাভাবে নগ্ন ও আচ্ছাদনবিহীন ব্যক্তিও চারিদিকে দেখা যাইতেছে। গরু মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুগণও খাদ্যাভাবে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকল ব্যক্তিকেই খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নওগাঁ থানা ব্যতীত আমরা ইতিপূর্ব্বে নওগাঁ মহকুমার রাণীনগর ও নন্দনালী নামক থানা দুইটীতে সাহায্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি। রাণীনগরে ৪টী কেন্দ্র খোলা

হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র চারিটী হইতে ও নন্দনালী থানার কেন্দ্র হইতে দুএকদিনের মধ্যেই চাউল ও বস্ত্র বিতরিত হইবে। নওগাঁ থানায়ও শীঘ্র বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিতরণের বিস্তারিত বিবরণ আমরা সহৃদয় সাধারণের গোচর করিব। সর্ব্বসমেত আমাদিগকে ৭০০ শত খানি গ্রামের অধিবাসিগণকে সাহায্যদান করিতে হইবে। আমাদের সেবকগণ অনুমান করেন, ইহাতে কমপক্ষে মাসিক ৬০০০ হাজার টাকা খরচ পড়িবে; আমরা আশা করি সাধারণের সহানুভূতিতে অর্থের অনটন হইবে না।

বন্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মুসলমান, বাকি হিন্দু। আমরা বরাবর জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই সেবা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণেও উহার কোনও বিরুদ্ধাচরণ হইবে না। কিন্তু বন্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে যদি তাহাদিগকে আশু সাহায্যদান না করা যায় তাহা হইলে পরিণামে যে অতি শোচনীয় হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই-জন্য আমরা সহৃদয় সাধারণের নিকট বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। সকলের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন সাহায্যদানে কালবিলম্ব না করেন। যে কোনরূপ সাহায্য, অর্থ বা বস্ত্র নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

(২) প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ বেলুড়, পোঃ আঃ বেলুড়, হাওড়া।

(স্বাঃ) সারদানন্দ

সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন।

৩১শে ভাদ্র, ১৩২৫ কলিকাতা।

প্রাপ্তি-স্বীকার

বস্ত্রসাহায্য কার্য্য।

বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

(৩রা আগষ্ট হইতে)

ক্ষুদিলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৩৲
নরেন্দ্রভূষণ দত্ত, চট্টগ্রাম ৩৲
শ্রীমতী প্রমোদাবালা দাস গুপ্তা, সন্দীপ ৩৫৲
অনুপম রায়, কলিকাতা ৫৲
কুমুদবন্ধু দত্ত, শ্রীহট্ট ২৲
ভূপেন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা ৫৲
A Friend, কলিকাতা ৫৲
সতীশ চন্দ্র সেন, বগুড়া ১৭৲
চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ২৲
ফকির চন্দ্র নাগ, কলিকাতা ১০৲
প্রসন্নকুমার ঘোষ, ময়মনসিংহ ২৫৲
এম, এস, এন, পিলে, কাউকালাট্টি
তারাপদ ব্যানার্জী, খুবড়ী

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত

(১৩—৮—১৮ হইতে)

পি, বসু, কলিকাতা
এককড়ি ঘোষ, কলিকাতা ৩৲
নিত্যলাল মুখার্জ্জী, কলিকাতা ২৲
প্রফুল্লনাথ রুদ্র, বিলাসপুর ৫৲
তারাপদ রায়, পুরী ২৲
উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, কলসকাটি ২৲
শ্যামাপদ মুখার্জ্জী, কলিকাতা ১৲
A Friend, কলিকাতা ১॥০
ব্রহ্মচারী গুরুদাস, মায়াবতী ৫৲
শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী, কলিকাতা ২৫৲
প্রফুল্লকুমার সরকার, চেংকানল ৫৲
জি, আর, কৃষ্ণ, মাইদকার ২৲
বেঙ্কট সুব্বা রাও, মান্দ্রাজ ১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৩৲
পি, চাটার্জ্জী, কলিকাতা ১০০৲
কানাইয়ালাল কোং, কলিকাতা ১১৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, কলিকাতা ১৲
রাধারমণ সেন, গোরক্ষপুর ১০৲
গোলচাঁদ জৈনী, লাহোর ৲
বসন্তকুমার চাটার্জ্জী, লাহোর ১০৲
এল, এম, ঘোষ, কলিকাতা ১৲
ডাঃ অনিলাক্ষ ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা ৫৲
গিরিশচন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী, কলিকাতা ২৫৲
নৃত্যলাল মুখার্জ্জী, আলিপুর ৮৲
সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, কলিকাতা ৫৲
ত্রিগুণাচরণ চক্রবর্ত্তী, দীনহাটা ১৲
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, মেদিনীপুর ৪
আত্মারাম, সিমলা ৫
।, ব্যাঙ্গালোর
এস, পি, নিয়োগী, ঘাটশীলা
বালমুকুন্দ, কলিকাতা ২৫৲
লক্ষ্মীনারায়ণ, কলিকাতা ১০০
বি, কে, বোস, নাগপুর ১৫
সতীশচন্দ্র সরকার, রেঙ্গুন ২৲
শ্রীমতী নুটু, কলিকাতা ৫৲
রজনীকুমার দে, জলপাইগুড়ি ১০৲
বিজয়কৃষ্ণ পাল, কলিকাতা ৪০০৲
শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী, পাণ্ড ১০৲
মুড়িরাম, রেঙ্গুন ১৫৲

বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

মাঃ ভূষণচন্দ্র পাল কাপড় ১০০খানা

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

মেসারস্ বিজয়রাজ হুকুমচাঁদ ৩৫০খানা
কুঞ্জলাল চাটার্জ্জী, ত্রিপুরা রাজ ১খানা
অজ্ঞাত ১খানা
মচু, কলিকাতা ১খানা
থাবু, কলিকাতা ১খানা
দেবীপ্রসাদ শীল, কলিকাতা ৪০খানা
শুকদেও দাস শিউনাথ, কলিকাতা ৪০খানা
জহরমল সুন্দরমল, কলিকাতা ৬০খানা
হাবি ঝি, ভাটপাড়া ২০খানা

উত্তরবঙ্গে বন্যা কার্য্য।

বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

(১০ই নবেম্বর হইতে)

শ্রীমতী ত্রৈলকাতারিণী দাসী, ভবানীপুর ১০
কিঙ্করবতী, অনাথআশ্রম ২॥০
গোকুল ভাণ্ডার, বালি ৫
সুবোধ চন্দ্র ঘোষ, হাসারা ২৫
মিসেস্ নোভা ফেন উইক ক্রাইষ্ট চার্চ
নিউজিল্যাণ্ড ৬১৮/০
জিতেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি, কলিকাতা ২৸৵০
কপার্টি ক্রীড়ক মণ্ডলী, বালি ৬/০
আর, এন্, পালিত, কলিকাতা ১০৲
আর এন্ সেন, রেঙ্গুন, ৯
অনারারি ট্রেজারার ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল
ফ্লাড রিলিফ কমিটি, কলিকাতা
অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ সেণ্ট কলাম্বাস
কলেজ, হাজারিবাগ ১৪০
হরিহর ভট্টাচার্য্য, বারাসাত ৩১
নির্ম্মলচন্দ্র ব্যানার্জি, কলিকাতা ৪
মোক্ষদা রঞ্জন বিশ্বাস, চাটগাঁ ৩
সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, দার্জিলিং ২
হরিপদ চৌধুরী, ফরিদপুর ১
টম্ সন্ হাই ইস্কুলের ১ম ও ২য়
শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (বালি) ৬॥৵০

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

(১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে)

সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা

হ্যারিসন্ ক্রস্‌ফিল্ড কোংর কর্ম্মচারিবৃন্দ ২৫
এস পি, চৌধুরী, কলিকাতা ১০৲
মাঃ কে সি, মিত্র কলিকাতা ২।০
এস, এস, ইস্কুলের ছাত্র ভবানীপুর ১২২৲
মেসারস্ বি, কে পাল (ঔষধ বাবদ) ৫০৲
রামনাথ খাচরা, বৈদ্যনাথ ১/০
ঠাকুরলাল কেশবলাল, কলিকাতা ৫৲
টেম্পেল স্কুল অব মেডিসিন, পাটনা ৫০৲
এক্‌স, ওয়াই ২৲
গোবিন্দচাঁদ ঘোষ, ভবানীপুর ৫৲
টি কম দাস, কলিকাতা ৫
নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ২
মাঃ বি মৈত্র ১২॥৵৫
প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহেবগঞ্জ ৫।/০
উপেন্দ্র নাথ সেন, বরিশাল ২
এ সিমপাথাইজার ২
বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রবৃন্দ,
কলিকাতা ১৭৫
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ২০০০
নটবর মণ্ডল কোং ১৮
বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা ১৭৮
প্রভাত চন্দ্র দাস গুপ্ত, ঢাকা ২
এস, রহমান, বাঁকুড়া ১
টি, আহামাদ, বাঁকুড়া ১
শরৎচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, রাঁচি ২
শরৎচন্দ্র দত্ত, রাঁচি ২
শশীভূষণ বসাক, কলিকাতা ২০
মাঃ নৃত্যলাল মুখার্জ্জি, বার লাইব্রেরি
আলিপুর ৬০
এ সিম্প্যাথাইজার, ভবানীপুর ৫
বেঙ্গল ব্রাদারহুড, ঢাকা ১৪৸০
বি, বি, এইচ, ই স্কুল ছাত্রবৃন্দ
একরার ১০
পি কে সেন, কলিকাতা ২০
অরবিন্দ চৌধুরী, পেইল গাঁ ১০
নরেন্দ্র নাথ রায়, রাঁচি ২৫
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মাঃ বঙ্গীয় জনসভা
(প্রথম কিস্তি) ১০০০
রাণী ভবানীর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ১০০

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভের উপায়।*

(স্বামী বিবেকানন্দ)

যে অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভগবানের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হই, মনুষ্যহৃদয়ের নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তর অনুসন্ধান আর নাই। কি অতীতকালে, কি বর্ত্তমান কালে মানব 'আত্মা', 'ঈশ্বর' 'অদৃষ্ট' সম্বন্ধীয় আলোচনায় যত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা আমাদের দৈনিক কাজ কর্ম্ম, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি লইয়া যতই ডুবিয়া থাকি না কেন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে কখন কখন একটী স্থির মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন মন সহসা থামিয়া যায় এবং এই জগৎপ্রপঞ্চের পারে কি আছে তাহা জানিতে চায়। কখন কখন সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কিছু কিছু আভাষ পায়, এবং তাহার ফলে তল্লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশেই এইরূপ ঘটিয়াছে। মানুষ অতীন্দ্রিয় দর্শনলাভ করিতে চাহিয়াছে, আপনাকে বিস্তার করিতে চাহিয়াছে; এবং যাহাকে আমরা উন্নতি, ক্রমাভিব্যক্তি বলি তাহা সর্ব্বকালেই মানবজীবনের চরম গতি বা ঈশ্বরানুসন্ধান-রূপ একমাত্র অনুসন্ধানের দ্বারাই পরিমিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতিসকলের বিভিন্ন প্রকারের সমাজগঠন হইতে যেমন আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহই মানবের আধ্যাত্মিক

* ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসেডোনা নগরস্থ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমন্দিরে স্বামিজী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

জীবনসংগ্রামের পরিচয় প্রদান করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজ যেরূপ সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিও সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত রহিয়াছে। কোন এক বিশেষ সমাজভুক্ত লোকসকল দাবী করেন যে একমাত্র তাঁহাদেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারা যতক্ষণ পারেন, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সেই অধিকার বজায় রাখেন। আমরা জানি যে, এইরূপ একটী ভীষণ সংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। সেইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ও কেবলমাত্র তাহারই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এইরূপ দাবী করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও ধর্ম্মই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি আনয়ন করিয়াছে, তথাপি ধর্ম্ম আবার যেরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে এখন আর কিছুই নহে। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও প্রেমের বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মই মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার ধর্ম্মই মানুষে মানুষে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক শত্রুতা বা বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়াছে। ধর্ম্মই মানুষের, এমন কি পশুর জন্য পর্য্যন্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্ম্মই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে। আবার আমরা ইহাও জানি যে সব সময়েই ভিতরে ভিতরে একটা চিন্তাস্রোত চলিয়াছে;—সব সময়েই বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনায় রত কতকগুলি তত্ত্বান্বেষী বা দার্শনিক রহিয়াছেন, যাঁহারা এই সকল বিবদমান ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও চেষ্টা করিতেছেন। ব্যষ্টিভাবে কোন কোন দেশে এই চেষ্টা সফলও হইয়াছে কিন্তু সমষ্টি ভাবে, সমস্ত পৃথিবীর দিক হইতে দেখিতে গেলে, উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এই ভাবটী ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, সকল সম্প্রদায়ই বাঁচিয়া থাকুক; কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী উদ্দেশ্য, একটী মহান্ ভাব নিহিত আছে, যাহা জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং এই হেতুই উহাকে পোষণ করা উচিত। বর্ত্তমান কালেও এই ধারণাটী আধিপত্য লাভ করিতেছে এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে। এই সকল চেষ্টা সকল সময়ে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বড়ই ক্ষোভের বিষয় আমরা দেখি যে আমরা আরও অধিক ঝগড়াবিবাদের সূত্রপাত করিতেছি।

এক্ষণে, ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ না করিয়া সাধারণ বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতে বিষয়টী দেখিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতা ত আর একটা আপত্তি নহে। যদি কোন লোক বলে, "বহিৰ্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে আমি কিছুই জানি না, অতএব বহির্জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই মিথ্যা।" তাহা হইলে তাহাকে মার্জ্জনা করা চলে না। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমগ্র জগতে ধর্ম্মভাবের বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, পৃথিবীর একটীও মুখ্য ধর্ম্ম মরে নাই; শুধু তাহাই নহে, তাহাদের প্রত্যেকটীই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুরা বিস্তার লাভ করিতেছে এবং য়িহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হইতেছে, এবং তাহারা দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ায় য়িহুদীধর্ম্মের গণ্ডী দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

কেবল একটীমাত্র ধর্ম্ম—একটী প্রধান প্রাচীন ধর্ম্ম—ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। তাহা প্রাচীন পারসিকদিগের ধর্ম্ম—জরথুষ্ট্র ধর্ম্ম।

মুসলমানগণের পারস্যবিজয় কালে প্রায় লক্ষ পারস্যবাসী ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাচীন পারস্য-দেশেই রহিয়া গিয়াছিল। যাহারা পারস্যে ছিল, তাহারা ক্রমাগত মুসলমানদিগের নির্য্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে লাগিল—এক্ষণে বড় জোর দশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে; ভারতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার কিন্তু তাহারা আর বাড়িতেছে না। অবশ্য তাহাদিগের গোড়া হইতেই একটী অসুবিধা রহিয়াছে—তাহারা অপর কাহাকেও তাহাদের ধর্ম্মভুক্ত করে না। আবার ভারতবাসী এই মুষ্টিমেয় লোকও, তাহাদের মধ্যে সোদর ব্যতিরিক্ত ভ্রাতাভগিনীগণের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত থাকায়, বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটীমাত্র ধর্ম্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম্মগুলিই অতি পুরাতন, তাহাদের একটীও বর্ত্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটাস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; একটীও প্রধান ধর্ম্ম ইউরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটীও নয়; প্রত্যেক ধর্ম্মই এসিয়া-সম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে। 'যোগ্যতম ব্যক্তি বা বস্তুই বাঁচিয়া থাকিবে'—আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণের এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই সকল ধর্ম্ম যে এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহারা কতকগুলি লোকের পক্ষে উপযোগী; তাহারা যে কেন বাঁচিয়া থাকিবে তাহার কারণ আছে—তাহারা বহুলোকের উপকার করিতেছে। মুসলমানদিগকে দেখ, তাহারা দক্ষিণ এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৌদ্ধগণ মধ্য এসিয়ায় বরাবর বিস্তার লাভ করিতেছে। য়িহুদীদিগের ন্যায় হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্ম্মে গ্রহণ করে না, তথাপি, ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতিসকল হিন্দুধর্ম্মের

ভিতর আসিয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুদিগের আচারব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মও যে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহা আপনারা সকলেই জানেন;—তবে আমার যেন মনে হয়, চেষ্টানুরূপ ফল হইতেছে না। খ্রীষ্টানগণের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে একটী ভয়ানক দোষ রহিয়াছে এবং পাশ্চাত্য সম্প্রদায় মাত্রেই এই দোষ বিদ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি কলকব্জাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কারণ কলকব্জা বড় বেশী। প্রচার কার্য্যটা প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসজ্জা, রাজ্য-শাসন প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে করিবে কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্রে তাহারা প্রাচ্যদিগের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। কারণ, ইহা বরাবর তাহাদেরই কাজ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহারা অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না।

অতএব মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, পূর্ব্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি লাভ করিতেছে। এই যে ঘটনা, ইহার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে; এবং সর্ব্বজ্ঞ, পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে ইহাদের একটী মাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকুক এবং অবশিষ্ট সকলগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা বহু পূর্ব্বেই সংসাধিত হইত। আর যদি এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে একটী মাত্র ধর্ম্মই সত্য এবং অপরগুলি মিথ্যা হইত তাহা হইলে উহা এতদিনে সমুদয় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিত। কিন্তু ঘটনা এরূপ নহে; উহাদের একটীও সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নাই। সকল ধর্ম্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য সময়ে অবনতির দিকে যায়। আর ইহাও ভাবিয়া দেখ যে, তোমাদের দেশে ছয়কোটী লোক আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র দুই কোটী দশ লক্ষ কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মভুক্ত। সুতরাং সব সময়েই ধর্ম্মের উন্নতি হয় না। সম্ভবতঃ সকল দেশেই, গণনা করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্ম্মসকলের কখনও উন্নতি, আবার কখনও

অবনতি হইতেছে। আবার দেখা যায়, জগতে সম্প্রদায়ের সংখ্যা সব সময়েই বাড়িতেছে। ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবি যদি সত্য হইত যে, সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর তাহাকে সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—তাহা হইলে জগতে এত সম্প্রদায় কেন? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই পুস্তকবিশেষকে ভিত্তি করিয়া কুড়িটী নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই সমস্ত সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই সেগুলি আমাদিগকে তাহাদের শব্দার্থ লইয়া ঝগড়া করিবার জন্ম দেন নাই। কিন্তু ঘটনা এইরূপই মনে হইতেছে। কেন এরূপ হয়? যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই ধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন তাহা হইলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কারণ কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেল এবং খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত সম্প্রদায় সমূহের কথা ধরুন; প্রত্যেক সম্প্রদায় ঐ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রান্ত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্বন্ধেই এই কথা। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, হিন্দুদের মধ্যে ত শত শত। এক্ষণে আমি যে সমস্ত ঘটনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য, আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম্মবিষয়ে যতবারই সমুদয় মনুষ্যজাতিকে এক প্রকার চিন্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ততবারই উহা বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এমন কি বর্ত্তমান কালেও নূতন মতপ্রবর্ত্তক মাত্রেই দেখিতে পান যে তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দূরে সরিয়া যাইতে না যাইতে তাহারা কুড়িটী দল গঠন করিয়া বসিয়াছে। আপনারা সব সময়েই এইরূপ ঘটিতেছে দেখিতে পান। কথা হইতেছে এই যে, সকল লোককে একই প্রকার ভাব গ্রহণ করান চলে না এবং আমি ইহার জন্ম ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী

নহি। বরং নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে বলিয়া আমি খুসী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাউক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু ইহাই যে, যদি আপনি, আমি এবং এখানে উপস্থিত আর আর সকলে ঠিক একই প্রকার ভাবরাশি চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়ই থাকিবে না। দুই বা ততোধিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ হইলেই যে গতি সম্ভব হয়, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই—চিন্তার বৈচিত্র্য হইতেই নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়। এখন, আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা করিতাম তাহা হইলে আমরা যাদুঘরের মিশর দেশীয় 'মামি'গুলার (Mummies) মত পরস্পরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতাম,—তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না! বেগবতী সজীব নদীতেই ঘূর্ণাবর্ত্ত বিদ্যমান থাকে, বদ্ধ ও মরা জলে আবর্ত্ত হয় না। যখন ধর্ম্মসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে তখন আর সম্প্রদায়ও থাকিবে না; তখন শ্মশানের পূর্ণ শান্তি ও সাম্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে। বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং উহা থাকিবেই থাকিবে। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে জগতে যত মনুষ্য আছে ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্ম্মরাজ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে—তাহার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে চলিতে পারে।

কিন্তু এই ব্যাপারটী পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করিতেছে, কিন্তু এই স্বাভাবিক গতিটা বরাবরই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং এখনও হইতেছে। সাক্ষাৎপক্ষে তরবারি ব্যবহৃত না হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নিউইয়র্কের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতেছেন শুনুন—তিনি প্রচার করিতেছেন 'যে ফিলিপাইনবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতিপূর্ব্বেই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত

হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রেস্‌বিটেরিয়ান করিতে চান এবং ইহার জন্য তিনি এই রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি স্বজাতির স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত! কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাঁহার দেশের একজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রচারক এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ লোক। যখন এইরূপ একজন লোক সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার কদর্য্য প্রলাপবাক্য বলিয়া যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না তখন জগতের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন, বিশেষতঃ, যখন আবার তাহার শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে উৎসাহ দিতেছে! ইহাই কি সভ্যতা? ইহা ব্যাঘ্র, নরখাদক ও অসভ্য বন্যজাতির সেই চিরাভ্যস্ত রক্তপিপাসা বই আর কিছুই নহে—কেবল নূতন নাম ও নূতন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান কালেই যদি ঘটনা এইরূপ হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় সকলকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, সেই প্রাচীনকালে জগৎকে কি ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের শার্দ্দূলসুলভ বৃত্তিনিচয় সুপ্ত রহিয়াছে মাত্র—ইহা একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহারা লাফাইয়া উঠে এবং পূর্ব্বের ন্যায় হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। তরবারি অপেক্ষাও, জড় পদার্থনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাপেক্ষাও ভীষণতর অস্ত্র-শস্ত্র আছে—অবজ্ঞা, সামাজিক ঘৃণা ও সমাজ হইতে বহিষ্করণ; এখন এই সকল ভীষণ মর্ম্মভেদী অস্ত্রই যাহারা ঠিক আমাদের ন্যায় চিন্তা করে না তাহাদের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। আর কেনই বা সকলে ঠিক আমার মত চিন্তা করিবে? আমি ত ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি বিচারশীল মানুষ হই, তাহা হইলে সকলে যে ঠিক্ আমার ভাবে ভাবিত নয় ইহাতে আমার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আমি প্রেতভূমিসদৃশ দেশে বাস করিতে চাহি না; আমি মানবের জগতে থাকিতে চাই—মানুষের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইতে চাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মতভেদ থাকিবে; কারণ,

পার্থক্যই চিন্তার প্রথম লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল লোক হই তাহা হইলে আমার অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া উচিত,—যেখানে মতের পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিবে।

তার পর প্রশ্ন উঠিবে, এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু কি করিয়া সত্য হইতে পারে? একটী জিনিস সত্য হইলে তাহার বিপরীত জিনিসটা মিথ্যা হইবে। একই সময়ে দুইটী বিরুদ্ধ মত কি করিয়া সত্য হইবে? আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর ধর্ম্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে সকল বাহ্য আচারের আবরণে বড় বড় চিন্তা সকল প্রকাশ পায় আমি সে সকলের কথা বলিতেছি না, নানা ধর্ম্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্রভৃতির কথা বলিতেছি না, আমি প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতরকার প্রাণবস্তুর কথা বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্ম্মের পশ্চাতে একটি করিয়া প্রাণবস্তু বা আত্মা আছে; এবং এক ধর্ম্মের আত্মা অন্য ধর্ম্মের আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করে, না, একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে?—ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখন হইতে এই প্রশ্নটী বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং সারা জীবন ধরিয়া উহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমার সিদ্ধান্ত হয় ত আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারে এই মনে করিয়া উহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাহারা পরস্পরের বিরোধী নহে, পরস্পরের পূর্ণতাসাধক। প্রত্যেক ধর্ম্ম যেন মহান্ সার্ব্বভৌমিক সত্যের এক একটী অংশ লইয়া তাহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। সুতরাং ইহা যোগদানের ব্যাপার—বর্জ্জনের নহে,. ইহাই বুঝিতে হইবে। এক একটী বড় বড় ভাব লইয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে; এক্ষণে আদর্শের সহিত আদর্শের সম্মিলন করিতে হইবে। এইরূপেই মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে।

মানুষ কখনও ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরন্তু সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া থাকে; নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরূঢ় হইয়া থাকে—কিন্তু কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নহে। পুত্র হয় ত পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণশালী হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া পিতা যে কিছু নন তাহা ত নহে। পুত্রের মধ্যে পিতা ত আছেনই, অধিকন্তু আরও কিছু আছে। আপনার বর্ত্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে কি আপনি এক্ষণে সেই বাল্যাবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন? আপনি কি সেই অতীতাবস্থার দিকে তাকাইয়া উহাকে কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? বুঝিতেছেন না, আপনার বর্ত্তমান অবস্থা সেই বাল্যকালের জ্ঞানই আরও কিছু অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট, এই মাত্র?

আবার ইহা ত সকলেই জানেন যে, একই জিনিসকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তি সূর্য্যের দিকে গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রসর হইতেছে অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের এক একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে তখন তাহার নিকট সূর্য্যের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ থাকিবে। যদি সে সেগুলি আমাদের সম্মুখে রাখে তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহাদের কোন দুইখানি ঠিক এক রকমের নহে, কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে এগুলি একই সূর্য্যের ফটোগ্রাফ—শুধু ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে গৃহীত। চারিটী কোণ হইতে এই গির্জ্জাটীর চারিখানি ফটোগ্রাফ লইয়া দেখুন, তাহারা কত পৃথক্ দেখাইবে, তথাপি তাহারা এই গির্জ্জারই প্রতিকৃতি। এইরূপে আমরা একই সত্যকে আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিতেছি। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন পাওয়া সম্ভব ততটাই পাইতেছি—তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের দ্বারা রঞ্জিত করিতেছি,

আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি। আমাদের সহিত সত্যের যতটুকু সম্বন্ধ, আমরা উহার যতটুকু গ্রহণ করিতে সক্ষম ততটুকুই গ্রহণ করিতেছি মাত্র। এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ; এমন কি, কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; তথাপি সকলেই সেই সর্ব্বজনীন সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আমার ধারণা এই যে, এই সমস্ত ধর্ম্ম ঈশ্বরের অনন্তশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং তাহারা, মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছে; তাহাদের একটীও মরে না—একটীকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। যেমন কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক শক্তিনিচয়ের কোন একটীরও বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় না। আপনারা দেখিবেন, প্রত্যেক ধর্ম্মই জীবিত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে ইহা হয় ত উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কোন সময়ে হয় ত ইহার সাজসজ্জার অনেকটা হ্রাস হইতে পারে, কখনও উহা রাশীকৃত সাজসজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উহার প্রাণবস্তু বা আত্মা সর্ব্বদাই উহার পশ্চাতে রহিয়াছে; উহা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্ম্মের যাহা চরম আদর্শ তাহা কখনই নষ্ট হয় না, সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মই জ্ঞাতসারে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

আর সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শনিকগণ ও অপর ব্যক্তি সকল কত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা এখানেই রহিয়াছে। সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, সেইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই 'ভ্রাতা' 'ভগিনী' দেখিতে পান নাই? আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে দেখিয়াছি। ভ্রাতৃভাব পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল কতকগুলি লোক আছে যাহারা ইহা দেখিতে না পাইয়া ভ্রাতৃভাবের নূতন নূতন

সম্প্রদায়ের জন্য চীৎকার করিয়া উহাকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেয়। সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্মও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অপরাপর লোকেরা, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার আপনা হইতে ঘাড়ে লইয়াছেন, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্য্য বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঐ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। তাঁহারা বরাবরই উহার প্রকাশে বাধা দিয়া আসিতেছেন, কারণ, উহাতে তাঁহাদের স্বার্থ আছে। আপনারা দেখিতে পান, সকল দেশের পুরোহিতেরাই অতিশয় গোঁড়া। ইহার কারণ কি? খুব কম পুরোহিতই আছে যাহারা নেতা হইয়া জনসাধারণকে চালিত করে, তাহাদের অধি-কাংশই জনসাধারণ দ্বারা চালিত হয় এবং তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীত-দাস হয়। যদি কেহ বলে ইহা শুষ্ক, ত তাহারাও বলিবে, হাঁ, শুষ্ক; যদি কেহ বলে, ইহা কাল, ত তাহারাও বলিবে, হাঁ, ইহা কাল। যদি জনসাধারণ উন্নত হয় তাহা হইলে পুরোহিতেরা উন্নত হইতে বাধ্য। তাহারা পিছাইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং পুরোহিতদিগকে গালি দিবার অগ্রে পুরোহিতগণকে গালি দেওয়া আজ কাল একটা ধারা হইয়াছে—আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপ-নারা আপনাদের যোগ্য ব্যবহারই পাইতেছেন। যদি কোন পুরোহিত আপনাদিগকে নূতন নূতন উন্নত ভাব দিয়া আপনাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার দশা কি হইবে? হয় ত তাঁহার পুত্রকন্যা অনাহারে মারা যাইবে এবং তাঁহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে। আপনারা যে সকল সাংসারিক আইন মানিয়া চলেন, তাঁহারাও তাহাই মানিয়া চলেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি অগ্রসর হন তাহা হইলে আমরাও হইব।" অবশ্য এমনও দুই চারি জন উচ্চ আধারসম্পন্ন লোক আছেন, যাঁহারা লোকমতকে ভয় করেন না। তাঁহারা সত্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন এবং এক মাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—যেন তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং

তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তাঁহারা কখনও পশ্চাতে চাহেন না, ফলে তাঁহাদিগের লোকও জুটে না। ভগবানই এক মাত্র তাঁহাদের সহায়, তিনিই তাঁহাদের পথপ্রদর্শক জ্যোতি এবং তাঁহারা সেই জ্যোতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

আগামীবারে সমাপ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার বি, এল)

(১৬)

ধ্যান যোগ।

উদ্ধব বলিলেন, আমার ধ্যানে প্রয়োজন নাই। ধ্যান কি? তা আমার জানিবার বাসনাও নাই। আমি তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস, ইহাতেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থ. অন্য আর কিছু আমি চাহি না! তবে তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমাকে আচার্য্য করিয়া রাখিয়া যাইতেছ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ধ্যান কি? তাহাঁকে কি বলিব? ভগবান্ উদ্ধবকে যোগাঙ্গ আসন ও সগর্ভ প্রাণায়াম উপদেশ দিলেন ও ধ্যানের ক্রম অর্থাৎ কিরূপে সবিশেষ ধ্যান হইতে নির্ব্বিশেষ ধ্যানে উপনীত হইতে হয়, শিখাইলেন।

সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা।

প্রথমে ইষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান করাই বিধি।

সুকুমারং অভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ॥

প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা করিয়া সুকুমার মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।

মাত্র মুখে ধারণা।

তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তম্ আকৃষ্য একত্র ধারয়েৎ
নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েৎ মুখম্।

সেই সর্ব্বব্যাপক চিত্তকে কুড়াইয়া এক জায়গায় ধারণা করিবে, আর অন্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না। কেবল সহাস্য মুখ চিন্তা করিবে।

আকাশে ধারণা।

তত্র লব্ধপদং চিত্তং আকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।

মুখে লগ্নচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আকাশে ধারণা করিবে।

কিছুই চিন্তা করিবে না।

তৎ চ ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

আকাশও ত্যাগ করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না, মাত্র শুদ্ধব্রহ্মে অবস্থিত রহিবে।

আত্মা ও পরমাত্মা যোগ কিরূপ।

জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইবে।

এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিলে মনের ত্রিপুটী অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান বা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—এই বিভাগ লয় হইয়া মন নির্ব্বাণ—অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়।

(১৭)

সিদ্ধি।

সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। আটটী সিদ্ধি ঈশ্বরপ্রধান। আর দশটী সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে হয়।

আটটী ঈশ্বরপ্রধান সিদ্ধি।

(১) অণিমা—অণু হওয়া, প্রস্তর প্রবেশ।
(২) মহিমা—মহান্ হওয়া, সমস্ত ব্যাপিয়া থাকা।
(৩) লঘিমা—মরীচি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাওয়া।
(৪) প্রাপ্তি—অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা চন্দ্রস্পর্শ।

(৫) প্রাকাম্য—ভূমিতে ভাসা ডুবা যেরূপ জলে।

(৬) ঈশিতা—শক্তি প্রেরণ।

(৭) বশিতা—বিষয়ে অনাসক্তি।

(৮) কামাবসায়িতা—সুখের সীমা প্রাপ্তি।

দশটী গুণজ সিদ্ধি।

(১) অনূর্ম্মিমত্ত্ব—ক্ষুৎ পিপাসা, জরা মৃত্যু, শোক মোহ রহিত হওয়া।

(২) দূর শ্রবণ।

(৩) দূর দর্শন।

(৪) মনোজব—যেখানে মন যায় সেখানে দেহ যায়।

(৫) কামরূপ—যেরূপ হইতে ইচ্ছা হয় সেইরূপ ধরা।

(৬) পরকায়া প্রবেশ।

(৭) স্বেচ্ছামৃত্যু।

(৮) সুরক্রীড়া ভোগ।

(৯) সত্য সংকল্প—যাহা সংকল্প করে তাহা পায়।

(১০) অপ্রতিহত আজ্ঞা।

ক্ষুদ্রসিদ্ধি।

এই আঠারটী ছাড়া ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচটী।

(১) ত্রিকালজ্ঞত্ব—ত্রিকালদর্শিত্ব।

(২) অদ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদিতে অভিভূত না হওয়া।

(৩) পরচিত্তাভিজ্ঞতা।

(৪) স্তম্ভন—অগ্নি, অর্ক, অম্বু, বিষ, অস্ত্রাদি প্রভৃতির বেগ নিরোধ করিবার ক্ষমতা।

(৫ অপরাজয়—সর্ব্বত্র জয়লাভ।

এই সব সিদ্ধি বিবিধ ধারণা হেতু হয়।

(৮)

সহজে সিদ্ধি লাভ।

সত্য বটে বিভিন্ন ধারণা হেতু এই সব সিদ্ধিলাভ হয় কিন্তু ভগবানে মন ধারণা করিলে সব সিদ্ধি লাভ হয়।

মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ"সুদুর্লভা।

আমাতে ধারণা করিলে এমন কি সিদ্ধি আছে, যাহা লাভ হয় না?

সিদ্ধি-অন্তরায়। বৃথা সময় নষ্ট।

অন্তরায়ান্ বদন্তি এতাঃ যুঞ্জতঃ যোগম্ উত্তমম্।

ময়া সম্পদ্যমানস্ত কালক্ষপণহেতবঃ।

কিন্তু উত্তম যোগাভ্যাসকারীরা এই সব সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে। আর আমাকে যে লাভ করিতে ইচ্ছা করে তার এ সবে বৃথা সময় নষ্ট হয়।

বিশেষতঃ নিষ্ফল।

মৎস্যজন্ম হেতু উদকস্তম্ভ করিতে পারে, পক্ষিজন্ম হেতু আকাশে গমন করিতে পারে। একটা মাছ বা একটা পাখী সহসা যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সিদ্ধি পাইবার জন্য যোগধারণা করিতে হইবে? যে করে, তার মত নির্ব্বোধ বিরল।

(১৯)

ভগবৎ বিভূতি।

সকলেই ধ্যান করিতে পারে না। কারণ সংযত পুরুষ ছাড়া ধ্যান হয় না। কিন্তু একটা উর্জ্জিত শক্তিবিশিষ্ট বস্তু বা পুরুষ দেখিলে মনে হয়, এই বুঝি ভগবান্ এবং তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় এবং তাহা চিন্তা করা সোজা হয়। উর্জ্জিত শক্তি ভগবানের অংশ বটে।

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং হ্রীঃ ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।

বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মে অংশকঃ॥

যেখানে যেখানে তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য্য, ভগ, বীর্য্য, তিতিক্ষা, বিজ্ঞান, সেখানে সেখানে আমার আবির্ভাব জানিবে।

এইরূপ আবির্ভাব মানিলে মন আকৃষ্ট হইবে এবং অসংযতচিত্ত সংযত হইবে, তারপর ধ্যানের উপযুক্ত হইবে।

(২০)

বিভূতি মনোবিকার মাত্র।

কিন্তু ইহা বুঝা উচিত ভগবানের আবির্ভাব কেবল বস্তুবিশেষে বা পুরুষবিশেষে নহে। ভগবান্ সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বপুরুষে বিদ্যমান। যেরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উদ্ধবকে ভগবান্ নানা বিভূতি বলিয়া পরিশেষে বলিতেছেন—

মনোবিকারা এব এতে যথা বাচা অভিধীয়তে।

যেমন আকাশকুসুম বাক্যে বলা যায়, কিন্তু ঐরূপ বস্তু নাই, সেইরূপ এই সব বিভূতি মনোবিকার মাত্র।

ইহাদের পারমার্থিকতা কিছুই নাই, অতএব বিভূতিতে অভিনিবেশ করিবে না।

সংযমের প্রয়োজন।

বাচং যচ্ছ মনঃ যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছ ইন্দ্রিয়াণি চ।

আত্মানম্ আত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে।

অতএব উদ্ধব! বাক্ সংযম কর, মন সংযম কর, প্রাণ সংযম কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর, সত্ত্বাশ্রয় করিয়া বুদ্ধি সংযম কর, তাহা হইলেই সংসারমার্গে আর ফিরিবে না।

অসংযত যতির তপস্যা কাঁচা ঘটের জল।

যঃ বৈ বাক্ মনসী সম্যক্ অসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ

তস্য ব্রতং তপঃ দানং স্রবতি আমঘটাম্বুবৎ।

যে যতি বাক্ মন সম্পূর্ণরূপে সংযত করে না, তার ব্রত, তপস্যা, দান সব নষ্ট হইয়া যায়, যেমন কাঁচা ঘটে জল রাখিলে হয়।

(২১)

বর্ণাশ্রম।

ভগবান্ চতুর্ব্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের উপদেশ দিলেন। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধারণ বালকের শিক্ষা বিস্তার জন্য সেইরূপ চতুরাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ তৈয়ার করা।

সত্য ও ত্রেতা।

সত্যযুগে অবতারাবিশেষের অভাবহেতু শুদ্ধ নির্ব্বিকল্প বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মকে ধ্যান করিত। ত্রেতাতে হৌত্র, অধ্বর্য্যব, উদ্গাত্র—ত্রিবিধ যজ্ঞই ধর্ম্ম ছিল।

সর্ব্ব-বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ম্ অকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্ম অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের হিত ও প্রিয়বাঞ্ছা—এইগুলি সার্ব্ববর্ণিকের ধর্ম্ম।

গৃহস্থেরও নিবৃত্তিনিষ্ঠা থাকা উচিত।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্তি এতে স্বপ্নো নিদ্রানুগঃ যথা।

পুত্র, দারা, আপ্তজন, বন্ধু, ইহাদের সঙ্গম পান্থশালাস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গমের তুল্য, কারণ স্বপ্ন নিদ্রাবসানে যেরূপ নষ্ট হয়, সেইরূপ পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে নাশ প্রাপ্ত হয়।

নিজগৃহে অতিথির ন্যায় বাস করিবে।

ইত্থং পরিমৃশন্ মুক্তঃ গৃহেষু অতিথিবৎ বসন্।
ন গৃহৈঃ অনুবধ্যেত নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কৃতঃ।

মুক্ত পুরুষ এইরূপ বিচার করিয়া নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া অতিথির ন্যায় উদাসীন হইয়া বাস করিবে, বদ্ধ হইবে না।

ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে ভগবান্ জ্ঞান করিবে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ন অবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত সর্ব্বদেবময়ঃ গুরুঃ॥

আচার্য্যকে ভগবান্ জ্ঞান করিবে। কখন অবমাননা করিবে না। মনুষ্যজ্ঞানে কখন অসূয়া করিবে না, কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

বানপ্রস্থী সকাম হওয়া উচিত নহে।

যঃ তু এতৎ কৃচ্ছ্রতঃ চীর্ণং তপঃ নিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায় অল্পীয়সে যুঞ্জ্যাৎ বালিশঃ কঃ অপরঃ ততঃ॥

যে এই কষ্টসম্পাদিত মোক্ষকর তপস্যা, ব্রহ্মলোকাদি তুচ্ছ কামেতে সংযুক্ত করে সেই সকাম তাপস অপেক্ষা মূর্খ আর কে?

সন্ন্যাসীর বিঘ্ন কামিনা।

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতঃ দেবাঃ দারাদিরূপিণঃ।

বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্তি অয়ং হি অস্মান্ আক্রম্য সমিয়াৎ পরম্।

ইনি আমাদের অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের নিকট যাইবেন এই আশঙ্কায় দেবগণ কামিনীরূপে সন্ন্যাসীর বিঘ্ন করেন।

(২২)

অনাশ্রমী।

ভগবান্ চতুরাশ্রম বলিয়া এইবার অনাশ্রমীর কথা বলিতেছেন। সন্ন্যাস দ্বিবিধ—বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস। বিবিদিষা সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত। বিদ্বৎ সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত নহে।

অনাশ্রমী কে?

জ্ঞাননিষ্ঠঃ বিরক্তঃ বা মদ্ভক্তঃ বা অনপেক্ষকঃ

সালিঙ্গান্ আশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরেৎ অবিধিগোচরঃ।

বৈরাগ্যবান্ জ্ঞাননিষ্ঠ বা নিরপেক্ষ মদ্ভক্ত আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে, কিন্তু বিধি কিঙ্কর অর্থাৎ বিধির দাস হইবে না।

বিদ্বৎ সন্ন্যাসের লক্ষণ।

বুধঃ বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলঃ জড়বৎ চরেৎ।

বদেৎ উন্মত্তবৎ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমঃ চরেৎ।

তিনি যদিচ বিবেকী কিন্তু বালকের ন্যায় মানাপমান শূন্য হইয়া খেলা করেন, যদিচ নিপুণ কিন্তু জড়ের ন্যায় থাকেন, যদিচ পণ্ডিত কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় কথা বলেন। যদিচ বেদার্থজ্ঞ কিন্তু গরুর ন্যায় অনিয়তাচার করেন।

তাঁর অভেদ জ্ঞান।

নহি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।

এরূপ জ্ঞানীর ভেদপ্রতীতি থাকে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানহেতু নষ্ট হইয়াছে।

আদান-প্রদান।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

পৃথিবীর চিন্তা আজ পাশ্চাত্য দেশগামিনী—যেখানে লোকক্ষয়-করী মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দেশকালকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশ ভোগ ও সভ্যতার লীলাভূমি এবং বিদ্যার আদর্শ নিকেতন বলিয়া বিবেচিত হইত. আজ চারি বৎসরের যুদ্ধে সে আদর্শ কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। জড়শক্তির উদ্দাম নৃত্যে পাশ্চাত্য ভূমি "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া পড়িয়াছে; এইরূপ খণ্ড প্রলয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রতি শতাব্দীতেই সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়। ঐহিক ভোগেচ্ছায় পরিচালিত সঙ্ঘ ও জাতিমাত্রেরই এই ভয়াবহ পরিণাম.—ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান।

পাশ্চাত্য বীরগণ বলেন, যুদ্ধই দেশের সঞ্চিত মল অপহরণ করিয়া জাতিকে নবীন জীবন প্রদান করে; সুতরাং ইহা প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম— অবশ্যম্ভাবী। যে দেশের চিন্তা শুধু ইহ-ভোগ-সমুখ আকাঙ্ক্ষার আপূরণে ধাবমানা মানবজীবন যথায় সংগ্রামময় বলিয়া পরিগণিত—সংগ্রামসক্ষমতা যথায় জীবনধারণের মুখ্য শক্তি বলিয়া বিবেচিত, সে দেশের পণ্ডিতগণ যে উক্তরূপ সিদ্ধান্তবাদী হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? অখণ্ড রাজ্যলিপ্সা, বাণিজ্যের অবাধ সম্প্রসারণ—অজস্র ধনাগমের অযুত পন্থা আবিষ্করণ - পার্থিব সুখের অনন্ত উৎস প্রকটন যে দেশের উচ্চাদর্শ বলিয়া পরিগণিত, সে দেশে হিংসা দ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমুখ শারীরিক ও যান্ত্রিক বলের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য জাতির আদর্শই এই সঙ্ঘর্ষের জন্য দায়ী।

ভগবান্ যীশুর সাম্যবাদ—দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া, অগ্রে ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য দূর করিয়া পরে ঈশ্বরোদ্দেশে বলি আহরণ ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ আদর্শবাক্য পাশ্চাত্য

দেশের জন্যই যথার্থ কথিত হইয়াছে। যে দেশে রজস্তম শক্তির প্রবল অভ্যুদয়, সে দেশে তথাকথিত সাম্য ভাবের আদর্শ স্থাপন ও গ্রহণ না করিলে জাতি ও সঙ্ঘের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য দেশ সেই সাম্যবাদ গ্রহণ না করিলে ধ্বংসমুখে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের আদর্শ অন্যরূপ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বন্দ্বময় জীবনের সমগ্রসংঘর্ষই এ দেশের প্রকৃত আদর্শ নহে। ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের মধ্যেও শান্তির প্রতিষ্ঠা আছে। স্বামিজী যেমন বলিতেন, "ভারতের জাতিমাত্রই বাস্তব জীবনকে আদর্শ জীবন বলিয়া গ্রহণ করে; একমাত্র ভারতবর্ষই আদর্শ জীবনকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। (We take ideal for the real : other nations, the real for ideal.) ভারতের উচ্চ আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ—জীবনরহস্যের উদ্ঘাটন—ঐহিক জীবনে অনাসক্তি মোক্ষার্থে ও পরহিতার্থে সর্ব্ব ত্যাগ। এই দেশের ত্যাগধর্ম্ম অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বেদবোধিত এই আত্মজ্ঞানলাভ-দ্যোতক ত্যাগধর্ম্ম কালক্রমে কর্ম্মহীনতায়—জড়তায় পরিণত হওয়ায় এবং কর্ম্মহীনতায় সামান্য জীবনসংস্থানেরও সম্ভাবনা না থাকায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে অর্জ্জুনকে অকর্ম্মরূপ কাপুরুষতাকে নিন্দা করতঃ বলিয়াছেন, "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ"—হে পার্থ, ক্লীবতা পরিত্যাগ কর। মীমাংসাশাস্ত্রের পূর্ব্ব ও উত্তরকাণ্ডে কর্ম্মপরতা ও কর্ম্মত্যাগরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সামঞ্জস্যকল্পে গীতোক্ত ধর্ম্ম কথিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মহীনতারূপ ক্লীবতার বিরুদ্ধেই উহার ইঙ্গিত। গীতাশাস্ত্রও ত্যাগকেই সর্ব্বোচ্চাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবকুলকে অগ্রে কর্ম্মতৎপর হইতে বলিয়া পরে কর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞাননিষ্ঠায় উপস্থাপিত করাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়াস বলিয়া অনুমিত হয়। কর্ম্মহীনতায় জীবকুল পাছে জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে—যাহাতে লোকহিতকর সৎকর্ম্মসহায়ে জীবকুল ত্যাগের উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত

হইতে পারে, গীতাশাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অভিপ্রায়। অনেকে মনে করেন, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী পাইলেই আত্মজ্ঞানলাভে চরিতার্থ হওয়া যায়। কিন্তু গীতার সামঞ্জস্য-নীতি এইরূপ কর্ম্ম-হীনতাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে উপহাস করিয়াছেন। সত্ত্বমাত্র ভাণ, তমোগ্রস্ত জনগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" সর্ব্বদা কর্ম্ম কর। কর্ম্মহীনতার চেয়ে কর্ম্ম করাই ভাল একেবারে কর্ম্মহীন হইলে জীব জড়ত্বে পরিণত হয়। সত্ত্বপ্রধান ত্যাগের আদর্শ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ত্যাগের উচ্চাদর্শের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা-কল্পে এই জন্য ভগবান কর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া জীবকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়—জন্মমৃত্যু প্রবাহে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। এই জন্য ভগবচ্চরণে কর্ম্মের ফলাফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ। স্বার্থজড়িত থাকিলে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না—বাদবিসম্বাদে জীবন উদ্বেলিত হয়। ত্যাগের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত কর্ম্মফলে জীব কদাপি বদ্ধ হইতে পারে না। ত্যাগের উচ্চাদর্শে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই জন্যই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ত্যাগের আদর্শ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গীতোক্ত সকাম ধর্ম্মের উদ্বেল প্রবাহে ইদানীং পাশ্চাত্য দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। আর প্রভু যীশুর সাম্যবাদ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়াই ইদানীং প্রয়োজন হইয়াছে। কর্ম্মহীনতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত জনগণকে এদেশে গীতার ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশবাসী জনগণকে যীশুর সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই জগৎ উন্নতির পথে—ত্যাগের আদর্শ পন্থায় অগ্রসর হইতে পারিবে।

স্বামিজীর কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। ব্যবহারিক জগতের, সুখ দুঃখ ভালমন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের পরিমাণ সমভাবেই বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। দেশকালবিশেষে কোথায়

কখন বা এই সকল দ্বন্দ্বভাবের উচ্চাবচ ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোথাও রজস্তমের আধিক্য, কোথাও বা সত্ত্বরজের প্রাবল্য ইত্যাদি। সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম রক্ষার্থ দেশ ও কালবিশেষে মহাপুরুষগণের অভ্যুদয় হয় যাঁহারা প্রকৃতির সাম্য বজায় করিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জীব ও জগতের হিতার্থে কর্ম্ম করেন। যে দেশে ঘোর রজস্তমোভাবের দিগ্‌দেশ-গ্রাসী ব্যাদান, সে দেশে সত্ত্বপ্রধান সাম্যবাদের প্রকটনকল্পে প্রভু যীশুর অভ্যুদয়। যেখানে সত্ত্ব ভাণে আচ্ছাদিত পরন্তু জড়তার ক্রোড়ে নিদ্রিত জীবকুল ঘোরতামসভাবাপন্ন, সে দেশ ক্লীবতানিন্দা-কারী শ্রীকৃষ্ণের গীতানির্ঘোষে মুখরিত। এই সকল মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবকুল ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

ঘোরতমসাচ্ছন্ন, দাসসুলভ হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত এদেশবাসীকে কথঞ্চিৎ রজোভাবে অনুপ্রাণিত করিতে মহাশক্তির ইচ্ছায় পাশ্চাত্য-গণ এদেশের ভাগ্যবিধাতারূপে বর্ত্তমান। পরন্তু তাঁহারা আবার প্রবল রজস্তমোভাবের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত অযুতশতাব্দী-সঞ্চিত ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অনুপ্রাণিত হইবে বলিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন। এ দেশবাসিগণ রজঃপ্রধান রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক সহজাত তামসভাব অতিক্রম করিবে বলিয়া তাঁহাদের শাসনাধীন রহিয়াছে। এই আদান প্রদান পরিসমাপ্তি হইলেই হিংসাদ্বেষ, শাস্য শাসক ভাব জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহাই প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়। এই আদান প্রদানে পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি অপেক্ষা করিতেছে। সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞলোক বুঝিয়াছেন, এই ত্রিলোক-সংক্ষোভী সংগ্রামাবসানে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবল বন্যায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ড প্লাবিত হইবে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ভূখণ্ডও রজঃশক্তি-সহায়ে জীবনসংগ্রামোপযোগী প্রভাব বিস্তারে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে। এই আদান-প্রদানে জীবকুল ধন্য হইবে — জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে রজঃপ্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ তোমরা রজোভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া জড়ভাবাপন্ন ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। কথঞ্চিৎ কর্ম্মপ্রবণ সঙ্ঘ ও জাতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাহাদের উৎসাহের বাধা দিও না। আমাদিগকে তোমাদের প্রবল রজঃশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। দেশে শান্তির বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে তোমরাও ভারতের প্রবল আধ্যাত্মিকতা লাভে প্রস্তুত হও; তোমাদের লোকক্ষয়কারী তাণ্ডবলীলার অবসান হইবে। আমরা সত্ত্বপ্রবল ত্যাগের আদর্শ লইয়া তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। উভয়ের আদান-প্রদানে উভয় ভূখণ্ড উপকৃত হইবার দিন আসিয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, প্রকৃতি জড় কিন্তু চলৎস্বভাবা। পুরুষ অচল কিন্তু চক্ষুষ্মান্। ইহাকেই অন্ধপঙ্গু ন্যায় বলে। এই উভয়ের অপূর্ব্ব সংযোগেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে। প্রাচ্যদেশও তেমনি পুরুষস্থানীয় চক্ষুষ্মান্—আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বলে বলীয়ান্। পাশ্চাত্য দেশ আবার প্রকৃতিস্থানীয়—কেবলই চলৎস্বভাব। জগতের শান্তি সংস্থাপন কল্পে প্রকৃতিস্থানীয় পাশ্চাত্য দেশকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির—আধ্যাত্মিকতার সাহায্য লইতে হইবে। পক্ষান্তরে প্রকৃতিস্থানীয় পাশ্চাত্য দেশের চলৎস্বভাব পুরুষস্থানীয় আমাদিগকে কর্ম্মপথে পরিচালিত করিবে—ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। এই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে। চিরশান্তির রক্তিমাভা পূর্ব্বাকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ, এই মহাসমন্বয় দর্শন জন্য দেবগণ আকাশে সমবেত হইয়াছেন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ।

(মঠের ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি)

হৃষীকেশ হইতে আগত মঠের কয়েকটী সাধুর প্রতি—তোরা সব হৃষীকেশী সাধু হয়ে গেলি! তাদের বোল্ 'জগৎ ত ত্রিকালমে হ্যায় নেই'—সেখানে এক একখানা গেরুয়া প'রে ভিক্ষে ক'রে বেড়ান ও গৃহস্থদের ঠকাবার জন্য গীতা ও বেদান্তের শ্লোক মুখস্থ করা, এই ক'ল্লেই সাধু হ'য়ে গেল? ও সব বাবা এখানে চ'ল্‌বে না। এ ঠাকুরের রাজত্ব! তাঁকে Ideal ক'রে নিয়ে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস যাতে বাড়ে তাই ক'র্ত্তে হবে। ঐ সব দিয়ে জীবনকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, তবে ত হবে; তা না—একখানা গেরুয় কাপড় নিয়ে হৃষীকেশী সাধুর মতন শুধু ফড়র্ ফড়র্ ক'রে শ্লোক ঝাড়্‌লেই সাধু হলো! পাখীর মত শ্লোক শুধু মুখে আওড়ালে চ'ল্‌বে না! জীবন চাই! জীবন্—জলন্ত জীবন! জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না, এক একখানা গেরুয়া কাপড় পরা ও শ্লোক মুখস্থ করা—ছ্যা, ছ্যা!

আজ কয়েক জন ভক্ত এসেছিল; তারা কথায় কথায় বল্লে আমাদের গুরুদেব খুব গীতা প'ড়্‌তে বল্লেন। আমি বল্লুম, শুধু প'ড়্‌লে কি হবে? জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না হ'লে কিছু হবে না;—ঠাকুর ব'ল্‌তেন 'গীতা দশবার উচ্চারণ ক'ল্লে যা হয়, গীতা মানে তাই।' অর্থাৎ গীতা, গীতা, গীতা—কি না, ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। ত্যাগী না হ'লে কিছুই হবে না। ত্যাগই হ'চ্চে মূল মন্ত্র। আর এক মাত্র ত্যাগেতেই শান্তি। এ ছাড়া আর পথ নেই। তোরা সব গীতা হ'য়ে যা, অর্থাৎ মনের ভেতর থেকে, শুধু বাহিরে নয়, ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'য়ে যা। ত্যাগী না হ'য়ে শুধু গীতা মুখস্থ ক'ল্লে আর কি হবে? আজ কাল ঘরে ঘরে ত গীতা রয়েছে ও অনেকে

প'ড়ছে। কিন্তু তবুও হ'চ্চে না কেন? কি ক'রে হবে? মন যে বিষয়ে আসক্ত! তা হ'লে কি হয়? ত্যাগ চাই, তবেই গীতার মর্ম্ম বুঝ্বে। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ। ঠাকুরকে স্থাখ্ না।, কি ত্যাগী! টাকা স্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ত্তেন না ; হাত বেঁকে যেত! তোরা তাঁকে Ideal করে নিয়ে জীবনকে গ'ড়ে তোল্ না।

পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতাই ধর্ম্ম। মন মুখ এক ক'র্ত্তে হবে। ঠাকুরকে দেখেছিলুম, পবিত্রতার জমাট মূর্ত্তি! জনৈক ব্যক্তি ঘুষ নিয়ে উপরি রোজগার ক'র্ত্তেন—তিনি একদিন ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় তাঁর পা ছোঁয়াতে তিনি আঁক ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। ঠাকুর সমাধি অবস্থায় প'ড়ে না যান এইজন্য তাঁকে ধ'রে থাকৃতে হ'ত। আমাদেরও তাই ভয় হ'ত, যদি আমাদের ছোঁয়াতে তিনি চীৎকার ক'রে ওঠেন।

আমাদের গুরু-ভাইদের ভেতর কি অমানুষিক ভালবাসা ছিল। লোকে ব'ল্তো, এ রকম ত কখনও দেখিনি। গুরুভাইয়ে গুরুভাইয়ে ত লাঠালাঠিই হ'য়ে থাকে। এ এক নূতন রকম দেখ্ছি। ঠাকুরকে কটা লোক বুঝেছে? আমরাই কি এখনো সব বুঝেছি? স্বামিজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে আলমবাজার মঠে আমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, 'তুমি ঠাকুরকে কি রকম বুঝেছ?' স্বামিজী ব'ল্লেন, 'ভাই, কিছুই বুঝ্তে পারিনি। কেবল তাঁর Outlineটুকু দেখ্তে পাচ্ছি।' তোরা পরস্পরে খুব ভালবাসা, প্রীতি রাখ্বি। তোরা কি কম মনে কচ্চিস্ না কি? ** আমি বাড়িয়ে বল্‌ছি না, হক্ কথা ব'ল্‌ছি।'

তোদের ভেতর সেই রকম অমানুষিক ভালবাসা নিয়ে আয়। আমরা স'রে গেলে সহরে সহরে হাঁসপাতালই কর্, আর বেদান্তের বক্তৃতা বা আশ্রমই কর্, কিছুতেই কিছু হবে না—যদি তোদের গুরুভাইদের ভেতর পবিত্রতা, গভীর ভালবাসা ও সদ্ভাব না আসে।

তোরা সব সিদ্ধ হয়ে যা—অহঙ্কার অভিমান পুড়িয়ে ফেল।

এখানে এলে সব সিদ্ধ—নরম হ'তে হবে ; কিন্তু অসত্য বা মিথ্যাকে কাট্‌বার জন্য সঙ্গে সত্যরূপ তলোয়ার রাখ্‌তে হবে। সে সময় খুব রোখা হ'তে হবে। ইউরোপের মহাযুদ্ধে ওরা কত Energy নষ্ট ক'চ্ছে। তোরা ওদের ঐ Energy টুকুই অনুকরণ ক'রে ভগবানের দিকে লাগিয়ে দে।

শিমলা ও সিপিমেলা।

(শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষে' শিমলা সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ করিয়া কেহই বলেন নাই। প্রতি বৎসরই গণ্যমান্য অনেকেই গ্রীষ্মের সময় বেড়াইতে আসেন, কার্য্যোপলক্ষে বহু বঙ্গসন্তানের এখানে বসবাস হইয়াছে। আমরাও প্রায় ২০ বৎসর এখানে আসা যাওয়া করিতেছি। স্বতঃই সকলের মনে হয়, এখানকার কি কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না? ইংরাজীতে দুই একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়—কিন্তু বাঙ্গালী-সাধারণের অবগতির জন্য বঙ্গভাষায় সেরূপ কোন বিশেষ চেষ্টা এখনও হয় নাই। অতএব সে সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিলে ধৃষ্টতা হইবে না।

শিমলার নামকরণ সম্বন্ধে একটু কৌতূহলজনক কথা আছে। বাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন, কীর্ত্তি রাখিয়া আসিতে ভুলেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধর্ম্মের জন্য জীবনে মমতাহীন হইয়া কত দুর্গম স্থানে গিয়াও তাঁহার চিরারাধ্য দেবতার মন্দির স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এতদূরে আসিয়াও

৺কালীমন্দির স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাহারও পূর্ব্বে, প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন হিন্দু পরিব্রাজক, সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, এই হিমগিরির হিমালয় নামানুসারে অত্রস্থিত সর্ব্বোচ্চ গিরিশিখর জ্যাকো বা যক্ষ * পর্ব্বতে (৮৩০০ ফিট উচ্চ) নির্জ্জনে সাধনাভিলাষী হইয়া একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নাম "শ্যামালয়" রাখিয়াছিলেন; তদবধি ঐ পর্ব্বতের পদপ্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লী 'শ্যামলা' নামেই প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। এই শ্যামলাই পার্ব্বতীয়গণের উচ্চারণে ক্রমপরিবর্ত্তিত হইয়া 'শামলা', 'শেমলা' ও পরিশেষে ইংরাজগণের সময়ে 'শিমলা' হইয়াছে।

ভারতের সকল স্থানই তাহার একটু পূর্ব্ব ইতিহাস সযত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে, শিমলারও পূর্ব্বেতিহাস জানিবার বিষয়। ভারতের শূর জাতিগণের মধ্যে গুর্খা অন্যতম। যে বিস্তৃত ভূখণ্ড হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ভারতের সমতল ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বদাই দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল কিন্তু অসংখ্য উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা ব্যবধান থাকায় এই বীরজাতিগণ একত্র মিলিত হইয়া একচ্ছত্রাধিকার স্থাপিত না করিতে পারিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ গুর্খাগণ উপযুক্ত নায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া নেপালের মনোরম উপত্যকাভূমিসকল অধিকৃত করিয়া তথায় তাহাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করে এবং ক্রমশঃ খণ্ডরাজ্যগুলিও স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া ভারতের উর্ব্বর সমতল ভূমির উপর লুব্ধনেত্রে চাহিতে থাকে। কিন্তু উত্তরভারত তখন মোগলের দ্বারা শাসিত হইত না—কাজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজের শিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহার পরই ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের নেপালযুদ্ধ। নেপালযুদ্ধের ইতিহাসও সকলেই জ্ঞাত আছেন। 'নেপালের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র

* Rev. Long's Guide to Simla, 1870.

প্রকাশিত হইবার পর লর্ড হেষ্টিংস নেপাল আক্রমণের জন্য চারিটী সেনাবাহিনী প্রস্তত করাইয়া তাহাদিগকে দানাপুর, বারাণসী, মিরাট এবং লুধিয়ানা এই চারি স্থান হইতে অগ্রসর হইতে অনুজ্ঞা করেন। শেষোক্ত দল জেনারল অক্টার্লোণী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া লুধিয়ানা হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তেজস্বী গুর্খাগণ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াও পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয় এবং ইংরাজ-বাহিনী ক্রমে ক্রমে গুর্খাগণের এক একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। নলাগড়, রামগড়, সুরাজগড়, সর্ব্বশেষে মালন দুর্গ অধিকৃত হইলে শান্তি স্থাপিত হয়। শিমলার পশ্চিমে অবস্থিত এই মালন ঐকাল হইতেহ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই যুদ্ধে শিমলা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল বিজয়-লভ্যস্বরূপ ইংরাজাধীনে আসিয়া পড়ে এবং সেগৌলীর সন্ধিসূত্রানুসারে নেপালের বর্ত্তমান সীমা নির্ণীত হয়। যুদ্ধাবশেষে ভারতগবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী রাজন্যবর্গকে মিত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদের ভূসম্পত্তি সকল প্রত্যর্পণ করেন।

১৮১৫ খ্রীঃ হইতেই শিমলা-ইতিহাসের আরম্ভ। যুদ্ধের পর সবাথু, কোটগড় ইত্যাদি কয়েকটী স্থান সেনানিবাসের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। ইহারই অধিনায়কগণ শিমলার কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করেন। লেফ্‌টেনেণ্ট রস্‌ সর্ব্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠগৃহ নির্ম্মাণ করেন। কাপ্তেন কেনেডি পার্ব্বতীয় রাজ্যগুলির প্রথম পলিটিকল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ইঁহারই নির্ম্মিত গৃহ, শিমলার দ্বিতীয় গৃহ, অদ্যাবধি 'কেনেডি হাউস্‌' নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। (ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোচ্‌বিহার মহারাজের গ্রীষ্মাবাস ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ইহা ক্রয় করিয়া পুনর্নির্ম্মিত করিয়া সরকারী দপ্তর করিয়াছেন।) কাপ্তেন কেনেডির সময় হইতেই শিমলা জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজন বায়ু-পরিবর্ত্তন মানসে গ্রীষ্মকালে এই স্থানে তাঁহার অতিথি হইয়া থাকিতেন এবং এই স্থানের মনোহারিত্ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও

স্বাস্থ্যের উপযুক্ততায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া জনসমাজে ইহার উপকারিতা প্রচার করিতেন। ক্রমে ইহা রুগ্ন, অক্ষম আতুরগণেরই নিকট অধিকতর পরিচিত হইয়া তাহাদের প্রিয়তম স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হইতে থাকে। ইহা শাসনকর্ত্তা ও ধনীলোকদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮২৭ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ ভাইকাউণ্ট কম্বারমিয়র কিছুকালের জন্য এখানে বাস করিয়া যান। ক্রমেই ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে ক্রয় করিতে মানস করিয়া ১৮৩০ সালে কাপ্তেন কেনেডির দ্বারা কেঁওথালের রাণা ও পাতিয়ালার মহারাজার নিকট হইতে তাঁহাদের শিমলার অংশটুকু ক্রয় করেন।

শিমলা ইংরাজের স্বাধিকারভুক্ত হইবার পর তথায় রাজপ্রতিনিধি ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত হইতে থাকে এবং তাঁহারা এখানে প্রতিবৎসর সদলবলে আসিয়া গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। বহু অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কর্ম্মচারিগণ ইংলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া শিমলাতেই তাঁহাদের বানপ্রস্থাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। এইরূপে ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ১৮৩২ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এইখানে বসিয়াই প্রতাপশালী শিখরাজা রণজিৎসিংহের প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজ্যসম্বন্ধে কোন বিশেষ বিষয়ের মীমাংসা করেন। ১৮৩৮ সালের ২৫ শে জুলাই এইখানেই কাবুলের শাহ সুজা, পঞ্জাবের রণজিৎসিংহ ও ভারতের ব্রিটীশ রাজপ্রতিনিধির 'ত্রিপক্ষীয় সন্ধি' স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলেই ১৮৩৮-৩৯ সালের আফগান-যুদ্ধ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের তরঙ্গ এখানেও সামান্যরূপে অনুভূত হয়। শিমলার নিকটবর্ত্তী জুটগ বা জগৎগড় হইতে একদল গুর্খাসৈন্য বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে কিন্তু সুবন্দোবস্তে সে বিদ্রোহাগ্নি প্রশমিত হয়। ১৮৬৪ সালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মন্ত্রিসভা ও দপ্তরাদির সহিত গ্রীষ্মকালে শিমলায় বাস করেন এবং তদবধি কেবলমাত্র ১৮৭৪ সাল—বাঙ্গলার চিরস্মরণীয় দুর্ভিক্ষের সাল—ব্যতীত প্রতি-

বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রীষ্মকাল এই স্থানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৬৯ সালে ইহার লোকসংখ্যা ১৪৮৪৮ ছিল, এখন প্রায় চল্লিশ হাজারেরও উপর স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শিমলা এখন Improvement Trust-র হাতে পড়িয়া সুরূপ ও মনোহর হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের জন্য এই সমিতি এখনও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্য রাজকর্ম্মচারীরা কখনই শ্রমকাতরতা দেখান নাই, রাজকোষ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। জ্যাকো পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে যে সুন্দর রাস্তা উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, ১৮৩০ সালে লর্ড কম্বারমিয়র স্বয়ং উহার নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ সালে সর হেনরী ফেন শিমলার সদর রাস্তাগুলি প্রস্তুত করাইয়া যান। এই ফেন সাহেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন রাস্তা প্রস্তুত করানই তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাগলা' ফেন বলিত। ১৮৫০ সালে সর চার্লস্ নেপিয়ারের সময় প্রসিদ্ধ কাল্কা শিমলা কার্টরোড, এবং ব্রাগস্ সাহেব কর্ত্তৃক গ্রেট হিন্দুস্থান ও তিব্বত পথ প্রস্তুত হয়। এই পথ ইংরাজের এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। কটিমেখলাস্বরূপ এই পথ হিমাদ্রির কটি বেষ্টন পূর্ব্বক তিব্বত ও ভারতের সংযোগ সাধিত করিয়াছে। ১৮৮৫ সালে Army Headquarters (ভারতীয় সমর দপ্তর-গৃহ) এবং ১৯০৪ সালে Gorton Castle অর্থাৎ সিভিল সেক্রেটেরিয়েট গৃহ প্রস্তুত হয়। টাউনহলটি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাকে শিখরচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু যুদ্ধের জন্য এখনও তাহাকে তদবস্থায় শ্রীহীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ১৮৪৬ সালে শিমলার প্রসিদ্ধ ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্যামলা-দেবীর মন্দির * ইহারই উপর, এখন যেখানে রথনী ক্যাসল্ নামক

* এরূপ কথিত আছে যে, শিমলায় প্রথমে যখন গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছিল তখন ইংলণ্ডের কোন বীর সন্তান ৺কালীমন্দিরের নিকট আপন আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিবার মানস করিলে মন্দিরটি তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ বোধ হইতে থাকে। একদিন তিনি

বাটী আছে, তথায় স্থাপিত ছিল। ১৮৩৫ সালে বিগ্রহটী স্থানান্তরিত করিয়া বর্ত্তমান ৺কালী বাটীতে আনা হয় এবং ১৮৪৫ সালে পশ্চিমাঞ্চলে কালীমন্দির স্থাপয়িতা সাধক রামচরণ ব্রহ্মচারী মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া যান। বর্ত্তমান মন্দিরটি দেখিবার সামগ্রী হইয়াছে. পাঁচ ছয় হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়া মার্ব্বেল প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা পুনর্গঠিত করিয়া মন্দিরের যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক ৺হরিদাস গুপ্ত, এবং বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুরোহিত শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য শিমলার বাঙ্গালী জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়া আছেন। শিমলার উত্তর পূর্ব্বদিকে যশোবরা টনেলও একটি দর্শনীয় জিনিষ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৬০ ফিট্। সম্প্রতি আর একটি টনেল বাজারের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। যশোবরা টনেল সম্বন্ধে একটু অখ্যাতি আছে। যখন লর্ড কিচ্‌নার ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ, তাহার পূর্ব্ব হইতেই টনেলটির প্রতি শিমলা মিউনিসিপালিটির বিশেষ সুনজর ছিল না। ইহা অপ্রশস্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় দেশীয়গণের যাতায়াতের জন্যই ছিল। একদিন সন্ধ্যায় ভারতের জঙ্গীলাট লর্ড কিচ্‌নার একাকী অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ফিরিবার মুখে, তাঁহার অশ্ব কোনপ্রকারে ভয়চকিত হওয়ায়, পড়িয়া গিয়া পা' ভাঙ্গিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকেন। ইহা ১৯০৭ সালের কথা; তাহার পর এই টনেলটির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখনকার পানীয় জল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত আর একটি দেখিবার বিষয়। ১৮৬৪ সাল হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর শিমলায় শুভাগমন করিতে থাকায় ও লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ার সহিত জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হইতে

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিগ্রহটি টান মারিয়া খডে ফেলিয়া দেন। রাত্রে স্বপ্নাবেশে দেবী তাঁহাকে তিরস্কার করিলে প্রাতে বিগ্রহটি কুড়াইয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করেন। এ সম্বন্ধে Towell's Guide to Simla নামক পুস্তকে ঐরূপ একটী কথা আছে। ইহা ১৮৩০ সালের কথা।

থাকে। তখন পর্ব্বতনির্ঝরিণীর জল অবরুদ্ধ করিয়া তাহাকেই পানীয় জলে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য ছোট শিমলার পথে Combermere Brigde এর নীচে একটা পুষ্করিণী প্রস্তুত করা হয়। আজও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কিন্তু কলের জল হইয়াছে। শিমলার উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ৯ মাইল দূরে মহাশু পর্ব্বতের পাদদেশে গভীর খদ্ প্রস্তুত করাইয়া শীতের বরফ ও বর্ষার বৃষ্টি ধরিয়া রাখা হয়। ইহাকে Catchment Area নাম দেওয়া হইয়াছে। এই জল এই ৯ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া শিমলার নিকটবর্ত্তী লালপানি নামক স্থানে আনা হয় এবং এই স্থানে পরিষ্কৃত হইলে দমকলের সাহায্যে শিমলার চতুর্দ্দিকে সরবরাহ করা হয়। মধ্যে আবার জলপ্রপাতদ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে ব্যবহারে আনিয়া অন্য প্রকারে জলসরবরাহের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৮২ সালে মহাত্মা রিপণ সাহেব এখানকার দরিদ্র দেশীয় অধিবাসিগণের জন্য রিপণ হাঁসপাতাল স্থাপিত করিয়া যান। ইহাই এখন দেশীয়গণের একমাত্র হাঁসপাতাল। ইহার সহিত প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী স্বর্ণময়ী ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও অন্যান্য দাতাগণের নাম জড়িত আছে।

এখন যাঁহারা শিমলায় আসেন পূর্ব্বের তুলনায় তাঁহাদের বিশেষ কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না। পূর্ব্বে শিমলাযাত্রিগণের কিরূপ লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইত তাহার একটু আভাস না দিলে পাঠক ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। ১৮৯০ সালের পর অম্বালা কালকা রেলপথ খুলিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে শিমলা যাত্রীদিগকে অম্বালায় নামিয়া ৩৮ মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া কালকায় আসিতে হইত। তখনকার পথের কষ্ট এখনও দুই চারি জনের স্মরণ থাকিতে পারে। সন্ধ্যার পর ডাকগাড়ী অম্বালায় আসিত এবং রাত্রি ১১টার পূর্ব্বে আহারাদি সারিয়া ঐ সময় অম্বালা ত্যাগ করিতে হইত। বৃটিশ-সন্তানের ভারতে কোন সময়েই কোন কষ্ট নাই, তাঁহাদের জন্য হোটেল সদা অবারিতদ্বার ও সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালীদের না ছিল ভাল

বসিবার স্থান, না ছিল আহারের ব্যবস্থা! যে কোন প্রকারে হউক তাহা সারিয়া লইয়া ডাকগাড়ীতে উঠিয়া ঘর্ঘরা নদীর তীরে আসিয়া নামিতে হইত। এই পার্ব্বত্য নদী অন্য সময় শুষ্ক বালুরেখার ন্যায় পড়িয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে হিমালয়ের জলরাশি বহন করিয়া তাহার যে উদ্দাম গতি হয় তাহা একপ্রকার ভীষণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গ্রীষ্মকালে গোযানে এবং বর্ষাকালে হস্তিপৃষ্ঠে এই নদী পার হইতে হইত, হস্তিপৃষ্ঠে পার্ব্বতীয় নদী পার হওয়া যে কত দুঃসাহসিকতার কার্য্য, বিশেষ বাঙ্গালী কেরাণীকুলের পক্ষে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই পথ অতিবাহিত করিতে পারিলেই উষার অরুণরাগের প্রথম উন্মেষের শোভা দেখিতে দেখিতে পথিক হিমগিরি-পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া যোগীশ্বরের ধ্যানমগ্ন গম্ভীর মূর্ত্তির ন্যায় এই অবিচলিত প্রশান্ত মূর্ত্তির সমক্ষে স্বতঃই নতশির হইয়া পড়িত। পথে পাতিয়ালার বিখ্যাত 'পিঞ্জোর বাগান'—এখন ইহা শ্রীভ্রষ্ট। কালকা (বা কালিকা, জনশ্রুতি এই যে, এই স্থানটি পুরাণোক্ত শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধস্থল) হইতে দুইটি পথ শিমলায় আসিয়াছে। একটি নূতন, ৫৮ মাইল। ইহাই বর্ত্তমান কাট রোড; ইহা অতি নিপুণতার সহিত ক্রমোচ্চভাবে প্রস্তুত হওয়ায় সকল প্রকার যান বাহনাদির যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি পুরাতন ও আদিম পথ। এই পথে শিমলায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইত। এক্ষণে আবার রেলপথ হওয়ায় পুরাতন দুইটি পথই শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে।

শিমলার কথা বলিতে হইলে শিমলার পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির বিষয় কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ১৮১৫ সালের গুর্খাযুদ্ধের পর এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ইংরাজশাসনাধীনে আসিয়াছে। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হয় নাই বরং সন্ধিসূত্রের* দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। এই রাজ্যের অধিপতিগণ সকলেই রাজপুতবংশীয় এবং প্রায় তাঁহারা রাণা

* Aitchison's Treaties and Sanads, 1892.

নামেই পরিচিত। গুর্খাগণের দৌরাত্ম্যের অবসান হইলে ইঁহারা ভারতগবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এখন বেশ নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তভাবে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে কুড়িটী ক্ষুদ্র রাজ্য উল্লেখযোগ্য। শিমলার ডেপুটী কমিশনার মহোদয় এই রাজ্য-গুলির পলিটিকাল এজেণ্ট। শতদ্রু হইতে যমুনোত্রি এবং অম্বালা হইতে প্রায় তিব্বতসীমানা পর্য্যন্ত এই রাজ্যগুলির বিস্তার। মামুদ গজনবির ভারত আক্রমণের সময় এবং পরবর্ত্তীকালেও মুসলমানদিগের সহিত সীমান্ত প্রদেশে রাজপুতদিগকে অনবরত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত অধিকাংশ অধিনায়কদিগকে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে হইত। সমরসজ্জিত দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতজাতি-গণ সময় ও সুবিধা পাইলেই পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই সময় হইতেই এই স্থানে রাজপুতের গতিবিধি আরম্ভ হয়। সমরক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মুসলমানদিগের হস্তে কেহ কেহ পরাজিত হওয়ায় দেশে ফিরিয়া না যাইয়া পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে স্বীয় স্বীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ করিতেন। ক্রমশঃ উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশই রাজপুতের অধীন হইয়া পড়ে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে শিমলার দক্ষিণপূর্ব্বে নাহান বা শিরমুর রাজ্য, উত্তরপশ্চিমে বিলাসপুর, উত্তরে বশাহর, পশ্চিমে নলাগড়, পূর্ব্বে কেঁওথাল প্রধান। কথিত আছে যে, যললমীরের উগ্রসেন রাও শিরমুর রাজবংশের আদি পুরুষ। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উগ্রসেন রাও এই প্রদেশ অধিকার করেন; তদবধি ঐ বংশই সিংহাসন অধিকার করিয়া রহি-য়াছেন। শিরমুর (অর্থাৎ মুকুটপরিহিত শির) স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়েই অন্যান্য রাজ্যগুলির অগ্রগণ্য। বর্ত্তমান অধিপতির খুল্লতাত বীর বিক্রমসিংহের ইংরাজদরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তাঁহার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে Honorary Lieutenant

* Towell's Guide to Simla.

Colonel in the Army নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে এই রাজ্যে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রেভিনিউ আদালত, ইংরাজ কর্ম্মচারীর অধীনে দুই তিন দল সৈন্য, পূর্ত্ত বিভাগাদি, লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা ইত্যাদি প্রায় সমস্তই আছে। বশাহরের রাজধানী রামপুর, শতদ্রু নদের তীরে অবস্থিত। রামপুর রামপুরী চাঁদরের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বৎসর ১১ই। ১২ই নভেম্বর এই স্থানে এক বড় মেলা বসিয়া থাকে, সেই সময় তিব্বত হইতে তিব্বতী ছাগলের পশম আমদানী হইয়া থাকে, এই পশম অমৃতসহরে চালান হইয়া তথায় রামপুরী চাদর প্রস্তুত হয়। এই পশমে মলিদা গায়ের কাপড়, অপেক্ষাকৃত মোটা পশমে পট্টু বা পাহাড়ী লুই এবং এখানকার বিখ্যাত 'গোদ্‌মা' কম্বল প্রস্তুত হয়। বশাহর রাজ্যে দেবদারু জাতীয় বড় বড় কেলু বৃক্ষের বন আছে। পঞ্জাবের অধিকাংশ রেলপথের ও গৃহাদির কাষ্ঠ এই স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার পশ্চিমে নলাগড় বা হিন্দোর, ইহা নলাগড়ি প্রস্তরের জন্য বিখ্যাত।

এইবার শিমলার বিখ্যাত সিপিমেলার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শিপিমেলা শিমলার ব্যস্ত জীবনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সেই দিন সুন্দর প্রভাত হইতে শিশিরসিক্ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকতরঙ্গ শিপির পথে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। স্থানের রমণীয়তা ও মেলার নামে আকৃষ্ট হইয়া বহু ইংরাজ ও বাঙ্গালী সিপির দিকে ধাবিত হন। পূর্ব্বে রাজপ্রতিনিধি ও সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়েরা সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া রাণাকে অনুগৃহীত ও আনন্দিত করিতেন। এখন অবশ্য তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেলার মনোহারিত্ব ও খ্যাতি এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে যে, সে দিন পর্ব্বদিনের ন্যায় শিমলার সমস্ত আফিস আদালত বন্ধ থাকে, যাহাতে শ্রমজীবী হইতে শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেই এই আমোদে যোগদান করিতে পারেন। রাজপ্রতিনিধি মহোদয় শিমলায় গ্রীষ্মানুভব করিলে শিমলার উত্তরপূর্ব্ব মশোবরা নামক স্থানে গমন

করিয়া থাকেন। এই মশোররা বাজার হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ নীচে নামিলে এক শ্যামল সুন্দর উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। তরুচ্ছায়া-সমন্বিত, শীতল সমীরণস্নিগ্ধ এই মনোরম সমতল ভূমিখণ্ড মেলার সময় অধিকতর মনোরম হইয়া উঠে। কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নির্ঝরিণীর কুল কুল শব্দ, বাতাসের মৃদু হিল্লোল চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীতে পিকবরের ন্যায় মন মাতাইয়া তুলে। এই স্থান কোটির রাণার অধিকারভুক্ত। এইখানে সিপি দেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত আছে। ইনি কোটি রাজবংশের ও ঐ স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় এই মেলা বসে এবং দুই দিন পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বে ইংরাজ দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য রাণা বিবিধ বন্দোবস্ত রাখিতেন। ধনুর্ব্বাণ খেলা, হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়া জনতরঙ্গের মধ্যে দ্রুত ধাবমান হওয়া, সর্পের খেলা, তরবারীযুদ্ধ অন্যান্য বহুবিধ খেলার বন্দোবস্ত থাকিত। কখন কখন বিখ্যাত পালোয়ানের মল্লযুদ্ধ মেলাকে সজীব করিয়া রাখিত। মেলার অধিকাংশই স্ত্রীলোক। প্রকৃতপক্ষে ইহা স্ত্রীলোকেরই মেলা। ইহাদের কেহ কেহ রাজপুতবংশীয়, কেহ কেহ পঞ্জাবী আর্য্যবংশসম্ভূত—দেখিতে গৌরাঙ্গী, কেহ কেহ পরম রূপবতী, মুখের গঠন অনেকটা কাশ্মীরী রমণীদিগের ন্যায়। মেলার দিন তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বসনভূষণে ভূষিত হইয়া চক্ষে কজ্জল দিয়া বিকশিতবদনে দলে দলে নির্ঝরিণীর পার্শ্বে বেড়াইতে দেখিলে সত্যই মনে হয়, এই স্থিরযৌবনা সুন্দরীর দল যেন স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরা-বৃন্দ, সৌন্দর্য্য-সরসীতে স্নান করিবার জন্য মর্ত্তে নামিয়াছে। সৌন্দর্য্যের সর্ব্বত্রই ছড়াছড়ি—অনেকে আবার তাহাই দেখিতে ছুটিয়া যান! এখানকার বদ্ধমূল জনশ্রুতি এই যে, এই মেলায় স্ত্রীবিক্রয় হইয়া থাকে।* কথাটা নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে। আমরা এ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের প্রমুখাৎ

* Simla Past and Present. Towell's Guide to Simla.

বা পুরাতন অধিবাসিগণের নিকট হইতে যতটুকু সত্য কথা আদায় করিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, এই মেলা বাহিরে যাহাই হউক, ভিতরে ভিতরে ইহা একটি বিবাহ-বাজার। পার্ব্বতীয় যুবক মনোমত পত্নীলাভের আশায় সম্বৎসর অপেক্ষা করিয়া এই সময়ে উচিতমূল্যে স্ত্রীগ্রহণ করিয়া থাকে। এখানকার বিবাহপ্রথায় একটু বিশিষ্টতা আছে। এখানে বিবাহার্থী যুবক কন্যার পিতা বা অভিভাবককে উচিতমত অর্থ না দিতে পারিলে তাহার পাণিগ্রহণে সমর্থ হয় না এবং ইহা সত্ত্বেও বিবাহবন্ধনের নিয়ম এই যে, স্ত্রীর স্বামীগৃহ বা স্বামীসহবাস মনোমত না হইলে বিবাহপণস্বরূপ যে অর্থ গৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলেই বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনা হইয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। সিপিমেলায় এইরূপ স্ত্রীসংখ্যাই অধিক এবং এইরূপে এখানে বিবাহার্থী যুবকযুবতীগণের মিলন সাধিত হইয়া থাকে। এই দেশীয় প্রথাটী অনেকের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, তবে সকল বিষয়েরই ভাল মন্দ দুই দিক্ আছে। মন্দ অভিপ্রায়ে এরূপ স্থলে উক্ত প্রথার গুপ্ত প্রচলন যে একেবারেই নাই তাহাও বলিতে পারা যায় না। রাজধানীর সকল সভ্যতা এইরূপই ফল প্রসব করিয়া থাকে। এখন ঐ প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন শিমলাবাসীদিগকে সিপির দিকে ধাবিত হইতে দেখা যায় না। সে দিনকার মেলা পার্ব্বতীয়গণের জন্য। যাহা হউক সিপিমেলা এখানকার একঘেয়ে জীবনের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তথাগত-বশিষ্ঠ-সংবাদ।

(শ্রীগোকুলদাস দে, এম্, এ)

একদিন মনোহর সায়ংকালে যোগিরাজ শাক্যসিংহ ধ্যান হইতে উঠিয়া শ্রাবস্তী বিহারের পশ্চিমাংশে মুক্তপ্রদেশে পাদচারণ করিতেছিলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটায় গগনমণ্ডল সুবর্ণমণ্ডিত হওয়ায় সেই কষিত-কাঞ্চন-কান্তি তথাগতের দেহজ্যোতি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া দর্শকের প্রাণে কোন্ অমৃতময় রাজ্যের সংবাদ আনিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের বিস্তার করিতেছিল। বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ নামক ব্রাহ্মণদ্বয় কিছুদিন যাবৎ জাত্যভিমান ত্যাগ করতঃ ভিক্ষুপদবী লাভেচ্ছু হইয়া বিহারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা তথাগতের সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনে যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্ব স্ব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনতিকাল মধ্যেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বশিষ্ঠ, তোমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আগারশূন্য প্রব্রজ্যা লইয়াছ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তোমাদের নিন্দা করে না? বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবন্, তাঁহারা আমাদের যথেষ্টই নিন্দা করেন। ভগবান্ তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিলে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, ভগবন্, ব্রাহ্মণগণ বলেন তাঁহারাই একমাত্র শুদ্ধ, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ; কেবলমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সে কারণ তাঁহারাই ব্রহ্মার আত্মীয়, অপর বর্ণেরা নহে। আর শ্রমণেরা 'নেড়া' ও নীচ বৃত্তি-জীবী মাত্র, এই বলিয়া আমাদের কুৎসা করেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বিহারপ্রদেশ উজ্জ্বল দীপমালায়

আলোকিত হইল। ভগবান্ সমীপস্থ আসনে উপবেশন করিয়া আগত ভিক্ষুমণ্ডলীর সম্মুখে বশিষ্ঠকে মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন :—

হে বশিষ্ঠ, সেই ব্রাহ্মণ সকল পুরাতনকে ভুলিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ব্রাহ্মণকুল এখন স্বাভাবিক নিয়মেই উৎপন্ন হয়, কারণ তাহাদের স্ত্রীকন্যারা স্বাভাবিক নিয়মেই ঋতুমতী ও গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। অহঙ্কারবশতঃ জন্মের ঐরূপ নির্দ্দেশ ও তোমাদের নিন্দা করিয়া তাহারা বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে, জানিবে।

পৃথিবীতে বর্ণের চতুর্বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। প্রত্যেক বর্ণেই অল্পবিস্তর প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য, কামসেবা, মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, বৃথা বাগাড়ম্বর, প্রবল আসক্তি, চিত্তবিপর্য্যয় ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা প্রভৃতি রহিয়াছে ও লোকে তন্নিবন্ধন নিরয়গামীও হইতেছে এবং ইহাও দেখা যায় যে, ঐগুলি হইতে বিরত থাকিয়া সদাচার দ্বারা প্রত্যেক বর্ণের লোকেই স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করে। ফলতঃ প্রত্যেক বর্ণেই এইরূপ নিন্দনীয় ও প্রশংসার্হ ব্যক্তিসকল বিদ্যমান। ইহা দেখিয়াও ব্রাহ্মণগণ যদি আপনাদেরই শ্রেষ্ঠতা ও অপরের হীনতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহা হইলে জানিও, উহা জ্ঞানিজনের অনুমোদিত নহে। কারণ, একমাত্র ধর্ম্মই জগতে শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ ভিক্ষু, অর্হৎ, নিষ্পাপ ব্রতচারী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, কৃতকৃত্য, আসক্তিশূন্য, ও সিদ্ধকাম হইবেন। যাঁহার চিত্ত পুনর্জ্জন্মের সমস্ত বন্ধন চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হইয়া সম্যক্ জ্ঞানে আলোকিত হইয়াছে, জানিবে তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। আর ধর্ম্ম ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সমভাবে শ্রেষ্ঠ ও সুখাবহ।

এক্ষণে কি জন্য ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ, তুমি জান, আমি শাক্যকুলে জন্মিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছি,

তাহা কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বেশ জ্ঞাত আছেন। আর ইহাও জান যে, শাক্যেরা প্রসেনজিতের অধীনস্থ থাকিয়া তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা সম্মাননা ও অভিবাদনাদি করিয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রসেনজিৎ শাক্যদিগের দ্বারা ঐরূপে সম্মানিত ও পূজিত হইয়াও সেই সম্মাননা ও বন্দনা আমায় অর্পণ করিয়া থাকেন। কেন? আমি শাক্যকুলে জন্মিয়াছি বলিয়া?—না আমার শৌর্য্য, বীর্য্য, রূপ, ও বংশমর্য্যাদা তাঁহাপেক্ষা বেশী বলিয়া? বাস্তবিক তাহা নহে, আমি সংসারত্যাগী, ধর্ম্মসেবী বুদ্ধ বলিয়াই তিনি আমার সম্মাননা করিয়া থাকেন। ইহাতে ধর্ম্মকেই তিনি বাস্তবিক পূজা করিয়া থাকেন, আমাকে নহে।

আর দেখ বশিষ্ঠ, তোমরা বহু জাতি, বহু নাম, বহু গোত্র ও বহু কুল হইতে আসিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছ। তোমরা কে? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করিবে, 'আমরা শাক্যপুত্র শ্রমণ'। কিন্তু ইহা তাঁহার মুখেই শোভা পায়, যাঁহার তথাগতের উপর অচল ভক্তি-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা কখনও মার, ব্রহ্মা, কোন দেবতা বা ব্রাহ্মণ দ্বারা বিচলিত হইবে না। তাঁহারই বলা উচিত, আমি ভগবানের পুত্র, আমি তাঁহার মুখ ও হৃদয় হইতে জন্মিয়াছি, আমি ধর্ম্মজ, ধর্ম্মনির্ম্মিত বা ধর্ম্মাত্মক। কারণ, হে বশিষ্ঠ, তথাগতের অপর নামই ধর্ম্মকায় বা ব্রহ্মকায়।

হে বশিষ্ঠ, এই দৃশ্যমান্ জগৎ এক সময়ে আদি কারণে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন বৃহৎ জলরাশির ন্যায় এই বিশ্বজগৎ এক মহা অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত ছিল। সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র তারকাদি কিছুই ছিল না। দিবা রাত্রি তখনও সৃষ্ট হয় নাই। মাস, পক্ষ, ঋতু, বৎসর, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তখন জগতের সংবর্ত্তনান্তে জীবকুল জ্যোতির আকার ধারণ করিয়া চিন্ময় আনন্দ-ভোজী, স্বয়ংপ্রভা, বিমানবিহারী ও শুদ্ধাচারী হইয়া বহুদিন অবস্থান করিতেছিল। অতঃপর জগতের বিকাশ হইল।

এই বিবর্ত্তন আরব্ধ হইলে প্রথমে সেই জ্যোতির্ম্ময় জীবগণ

মানবাকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্ববৎ চিন্ময়, আনন্দ-ভোজী, স্বয়ংপ্রভা ও ব্যোমচারী হইয়া শুদ্ধভাবে বহুকাল অতিবাহিত করিল।

এইরূপে বহু দিন গত হইলে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের উপরিভাগে সর উদ্গমের ন্যায় সেই সুবিশাল জলরাশির উপর রসময় পৃথিবীর সঞ্চার হইল। উহা সদ্যোজাত নবনীর ন্যায় বর্ণ ও গন্ধসম্পন্ন এবং উহার আস্বাদ মধুর ছিল।

অতঃপর কোন এক চিন্ময় প্রাণীর রসনায় লালসা জন্মিল। অমনি কৌতূহলবশতঃ অঙ্গুলি দ্বারা এই রসময় পৃথিবীর কিয়দংশ জিহ্বায় গ্রহণ করিলে পর তাহার সর্ব্বশরীরে আস্বাদজনিত সুখের এক প্রবাহ ছুটিল এবং সে তদবধি তাহাই খাইতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া অন্য সকলেও ঐ রসময় পৃথিবী ভক্ষণ করিতে লাগিল। ফলে তাহাদের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। চন্দ্র সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। নক্ষত্র, তারকা, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু এবং বৎসর সৃষ্ট হইল।

সেই চিন্ময় গতপ্রভ প্রাণিগুলি বহু দিন রসময় পৃথিবী ভক্ষণ করিলে তাহাদের গাত্র স্থূল ভাব ধারণ করিল। বর্ণ বিবর্ণ হইতে লাগিল। কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ—এইরূপ বর্ণভেদ জন্মিতে লাগিল, আর তৎসঙ্গে উজ্জ্বল বর্ণেরা হীনবর্ণদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। এইরূপে অহঙ্কার ও ঘৃণার উদয় হওয়ায় সেই রসময় পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। তখন সকলে একত্র হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু ভ্রমবশতঃ উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

রসময় পৃথিবী লুপ্ত হইলে সর্পছত্রের ন্যায় একপ্রকার বর্ণ, গন্ধ ও সুমিষ্ট রসসম্পন্ন ত্বকের আবির্ভাব হইল। তখন জীবসকল তাহাই খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহারা আরও অধিক স্থূলভাব প্রাপ্ত হইল, বর্ণ অধিকতর বিবর্ণ হইল। বর্ণভেদ আরও বেশী মাত্রায় ঘটিতে লাগিল ও তৎসহিত অহঙ্কার ও ঘৃণা অতিশয় প্রবল হইল। ফলস্বরূপ সেই স্বয়ংজাত সুমিষ্ট ত্বক্ লুপ্ত হইল। তখন সকলে একত্র হইয়া আবার দুঃখ করিতে লাগিল।

অতঃপর 'বদালতা' নামক এক প্রকার সুমধুর সুখাদ্য শাক জন্মিয়াছিল। উহার অপূর্ব্ব ঘ্রাণ ও আস্বাদ পাইয়া সকলে তাহাই ভক্ষণ করিতে লাগিল। উহা বহুকাল খাইবার পর সকলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিবর্ণতা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লাভ করিল। হীনবর্ণেরা অপেক্ষাকৃত উত্তম বর্ণদিগের হেয় হইল। মান, অপমান, ঘৃণা ও অহঙ্কারে জীবের চিত্ত বিলক্ষণ মলিন হইয়া দেহকেও স্থূল ও কঠিন করিল। তখন সেই বদালতা আর উৎপন্ন হইল না। আবার সকলে প্রকৃত রহস্য না জানিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

এইবার ধান্যবৃক্ষের জন্ম হইল। তখন উহা তুষ-কণ-বিহীন সুগন্ধি উত্তম তণ্ডুল উৎপন্ন করিত। লোকে সন্ধ্যাকালে যাইয়া যাহা সংগ্রহ করিত, পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাহা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকিত, আবার মধ্যাহ্নকালে যাহা সংগ্রহ করিত সায়ংকালে তাহা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকিত। এইরূপে প্রতিদিন সংগ্রহ ও আহার করিয়া লোকে জীবন ধারণ করিত। বর্ণের মলিনতা ও দেহের স্থূলতা এতদিনে যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। এক্ষণে ঐরূপ আহারবিহারের ফলে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ লক্ষিত হইল। তখন পুরুষ নারীর চিন্তায় কষ্ট পাইতে লাগিল এবং নারী পুরুষের ধ্যানে আপনার অস্থিমজ্জা শুষ্ক করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গম হইল। ঐ সময় উহার বিপক্ষ দল দম্পতির উপর নানা মিষ্টালাপের সহিত গোময়, নিষ্ঠীবন ইত্যাদি প্রয়োগ করিত। ইহাই অধুনা, বিবাহোৎসবের সময় বরকন্যাকে লইয়া যে আমোদ প্রমোদ হয়, তাহার আদি কারণ।

সমাজে বিবাহ-প্রথা ছিল না বলিয়া ঐ দম্পতিকে প্রথম প্রথম গ্রামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। তাহারা জঙ্গলে যাইয়া বাস করিত। তখনও পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, এই দম্পতি বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের ভয়ে প্রথম গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

এইরূপ বহু গৃহ নির্ম্মিত হইলে লোকের আলস্য জন্মিল। তখন কেহ একবার যাইয়া দুই বারের আহার সংগ্রহ করিত। তাহাকে

দেখিয়া অপর একজন দুইদিনের, তাহাকে দেখিয়া অন্য একজন চারি দিবসের, ক্রমে, সপ্তাহের, এইরূপে প্রতি গৃহে ধান্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। সংগৃহীত ধান্য আহার করিবার সময় দৃষ্ট হইল যে তাহাতে তুষ জন্মিয়াছে, কণা আসিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাই এবং তাহা সেরূপ আপনি সিদ্ধ হয় না। তখন সকলে মিলিয়া এক বিরাট সভা করিল। উহাতে আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যাবলী ও তদনুগামী অবস্থাসকলের সমালোচনা করিয়া দুঃখের সহিত ব্যক্ত করিল যে, তাহাদিগের মধ্যে পাপের প্রসার হেতু উক্তরূপ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর সকলের মধ্যে ধান্য সমভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট হউক, এই প্রস্তাব করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইল।

এই নিয়মে কিছুকাল গত হইলে কোন এক লুব্ধ স্বীয় ভাগ সংরক্ষিত করিয়া গোপনে অন্যের অংশ গ্রহণ করিল। তাহাতে সকলে তাহাকে ধৃত করিয়া ঐ পাপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিল। সেও 'আর করিব না' বলিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ করিল। দ্বিতীয় বারও ধৃত ও ভৎর্সিত হইয়া পরিত্রাণ পাইল। তৃতীয় বার অপহরণ করিলে সকলে মিলিয়া উহাকে হস্ত, লোষ্ট্র, যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তদবধি মিথ্যাকথা, চৌর্য্য, দুষ্ক্রিয়া ও তদনুযায়ী প্রহার জনসমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

চৌর্য্যের উদয় হইলে লোকে এক সভার অনুষ্ঠান করিয়া প্রস্তাব করিল, একজন শাসনকর্ত্তার আবশ্যক। তিনি ন্যায়কে রক্ষা করিবেন, অন্যায়কে দমন করিবেন এবং দোষীকে নির্ব্বাসিত করিবেন এবং তাঁহাকে সকলে স্ব স্ব ধান্যের ভাগ অর্পণ করিবে। উহা অনুমোদিত হইলে যিনি তাহাদিগের মধ্যে রূপে গুণে ও পরাক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাকেই শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করা হইল। তিনি সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেন, প্রজারাও তাঁহাকে ধান্যের ভাগ অর্পণ করিত।

মহাজনের সম্মতি অনুসারে নির্ব্বাচিত বলিয়া তাঁহার 'মহাসম্মত'

এই প্রথম নাম হইল। ক্ষেত্রসমূহের স্বামী বলিয়া 'ক্ষত্রিয়' এই দ্বিতীয় এবং ধর্ম্মের দ্বারা অপরকে রঞ্জিত করেন বলিয়া তাঁহার 'রাজা' এই তৃতীয় নাম উৎপন্ন হইল।

হে বশিষ্ঠ, বহু পুরাকাল হইতেই রাজমণ্ডলী ক্ষত্রিয় এই উপাধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম তখন একরূপ ভাবেই বিরাজমান ছিল, কেবল এখনকার মত অধর্ম্মের এত প্রকোপ ছিল না।

ক্রমে কতকগুলি লোকের মনে স্বতঃই উদয় হইল যে, মনুষ্য-সমাজে চৌর্য্য, শঠতা, মিথ্যা কথা, প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া ও নির্ব্বাসন প্রভৃতি অস্বাভাবিক দণ্ড সকল উদ্ভূত হইয়া পাপের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাঁহারা এই পাপ সর্ব্বথা পরিহার কামনায় অরণ্যে গমন করিয়া ধ্যানধারণাদি দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ হইল। তাঁহারা নগর হইতে অরণ্যে গমন করিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি, ধূম ব্যতীত ধ্যান করিতেন। তাঁহারা আহারের জন্য প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। আবার আসিয়া ধ্যান করিতেন। লোকে সেইজন্য তাঁহাদের 'ধ্যানী' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই ধ্যানী ব্যক্তিগণের কতকগুলি অরণ্যে ধ্যানময় জীবন যাপন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গ্রন্থপ্রণয়নাদি দ্বারা কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধ্যান করিতেন না বলিয়া লোকে তাহাদিগকে 'অধ্যায়ক' বলিত; এখন ইঁহাদের প্রভূত সম্মান কিন্তু তখন অতি অল্পই ছিল। ধর্ম্ম তখন সমভাবেই বর্ত্তমান ছিল এবং ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন।

তদনন্তর কতকগুলি লোক সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সহিত বাস করিত ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপে আপনাদের নিযুক্ত রাখিত। বিশ্রুত কর্ম্ম করিত বলিয়া তাহাদের নাম হইল বৈশ্য। তাহারাও ধর্ম্মের দ্বারা জীবন পরিচালিত করিত।

অবশিষ্ট লোকেরা ক্রূর কর্ম্ম করিত বলিয়া তাহাদের শূদ্র অভি-ধান হইল। ইহাই শূদ্রের পুরাতন ব্যাখ্যা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মকেই পরিমাপক করিয়া এই চতুবর্ণের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ ধর্ম্মই ইহ জগতে ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বস্তু।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কখন কেহ কেহ স্ব স্ব নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের উপর বিরক্ত হইয়া শ্রমণ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ কখন কখন অনুষ্ঠেয় বিধির উপর বিরক্ত হইয়া শ্রমণ হয়; ক্ষত্রিয় নিজ কর্ত্তব্যকে ঘৃণা করিয়া শ্রমণ হয়, বৈশ্যও সংসারসুখে বীতরাগ হইয়া শ্রমণ হয় এবং শূদ্রও স্বীয় ক্রূর কর্ম্মে ভীত হইয়া শ্রমণ হইয়া থাকে। শ্রমণ বলিতে এই চতুবর্ণের মধ্যে যাঁহারাই সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মময় জীবন গঠন করিবার জন্য আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই বুঝায়।

অন্যদিকে ইহাও দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বা যে কেহ হউক কায়মনোবাক্যে দুষ্ক্রিয়া করিয়া মিথ্যা-দৃষ্টিজনিত কর্ম্ম হেতু দেহান্তে অপার দুর্গতি—নিরয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। অথবা কায়মনোবাক্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সম্যক্-দৃষ্টি ও তৎসংযুক্ত কার্য্য করিয়া দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখভোগ করে। সুতরাং এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুবর্ণের মধ্যে উভয়বিধ লোকই পরিদৃষ্ট হয়।

হে বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কেহ হউন না কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া বোধি-বিধায়ক তত্ত্বসকলের চিন্তা দ্বারা এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হন।

সেইজন্য ধর্ম্মই কেবল ইহ ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত আছে।

ব্রহ্মা সনৎকুমার যথার্থই গাথায় বলিয়াছেন—

গোত্রে কয় ক্ষত্রিয়কে শ্রেষ্ঠ সবাকার,
পার্থিব সম্মানে মাত্র সম্মান তাহার।
কিন্তু সেই অর্হৎ চরিত্র মহান্,
ত্রিলোকেতে নাই কেহ তাঁহার সমান।

ইহাতে বিন্দুমাত্র ভুল নাই”। এই বলিয়া ভগবান্ সেই রাত্রের কথাপ্রসঙ্গ শেষ করিলেন। উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহার বাক্যে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

সাহিত্য-সৌন্দর্য্য।

(ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু)

আজকাল বাংলা সাহিত্যের লেখকসংখ্যা দিন দিন যে প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা প্রকৃতই সুখের বিষয় বলিতে হইবে। অনেকে এই কথার পর একটা ‘কিন্তু’ দিয়া বলিয়া থাকেন, “উন্নতি অর্থে ভাষাকে নূতন ভাবে তৈয়ারী করা নহে, যাহা আছে তাহার উৎকর্ষ সাধন করা—ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করা। অপেক্ষাকৃত দুরূহ ভাষাকে অনেকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, ভাষা ভাবানুগামিনী। —উচ্চস্তরের ভাব তেমন ভাষা না হইলে পরিস্ফুট হইবে কেন?”

এ কথায় আমাদের একটু অন্যমত আছে। আমাদের মতে যাঁহারা ভাষাকে যত ছোট ও সাধারণ কথায় বড় ভাবাপন্ন করিয়া সাজাইয়া দেন, তাঁহাদের কবিত্বশক্তি তত বেশী। দেশ-কাল-পাত্র ও রুচি অনুসারে ভাষাকে রূপান্তরিত না করিলে চলিবে কেন? এবং এই রূপান্তরিত করার নামই ভাষার উন্নতি। কেন না, দেশ সেই ভাষারই ভক্ত। দুরূহ ভাষা ঘৃণা বা অবহেলা করেন কাহারা? যাঁহারা সে ভাষার ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিতে অক্ষম; না বুঝিলে বা না অনুভব করিতে পারিলে কিসের আকর্ষণে মানুষ

* পালি ‘অগ্‌গঞ্‌ঞ’ সূত্র অবলম্বনে লিখিত।

দুরূহ ভাষাকে ভাল ভাবে স্থান দিবে বা তাহা পাঠ করিবে। এ অন্যায়ের জন্য বঙ্গীয় পাঠকগণের প্রতি লেখক বিরক্ত বা দুঃখিত হইলে চলিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান যুগে ভাষাকে সহজ ও সরল করিয়া উচ্চস্তরের ভাবময় করিয়া তোলাই সঙ্গত। কেন না, দেশের জন্য যাঁহারা রচনালেখক, তাঁহারা সর্ব্বদাই দেশের রুচি মানিয়া চলিতে বাধ্য। ছোট কথায় বড় ভাবের অবতারণা হইতে পারে কি না, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভাষাকে যতই সহজ, সরল ও ক্ষুদ্র করি না কেন, তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহ হইতে অনন্ত ভাবময় শক্তি দিতে না পারিলে সে ভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

অধিকাংশ পাঠককে ভাবের কাছে আজকাল বড় একটা ধরা দিতে দেখি না। যেখানে ভাব লইয়া মানুষকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, সেইখানেই তাহার বিরক্তি উপস্থিত হয়। এই বিরক্তি অনুভূত হয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ অনেকের নিকটে অবজ্ঞাত। কিন্তু এই সকল লোকের উপর অভিমান করিয়া যদি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ না হইতেন তবে বঙ্গসাহিত্যের একটা সুন্দর দিক্ অনুদ্ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি একটা বাঁধা অর্থ ধরা দেয় না, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। কিন্তু আমরা বুঝি, যাহা লইয়া মানুষকে আলোচনা করিতে হয় না, বা উচ্চ অঙ্গের ভাবের সঙ্গে মিশিতে হয় না, সে কবিতা রচিত না হইলেও সাহিত্যের কিছু আসে যায় না। সে সব কবিতা সমালোচনা করিতে বসিয়া শুধু লিখিতে হয়—'ভাল লাগিল না' 'ভাষা সরল হয় নাই', 'লিপিচাতুর্য্য মৌলিক গল্পেরই মত ফুটিয়াছে.' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আর কিছু বলিবার থাকে না। বাঙ্গালা ভাষায় ভাবের অভাব নাই. প্রাচীন কাব্যগ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে যেরূপ ভাব ও ভাষার—উপর দেশের বার আনা লোকের শিক্ষা নির্ভর করে, সেইরূপ ভাবেই লেখককে চলিতে হইবে।

কেন না, ভাষা ও কাব্য-সৌন্দর্য্য লেখকের নিজের জন্য নহে, পাঠকের জন্য। তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহাদের রুচি কতকটা মানিয়া চলিতেই হইবে। কেবল মাত্র দেশের শিক্ষিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের নিরক্ষর ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

সকল মানুষ যেমন একই ঈশ্বরের সন্তান. সকল ধর্ম্মই তেমন একই ধর্ম্মের অধীন। ধর্ম্মগত বিদ্বেষ লইয়াও অনেকে অনেক কবি ও সাহিত্যিককে প্রকাশ্যভাবে ভাল বলিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদের দুর্ব্বলতা। প্রতিভাশালী লেখক সম্বন্ধে মুখে যে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও গর্ব্বে মস্তক অবনত করেন না, অথবা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

অনেক সময় ভাষায় একটা দোষ বড় বড় লেখকগণও করিয়া যান। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি ধর্ম্মবিষয়ক নাটক ও একখানি সামাজিক নাটক লিখিয়া যান। অবশ্য পরিশেষে তাঁহার 'বঙ্গনারী' নামে আর একখানি সামাজিক নাটকও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার সব পুস্তকের একই ভাষা। রণক্ষেত্রে যে ভাষায় মাধুর্য্য আনয়ন করে, সামান্য গৃহস্থ-পরিবারের মৃত্যুচ্ছবিতে সে দুরূহ ভাষা থাকিলে চলিবে কেন? তাঁহার "পরপারে" নাটকে করুণাময়ীর মৃত্যুর পর দয়ালের মুখে যে ভাষা তিনি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত লেখকের পক্ষে নিতান্তই অশোভন হইয়াছে। শোক করিবার সময় যদি অভিধানের দুরূহ ভাষা খুঁজিয়া শোক করিতে হয়, তবে স্বাভাবিক অভিনয় হইবে বলিয়া নাটক দেখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। ইহাতে যত বড় অভিনেতাই হউন না কেন, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়চাতুর্য্য দেখাইতে পারিবেন না। শুধু বীরভাবে শোক, দুঃখ, হর্ষ করিয়া দর্শকের মনে একটা সাময়িক 'উত্তেজনা' আনয়নপূর্ব্বক করতালি লাভ করিতে পারেন মাত্র।

গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটকগুলি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত। তাঁহার ভাষাতে দুরূহ শব্দ নাই, অথচ গভীর ভাব আছে। অভিনেতার অভিনয়ক্ষমতা থাকিলে নাট্যকারের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও একখানি ছবি সাজিতে পারেন। এই সব ছোট কথায় বড় ভাব দিয়াই গিরীশচন্দ্র নাট্যসম্রাট্ আর রবীন্দ্রনাথ কবিসম্রাট্।

গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকগণের প্রতি আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। আজকাল বাংলা দেশের পাঠকগণ ইঁহাদেরই ভক্ত; তাহার প্রমাণ, ॥০ আট আনা সংস্করণের পুস্তকগুলির বহুল প্রচার। অন্য ভাবের পুস্তকপাঠ নবীন পাঠকের রুচিবিরুদ্ধ। সুতরাং গল্প উপন্যাস, নাটক যাহাতে অসার, নিরর্থক, ভাবশূন্য না হয় এবং শুধু ঘুম আনাইবার মহৌষধ না হইয়া জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার যথেষ্ট সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে লেখকগণের মনযোগ দিতে হইবে। উৎকৃষ্ট নাটকই অভিনয়ের উপযোগী, এবং অভিনয় দর্শনে মানবের শিক্ষা লাভ হয়। উপন্যাস ভাল হইলে, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চরিত্রগত সৌন্দর্য্য স্বতঃই পাঠকের মনে উদিত হইয়া লেখকের গূঢ় অভিপ্রায় তাহাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। বহু নিরক্ষর ব্যক্তিকে ইতিহাস ও পুরাণের কথা বলিতে শোনা যায়; তাহারা যাত্রা ও নাটক দেখিয়াই এ কথা বলিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই সব আমোদ যদি কুরুচি ও কুভাবাপন্ন না হয়, তবে 'পুঁথিগত বিদ্যা' না হইলেও নিরক্ষর ব্যক্তি বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

এইবার আমরা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলোচনা করিব। কেমন করিয়া বাঙ্গালীকে চলিতে হইবে, কেমন করিয়া বাঙ্গালীর ভাষা গঠন করিতে হইবে, বহুদিন যাবৎ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ধর্ম্মপুস্তকে তাহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর অভাব বুঝিয়াছিলেন, এবং যেমন করিয়া লিখিলে ভারতবাসী শিক্ষিত হইতে পারে, বঙ্কিমবাবু তাহাই

লিখিয়া গিয়াছেন। নব্যযুগের পথপ্রদর্শক বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের এত আদর। তাই আজ তাঁহার জন্য ভারতবাসী গর্ব্বিত, তাই তিনি সাহিত্য-সম্রাট্। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, বহু আলোচনা এখনও বাকী রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রকে আজও বাঙ্গালী ঠিক চিনিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি লইয়া নানা জনেই নানামতে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে যাহা ভাল, তাহা 'ভাল' বলিবার অধিকার সকলেরই আছে, এই সাহসেই তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সাহসী হইতেছি। গুরুতর রাজকার্য্যভার মস্তকে লইয়া, হাজার হাজার বাদী বিবাদীর নথি খতাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র নবীন যুগের জন্য যে রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

সাহিত্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, দাশরথি ইত্যাদি শত শত সাহিত্যরথী রহিয়াছেন যাঁহাদের কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। সে সৌন্দর্য্য দেখিতে গেলে শত শত পুস্তক লিখিতে হয়, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ অসম্ভব। তাই শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া আজ তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দেখিবার সামান্য প্রয়াস পাইব মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই আমাদের বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজন, কেন না, তাহাতে এক দিকে যেমন নবীন পাঠকের চিত্তাকর্ষণের যথেষ্ট উপাদান আছে, অন্য দিকে তেমনি ভাষা ভাবময়ী হইয়া শিক্ষিত ব্যক্তির আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই প্রীতিসম্পাদন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক যে কোন স্থান হইতে খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করা যায়, সেই স্থান হইতেই একটা নূতন আস্বাদন ও আকর্ষণ অনুভব করা যায়। ইহা যেন চিরনূতন। নূতন বেশ লইয়া যেন প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে

মানুষকে অপূর্ব্ব সম্পদ্ দান করে। ভাব অনেকের নেই আসিয়া থাকে; উহাকে যাঁহারা চিত্রে ও ভাষায় ফুটাই দিতে পারেন তাঁহারাই কবি। এই সব কাব্যকুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি চরিত্রই যেন এক একখানি ছবি। পাঠ করিতে করিতে সে ছবি যেন জীবন্ত হইয়া আপনি আসিয়া হৃদয়ে ধরা দেয়।

যেখানে ইন্দ্রিয়সম্ভোগস্পৃহার সহিত রূপের সম্বন্ধ, সেইখানেই প্রেম পদদলিত—সেইখানেই মানুষ অধঃপাতের নিম্নস্তরে অবস্থান করে। সেই জন্য গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী প্রভৃতির পতন ঘটিয়াছিল। আর যেখানে তাহা নহে, সেখানে রূপ অখণ্ড ও অক্ষয় হইয়া চিরদেদীপ্যমান থাকে। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, শৈবলিনীর হৃদয়ে যে প্রেম ছিল না তাহা নহে, সে প্রেম ক্ষণিক। লালসাকে প্রেম বলা চলে না। প্রেমানুশীলন মনুষ্যজীবনের পবিত্র স্বর্গীয় সাধনা। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার ছবি সযত্নে হৃদয়কন্দরে রক্ষিত করার নামই প্রেম, এই প্রেমকেই সাধনা কহে, এবং এই সাধনা হইতেই মানুষ রূপকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া অরূপে সিদ্ধি লাভ করে। সে সিদ্ধির আসনে দেখিয়াছি, 'প্রতাপকে', 'দেবী চৌধুরাণীকে' ও 'কপালকুণ্ডলাকে'। ইহারা যে রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ আছে—তৃষ্ণা নাই, শান্তি আছে—আর্ত্তনাদ নাই, উচ্ছ্বাস আছে—আবেগ নাই, আশা আছে—ভয় নাই। কপালকুণ্ডলা এই প্রকার প্রাণময়ী প্রেমময়ী। সেক্ষপিয়ারের 'মিরান্দা'ও কালিদাসের 'শকুন্তলা' অনেকটা কপালকুণ্ডলার মত। তিনজন চিত্রকরের তিনটী প্রেমময়ী মূর্ত্তি। আজ আমরা 'কপালকুণ্ডলাকে' লইয়াই আলোচনা করিব। কাপালিক ও প্রস্পেরো, মিরান্দা ও কপালকুণ্ডলা, গনজালো ও অধিকারী, ফার্দ্দিনান্দ ও নবকুমারের চরিত্র-সৌন্দর্য্য, প্রেমপার্থক্য বিস্তারিতভাবে বিচারে অন্য সময়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা রাহল।

যে দিন পরের "উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইয়া সরল, সাহসী ব্রাহ্মণসন্তান নবকুমার সমুদ্রতীরে বিসর্জ্জিত হইলেন, সে দিন নবকুমার কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। যখন বুঝিলেন সহযাত্রীরা সত্য সত্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে. তখনও সহযাত্রীদের প্রতি নবকুমারের কিছুমাত্র বিরক্তি বা বিদ্বেষ আসে নাই। এই ক্রোধ না করাকেই প্রেম বলে। প্রেমিকের হিংসা বা প্রতিশোধ লইবার বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না ; নবকুমার এমন কি সঙ্গিগণের প্রতি মনে মনে বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই ; তিনি শুধু বুঝিয়াছিলেন, "তুমি অধম. তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?" সমুদ্রের রূপে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,-তাঁহার সমুদ্রদর্শন সার্থক হইয়াছিল। এই সার্থকতার জোরেই সঙ্গী যাত্রীগণের এত বড় কৃতঘ্নতাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার যাত্রিগণকে ক্ষমা কোথাও করেন নাই, তবে আমাদের মনে হয় এত বড় অন্যায়ের প্রতিশোধ না লওয়াই ক্ষমা, কেন না, নবকুমার দুর্ব্বল নহেন, দরিদ্রের সন্তানও ছিলেন না। সুতরাং কিছু না বলাই ক্ষমা, এবং এই ক্ষমা প্রেমের দ্বারাই আনিত।

কপালকুণ্ডলার সহিত সান্ধ্য ছবির মাঝখানে সমুদ্রতটে প্রথম যখন নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়. তখন নবকুমার সেই শিশুস্বভাবা বনবিহারিণী রূপ দর্শনে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে চাহনি লালসার নহে ; সুন্দর, তাই দেখিতেছিলেন। সে চাহনিতে তন্ময়তার সঙ্গে ভক্তি মিশান ছিল।

শার্দ্দূলচর্ম্ম-পরিহিত শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত তান্ত্রিক সাধক কাপালিক নবকুমারকে বধার্থে যখন ভৈরবীমূর্ত্তির নিকট লইয়া গেলেন, তখন কপালকুণ্ডলার স্ত্রীসুলভ স্নেহে বা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া খড়্গ চুরি করিয়া রাখিয়া বধকার্য্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা আনয়নপূর্ব্বক নবকুমারকে লইয়া পলায়ন করেন। যদি সেই দিবস বালিয়াড়ির শিখর হইতে কাপালিক পতিত না হইতেন, যদি সে পতনে দুই

বাহু ভগ্ন হওয়ায় হতচেতন না হইতেন, তবে নবকুমারকে কেহই রক্ষা করিতে পারিতেন না। নবকুমারকে লইয়া কপালকুণ্ডলা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিলেন। এ পলায়নে কোন লালসা ছিল না। খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্তই তাঁহাদের দ্বারা কপালকুণ্ডলা ত্যক্ত হন, ইনি ব্রাহ্মণকন্যা; কাপালিক স্বীয় যোগ সিদ্ধি মানসে ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই বনের নীরবতার মাঝখানেই তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। মানুষের যে সব দোষ থাকিতে পারে, কপালকুণ্ডলার তাহাও ছিল না, সুতরাং লালসা কোথা হইতে আসিবে?

তৎপরে অধিকারী কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া নব কুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিলেন। বিবাহকার্য্য শেষ হইলে কপালকুণ্ডলা দেবীর চরণে বিল্বপত্র রাখিলেন—দেবী তাহা গ্রহণ করিলেন না। সম্ভবতঃ জগন্মাতার ইচ্ছা নহে যে, কপালকুণ্ডলার পবিত্র জীবন সংসারের লালসার দিকে চলিয়া যায়। বিবাহে কপালকুণ্ডলার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই ছিল না, কেন না তাঁহার কোন কামনা ছিল না। কপালকুণ্ডলা নিষ্কাম প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গীতা পাঠ করিয়া মানুষ যেরূপ হইয়া থাকে, কপালকুণ্ডলা পাঠ না করিয়াই তাহা হইয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। যাহা হউক কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে স্বামীপদে বরণ করিলেন, যোগ্য পাত্রেই কপালকুণ্ডলা অর্পিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার প্রেম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বুঝি উন্নতপ্রাণ নবকুমারেরও ছিল না।

অধিকারীর নিকট বিদায় লইয়া মেদিনীপুর-পথে নবকুমার কপালকুণ্ডলার শিবিকার পশ্চাতে পড়িলেন। কেন না, তিনি পদব্রজে যাইতেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দস্যু কর্তৃক ভগ্ন শিবিকায় আবদ্ধা মতিবিবিকে তিনি বন্ধনমুক্ত করিয়া নিজে যষ্টিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে চটিতে লইয়া চলিলেন। স্ত্রী ও পরপুরুষ এভাবে রাত্রিকালে

চলিতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, কেন না নবকুমার সংযমী ও চরিত্রবান্ যুবক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি দেবীপুরের 'দেবেন্দ্র দত্তের' কাঁধে মতিবিবিকে স্থান দিতেন, তবে সে রচনাতে ঠিক ভক্তিভাবে প্রেমের ছবি দেখিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে সপত্নী জানিয়াও যথেষ্ট অলঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত করিয়া দিলেন। মতি, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী, অদৃষ্টক্রমে মুসলমান হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর ছিল। অলঙ্কার দস্যুতে লইয়া গেলেও যথেষ্ট ছিল, সে সমস্ত মতি কপালকুণ্ডলাকে পরাইলেন। সপত্নীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধা হইলেন। কেন হইলেন? প্রেমময়ীর নিকট লালসাময়ীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্বামীহারা পদ্মাবতী আগ্রায় সেলিমের প্রেমভিখারিণী, নুরজাহানকে সরাইয়া তিনি সম্রাজ্ঞী হইতে ব্যস্ত। তবু এই চটিতে অন্ধকার গৃহে মতির এক দীর্ঘশ্বাসে তাহার হারাণো পুরাতন প্রেমকে মূর্ত্তিমতী হইয়া জাগিতে দেখিয়াছিলাম। লালসাকে যে প্রেম বলা চলে না, এবং প্রেম না হইলে মানুষ যে শান্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ মতিবিবি। মতি লালসার তাড়নায় যাহা চাহিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে, যাহা কল্পনা করিয়াছে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তবু প্রাণে শান্তি পায় নাই। মতির হৃদয়ে যদি প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সে পূর্ব্ব হইতেই তৃপ্তিলাভ করিত।

কপালকুণ্ডলা এতগুলি গহনা পাইয়াও অপকটহৃদয়ে ভিক্ষুককে দান করিল, অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিল। তাহার পাওয়াতেও আনন্দ নাই, দানেও দুঃখ নাই, এইটুকুই কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাধুর্য্য।

নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া সহযাত্রিগণ যে প্রকার বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, এ প্রকার বীর বাঙ্গালীসমাজে অভাব নাই। আমরা নবকুমারের মহত্ত্ব দেখিয়াছি সেইদিন, যেদিন সপ্তগ্রামে প্রেমপীড়িতা মতির সহিত নবকুমারের কথা হইয়াছিল।

পদ্মাবতী ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে এত কাল আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াও আগুন স্পর্শ করেন নাই। পান্থনিবাসে এক রাত্রিতে তাঁহার যে প্রেমের উন্মেষ হইয়াছিল, সে প্রেম ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আজ সে সত্যই প্রেমময়ী হইয়াছে। যখন সে প্রেমময়ী, তখন ধনসম্পদ্ গৌরবলালসা সমস্তই তাহার নিকট অসার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তখন তাহাতে আর কোন স্পৃহা রহিল না, কেন না প্রেমিক প্রেমিকার কোন সাংসারিক তৃষ্ণা থাকিতে পারে না। তবু পদ্মাবতী আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্য লইয়া সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যৌবন ও ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া নবকুমারকে প্রলুব্ধ করিবেন। কিন্তু শত প্রলোভনেও নবকুমারের হৃদয় টলাইতে পারিলেন না; এইখানে নবকুমার ও পদ্মাবতীর ছবি যেমন করিয়া আঁকিলে হয়, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবেই তাঁহাদের অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রেমের ডাকে মতি আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, নবকুমারও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মতিবিবিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! এই প্রকার ত্যাগেই প্রেমের বিকাশ। পদ্মাবতী যদি সম্পূর্ণরূপে প্রেমময়ী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর স্বামীকে পাইতে ব্যস্ত হইয়া কুপথ অবলম্বন করিতেন না। প্রেমিকা না হইলে প্রেমময়কে কখনই পাওয়া যায় না।

কাপালিক কপালকুণ্ডলার অনুসন্ধান করিতে করিতে সপ্তগ্রামে আসিলেন, তাহাকে না পাইলে তাহার তন্ত্রসাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। কপালকুণ্ডলার সন্ধান পাইয়াও কাপালিক ভগ্নহস্ত নিমিত্ত সহকারীর আবশ্যক হইয়া পড়িল। পুরুষবেশী পদ্মাবতী যখন স্বীকৃত হইল না, তখন ছলনা অবলম্বন ভিন্ন কাপালিকের কোন উপায় রহিল না। পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে স্বীকৃতা হইল না, লালসায় হোক আর প্রেমেই হোক সে স্বামীকে চায়। সম্পূর্ণ প্রেম হৃদয়ে থাকিলে স্বামীকে চাহিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার সপত্নীর

প্রাণ নিতেও ইচ্ছা নাই, এইখানেই সে যে একেবারে প্রেম-হীনা নহে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কাপালিকের অন্য সুযোগ ঘটিল—কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দিহান নবকুমারকে তিনি বুঝাইলেন, কপালকুণ্ডলা চরিত্রহীনা। এই প্রকারে উত্তেজিত নবকুমারকে সুরা পান করাইয়া কাপালিক সম্পূর্ণভাবে তাহাকে হাত করিল। রাত্রিকালে বনে, অপরিচিত ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত নিঃসঙ্কোচে কপালকুণ্ডলা আলাপ করিলেন; পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার পক্ষে তাহা দূষনীয় হয় নাই। কপালকুণ্ডলা আসিবার সময় কালীর পদে বিল্বদল দিয়া আসিয়াছিলেন। মা, তাহা গ্রহণ করেন নাই, সেই হইতে সে ভীতা!—তাহা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাহার লজ্জা, ভয়, দুঃখ কিছুই ছিল না। পদ্মাবতী নিজ পরিচয় দিয়া কপালকুণ্ডলাকে স্বামী পরিত্যাগ করিতে বলিলে তিনি অবলীলাক্রমে স্বামী ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইখানেই কপালকুণ্ডলার নারীত্বের গৌরব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই চরণ দুটি মনে পড়িল—

"প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়, আদানে প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।"

বন পরিত্যাগ করিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, জ্ঞানহারা নবকুমার যন্ত্রচালিতের ন্যায় 'কুলটাকে' বধার্থ তাহার পিছু লইলেন, পাছে শক্তি হারাইয়া ফেলেন এই ভয়ে পুনরায় কাপালিকের নিকট হইতে সুরা পান করিয়া টলিতে টলিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে আইস।"

সকলে মহাশ্মশানে উপনীত হইলেন। কাপালিক নবকুমারকে আদেশ করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। সেই মহাশ্মশানের উপর দিয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া তাহাকে স্নান করাইতে নদীতে যাইতেছিলেন, তখনই আমরা কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব প্রেমময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি! ধন্য সেই

ছবি, ধন্য সেই চিত্রকর। এই সময়ে যে ভাবে ও যে ভাষায় নবকুমারকে দুই চারিটী কথা কপালকুণ্ডলা বলিয়াছিলেন, পাঠকের বুঝিবার ও দেখিবার ক্ষমতা থাকে ত সমস্ত মাধুর্য্য সেইখানেই অনুভব করিতে পারিবেন। তাহার অনন্ত স্বর্গীয় প্রেম বুঝিবার ক্ষমতা নবকুমার কোথায় পাইবেন? প্রেমের রাজ্যে লালসা নাই, হিংসা নাই, প্রবঞ্চনা নাই, অবিশ্বাস নাই বলিয়াই পদ্মাবতী স্বামীহারা হইলেন, নবকুমার পথচ্যুত হইলেন, কাপালিকের নিষ্ঠুর সাধনা ব্যর্থ হইল!

সেই প্রেমের গরীয়সী মূর্ত্তি চৈত্রবায়ুতাড়িত বিশাল তরঙ্গে বিসর্জ্জিতা হইল! প্রেমের এ প্রকার উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অনেক দিন দেখি নাই। কপালকুণ্ডলা প্রেমের আদর্শ. হিন্দুর গৌরব, মনুষ্যজীবনের একমাত্র 'সাধনা'।

একবার ওঠ, মৃন্ময়ি! আবার সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া তোমার আগুলফলম্বিত কেশরাজি সমুদ্রের শান্ত সমীরণে উড়াইয়া দাঁড়াও! একবার তোমার কোমল কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রিয়ভোগ-বিমূঢ়ের হৃদয়তন্ত্রীতে নিষ্কাম-প্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া যাও! তুমি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা লইয়া আমাদের সম্মুখে এস—আমরা তোমায় নমস্কার করি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

উত্তরবঙ্গ বন্যাকার্য্য—কার্য্যবিবরণী ও আবেদন।

গত বারের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা পরিদর্শনান্তর আমরা থানা রাণী-নগরে ৫টী, থানা নওগাঁয় ৫টী ও নন্দনালি থানায় ২টী সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, নন্দনালী থানার কেন্দ্র দুই-টীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহাদের কার্য্য পরিচালনা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন করিলেও সোসাইটী কেন্দ্র দুইটীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিবেন।

কার্য্যারম্ভের পর ৩য় সপ্তাহে ৩৪৬০ জন ব্যক্তি সমস্ত কেন্দ্রগুলি হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হন. সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন চাউল ব্যতীত ২২০ জোড়া নূতন এবং কতকগুলি পুরাতন কাপড় কেন্দ্রগুলি হইতে বিতরিত হইয়াছে। বস্ত্রাভাব সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। পরিদর্শন কালে নগ্ন এবং অর্দ্ধনগ্ন বহু স্ত্রীপুরুষ আমাদের সেবকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। দুবলহাটী, হাঁসাইগাড়ী ও বলিহার কেন্দ্রে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে বন্যায় ক্ষেত্রাদি ডুবিয়া যাওয়ায় গরুর খাদ্যেরও অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। খাদ্যাভাবে বহু গরু বাছুর মারা গিয়াছে। আমরা ঐ সকল গ্রামে ইতিমধ্যে ৪০০০ আটি খড় বিতরণ করিয়াছি। অন্ততঃ এখনও একমাস কাল খড় বিতরণ করিতে হইবে, ইহাতে সাপ্তাহিক অল্পাধিক ২৫০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িবে। কেবল হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্রতেই ৬৪৭টী গরুকে প্রথম সপ্তাহেই সাহায্য করা হইয়াছে। নওগাঁর রিলিফ কমিটী আমাদিগকে যে ২০০০ আটি খড় বিতরণের জন্য দেন, তদ্দ্বারা রাণীনগর থানার কেন্দ্রসমূহে বিশেষতঃ রাতোয়ালে খড় দেওয়া হয়।

নিম্নে ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রসমূহের সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রথম সপ্তাহের বিতরণ তারিখ কেন্দ্রগুলির পার্শ্বে দেওয়া হইল।

থানা রাণীনগর।

কেন্দ্রের নাম।	গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণের সংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ।
কাশিমপুর (১৪।৯।১৮)	৮	৯০	৪॥০
ঐ, পর সপ্তাহে	১৭	২২৩	১১/৩

ঐ, ”	১৬	২২৪	১১/৮
ঐ, ”	১৭	২২২	১০॥৪
বিল্ কৃষ্ণপুর (১৬।৯।১৮)	১৫	৫৫	২৸৹
ঐ, পর সপ্তাহে	১৮	৮৯	৪।৮
ঐ, ”	১৮	৮৯	৪।৮
রাতোয়াল (১৬।৯।১৮)	৩০	২৯৩	১৪॥৬
ঐ, পর সপ্তাহে	৩৯	৮২২	৪১/৪
ঐ, ”	৪১	৬৩৭	৩১৸৪
রাণীনগর (১৮।৯।১৮)	২১	১৮২	৯/৪
ঐ, পর সপ্তাহে	২৫	২৬৩	১৩/৬
ঐ, ”	২৯	২৬২	১৩/৪
ভাণ্ডারগ্রাম (১৯।৯।১৮)	২২	১৯৩	৯৸২
ঐ, পর সপ্তাহে	২৮	২৭৫	১৩৸
ঐ, ”	৪১	৪০৬	২০।২

থানা নওগাঁ।

নওগাঁ (২৫।৯।১৮)	২৬	৪৪১	২২॥২
ঐ, পর সপ্তাহে	৫৬	৫৪২	২৭/৪
দুবলহাটী (২৩।৯।১৮)	২৩	১৫৮	৭৸৬
ঐ, পর সপ্তাহে	৩১	২২৯	১১/৮
শৈলগাছি (২৪।৯।১৮)	২২	২৭৫	১৩৸৹
ঐ, পর সপ্তাহে	২২	৩১১	১৫॥২
বালিহার (২৭।৯।১৮)	৮	৪৮	২।৬
হাঁসাইগাড়ী (৬।১০।১৮)	৬	৪৫	২।০

৩১ মন চাউলও কেন্দ্রগুলি হইতে সাময়িক সাহায্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা স্থানীয় অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হইয়াছে, কিন্তু বন্যায় শতকরা ৭৫ খানি বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় এবং মাঠের ধান অর্দ্ধেকের উপর নষ্ট হওয়ায়, জল কমিয়া গেলেও গ্রামবাসিগণকে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে। লোকে

এখনই এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে, আশঙ্কা হয়, যদি সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর শীঘ্র দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে কৃষিঋণ, গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য অর্থ, রবিশস্যের বীজ, এককালীন অর্থদানাদির দ্বারা সাহায্য না করেন, তাহা হইলে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে আমরা দুঃস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে যে সকল সদাশয় ব্যক্তি, সভা, সমিতি অর্থ এবং বস্ত্রাদি দ্বারা এই সেবা কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা আশা করি এই সেবা কার্য্যে সহানুভূতির অভাব হইবে না। এখনও লোকের সাহায্যের প্রয়োজন থাকায় আমরা সাধারণের নিকট আরও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। অর্থ বা বস্ত্র নিম্ন লিখিত ঠিকানা দ্বয়ে প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

বিগত ১০ই অক্টোবরের বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর বন্যার জল গ্রাম ও মাঠ হইতেও সরিয়া গিয়াছে। আতঙ্ক কমিয়া যাওয়ায় জনসাধারণ স্ব স্ব গ্রামে ও গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে ও যাহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আছে তদ্দ্বারা আগামী শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্ব স্ব গৃহাদির পুনর্নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকগণ রবিশস্য বপন করিবার জন্য ক্ষেত্রাদিতে চাষ আবাদ করিতেছে। তজ্জন্য শ্রমজীবিরাও কাজ কর্ম্ম পাইতেছে—যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা কম মজুরীতে। গভর্ণমেণ্টও কৃষিঋণ ও রবিশস্যের বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় দুবলহাটী হাঁসাইগাড়ী ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্রগুলি হইতে চাউল বিবরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলেও এমন অনেক দুঃস্থ পরিবার আছেন, যাঁহাদের গৃহে বিধবা স্ত্রীলোক নাবালক শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত উপার্জ্জনক্ষম কেহই নাই যাঁহাদিগকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের কেন্দ্রাধীনস্থ গ্রামসমূহের ঐরূপ পরিবারসমূহে আমরা এককালীন কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য করিব স্থির করিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা উহা মূলধন-

রূপে ব্যবহার করিয়া ধান বা চাউল কেনা বেচা করিয়া আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন বা প্রয়োজন বুঝিলে উহা দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া আগামী শীত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। থানা নওগাঁর ডুবলহাটী, নওগাঁ ও হাঁসাইগাড়ী এবং রাণীনগর থানার ভাণ্ডার গ্রাম ও রাতোয়াল এই পাঁচটী কেন্দ্র হইতে উক্ত সাহায্য বিতরিত হইবে। আমরা শুনিলাম, গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐরূপ সাহায্য প্রদান হইবে না, যদিও ঐরূপ সাহায্য পাইবার উপযুক্ত পরিবারের সংখ্যা বিরল নহে।

নিম্নে ৬ই হইতে ২৮ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

থানা রাণীনগর।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা	চাউলের পরিমা
রাণীনগর (৯।১০।১৮)	২৮	১৯১	৯॥২
ভাণ্ডার গ্রাম (১০।১০।১৮)	৪১	৪২৪	২১/৮
ঐ, পর সপ্তাহে	৪১	৪০০	২০/
বিল্ কৃষ্ণপুর (৭।১০।১৮)	১৬	১০৪	৫/৮
ঐ, পর সপ্তাহে	১৬	১০১	৫।২
রাতোয়াল (৭।১০।১৮)	৪৩	৫২৪	২৬/৮
ঐ, পর সপ্তাহে	৪৩	৪১৮	২০৸৬
ঐ, ”	৪০	২২২	১১/৪

থানা নওগাঁ।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা	চাউলের পরিমা
নওগাঁ (৭।১০।১৮)	৫৮	৫০৮	২৫।৬
ঐ, পর সপ্তাহে	৫৯	৪৮৮	২৪।৬
শৈলগাছি (৮।১০।১৮)	২২	৩০৪	১৫/৮
বলিহার (৩০।৯।১৮)	২৮	৯৭	৪৸৪
ঐ, পর সপ্তাহে	৩৪	১৭২	৮॥৪
ঐ, ”	৩৫	১৬১	৮২/

দুবলহাটী (৭।১০।১৮)	৩৫	২৭১	১৩॥২
ঐ, পর সপ্তাহে	৩৫	২৪৯	১২/৮
ঐ, ”	৩৬	২৮১	১৪/২
ঐ, ”	৩৭	১০৫	৫।০
হাঁসাইগাড়ী (৯।১০।১৮)	১৩	১৫৫	৭৸০
ঐ, পর সপ্তাহে	১৩	১৪৫	৭।০
ঐ, ”	২৩	১৮৩	৯✓৬

১৭/মণ চাউলও কেন্দ্রগুলি হইতে সাময়িক সাহায্যরূপে দেওয়া হইয়াছিল। থানা রাণীনগরে কাশিমপুর কেন্দ্র গত ৫ই অক্টোবর বন্ধ হইয়াছে।

পুরাতন বস্ত্র ব্যতীত ১৫৫ জোড়া নূতন বস্ত্র কেন্দ্রগুলি হইতে বিতরিত হইয়াছে। হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র হইতে গত ২রা হইতে ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৯খানি গ্রামে ৮৪০টী গরুকে ৩৫ কাহন খড় ৪ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমশঃ বন্যাপ্লাবিত উত্তরবঙ্গের অধিবাসিগণের অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই আমরা অন্যান্য সাহায্য-কেন্দ্রগুলিও বন্ধ করিব। যাঁহারা অর্থাদি দান করিয়া দুঃস্থ নারায়ণগণের সেবায় সহায়তা করিয়াছেন, সেই সকল সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ, যাঁহারা দুঃসময়ে সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতা আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের তহবিলে এখনও যে অর্থ আছে তদ্দ্বারাই আমরা বর্ত্তমান সেবাকার্য্য সমাধা করিতে পারিব; কিন্তু হয় তো ভবিষ্যতে ভগবান না করুন, উত্তরবঙ্গবাসীর পুনঃসাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। অন্যান্য জেলা হইতেও (যথা বাঁকুড়া মানভূম, পুরী প্রভৃতি) আমরা এখনই সাহায্যপ্রার্থনার আবেদন প্রাপ্ত হইতেছি। ঐ সকল স্থানের অবস্থাসম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, বোধ হয় শীঘ্রই সাহায্যকেন্দ্র খুলিতে হইবে। অতএব আমাদের সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা সাহায্য প্রেরণে যেন বন্ধ না করেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানাদ্বয়ে সাহায্য প্রেরিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেন্ট ফণ্ডে সাদরে গৃহীত হইবে ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দুরবস্থা মোচনকল্পে ব্যয়িত হইবে।

১। সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
উদ্বোধন অফিস, ১নং মুখার্জ্জি
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
২। প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
মঠ, বেলুড় পোঃ, হাবড়া

গত আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধনে যে বস্ত্রবিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তদনন্তর যে সকল কেন্দ্র হইতে বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল। মিশনের উত্তরবঙ্গে বন্যাকার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত হইবে, কিন্তু এই বস্ত্রবিতরণ কার্য্য এখনও চলিতে থাকিবে। অতএব এই বস্ত্রবিতরণ কার্য্যে যিনি যাহা সহায়তা করিতে চান, তাহা উল্লিখিত ঠিকানাদ্বয়ের যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

বাঁকুড়া ৪৫ ; গড়বেতা (মেদিনীপুর) ৫ জোড়, গুটীয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বরিশাল) ১৫ জোড়া ; কোটালীপাড়া, (ফরিদপুর) ৩০ জোড়া ; রাজসাহী জেলার বন্যাক্লিষ্ট স্থানে মিশনের কেন্দ্র সমূহ হইতে ৩৮৬ জোড়া ; কলমা (ঢাকা) ২০ জোড়া, বেলুড় (হাওড়া) ২১ জোড়া, সোণার গাঁ (ঢাকা), ২৫ জোড়া, ভুবনেশ্বর (পুরী) ৪০ জোড়া ; কোয়ালপাড়া, ৫০ জোড়া, বরানগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল হোম ৫ জোড়া এবং এতদ্ব্যতীত ১৯ জোড়া কাপড় বিভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি।*

মহাপুরুষের জীবনালোকেই মানবমনে উচ্চ ভাব বিকাশ লাভ করে। যে সমস্ত ভাব দ্বারা আমাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত, যে সকল চিন্তা দ্বারা আমাদের কার্য্য পরিচালিত, যাহা আমাদের জীবনকে কোন উচ্চ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, মহৎজীবনাদর্শের নিকট আমরা তজ্জন্য ঋণী। শাস্ত্রচর্চ্চা ও উপদেশ-শ্রবণ দ্বারা মনে সাময়িক প্রেরণা, হৃদয়ে ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস লাভ হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা জীবন গঠিত হয় না—'মানুষ তৈয়ারী' হয় না। কারণ, মানুষ যে সকল উচ্চ বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করে অথবা চিন্তা ও কল্পনা সহায়ে যে সকল তত্ত্ব ধারণা করে, মহাপুরুষের জীবনেই উহাদের সাক্ষাৎ প্রকাশ। অতএব মহৎজীবনালম্বনই মহৎভাবলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। এই হেতু মহাপুরুষগণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সমাদৃত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

স্বাভিব্যক্তি কথাটী ইংরাজী personality শব্দের অনুবাদ হইলেও উহার প্রতিপাদ্য ভাব আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয়, ভারতীয়। ভারতীয় অধিকারবাদ—যাহা ভারতীয় চিন্তার অবলম্বন, ভারতীয় সাধনার সোপান—তাহা এই স্বাভিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াই ভারত অসংখ্য ধর্ম্মমত, বিচিত্র অনুষ্ঠানসমূহ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভারত অজ্ঞকে অজ্ঞের আসন প্রদান করিয়া ব্যক্তিগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ধর্ম্মসমন্বয়বাণী "যত মত তত পথ", "কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই" তাঁহার এই কথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ভাব বা

* স্বামীজির ষট্‌পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে পঠিত।

স্বভাবের বিকাশই স্বাভিব্যক্তি। ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বভাব যখন মানুষের চিন্তা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাহাকে স্বাভিব্যক্তি বা personality বলা যায়। ইহা আত্মপরিচয়, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্য্যাদাসমন্বিত আত্মপ্রকাশ,—অভিমানদুষ্ট আত্মপ্রচার নহে। ইহা আপন মর্য্যাদারক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরের গৌরব রক্ষা করে। ইহা নিজ অধিকার লাভের সঙ্গে পরকেও অধিকার প্রদান করে। এই স্বাভিব্যক্তির উপরই মানবজীবনের বিশিষ্টতা। ইহা প্রত্যেকের জীবনে ভিন্নরূপ হইয়াও কাহারও মধ্যে কম কাহারও মধ্যে অধিক পরিস্ফুট। স্বামীজির মধ্যে উহার সম্পূর্ণ জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রকাশ। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে, কার্য্যে, ভাবে, চিন্তায় ও অঙ্গভঙ্গীতে স্বাভিব্যক্তি দেদীপ্যমান। তাঁহার জীবন আকাশের মত অনন্ত, বিচিত্র ও আলোকময়। অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, অপূর্ব্ব তাঁহার বৈরাগ্য, জ্বলন্ত তাঁহার বিশ্বাস, অমিত তাঁহার তেজ, অসাধারণ তাঁহার বিদ্যা, অমানুষী তাঁহার প্রতিভা, অনন্ত তাঁহার জ্ঞান, অচিন্ত্য তাঁহার প্রেম! ভাবিবামাত্র কি এক কর্ম্মদৃপ্ত, চিন্তাপ্রবীণ, জ্ঞানগম্ভীর, প্রেমপূত, শান্তিস্নিগ্ধ, ভাবোজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়, তেজোঘনমূর্ত্তি মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে! ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি। ইহারই প্রভাবে তিনি বিলাসনিকেতন পাশ্চাত্যকে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ, মৃতপ্রায় ভারতকে সঞ্জীবিত ও মোহগ্রস্ত বঙ্গভূমিকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন।

শৈশবের খেলাধুলা, কৈশোর ও যৌবনের বিদ্যাচর্চ্চা, সহচরগণের সহিত ব্যবহার ও কঠোর সংসার-সংগ্রামের মধ্যে স্বামীজির স্বাভিব্যক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও উহা সর্ব্ব প্রথম সেই দিনই সুপরিজ্ঞাত, যে দিন তিনি সত্যলাভের প্রবল প্রেরণায় দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন এবং হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিয়া, সংশয়ের পর সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি?" কি অদ্ভুত প্রশ্ন! শাস্ত্রালোচনা এবং যথাসম্ভব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া,

কৌলিক ও লৌকিক রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করিয়া মানুষ চিরকালই মনে করে ধর্ম্মলাভ করিতেছি। কিন্তু ধর্ম্ম যে কেবল মতবিশ্বাস নহে, শুদ্ধ অনুষ্ঠান বা বিচার নহে, ধর্ম্ম যে সাক্ষাৎকারের বস্তু, উপলব্ধির বিষয়; এ কথা কয়জনের প্রাণে আঘাত করে? সত্যের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা যে অন্ধগণের হস্তীসম্বন্ধে বিবাদের ন্যায় নিষ্ফল নিরর্থক, ইহা কয় জন বোঝে? তাই স্বামীজি জগৎকে নূতন করিয়া বলিয়া গেলেন,—

"বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খামিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয় ত আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু—উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনামাত্র নহে—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবার বস্তু, শুধু শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিষ নহে; সমস্ত মন প্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে—ইহাই ধর্ম্ম।"* "এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন ধর্ম্ম কেবল কথার কথা ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদ স্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।"†

সত্যলাভের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষাই স্বামীজির হৃদয়ে ছিল। স্বামীজি নিজে যাহা করিয়াছেন তাহাই মুখে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার জীবন তৎপ্রচারিত ভাব ও চিন্তাসমূহের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ। ঈশ্বরলাভের অন্তরায় জানিয়া গুরুপ্রদত্ত অযাচিত অষ্টসিদ্ধি সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অভাবের ভীষণ তাড়নায় "বুদ্ধিহারা" প্রায় হইয়াও গুরুর কথায়ও জগদম্বার নিকট ঐহিক বিষয় যাচ্ঞা করিতে পারেন নাই। সত্য-দর্শনের প্রবল আগ্রহে সাংসারিক দারুণ অভাব ভুলিয়া, ঐহিক উন্নতির সমস্ত

* সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।

† হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, কাশীপুরের উদ্যানে কঠোর সাধনাবলে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সংস্পর্শে আত্মপরিচয় লাভ করিয়া স্বামীজি অচিরেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনন্যসাধারণ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাই সহপাঠিগণকে অনেক সময় রহস্য করিয়াই যেন বলিতেন, "দেখ্, তোরা হয় ত বড় জোর উকিল, ডাক্তার বা জজ্ হবি, আমি কিন্তু নূতন কিছু কোর্‌বো।" সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন সাধারণ সন্ন্যাসিগণের মত মানবসমাজের বাহিরে কেবল আত্মমুক্তির সন্ধানে অথবা আনন্দ আস্বাদনে ব্যয়িত হইবে না—তাঁহার কর্ত্তব্য শুদ্ধ নিজ-দেহের, নিজ সমাজের, নিজ দেশের প্রতি নয়, সমস্ত সমাজের সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির,সমস্ত জগতের জন্য তাঁহার জীবন। কাশীতে অবস্থান কালে তিনি শ্রীযুক্ত প্রমদা দাস মিত্রকে বলিয়াছিলেন—"Some day I shall fall upon the society like a bomb-shell." * পরিব্রাজকবেশে ভারতের সর্ব্বত্র কখনও হিমারণ্যে কঠোর তপস্যায়, কখনও তীর্থমন্দিরে পূজা ধ্যানে, কখনও রাজপ্রাসাদে ধর্ম্মোপদেশ দানে, কখনও দরিদ্রগৃহে আতিথ্য গ্রহণে, কখনও চণ্ডালসহ মধুর আলাপনে, কখনও রাজপথে, মরুভূমিতে বা সাগরতটে অনশনে,—দীর্ঘ সাত বৎসর কাল যাপন করিয়া ভারতের উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন, সাধু, অসাধু সকলের সহিত সমভাবে পরিচিত হইয়া, ভারত-জীবন-সমস্যার এক অভিনব উপায় স্থির করিয়া, জগতের মোহস্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য সুদূর আমেরিকায় ছুটিয়া গেলেন। অসহায়, অজ্ঞাতনামা, গৈরিকধারী হিন্দু সন্ন্যাসীযুবক আত্মনির্ভরতাবলে ভোগমত্ততা, জাত্যভিমান, জ্ঞানগরিমা ও ধর্ম্মবিদ্বেষের মধ্য দিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। যে চিকাগো মহাসভায় ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তথায়

* একদিন আমি বজ্রের ন্যায় সমাজের উপর পতিত হইব।

হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও ঈশ্বরদর্শন প্রচার দ্বারা, সমন্বয় ও শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া জগতের চিন্তাপথে নূতন আলোক প্রদান করেন। বৌদ্ধযুগের পর বিদেশে ভারতের ধর্ম্মপ্রচার এই প্রথম। ইহা স্বামীজির স্বাভিব্যক্তির আর এক জলন্ত নিদর্শন। New york Herald বলিয়াছিল :—Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions; after hearing him we feel, how foolish it is to send missionaries to this learned nation. *

চিকাগো মহাসভার পর স্বামীজি আমেরিকাবাসিগণের ধর্ম্মোৎকণ্ঠা মিটাইবার জন্য তিন বৎসর কাল তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন গমন করেন ও ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত Prof. Max-Muller ও Kiel Universityর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Paul Duessenএর সহিত তাঁহার সাক্ষৎ হয়। তাঁহারা উভয়ে স্বামীজির সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচ্যশাস্ত্র আলোচনা সম্বন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেন,—If Max-Muller is the old pioneer of the new movement, Duessen is certainly one of its younger advance guards." এই সাক্ষাতের ফলেই Prof. Max-Muller, 'The Life and Sayings of Sri Ramkrishna' নামক তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। স্বামীজির ওজস্বিনী ভাষা, তেজোদ্দীপ্ত বদন, অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সুমহৎ চরিত্র ও ধর্ম্মোপলব্ধি পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের প্রাণে সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাঁহার পূত সংস্পর্শে

* বিবেকানন্দই যে ধর্ম্ম মহাসভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বিষয় হইয়াছিলেন, ইহাতে আর কিছুই সন্দেহ নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমাদের বেশ ধারণা হইয়াছে যে, এই সুশিক্ষিত জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করা কি নির্বুদ্ধিতার কাজ।

ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে কত চরিত্রহীন চরিত্রবান্, কত সন্তপ্ত শান্তিপ্রাপ্ত, কত নাস্তিক ঈশ্বরবিশ্বাসী, কত নর নারী ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসব্রতধারী হইয়াছিলেন।

স্বামীজির এই সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাসকল রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, ও জ্ঞানযোগ নামে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। এ সব তাঁহার ভক্তিমান্ শিষ্য Mr. Goodwinএর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। স্বামীজির বক্তৃতাবসানে Goodwin প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উহা ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিতেন ও প্রত্যূষে তাহা জনসমক্ষে প্রচার করিতেন। স্বামীজি কোন কোন সপ্তাহে ১৭টী বক্তৃতাও প্রদান করিতেন। বক্তৃতা ব্যতীত তিনি ক্লাশ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দান ও বহুসভাসমিতিতে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। স্বামীজির লণ্ডন অবস্থান সম্বন্ধে Mr. Eric Hammond লিখিয়াছেন, —"Clubs, societies, drawing-rooms opened their doors to him. Sets of students grouped themselves together in this quarter and that, and heard him at appointed intervals. His hearers, hearing him longed to hear further."* Indian Mirror পত্রিকার লণ্ডনবার্ত্তাবহ লিখিয়াছেন, —"It is a rare sight to see some of the most fashionable ladies in London seated on the floor, cross-legged, of course, for want of chairs, listening with all the *Bhakti* of an Indian *Chela* towards his *Guru*."† এইরূপ একদিনই

* ক্লাব, সোসাইটী, ড্রইংরুমসকলের দ্বার তাঁহার নিকট সদা উন্মুক্ত থাকিত। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা নানাস্থানে জড় হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিত। আর একবার যিনি তাঁহার কথা শুনিতেন, তিনি পুনরায় তাহা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

† লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তবংশীয়া কতকগুলি মহিলা চেয়ারের অভাবে মেঝেতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া একজন ভারতীয় শিষ্যের ন্যায় প্রগাঢ় গুরুভক্তি-সহকারে তদীয় কথা শ্রবণ করিতেছেন, এরূপ দৃশ্য বাস্তবিকই বিরল।

ভারতসেবাব্রতধারিণী ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margerate Noble) স্বামীজিকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। The Master as I saw Him গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, —

"সময়টা নভেম্বর মাসের এক রবিবারের ঠাণ্ডা বৈকাল বেলা এবং স্থান ওয়েষ্টএণ্ডের (West-End) একটা বৈঠকখানা; তিনি অর্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া এবং কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানে প্রজ্বালিত অগ্নির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন; আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তৎপ্রদত্ত উত্তরটীর উদাহরণস্বরূপ কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের সময় তত্রত্য দৃশ্যটী তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ভারতীয় উদ্যানের অথবা সূর্য্যাস্ত সময়ে কূপান্তিকে বা গ্রামের উপকণ্ঠে তরুতলে উপবিষ্ট কোন সাধুর পার্শ্বে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দেরই এক কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে।

"ইংলণ্ডে আচার্য্য হিসাবে স্বামীজিকে আমি আর কখনও এমন সাদাসিধাভাবে দেখি নাই। ইহার পরে তিনি সর্ব্বদাই বক্তৃতা দিতেন; অথবা তিনি যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহা এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ত্তৃক পদ্ধতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হইত। শুধু এই প্রথম বারেই আমরা মাত্র ১৫।১৬ জন অভ্যাগত ছিলাম।, আমাদের মধ্যে অনেকে আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। স্বামীজি তাঁহার গেরুয়া পোষাক ও কোমরবন্ধ পরিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন।—যেন আমাদিগের নিকট কোন এক দূর দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একবার "শিব! শিব!" বলিতেছেন, উহা আমাদের নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকিতেছে—আর তাঁহার মুখমণ্ডলে লোকে খুব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের বদনে যে মিশ্রিত কোমলতা ও মহত্ত্বের ভাব দেখিতে পায়, তাহাই লক্ষিত হইতেছিল। হয়ত উহা সেই ভাব, যাহা রাফেল আমাদিগকে

তাঁহার Sistine Child * এক ললাটফলকে আঁকিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।"

অদ্ভুত ভারতীয় সাধুর অদ্ভুত শিক্ষাদান! আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদী মধ্যস্থ Thousand Island Park নামক দ্বীপে স্বামীজির অবস্থান ও শিক্ষাদান বর্ণন করিয়া অপর এক পাশ্চাত্য শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডো Inspired Talks নামক পুস্তকের সূচনায় লিখিয়াছেন ঃ—

"স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্ম্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখন মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষটী হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্ত্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন।"

কিন্তু স্বামীজি কেবল প্রচারকার্য্যেই নিমগ্ন ছিলেন না। তৎ-প্রচারিত ভাবসমূহ যাহাতে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবন গঠন করিতে পারে তজ্জন্য স্থানে স্থানে বেদান্তসমিতি স্থাপন করিয়া গুরু-ভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ ও পাশ্চাত্য শিষ্য স্বামী কৃপানন্দকে উহাদের ভারার্পণ করেন। এইরূপে পাশ্চাত্যে এক মহাজাগরণের সূত্র-পাত করিয়া স্বামীজি প্রায় চারি বৎসর প্রবাসের পর গুরুগতপ্রাণ মিঃ গুডউইন, ও মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার সহ জন্মভূমি

* এই বিখ্যাত চিত্রখানির মধ্যস্থলে শিশু ঈশা ও তাঁহার জননী মেরীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, বামে সেণ্ট সিক্টাসের, দক্ষিণে সেণ্ট বার্বারার এবং নিম্নে দুইটী দেবশিশুর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা এখন ড্রেসডেনে।

ভারতে প্রত্যাগমন করেন। সেভিয়ারদম্পতী বহুকাল ধর্ম্মচর্চ্চায় নিরত থাকিয়াও সত্যনির্ণয় করিতে না পারিয়া স্বামীজিকে প্রথম দর্শন-মাত্র উভয়ে একই কালে বলিয়াছিলেন—"This is the man and this is the philosophy that we have been seeking in vain all through life."* এই সেভিয়ারদম্পতীই সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া হিমালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মিলনক্ষেত্র মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামীজির অপর ভক্ত Miss Henrietta Muller এর অর্থে বেলুড়মঠ স্থাপিত হয়। স্বামীজি ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও পাশ্চাত্যের অর্থে ভারতে মঠস্থাপন করিতে দেখা যায় নাই।

স্বদেশে পদার্পণ মাত্র সমস্ত ভারত যেন প্রবুদ্ধ—একপ্রাণ হইয়া দিগ্‌বিজয়ী ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইল। রাজাধিরাজ-সেবিত বিবেকানন্দ ভারতে সর্ব্বত্র যেরূপ অভিনন্দিত ও পূজিত হইয়াছিলেন এইরূপ আর কেহ কখনও হন নাই। স্বদেশ-দর্শন মাত্র তাঁহার প্রাণের আবেগ ও মনের বল যেন সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল। জ্বলন্ত উৎসাহে তিনি কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র আপন জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ্‌ অকাতরে বিতরণ করিয়া ভারতের যথার্থ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন:—

"অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এদেশের সমস্যা জটিলতর—গুরুতর। জাতীয় অবান্তর ভাব, ধর্ম্ম, ভাষা, শাসন—সমুদয় লইয়াই একটী জাতি গঠিত। * * * কেবল আমাদের পবিত্র পুরাণেতিহাস, আমাদের ধর্ম্মই আমাদের সম্মিলনভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। * * * যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আর আমরা চাই, আমাদের ধর্ম্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধ-

* ঠিক এই লোককেই এবং এই ধর্ম্মমতকেই আমরা সারাজীবন ধরিয়া বৃথা অন্বেষণ করিতেছিলাম।

বনিতা সকলের নিকট, প্রচারিত হউক—সকলে সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। * * * যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগজীবাণু বাস করিতে পারে না। ধর্ম্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি ঐ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোন বাহ্য দোষ, এমন কি, আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্য দোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। * * * এই ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ইহার অনুসরণ কর, তোমরা মহত্ব পদবীতে আরূঢ় হইবে। উহা পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে—বিনাশ। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই। আমার এইটুকু মাত্র বক্তব্য এবং ইচ্ছা যে, তোমরা ভুলিও না যে, ঐগুলি গৌণমাত্র, ধর্ম্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম্ম—তারপর চায় অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্ম্মভাবকে বিশেষভাবে জাগাইতে হইবে।"*

কিন্তু কর্ম্মবীর স্বামীজি কেবল কথায়ই কার্য্য শেষ করেন নাই। আমেরিকার ন্যায় এখানেও ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য এক মহা-যন্ত্র স্থাপন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা স্বামীজির প্রবল কার্য্যকুশলতা, গভীর চিন্তাশীলতা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা ও বিশাল মহাপ্রাণতার পরিচায়ক। একদিকে উদার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, অপরদিকে সাধনভজনাদি সহায়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায়। স্বামীজি দেখিতে পাইয়াছিলেন, "সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া দেশ ধীরে ধীরে মহা

* ভারতের ভবিষ্যৎ, মাদ্রাজ।

তমোগুণ হ্রদে ডুবিয়া গেল” অথচ ইহাকে জাতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ফিরিয়া পাইতে হইবে। কিন্তু তমোভাবাপন্ন ভারতের পক্ষে ত্যাগপথ অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ ঈশ্বরারাধনা ও ধ্যানাদি সহায়ে সত্যলাভ অতীব আশঙ্কাজনক। কারণ, কর্ম্মহীন বৈরাগ্য অনেকস্থলে আলস্যের রূপান্তর—প্রচ্ছন্ন তমোভাব মাত্র। অলস শান্তিপ্রিয়তা সজীব ভাবতন্ময়তার ফল না হইয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ উপস্থিত হয়। তাই স্বামীজি ত্যাগের সহিত কর্ম্ম সংযুক্ত করিয়া দিলেন। কোন্ কর্ম্ম? 'দেশের ও দশের' উপকার। শিবজ্ঞানে জীবসেবা—দরিদ্র বিপন্ন নারায়ণগণের সেবা। কঠিন রোগের কঠিন ঔষধ। সুখসৌন্দর্য্য ও সম্পদের মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত দর্শন অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর। কিন্তু দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ ও মৃত্যুমধ্যে মঙ্গলময়ের 'সত্যং শিবং সুন্দরং' মূর্ত্তির সন্ধান কয়জন পায়? 'অসিধরাকরালিনী' মা যে 'বরাভয়দায়িনী' একথা কেই বা বুঝে? বিনাশ ও লয়মুখে জীবের সংসারস্বপ্ন ঘুচাইয়া নিত্যানন্দের সন্ধান বলিয়া দেওয়াই সংহারিণী বিদ্যাশক্তির কার্য্য। সংহারিণী মহাশক্তির এই কল্যাণময়ী মূর্ত্তির দর্শন না পাইলে—রোগ, শোক, মৃত্যু, ও ধ্বংসের এই ক্ষেমঙ্কর ভাব বুঝিতে না পারিলে মঙ্গলময়ের যথার্থ ধারণা হয় না, 'মঙ্গলময়' কেবল কথার কথা—আত্মপ্রতারণা মাত্র। তাই স্বামীজি কঠোরের উপাসনায়, ভীষণের পূজায় ভারতকে আহ্বান করিলেন,—

“জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥” —

শিবজ্ঞানে জীবসেবা ব্যবস্থার আর এক উদ্দেশ্য ধর্ম্মসমন্বয়। একমাত্র সার্ব্বভৌমিক বেদান্তই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তি। তাই স্বামীজি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য সর্ব্বভূতে নারায়ণ বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য বলিলেন,—

"ব্রহ্মহতে কীটপরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর !"

মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ের আরোপ করিয়া যেমন হৃদয়মন্দিরে সচ্চিদানন্দের দর্শন লাভ হয়, ঈশ্বর বোধে জীবসেবা করিয়াও সেইরূপ সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন ঘটিবে, সন্দেহ কি। বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এই অভিনব উপায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটই স্বামীজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোক পাইয়া স্বামীজি একদিন বলিয়াছিলেন,—'অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়; সংসারের সকল কাজ উহার অবলম্বনে করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সেই সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ বা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায় ? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ

হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

'ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন-পূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই যে তাহারা আশু লক্ষ্যে পৌঁছাইবে এ কথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্ব্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকেই শুনাইয়া মোহিত করিব।' *

এই সেবাধর্ম্মের সহিত ভারতে জাতীয়তা গঠনের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। প্রথমতঃ, ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর লোক ইহাতে সমভাবে যোগদান করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যথার্থ ত্যাগী, অনুরাগী ও কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তি দ্বারাই দেশের, সমাজের ও জাতির কল্যাণ সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, স্বার্থত্যাগী শিক্ষিত জনগণের সেবা দ্বারা ভদ্র ও ইতর সাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইবে। শিক্ষিত সমাজ দ্বারা জন-সাধারণ পরিচালিত না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

পরন্তু স্বামীজি দেখিলেন—এই তমসাচ্ছন্ন, অনশনক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, মহামারীগ্রস্ত ভারতে কয়জন ত্যাগের মর্য্যাদা বুঝিবে? —"এই ভারতে কয়জন? সেই মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সেই দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩২৪।

যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সেই বিশাল হৃদয় কোথায় যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।" অতএব ভারতের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। "রজোগুণের মধ্যে দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না করিলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?" অপরদিকে দেখিলেন, রজোগুণপ্রধান পাশ্চাত্য ভোগের চরম সীমায় উপনীত—ধ্বংসোন্মুখ। তাই জগৎগুরু বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ও ভারতের জাতীয়-জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান স্থির করিলেন।—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"

এইরূপে স্বামীজি আপন জীবনব্রত কার্য্যে পরিণত করিয়া উহারই সৌকর্য্যসাধনার্থ প্রায় তিন বৎসর কাল পরে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করেন। এবার তিনি কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারকালে জনৈক মহিলা ছাত্রীর নিকট হইতে স্যানফ্রান্সিসকো নামক স্থানে ১৬০ একর (৫০০ শত বিঘা) জমী প্রাপ্ত হইয়া "শান্তি আশ্রমের" প্রতিষ্ঠা করেন। সানফ্রান্সিসকো মন্দিরই পাশ্চাত্য জগতে প্রথম হিন্দু মন্দির। এক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া স্বামীজি প্যারিস মহাসভায় (Congress of the History of Religions) বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করেন। প্যারিস অবস্থান কালে বহু বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, ভাস্কর, চিত্রকর, বিজ্ঞানবিৎ, গায়ক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত স্বামীজির আলাপ হয়। তৎপরে স্বামীজি ইউরোপের নানাস্থান—বিয়েনা, কনষ্টান্টিনোপল, এথেন্স, এবং মিশর দর্শন করিয়া

সহসা সকলের অজ্ঞাতসারে একেবারে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার এই শেষ পাশ্চাত্য দেশ দর্শন সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—"স্বামীজি এই কয়মাস কাল ইউরোপ ও আমেরিকায় যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইতে লোকের সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই অধিক মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার আশপাশের জগৎকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না বলিলেই হয়। সচরাচর লোকে জিনিষকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, তিনি তৎপ্রতি আদৌ খেয়াল করিতেন না, অত্যধিক সফলতা লাভ করিয়াও তিনি কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না হইবার কারণ, যে মহাশক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছিল তাহার মাহাত্ম্য তিনি অতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কার্য্যে বিফল মনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন না। জয় পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে—তিনি তাহাদের সাক্ষী মাত্র। *" তিনি এবার দেড় বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার দৃঢ় শরীর ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নানাস্থান দর্শন ও জলন্ত উৎসাহে শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জ্ঞানের সহিত ভাবের এবং কর্ম্মের সহিত সমতার মিশ্রণ স্বামীজির জীবনের দুইটী প্রধান বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যবিজয়ী বেদান্তমূর্ত্তি স্বামীজির জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া General Assembly College এর Principal William Hastie তাঁহার জীবনের প্রারম্ভেই বলিয়াছিলেন,—He is an excellent philosophical student. In all the German and English universities there is not one student so

* আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

brilliant as he*" স্বামীজির গভীর প্রেম চারিটী বিশেষভাবে প্রকটিত :—

প্রথমতঃ; তাঁহার স্বদেশানুরাগ। কলিকাতায় বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন ইংরাজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজি! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী, মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য ভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে?" আমি বলিলাম, "পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার পূর্ব্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থ-স্বরূপ।' ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার আসিল'না।" †

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার গুরুভক্তি। গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কতবার কথোপকথন ও বক্তৃতাস্থলে তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আর বলিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজে প্রদত্ত The Sages of Inda বিষয়ক বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"যদি আমার জীবনে একটী সত্যও বলিয়া থাকি, তবে সে তাঁহার, তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি যাহা অসত্য, ভ্রমাত্মক—যাহা মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার। তৎসমুদয়ের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।"

কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে তাঁহার অভিনন্দন-কালেও তিনি গুরুদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না; আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না; উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি

* তিনি দর্শনশাস্ত্রের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র। সমস্ত জর্ম্মাণ ও ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ছাত্র একজনও নাই।

† কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর—ভারতে বিবেকানন্দ।

শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটী ভাগের এক ভাগেরও তুলনা হইতে পারে না।"

তৃতীয়তঃ তাঁহার ঈশ্বরভক্তি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'নরেন্দ্রের নির্গুণে ভক্তি'। কিন্তু সগুণে ভক্তি ব্যতীত নির্গুণে ভক্তি লাভ হয় না। স্বামীজিও ভক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, "ভক্তি আমাদের প্রকৃতি স্রোতের সহিত সামঞ্জস্য ভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না।" স্বামীজির রচিত স্তোত্রাদির মধ্যে এবং কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর পূজায় তাঁহার সগুণে ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ তাঁহার বিশ্বপ্রেম। স্বামীজি যেন এক দিকে শঙ্করের মেধা অপর দিকে বুদ্ধের হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছিলেন। একমাত্র মুক্তাত্মাগণই বলিতে পারেন,—

"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব,—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'—এই আমার ধর্ম্ম। যার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্য্যে সহায়তা করতে পারে।"

অপার জ্ঞানের সহিত অপার প্রেমের ন্যায়, অশেষ কর্ম্মের সহিত অসীম শান্তভাবের মিশ্রণও স্বামীজির জীবনে অনির্ব্বচনীয়। অনন্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও স্বামীজির মন সর্ব্বদা সমাধির উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছিল। পরমহংসদেব বলিতেন—'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'। শিক্ষাদান কালে স্বামিজী কিরূপ আপনভাবে থাকিতেন, বিলাস বিভবের মধ্যে কিরূপ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেন, ভগ্নী নিবেদিতার লেখনীমুখে তাহার কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। বক্তৃতা দান কালে স্বামীজি সম্পূর্ণ তন্ময় 'a voice without body' হইয়া যাইতেন। রঙ্গরসিকতার সময়ও 'he was never for a moment far from the dominating note of his life'। সুইজরলণ্ডে প্রকৃতির মনোরম মূর্ত্তি দর্শনে, তপোভূমি ভারতে হিমালয় দর্শনে তাঁহার কর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা উপস্থিত হইত। তাঁহার নিজের কথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, "যেমন এই শৈলরাজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়নগোচর

হইতে লাগিল, ততই আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি—বৎসর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে বুদ্বুদ খেলিতেছিল তাহা—যেন শান্ত হইয়া আসিল, আর কি কায আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আবার কি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, ও সকল বিষয়ের আলোচনায় মন না দিয়া এখন আমার মন—হিমালয় যে এক সনাতন সত্য অনন্ত কাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্য্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদী-সমূহের বেগশীল আবর্ত্তসমূহে আমি যে এক তত্ত্বের মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে।"* গুণাতীত স্বামীজি যেন জগতে নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই দুরূহ সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বামীজির বালক-ভাবের মধ্যেও তাঁহার গুণাতীত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সেভিয়ার দম্পতীর সহিত তাঁহার ব্যবহার ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। লণ্ডনে দ্বিতীয়বার অবস্থান কালে স্বামীজির এই গুণাতীত বালকভাব এক সময়ে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে। তিনি আপনাকে শক্তিমানের যন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছিলেন,—

"আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য কর্‌ছি। আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি; আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ প্রত্যেক কাযটী লক্ষ্য করে আস্‌ছেন—কারণ, আমি তাঁর হাতের যন্ত্র বই আর কি? তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—সব সুখের আশা ছেড়েছি—জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদা ক্রীড়া-শীল আদরের ধন—আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ড কার-খানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে বা কোন্ যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎনাট্যের সকল

* আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর।

অংশেই তিনি এই সব হাসি কান্নার অভিনয় কচ্ছেন। জো যেমন বলে—ভারি তামাসা, ভারি তামাসা !” *

ইহাই যথার্থ বিবেকানন্দ! এই গুণাতীত অবস্থার জন্য তিনি সকল দেশের সকল জাতির সম্পত্তি, সকল আচার ব্যবহারের অতীত ছিলেন। তিনি নিজেই একবার প্যারি হইতে লিখিয়াছিলেন,—

“As for me, mind you, I stand at nobody's dictation. I know my mission in life, and no charivarism about me ; I belong as much to the world as to India, no humbling about that. * * * What country has any special claim on me ? Am I any nation's slave ?” †

স্বামীজির চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব একাধারে অনেক গুণ। বাগ্মী, তার্কিক, সমালোচক, রসিক, লেখক, কবি, গায়ক, বাদক, শিল্পজ্ঞ বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধের কার্য্য নহে। স্বামিজীর স্মৃতিশক্তিও অদ্ভুত ছিল। পুস্তক পাঠে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, একবার পড়িলে বড় বড় গ্রন্থ মুখস্থ হইয়া যাইত। স্বামীজির প্রতিভা সহপাঠিগণের চিত্তে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিত প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়,—“Undoubtedly a gifted youth, sociable, free, unconventional in manners, a sweet singer, the soul of social circles, a brilliant conversationalist somewhat bitter and caustic, piercing with the shafts of a keen wit, the shows and mummeries of the world, sitting in the scorner's chair

---

* পত্রাবলী—২য় ভাগ।

† “আমি কাহারও আদেশের অপেক্ষা রাখি না। এ জীবনে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আমি বেশ জানি। শত চীৎকার ও বাধা বিপত্তিতেও আমি তাহা ভুলিব না। আমি ভারতের ওযেমন আপনার, সমস্ত জগতেরও তেমনি। ইহার চেয়ে খাট করিলে চলিবে না। * * * কোন দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে ? আমি কি কোন জাতির ক্রীতদাস ?”

but hiding the tenderest of hearts under the garb of cynicism ; altogether an inspired Bohemian but possessing what Bohemians lack,—an iron will ; somewhat peremptory and absolute, speaking with accents of authority and withal possessing a strange power of the eye which could hold his listeners in thrall." * বক্তৃতার ভাষা এবং রচনার মধ্যেও স্বামীজির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকাগো মহাসভায় জীবনের প্রথম বক্তৃতায়ই তিনি জগদ্ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে কিরূপ তেজঃপূর্ণ তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। ইংরাজী সাহিত্যে কার্লাইলের মত আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষা কমই আছে। স্বামীজির বক্তৃতা পড়িয়া মনে হয়, স্বামীজি যেন তাঁহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। গভীর দার্শনিকতত্ত্বসমূহ তিনি অবলীলাক্রমে বুঝাইয়া দিতেন। বক্তৃতার ভাষা তাঁহার বাগ্মীতা, স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়বত্তা ও তেজস্বিতার নিদর্শনস্বরূপ। স্বামীজির গদ্য রচনা কখনও গুরুগম্ভীর কখনও লঘু অথচ দ্রুত। তিনি বিশেষণবহুল সমাসযুক্ত বাক্য রচনায় যেমন নিপুণ, কথোপকথনের ভাষায়ও তেমন সিদ্ধহস্ত—কোথাও ভাবগাম্ভীর্য্য, তীক্ষ্ণ বিচার ও মৌলিক গবেষণা, কোথাও বা বিদ্রূপ, কটাক্ষ ও রসিকতা। স্বামীজির কবিতাগুলি তাঁহার সঙ্গীতাভিজ্ঞতা, ভাবুকতা ও কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'র মধ্যে তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় কোমল ও কঠোর ভাবের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ করিয়াছেন।

স্বামীজির বিচিত্র স্বভাবের ন্যায় তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং চাল

* বাস্তবিকই তিনি একজন অসীম মেধাবী, স্বাধীনচেতা, কুসংস্কারবিহীন, লোকপ্রিয়, সুগায়ক, দৃঢ়চেতা, ও প্রকৃত হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। বক্তৃতা বা কথোপকন সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ চক্ষুদ্বয় হইতে এক স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নির্গত হইত। তিনি একাধারে বোহিমীয়াবাসিদিগের ন্যায় প্রবল কল্পপ্রবণ—ও তৎসহ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্নছিলেন।

চলনও অপূর্ব্ব ছিল। তাঁহার উন্নত বপুঃ, বিস্তীর্ণ বক্ষঃ, জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, তেজঃপূর্ণ আয়ত লোচন, মহিমমণ্ডিত প্রশস্ত ললাট দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়-মন অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করিত। স্বামীজির অন্তরের ভাব তাঁহার মুখমণ্ডল ও চক্ষে সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইত। তাঁহার বদনমণ্ডল কখনও হাস্যোজ্জ্বল, কখনও চিন্তাধীর, কখনও কর্ম্মকঠোর, কখনও ভাবকোমল। তাঁহার চক্ষু কখনও হর্ষোৎফুল্ল, কখনও বিচার-গম্ভীর, কখনও প্রেমস্নিগ্ধ, কখনও ধ্যানস্তিমিত। তাঁহাকে দেখিলে কখনও রাজপুত্র, কখনও যোগী বলিয়া মনে হইত। স্বামীজির গতি কখনও অরণ্যবিহারী সিংহের মত স্বচ্ছন্দ, স্বানন্দ, কখনও বালকের মত দ্রুত ও চঞ্চল ছিল। এইরূপ তাঁহার অন্তরের ন্যায় দেহের ভাবও অনন্ত ছিল।

এই অগণিতগুণাধার, অনন্তজ্ঞানসমুদ্র, অফুরন্ত প্রেমের উৎস, বালসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কে? শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের জন্ম, কর্ম্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচারকার্য্যও অত্যাশ্চর্য্য।" স্বামীজির নিজজীবন সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য। মান্দ্রাজে প্রদত্ত 'The Sages of India' বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন, সকল সম্প্রদায় এক আত্মা, এক শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত দরিদ্র, দুর্ব্বল, পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব সকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত সকল বিরোধী-সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিবে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যভাবে উন্নতিসাধক সার্ব্ব-

ভৌমিক ধর্ম্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।"

কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সঙ্গে স্বামীজির জীবনকেও আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁহার রচিত শ্লোকের চরণ দুইটি—

"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।"

তাঁহার নিজের জীবনকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজির জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহিত সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বিবেকানন্দকে জানিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা আবশ্যক, শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলেও বিবেকানন্দকে বুঝা আবশ্যক। অধিক কি, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই জানিতেন বিবেকানন্দকে এবং বিবেকানন্দই বুঝিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। গুরুগতপ্রাণ স্বামীজি গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে একেবারে বিহ্বল হইয়া যাইতেন; ঠাকুরও 'নরেন্দ্র নরেন্দ্র' করিয়া পাগল হইয়া পড়িতেন। অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কতবার কলিকাতায় ছুটিয়া গিয়াছেন। কখনও তাঁহাকে আদর করিতেন, কখনও নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিতেন। কখনও বলিতেন, 'নরেন্দ্র মৎস্যের মধ্যে রোহিত,' কখনও বলিতেন, 'গ্রহের মধ্যে সূর্য্য,' কখনও 'পদ্মের মধ্যে সহস্রদল'। আবার বলিয়াছিলেন,—'নরেন্দ্র আমার শ্বশুর ঘর' 'নরেন্দ্রের চাবি আমার কাছে রহিল, ও আপনাকে বুঝিতে পারিলে থাকিবে না।' গুরু-শিষ্যের এই অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ, এই অশ্রুতপূর্ব্ব সম্বন্ধ কি সৃষ্টি-প্রবাহের তরঙ্গবিশেষ, অথবা ইহা কি সেই সনাতন মহাকর্ষণের ভাগবতলীলার পুনঃপ্রকাশ? বুঝি বা শক্তিমানের লীলাবিলসন যাহা জ্ঞানময়, ভক্তিময় মূর্ত্তিধারণ করিয়া জগদুদ্ধারের কারণ হইয়াছিল, যাহা আনন্দঘন প্রেমঘন বিগ্রহাবলম্বনে জগতে প্রেমের অভিনয় ঘটাইয়াছিল, যাহা অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে জগৎ

মাতাইয়াছিল, জটিলতর যুগ প্রয়োজন সাধনের জন্য ভক্ত্যাবৃত জ্ঞান-বপুঃ জ্ঞানাবৃত ভক্তিবপুঃ ধরিয়া পুনঃপ্রকটিত! স্বামীজিও এক সময়ে জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"তাঁর (ঠাকুরের) ভিতরটা কেবল জ্ঞান, বাহিরটা কেবল ভক্তি, আমার বাহিরটা জ্ঞান, ভিতরটা ভক্তি।" কিন্তু জগৎ এই লীলারহস্য বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না, দেখিয়াও যেন নয়ন মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছে; তাই আজিও জগৎ নূতন আদর্শের কল্পনা করিতেছে, নূতন যুগের স্বপ্ন দেখিতেছে। বর্ত্তমান আদর্শ যেন ইহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহাতেও সে নিজের কার্য্য স্থির করিতে পারিতেছে না। এখনও যেন তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় হয় নাই।

হে ভারত, তুমিও কি ঘরের জিনিসকে চিনিয়া লইবে না? এস ভাই, "যে শক্তির উন্মেষমাত্র দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্রের পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।" 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' তোমাদের জীবন তুচ্ছ ধন, মান, বিদ্যা ও যশের জন্য, ক্ষুদ্র পারি-বারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টায় বিনষ্ট করিও না। যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ গতানুগতিকের অনুসরণ না করিয়া, আপন আপন ভাব বুঝিয়া, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, যথার্থ শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হও। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঈশ্বরদর্শন ও ধর্ম্মসমন্বয় বাণী সফল হউক!

এস ভাই, আর বিলম্ব করিও না; আপনাকে চিনিয়া লও, আপ-নাকে বিশ্বাস কর। "আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক" এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এই আত্মপ্রত্যয়—এই শ্রদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বঙ্গীয় যুবকগণের মুখ চাহিয়া বড় আশায় বলিয়াছিলেন,—

"বীর হও; শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে। আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই

কার্য্যেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদূর বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখনও ভাবি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোনও দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত,—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইও না; কারণ, মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে। আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিবে। কোন কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হইলে এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব—

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভের উপায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর).

(স্বামী বিবেকানন্দ)

এদেশে (আমেরিকায়) আমার জনৈক মরমন (Mormon) ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি আমাকে তাঁহার মতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি, বলিয়াছিলাম, "আপনার মতের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে আমরা একমত নহি। আমি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং আপনি বহু বিবাহের পক্ষপাতী, ভাল কথা, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন?" ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি রকম, আপনি বিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নহেন আর আমি বহু বিবাহের পক্ষপাতী, তথাপি আপনি আমাকে আপনাদের দেশে যাইতে বলিতেছেন!" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার দেশবাসী সকল প্রকার ধর্ম্মমতই শুনিয়া থাকেন—তাহা যে দেশ হইতেই আসুক না কেন আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান; কারণ প্রথমতঃ, আমি সম্প্রদায় সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ, তথায় এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান সম্প্রদায়গুলির উপর আদৌ সন্তুষ্ট নহেন, এবং এই হেতু তাঁহারা ধর্ম্মের কোন ধারই ধারেন না। সম্ভবতঃ তাহাদের কতকগুলি আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন।" সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, লোকের ধর্ম্মলাভ করিবার ততই বেশী সম্ভাবনা থাকিবে। যে হোটেলে সব রকম খাবার পাওয়া যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়সংখ্যা বাড়িয়া যাক্, তাহা হইলে লোকের ধর্ম্মজীবনলাভের সুবিধা হইবে। আপনি ইহা মনে করিবেন না যে, লোকে ধর্ম্ম চায় না। আমি

তাহা বিশ্বাস করি না। তাহারা যেটী চায় প্রচারকেরা ঠিক সেটী দিতে পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা ঐ রকম একটা কিছু বলিয়া ছাপমারা হইয়া গিয়াছে, তাহারও যদি এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাহাকে ঠিক তাঁহার মনের মতন আদর্শটী দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে হয়ত সমাজের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। আমরা বরাবর যে ভাবে খাইতে অভ্যস্ত সেই ভাবেই খাইতে পারি। দেখুন না, আমরা হিন্দু আমরা হাত দিয়া খাইয়া থাকি। আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আঙ্গুল 'খেলে' বেশী, আপনারা ঠিক ঐরূপে ইচ্ছামত আঙ্গুল নাড়িতে পারেন না। শুধু খাবার দিলেই হইল না, আপনাকে উহা নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ শুধু যে কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব দিলেই হইল তাহা নহে, সেগুলি এরূপ ভাবে দিতে হইবে যাহাতে আপনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন। সেগুলি যদি আপনার নিজের ভাষায়—আপনার প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়, তবেই আপনি উহাতে খুসী হইবেন। আমার নিজের ভাষায় কথা কহেন, এমন কোন ব্যক্তি আসিয়া আমি বুঝিতে পারি এরূপ ভাবে আমাকে তত্ত্বোপদেশ দিলে আমি তৎক্ষণাৎ উহা বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মত উহা ধারণা করিতে সমর্থ হই—ইহা অতি সত্য ঘটনা।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তরের এবং প্রকৃতির মানবমন রহিয়াছে এবং ধর্ম্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত রহিয়াছে। এক ব্যক্তি দু তিনটী মত বাহির করিয়া বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্ম সকল লোকের উপযোগী হওয়া উচিত। তিনি একটী ছোট খাঁচা হাতে লইয়া এই জগৎরূপ ভগবানের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর, হস্তী, এবং সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হস্তীটীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ইহার মধ্যে ঢুকাইতে হইবে।" আবার, হয়ত এমন এক সম্প্রদায় আছে যাদের মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল ভাব

আছে। তাঁহারা বলেন, "সকলেই আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হউক!" "কিন্তু সকলের ত স্থান হইতেছে না?" "কুছ পরোয়া নেই! তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন করিয়া পার ঢোকাও।" "আর তাহারা যদি না আসে?" "তাহারা নিশ্চিত উৎসন্ন যাইবে।" আমি এমন কোন প্রচারক বা সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না যাঁহারা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখেন, "আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথা শুনে না, ইহার কারণ কি?" ইহা না করিয়া তাঁহারা কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, "লোকগুলো ভারি পাজি।" তাঁহারা একবার জিজ্ঞাসাও করেন না, "কেন লোকে আমার কথার কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে ধর্ম্মের সত্যসকল দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আমি তাহাদের মাতৃভাষায় কথা কহিতেছি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সমর্থ হইতেছি না?" বাস্তবিকই তাঁহাদের আরও ভাল করিয়া জানা উচিত, এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে লোকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না, তখন যদি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় ত তাঁহাদের নিজেদের গালাগালি দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল সময়ে উহা লোকদেরই দোষ! তাঁহারা কখনও তাঁহাদের সম্প্রদায়কে বড় করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করেন না।

সুতরাং কেন যে এত সঙ্কীর্ণতা রহিয়াছে তাহার কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—অংশ আপনাকে পূর্ণ বলিয়া সর্ব্বদা দাবী করিতেছে; ক্ষুদ্র—সসীম বস্তু আপনাকে অসীম বলিয়া সর্ব্বদা জাহির করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কথা একবার ভাবিয়া দেখুন—মাত্র, কয়েক শতাব্দী হইল ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে তাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহারা আবার কিনা ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্তই জানিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আস্পর্দ্ধা করে! কতদূর আস্পর্দ্ধা একবার দেখুন! মানুষ যে কতদূর আত্মম্ভরী হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। আর এই প্রকার দাবী যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই এবং প্রভুর কৃপায় উহা

চিরকালই ব্যর্থ হইবে। এই বিষয়ে মুসলমানেরা সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইয়াছিল—এক হস্তে কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি ; "হয় মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ কর নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর—আর দ্বিতীয় উপায় নাই!" ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন তাহাদের কি ভয়ানক উন্নতি হইয়াছিল—ছয়শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিল যখন তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে হইয়াছিল। অপর কোন ধর্ম্মও যদি ঐরূপ করে তবে তাহাদিগেরও ঐ দশা হইবে। আমরা এই প্রকার শিশুই বটে! আমরা মানবপ্রকৃতির কথা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবনপ্রভাতে আমরা মনে করি যে, আমাদের অদৃষ্ট কি এক অসাধারণ রকমে গড়িয়া উঠিবে এবং আমাদের এই বিশ্বাস কিছুতেই দূর করিতে পারে না। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় আমাদের চিন্তা অন্যরূপ দাঁড়ায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রথমাবস্থায়, যখন তাহারা একটু বিস্তৃতি লাভ করে তখন তাহারা মনে করে, কয়েক বৎসরেই সমুদয় মানবজাতির মন বদলাইয়া দিবে এবং বলপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইবার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণবধ করিতে থাকে। পরে যখন তাহারা অকৃতকার্য্য হয় তখন তাহাদের চক্ষু খুলিতে থাকে। দেখা যায়, ইহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক। একবার ভাবিয়া দেখুন যদি এই গোঁড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটী সমুদয় পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িত তাহা হইলে আজ মানুষের দশা কি হইত! প্রভুকে ধন্যবাদ, যে তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী মহান্ সত্যকে দেখাইয়া দিতেছে ; প্রত্যেক ধর্ম্মই কোন একটী বিশেষ সারবস্তুকে—যাহা তাহার প্রাণ বা আত্মাস্বরূপ—তাহাকেই ধরিয়া রহিয়াছে। আমার একটী পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে :—কতকগুলি রাক্ষস ছিল ; তাহারা মানুষ মারিত এবং

নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করিত। কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মারিতে পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া বাহির করিল যে তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখীর মধ্যে রহিয়াছে এবং যতক্ষণ ঐ পাখীগুলি নিরাপদে থাকিবে ততক্ষণ কেহই তাহাদের মারিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক একটী প্রাণ-পক্ষী আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তুটী রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের একটী আদর্শ, একটী উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যেটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যই এইরূপ এক একটী আদর্শ, এইরূপ এক একটী উদ্দেশ্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। আর যাহাই নষ্ট হউক না কেন, যতক্ষণ সেই আদর্শটী ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার বিনাশ নাই। সম্পদ্ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ্ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া থাকেন, কিছুই আপনার বিনাশসাধন করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেন, এমন কি শতায়ুঃ হইতে পারেন কিন্তু যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জ্বল এবং সতেজ থাকে তাহা হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্তু যখন সেই আদর্শ হারাইয়া যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে তখন আর কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্—সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এবং জাতি আর কি—ব্যষ্টির সমষ্টি বই ত নয়? সুতরাং প্রত্যেক জাতির একটী নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যেটী বিভিন্ন জাতিসমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যদি ঐ জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে এবং উহা অচিরেই অন্তর্হিত হইবে।

ধর্ম্মের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই সকল পুরাতন ধর্ম্ম যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে,

তাহারা নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। তাহাদের সমুদয় ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও, সমুদয় বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, সমুদয় বিবাদ বিসম্বাদ সত্ত্বেও, তাহাদের উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর আবর্জ্জনা-স্তূপ সঞ্চিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ডটী ঠিক আছে—উহা জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে—ধুক্ ধুক্ করিতেছে। উহারা যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে উহাদের একটীও তাহা বিস্মৃত হয় নাই। আর সেই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা কি আনন্দকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমানধর্ম্মের কথা ধরুন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ মুসলমানধর্ম্মকে যত অধিক ঘৃণা করেন এরূপ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মকেই করেন না। তাঁহারা মনে করেন এরূপ নিকৃষ্ট ধর্ম্মের আর কখনও অভ্যুদয় হয় নাই। কিন্তু দেখুন, যাই এক জন লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল, সমুদয় ইসলামীয়গণ তাহাকে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল! এরূপ আর কোন ধর্ম্ম করে না। যদি এক জন রেড-ইণ্ডিয়ান মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্রে ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং সে শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান হইলে রাজসরকারে যে কোন পদ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এদেশে আমি এ পর্য্যন্ত এমন একটীও গির্জ্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও কাফ্রি পাশাপাশি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটী একবার ভাবিয়া দেখুন যে ইসলামধর্ম্ম তদন্তর্গত ব্যক্তি সকলকে সমানচক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন, এইখানেই মুসলমানধর্ম্মের বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। কোরাণের অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়ৈকলক্ষ্য জীবনের কথা দেখিতে পাইবেন; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমানধর্ম্ম জগতে যে বার্ত্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে তাহা এই যথার্থ ভ্রাতৃভাব—যাহা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পরের প্রতি পোষণ করিয়া থাকে।

মুসলমানধর্ম্মের উহাই সারতত্ত্ব এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি আর আর বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা তাহা

মুসলমানধর্ম্মের নিজস্ব নহে; তাহারা অন্য ধর্ম্ম হইতে ঢুকিয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটী জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্ম্মে—পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম্মপুস্তকসমূহে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা এরূপভাবে আত্মার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আত্মা অপার্থিব বস্তু এবং এই অর্থে উহাতে কখনও মানবীয় ভাব আরোপ করা যায় না। সেই একত্বের ধারণা—সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি উক্তি হিন্দুদের নিকট প্রলাপোক্তি বই আর কিছুই নহে—উহা মনুষ্য কর্ত্তৃক ভগবানে মনুষ্যোচিত গুণাবলীর আরোপ মাত্র। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা এখনই এবং এইখানে বর্ত্তমান। অনন্তকালের একটী মুহূর্ত্ত যেরূপ অপর যে কোন মুহূর্ত্তও তাহাই। যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী তিনি এখনও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে কিছু উপলব্ধি হইলেই তবে ধর্ম্মের আরম্ভ হইল—কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিম্বা উহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা, অথবা প্রকাশ্যভাবে নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করা—ইহাদের কোনটীই ধর্ম্ম নহে। আপনি ঈশ্বর আছেন বলিতেছেন—"আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি?" যদি 'না' বলেন তবে আপনার তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার আছে? আর যদি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন না কেন? কেন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন না। ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটীই ভারতের মহান্ আদর্শ এবং ইহাদিগকে ধরিয়া আছে বলিয়াই তাহার এত ভুল ভ্রান্তিতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

খ্রীষ্টানদিগের প্রচারিত মূল ভাবটীও ইহাই—"সতর্ক থাক এবং

প্রার্থনা কর—কারণ, ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে”—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হয় নাই। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, খ্রীষ্টানগণ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন কাল হইতে, অতি কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমূহেও অপরকে সাহায্য করা, হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা আপনাদিগকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এই লক্ষ্যে স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবিত থাকিবে।

সম্প্রতি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ইহা স্বপ্নমাত্র। জানি না ইহা কখনও জগতে কার্য্যে পরিণত হইবে কি না। কিন্তু কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মরা অপেক্ষা কখন কখন স্বপ্ন দেখাও ভাল। বড় বড় সত্য, তাহা যদি স্বপ্নও হয়, তথাপি ভাল নিকৃষ্ট বাস্তব অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। অতএব একটা স্বপ্ন দেখা যাক্।—

আপনারা জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয় ত একজন বস্তুতান্ত্রিক সহজজ্ঞানে আস্থাবান্ যুক্তিবাদী; আপনি আচার অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত এমন সব বিষয়ে বিশ্বাস করিতে চান, যাহাতে কল্পনার একটুকু অবসর মাত্র নাই। আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনাস্থলে কোন প্রকার ছবি বা মূর্ত্তি রাখিতে দিবেন না। বেশ কথা! কিন্তু অপর এক প্রকার লোক আছেন, তিনি একটু বেশী শিল্পকলাপ্রিয়—ঈশ্বরোপাসনা করিতে গিয়াও তাঁহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন হয়; তিনি উহার ভিতর নানা সরল ও বক্ররেখা, বর্ণ, রূপ, প্রভৃতির সৌন্দর্য্য প্রবেশ করাইতে চান—তাঁহার পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজার সর্ব্বপ্রকার বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন। আপনি যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি বিচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি তাঁহাকে ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন। আর একপ্রকার

লোক আছেন, প্রেমিক—তাঁহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবানের পূজা এবং স্তবস্তুতি করা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন ভাব নাই। তাহার পর জ্ঞানী—তিনি এই সকলের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করেন এবং মনে করেন, "উহারা কি মূর্খ! ঈশ্বরের কি ক্ষুদ্র ধারণাই করিতেছে!"

তাঁহারা পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন কিন্তু এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। এই সকল বিভিন্ন মন—এই সকল বিভিন্ন সাধনা দরকার। যদি আদর্শ ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা উদার এবং বিস্তৃত হওয়া উচিত, যেন এই সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাইয়া দিতে পারে। উহাকে—জ্ঞানীকে দার্শনিক বিচারের দৃঢ়ভিত্তি, উপাসককে ভক্তের হৃদয়, আনুষ্ঠানিককে উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাব এবং কবিকে, সে যতদূর পারে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, এবং অন্যান্য প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভাব যোগাইবার উপযোগী হইতে হইবে। এইরূপ উদার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে হইলে, আমাদিগকে ধর্ম্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তাহাদের সকলকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব গ্রহণই (acceptance) আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত - বর্জ্জন নহে। কেবল পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা (toleration) নহে—উহা অনেক সময়ে নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। সুতরাং আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী। কেন আমি পরধর্ম্মসহিষ্ণু হইব? পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা বলিলে আমি বুঝি যে, কোন ধর্ম্মমত অন্যায় করিতেছে কিন্তু আমি দয়া করিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। তোমার আমার-মত লোক কাহাকেও দয়া করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এরূপ মনে করা কি ভগবানের নামে দোষারোপ করা নহে? আমি অতীতের ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকলের সহিতই পূজা করিব। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা

করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেই ভাবে তাঁহার আরাধনা করিব। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টান-দিগের গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও সংঘের শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া হিন্দুর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইব ও তাঁহার ন্যায়, সকলের হৃদয়কন্দর-উদ্ভাসিতকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট হইব।

শুধু ইহাই নহে. যাহারা পরে আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের পুস্তক কি সমাপ্ত হইয়াছে?—অথবা এখনও উহা ক্রমপ্রকাশ্য রহিয়াছে? জগতের এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ এক অদ্ভুত পুস্তক। বাইবেল, বেদ, কোরাণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ পুস্তকের এক একখানি পত্র, এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমার হৃদয় সেই সকলের জন্যও উন্মুক্ত থাকিবে। আমরা বর্ত্তমানে রহিয়াছি, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যতের ভাবরাশি গ্রহণ করিবার জন্যও আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিব, বর্ত্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিষ্যতেও যাহা উপস্থিত হইবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া রাখিব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্ত্তমানের মহাপুরুষদিগকে প্রণাম এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন তাঁহাদের সকলকে প্রণাম।

(সমাপ্ত)

বিল্লাইচণ্ডী ও মুসলমানের হিন্দুত্ব।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস)

কিছুদিন হইল উদ্বোধনের পাঠকপাঠিকাগণকে মীরাটের নৌচণ্ডী বা নবচণ্ডীর কথা বলিয়াছিলাম। আজ তাঁহাদের নিকট আর এক চণ্ডীদেবীর সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলাম। ইঁহার নাম বিলাই-চণ্ডী। এই দেবীর নামে ই, বি, রেললাইনের উপর একটি ষ্টেশন আছে, তাহা পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন হইতে ৫।০ মাইল উত্তরে এবং সৈদপুর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। শুনা যায়, বিলাইচণ্ডী হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে বিজন অরণ্যমধ্যে বিরাট-রাজের প্রাসাদ বিদ্যমান আছে।

ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে বিলাইচণ্ডীর স্থান। পূর্ব্বে বিরাট-রাজধানীর প্রবেশদ্বার এইখানে ছিল। তাহার নিদর্শন এখানকার ভগ্ন ইষ্টক ও মৃৎস্তূপ এবং শমীবৃক্ষ। শুনা যায়, এ দিকে যখন রেললাইন পাতা হয়, তখন স্থানীয় লোকদিগের আপত্তি সত্ত্বেও এখানকার প্রস্তর, প্রাচীর, দ্বার প্রভৃতি কতিপয় সাহেব কর্ত্তৃক নিঃশেষে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই এই স্থান মৃৎস্তূপে পরিণত, অরণ্যে পরিবৃত ও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। অরণ্যের চতুর্দ্দিক এক্ষণে পরিষ্কৃত হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে শোভিত হইলেও মূল ভিটা ময়নাকাঁটার ক্ষুদ্র জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ভিটার একাংশে ঈষদুন্নত মৃৎস্তূপের উপর একটি নাতিবিস্তৃত ঘনপত্র শমীবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। তাহার সন্নিহিত উচ্চতর মৃৎস্তূপের উপর মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত বংশনির্ম্মিত এক খানি প্রশস্ত কুটীর। অল্পদিন হইল জনৈক সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমস্বরূপ উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর এক সন্ন্যাসী এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের

সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী আছে। এদিকে হিন্দুর সংখ্যা অল্প। সন্ন্যাসীর এই বনাশ্রমের অদূরে একটি অরণ্য আজিও বিদ্যমান আছে। তথায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে ময়ুর, হরিণ প্রভৃতি দলে দলে বিচরণ করিত, কিন্তু শিকারীর সন্তোষবিধান ও রসনার তৃপ্তিসাধনার্থ নয়নাভিরাম জীবকুলের স্বচ্ছন্দ-বিহার ও নৃত্যগীত চিরবিরাম লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জনৈক মুসলমান "বাহে" বলিল, এখানে বহুকাল হইতে "মাদারের বাঘ" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ পীরের রক্ষিত ব্যাঘ্র আছে, সেইটি মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না, কেহ তাহাকে মারিতেও পারে না। যাহা হউক এই ব্যাঘ্রভয়ে কেহ এস্থানে সন্ধ্যার পর আর থাকে না। কিন্তু দিবাভাগে মধ্যে মধ্যে দূর দূরান্তর হইতে হিন্দু নরনারী এবং সময়ে সময়ে মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষটি দেখিতে আসেন। লোকের বিশ্বাস উহা সেই শমীবৃক্ষ যাহাতে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস-কালে গাণ্ডীবাদি দৈবাস্ত্রসমূহ লুকাইয়া রাখিয়া ছদ্মবেশে বিরাটরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্থানীয় মুসলমান ও অশিক্ষিত হিন্দুগণ ইহাকে "অচিনা গাছ" বলিয়া থাকে। ইহার কাণ্ডাংশ অনেকটা বটের ঝুরী-হীন কাণ্ডের মত। শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও ঘনপত্র। সোঁদাল পাতা একটু কম চওড়া ও বেশী পুরু হইলে যেমন হইত এই গাছের পাতাও অনেকটা সেইরূপ। বৃক্ষতল গাঁদাফুলের গাছে বেষ্টিত করা হইয়াছে, এবং বৃক্ষের কাণ্ড-ত্বকে কোন কোন দর্শক স্ব স্ব নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই বৃক্ষতলে বিলাইচণ্ডীর অধিষ্ঠান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এখানে কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুনা গেল, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীঠাকুর শীঘ্রই চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মূর্ত্তি গঠন করিতে দেওয়া হইয়াছে।

দেবীপুরাণে ইঁহার উল্লেখ নাই। পুরাণ-সমুদ্র মন্থন করিলে বিলাইচণ্ডীর উদ্ভব হয় কি না বলা কঠিন। কিন্তু যে দেবী সর্ব্ব-ভূতেই মাতৃরূপেও শক্তিরূপে সংস্থিতা, আমরা যাঁহার "প্রতিমা

গড়ি মন্দিরে মন্দিরে," সেই স্থপাতীতা কালাতীতার মূর্ত্তি যদি আজ এই পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাতে পৌরাণিক সংস্কার ক্ষুণ্ণ হয় না। মহাভারতের কাল আজিও মীমাংসার স্থল হইয়া থাকিলেও অর্জ্জুনাদির শমীবৃক্ষে অস্ত্ররক্ষা ঘটিত ব্যাপার যে শত শত বৎসরের কাহিনী তাহাতে কাহারও সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবস্পর্শপূত শমীবৃক্ষ বলিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। কারণ, বৃক্ষটি একশত বৎসরের হইবে কিনা সন্দেহ। ইহার পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র অচিনা গাছ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইটি ব্যতীত এই জঙ্গলের মধ্যে এই জাতীয় বৃক্ষ আর নাই। ইহার শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হয়, ফল হয় না। যদি এই বৃক্ষ সেই পৌরাণিক বৃক্ষের বীজ হইতে জাত বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং সেই যুক্তিতে ইহার পবিত্রতা এবং পূর্ব্ব সংস্কার রক্ষা করিবার প্রয়াস হয়, তাহা হইলে প্রথমেই ইহার শমীত্বের প্রমাণ আবশ্যক। ইহা যে শমীবৃক্ষ তাহা উদ্ভিদ্বেত্তাগণের এবং এই স্থান যে বিরাটরাজ্যের প্রবেশ দ্বার ছিল তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। তাহা হইলে এবং দেশশুদ্ধ লোকের মুখে শোনা এই অচিনা গাছকে বেশ চিনাইয়া দিলে, হয় বহুদিনের ভ্রম দূর হইবে, না হয় বহুদিনের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া স্থানের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইবে এবং এক্ষণে যথায় দুই দশজন কৌতূহলীর আগমন হইতেছে, সেই ধান্যক্ষেত্র ও সর্ব্বত্র জলাবিলপরিবৃতা বিলভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিলাইচণ্ডীর তলা সহস্র সহস্র নরনারীর মহাতীর্থে পরিণত হইবে। আমরা শুনিলাম, অনেকে ঔষধার্থে এই বৃক্ষের পাতার রস খায়। কিন্তু কি রোগে ইহা সেব্য, আমাদের সংবাদদাতা 'বাহে' তাহা বলিতে পারিল না। সুতরাং আমরা এই বৃক্ষের পত্র "ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্লাণ্টস্" (Indian Medicinal Plants) * নামক বিরাট্ গ্রন্থের

* Indian Medicinal Plants (containing botanical descriptions, names in the principal vernaculars, properties and uses of over

অন্যতম সম্পাদক স্বনামপ্রসিদ্ধ মেজর বি, ডি, বসু, এম্ ডি, আই, এম, এস মহাশয়কে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলাম। * শমী আমাদের দেশের সাধারণ সাঁই গাছ। অভিধানে শমি বা শমী বাবলাজাতীয় বৃক্ষ, যাহার কাষ্ঠ যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হয়। শমীবৃক্ষের আর এক নাম 'অগ্নিগর্ভা'। কারণ অগ্নি এই বৃক্ষের মধ্যে লুকাইত ছিল। এই অগ্নি পাণ্ডবদিগের দ্বারা লুক্কাইত অস্ত্রাগ্নি বলিয়াই বোধ হয়, কারণ অল্পাধিক পরিমাণে সকল বৃক্ষই অগ্নিগর্ভ।

চণ্ডীতলা হইতে এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে। এই স্থান বহুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রসমূহ পরিবৃত একটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই গ্রামও বিলাইচণ্ডী নামে খ্যাত। 'ষ্টেশন হইতে শমীবৃক্ষ দেখিয়া এখানে আসিতে হইলে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয় কিন্তু সোজা ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে 'বুড়ীর হাট' নামক ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া এখানে আসিতে প্রায় এক মাইল পথ চলিতে হয়। ইহার পর লক্ষ্মণপুর নামক গ্রাম। লক্ষ্মণপুরেও হাট বসে। ষ্টেশন হইতে এই সকল গ্রামে যাইবার জন্য ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যে পথ আছে তাহাতে গোযানের চলাচল আছে। কিন্তু বর্ষায় তাহাতে পদব্রজে গমন করাও দুঃসাধ্য। চারি পাঁচ ঘর হিন্দু ব্যতীত এখানে সমস্তই মুসলমানের বাস। গ্রামের জমীদার হিন্দু, যে কয় ঘর হিন্দুর উল্লেখ করা হইল শেখ খেরকেটু তাহাদের অন্যতম। ইহার স্ত্রী চয়নবিবি এবং কন্যা খয়রউন্নিসা ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই।

1,300 Indian plants and used in medicines by the Medical Profession all over the world) by the late Lieut. Col. R. A. Kirtikar, F.L.S., I.M.S. (Retd.), Major B. D. Basu, I.M.S. (Retd.), and an I.C.S. (Retd.). Price 250 Rupees only. Panini Office, Bhuvaneswari Asrama, Bahadurganj, Allahabad.

* এই প্রবন্ধ লেখার পর মেজর বসুর পত্র পাইয়াছি। তিনি জানাইয়াছেন যে উহা শমী বৃক্ষ নহে।

চতুর্দ্দিকে মুসলমান দেখিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কয় ঘর হিন্দুর বাস, শেখ খেরকেটু বলিল, "আমরা চার পাঁচ ঘর মাত্র হিন্দু এখানে বাস করি।" ইহার বাড়ীর উত্তরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাস এবং দক্ষিণে কনিষ্ঠভ্রাতার বাড়ী। সহোদরদ্বয় ইঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে. এবং শত্রুতা করিতেও ছাড়ে নাই। এ গ্রামে ইহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের বাস। তাহার পূর্ব্বের সংবাদ ইহার জানা নাই। প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দর্শনীয় কিছুই ছিল না, কিন্তু ১৩১৯ সাল হইতে শেখ খেরকেটু সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং স্বীয় আচরণ অনুষ্ঠানে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সাধারণের কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়াছে। শেখগৃহ হিন্দুর তীর্থে পরিণত হইতে চলিয়াছে। হিন্দু নরনারী ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে আসিয়া পূজা দিয়া মানত করিয়া দোলদুর্গোৎসব ও রাসপর্ব্বাদিতে যোগ দান করিয়া যায়। রোগযন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভের জন্য, মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভের আশায় লোক ইহার আশ্রয়গ্রহণ করে। ইনি শিবের নিকট, কালীর নিকট, মহিষমর্দ্দিনীর নিকট, হরির নিকট—ইহার প্রতিষ্ঠিত সকল দেবতার নিকট তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করেন। দেবমূর্ত্তি ও গোব্রাহ্মণের প্রতি এই পরিবারের অচলা ভক্তি দর্শনে হিন্দুমাত্রেই মুগ্ধ; শেখ খেরকেটু এক্ষণে শ্রীপ্রেমহরি দাস এবং তদীয় কন্যা মুসম্মাৎ খয়রুন্নিসা এক্ষণে শ্রীমতী প্রেমহরি দাসী নামে পরিচিত। গৃহিণী চয়নবিবির নামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ইহারা তিন জনেই আচারনিষ্ঠ, নিরামিষভোজী,—মুসলমানের খাদ্য ইহাদের ত্রিসীমানার মধ্যে আসিতে পায় না। ইহারা পলাণ্ডু পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। সময়ে সময়ে শিক্ষিত হিন্দুগণ এখানে আসিয়া দেবালয়প্রাঙ্গণে রন্ধনাদি করিয়া অন্নভোজন করত ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। স্থানীয় মুসলমানদিগের ও জ্ঞাতিবর্গের বিবিধ উৎপীড়ন ও ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও ইহারা বিচলিত হয় নাই। ইহাদের সম্বন্ধে বহু কৌতুহলজনক সংবাদ পাইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনার্থ আমরা এই মুসলমান-হিন্দু পরিবার

ও দেবালয় দর্শনে গমন করি। আমরা বিলাইচণ্ডী ষ্টেশনে নামিয়া প্রথমেই এই যবন হরিদাসের গৃহে উপস্থিত হই।

কয়েকদিন পূর্ব্বে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে খেরকেটুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সুতরাং দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া সে মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। খেরকেটুর প্রৌঢ় বয়স, দেহ কৃশ, গলায় তুলসীর মালা—মালার মধ্যে ফকীরদিগের গলায় পাথর বা কাচের যেরূপ মালা থাকে তাহারও দুইটি দানা, কপালে শ্বেত চন্দনের চিহ্ন—পরিধানে ধুতী, ঊর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন। আমরা দেবালয়ের সম্মুখে কিছু দূরে একটি চালার নীচে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে খেরকেটুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহার নিকট একখানি খাতা আছে, তাহাতে দেখিলাম হরিদ্বার পাতঞ্জল আশ্রমের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গঙ্গানন্দ স্বামিজী মহারাজ, সৈদপুর নিবাসী বাবু কেদারনাথ ঘোষ, দার্জ্জিলিংয়ের বসু এণ্ড বসু কোম্পানীর বাবু খগেন্দ্রকুমার বসু, পার্ব্বতীপুরের (অধুনা শালিখা নিবাসী) অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার ব্রজনাথ মিত্র, কাটিহারের মেডিক্যাল অফিসর বাবু অঘোরনাথ ঘোষ, এল, এম, এস এবং আরও ৬০।৬৫ জনের নাম স্বাক্ষরিত দেখিলাম। ইহাদের অনেকেই অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। একজন মাড়বারী ভদ্রলোকের স্বাক্ষর দেখিলাম। ইনি সৈদপুরের মহাজন অর্জ্জুনদাস আগরওয়াল্। গত হরিপূজার সময় চারিজন খ্রীষ্টান, তন্মধ্যে দুইজন রেল বিভাগের সাহেব, আসিয়া কিছু কিছু চাঁদা দিয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম, দিনাজপুর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব ঠাকুর দেখিতে আসেন। ইনি একবার ঠাকুরের ভোগের জন্য একশত ফজলী আম দিয়াছিলেন। ভোগের সামগ্রীর বা প্রেমহরিদাসের অর্থের অভাব হইলে এই দয়ালু সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহা পূরণ করিয়া দেন। আমরা আলাপ করিতেছি এমন সময় শেখকন্যা শ্রীমতী প্রেমহরি দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিধানে সাড়ী মাত্র, মাথার চুল পশ্চাতে জড়ান—বিউনি করা হয় নাই, মধ্যমাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যাম-

বর্ণা, পুষ্টাঙ্গী ও পূর্ণযৌবনা, প্রায় ষোড়শী কিন্তু কুমারী, মুখশ্রী গম্ভীর, দৃষ্টি স্থির, নেত্রদ্বয় সারল্যপূর্ণ, স্বল্পভাষিণী, বনহরিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দগতি কিন্তু ধীর ও বিনয়নম্রা। হরিদাসী আসিয়া পিতার ইঙ্গিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অভিবাদন করিল। তাহাকে যে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলাম সংযতভাবে তাহার উত্তর দান করিয়া প্রস্থান করিল। আমরা তাহার পূর্ব্বনাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল "পূর্ব্বে আমার নাম ছিল খয়রূউন্নিসা, এখন হইয়াছে প্রেমহরিদাসী"। হরিদাসীকে দেখিলে কখন যে তাহার নাম খয়রূউন্নিসা ছিল তাহা মনেই হয় না। উপযুক্ত হিন্দুপাত্র অর্থাৎ যে দেবসেবা বজায় রাখিতে পারিবে এরূপ হিন্দুর সন্তান পাইলে পিতা কুমারীর বিবাহ দিতে সম্মত।

বেলা একটা বাজিল। ভোগের আয়োজন জন্য প্রেমহরিদাস উঠিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। বেড়া দিয়া ঘেরা খানিকটা জমির মধ্যে কয়েকখানি চালাঘরে মাচার উপর দেবমূর্ত্তিসকল স্থাপিত। ভিতরে যাইতেই বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেবতার নাম করিতে বলায় প্রেমহরিদাস বলিয়া যাইতে লাগিলেন "প্রথম চালার মধ্যে জগন্নাথদেবের রথ ও ইন্দ্রসভা, যমসভা, নরসিংহ অবতার, বিষ্ণু অবতার। পরবর্ত্তী চালার নীচে ও মাচার উপর সাজান রামসীতার রাজ্যাভিষেক, বিষেভদ্রা (বিষ্ণুভদ্রা), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মূর্ত্তি, গৌর, নিতাই ও রাধা, জগন্নাথ, বলদেব, লক্ষ্মী, জন্মাষ্টমী (বসুদেবের কোলে কৃষ্ণ, মাথার উপর এক সর্প ফণা ধরিয়া আছে); তৃতীয় চালায় মাচার উপর বৃহৎ শিবমূর্ত্তি, মূর্ত্তির সম্মুখে দুই ঋষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি; মহাদেবের বাম দিকে চতুর্থ চালা ঘরে দশভূজার মূর্ত্তি; পঞ্চম চালাঘরে বাসন্তী মূর্ত্তি, ষষ্ঠ চালার নীচে মাচার উপর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি।" আমরা শুক্রবার গিয়াছিলাম। শুনিলাম আগামী রবিবার জগদ্ধাত্রী ও সীতেশ্বরী কালী (?), এই গৃহের একাংশে স্থান পাইবেন। মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে। সপ্তম চালার মধ্যে কৃষ্ণকালী, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে জটিলা ও পদতলে রাধা, পার্শ্বে স্বতন্ত্র মঞ্চে বসন দড়ি য়া

(চণ্ডীর ভগ্নী. শীতলা); অষ্টম চালাগৃহে গঙ্গাদেবী, মনসা ঠাকুরাণী, বুড়ী ঠাকুরাণী (চণ্ডী), ও মশান ঠাকুর (চণ্ডীর পুত্র ওলাউঠা ঠাকুর)। ঘরগুলি বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত। সমুদয় মূর্ত্তিই মৃণ্ময়। বর্ষার জলে, এবং করতোয়া নদীতে বন্যা আসিয়া এস্থান জলমগ্ন হইলে মাটি গলিয়া রং উঠিয়া মূর্ত্তিগুলি অল্লাধিক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। মহাদেব যোগাসনে বসিয়া আছেন, নয়নদ্বয় কিন্তু বিস্ফারিত। জল লাগিয়া রং অনেক উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই উন্নতদেহ বিরাট্ মূর্ত্তিই এখানকার প্রধান দর্শনীয়। শুনিলাম, শিবস্থাপনাই এখানে প্রথম এবং অনাদিলিঙ্গ শিলামূর্ত্তি কত প্রাচীনকাল হইতে এখানে ছিল কেহ বলিতে পারে না। সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হয় কিন্তু এই শূন্যস্থান বহুকাল হইতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। এক্ষণে ঠিক সেইস্থানে মৃণ্ময়মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে একটির পর একটি করিয়া হিন্দুর যাবতীয় দেবকুল এখানে স্থান পাইতেছেন। মূর্ত্তিগুলি দেখা হইলে একটি কৌপীনপরিহিত হিন্দু ধীবরকে কলাপাতের টুকরায় প্রত্যেক মঞ্চের সম্মুখে ভোগ সাজাইয়া দিতে বলিয়া প্রেমহরিদাস নিজে একটি কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে প্রত্যেক দেবতার আগে দাঁড়াইতে লাগিলেন। ভোগের সামগ্রী মাত্র গুড়মাখা খই। কিছুক্ষণ কাঁসর বাজাইবার পর যবন হরিদাস মহাদেবের অগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যুক্তহস্তে বসিয়া মানসিক পূজা ও প্রার্থনা করিলেন।

প্রেমহরিদাসী পূজা ও সন্ধ্যারতি করিয়া থাকে। পিতা ভোগ দেয়। চয়ন বিবির দেবসেবায় অধিকার নাই। শেখ খেরকেটুর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া—তাহাদের ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে খেরকেটু এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করে—"আমি গত ১৩১৯ সালে স্বপ্নাদেশ জানিয়া নিম্নলিখিত দেবতাদিগের পূজা করিতে অধিকারী হইয়াছি। আশা করি, হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমার সহায়তায় বিমুখ হইবেন না। আমি প্রথমে

মহাদেব সন্ন্যাস ঠাকুরের পূজায় ব্রতী হই, পরে শক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি, • যথা—ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, কালী, কৃষ্ণকালী, গঙ্গাদেবী, মনসা ঠাকুরাণী, বুড়ী ঠাকুরাণী, বসন বড়ুয়া, মশান ঠাকুর। বর্ত্তমানে বাসন্তী দেবীকে স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এই জন্য হিন্দু ভ্রাতৃগণের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করি। মহাদেব ঠাকুরের দর্শন হইলে পর জন্মাষ্টমী মূর্ত্তি, রাম সীতার রাজ্যাভিষেক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গৌরনিতাই ও দোললীলা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি। বাদশাহী আমলে বাধ্য হইয়াই হউক "অথবা লোভে পড়িয়াই হউক আমার পূর্ব্ববংশ নবীর দীন মানিয়া চলিলেও আমি পৌত্তলিক ধর্ম্ম মানিব, কেন না আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও দেশান্তরিত হন নাই। * * * হিন্দুস্থানের গৌরব রক্ষার জন্য আমি বৈদিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পূজা-পার্ব্বণ করিব।" পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গঙ্গানন্দ স্বামীজি মহারাজ প্রমুখ কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যবন হরিদাসের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া লিখিয়াছেন—"মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে এই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিল, কিন্তু মুসলমান রাজার পীড়নে বা লোভে যে কারণেই হউক, মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছিল, সম্প্রতি এই ব্যক্তি দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রীতিমত 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' করিতে ইচ্ছা করে ও যথাসম্ভব করিয়া থাকে। ইহাতে সকল হিন্দু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ইহার আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।"

আমরা খেরকেটুর মুখে শুনিলাম, যে ভূখণ্ডের উপর বর্ত্তমান দেবমূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহার নিম্নদেশে—বহু নিম্নে প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী আছে। সেই পাতালপুরী অসংখ্য দেব দেবীতে পূর্ণ। এক দিন স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমীদার শিবেন্দ্র বাবু, তাহার ভ্রাতা বিজয় বাবু, জনৈক ক্ষত্রী এবং শেখ খেরকেটু রাত্রিযোগে একই সময় স্বপ্ন দেখেন যে ইঁহারা এই পাতালপুরীতে দেবতাদিগের মধ্যে নীত হইয়াছেন। শিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে এই সকল

দেবতার পূজা ও নিয়মিত সেবা করিতে পারিবে?" এতগুলি দেবতার পূজা ও রীতিমত সেবা করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অপর তিন জন পশ্চাৎপদ হইলে যবন হরিদাস বলিলেন "আপনি যদি ভরসা দেন তাহা হইলে, আমি মুসলমান হই আর যাই হই, আপনার প্রসাদে সকল ভার লইতে পারি।" তখন মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দেবসেবার ভার ইহারই উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহার কন্যাকে কুমারী রাখিবার কারণ এই যে, কন্যাটির ৭ বৎসর বয়সে একবার জ্বর হয় এবং তাহাতে আট দিন পর্য্যন্ত তাহার অন্ন বন্ধ ছিল। নবম দিনের রাত্রি দশটার সময় জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়। সকলেই কন্যাটি মৃত জানিয়া আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু সেই সময় তন্দ্রাবেশে জ্যোতির্ম্ময় শিবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলেন "তুমি আমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আমার সেবা কর, নিত্য ভোগ দাও, কন্যা ভাল হইবে, কিন্তু যদি তাহার বিবাহ দাও তাহা হইলে মুসলমানের সঙ্গে নহে, হিন্দুমতে ও হিন্দুর সহিত।" বলা বাহুল্য শিবের আদেশ পালিত হয় ও কন্যা অচিরে পুনর্জ্জীবিত হয়। পিতা ও কন্যা প্রায়ই স্বপ্নে দেবতাদের আদেশ প্রাপ্ত হয়—তাহাদের অলৌকিক রূপ-মাধুরী ও লীলা দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়। এই পরিবারের বিনীত ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই তৃপ্ত হয়, কিন্তু ইহাদের প্রতি স্থানীয় মুসলমানসমাজ খড়্গহস্ত। বিদ্বেষের বহ্নি পূর্ব্ববৎ তীব্র না থাকিলেও আজও লুপ্ত হয় নাই। তাহার ফলে হবি প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান পিতাকে আক্রমণ ও প্রহার করিয়া কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। তৎপূর্ব্বে হিমাতুল্লা মণ্ডল উক্ত হবির পুত্র নজরের সহিত খেরকেটুর কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে খেরকেটু তাহাতে স্বীকৃত হয় না। প্রস্তাব ব্যর্থ হইল দেখিয়া এবং মুসলমানের হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা বলপূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া গিয়া নজরের সহিত বিবাহ দিবার চেষ্টা করে। মোকদ্দমায় অপরাধীদিগের কারাদণ্ড হয়। প্রতি-বাদীপক্ষ বলে ইতিপূর্ব্বে নজরের সহিত খয়রুউন্নিসার যথাবিধি বিবাহ

হইয়াছিল কিন্তু কন্যার পিতা কন্যাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া গিয়াছিল। দিনাজপুর সেশন আদালতে আপীল হইলে পিতা ও কন্যা বিবাহ অস্বীকার করে। কন্যার-এজাহার শ্রবণকালে তাহার অধরে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া এবং অনর্গল উক্তির পারিপাট্য লক্ষ্য করিয়া জজ বাহাদুর তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, অধিকন্তু পুলিসের ডাইরী— যাহার সাহায্যে কন্যাপক্ষেরও মোকদ্দমার অনেকটা কিনারা হইতে পারিত— কোন অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য হওয়ায়: যথেষ্ট প্রমাণাভাবে দণ্ডিত অপরাধীরা নিষ্কৃতি লাভ করে। কন্যাকে দেখিলে, তাহার যে বিবাহ হইয়াছিল, ইহা মনে করিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিলাম, প্রেম হরিদাসের গৃহে বিবিধ দেবদেবী পূজা প্রাপ্ত হইলেও শিবই তাহার প্রধান উপাস্য। হরিদাস নাম হইলেও অন্তরে তিনি পূর্ণ শিবদাস। কিন্তু হরের আর হরে যখন প্রভেদ নাই তখন হরিদাস বলিতে আপত্তি কি? দেখিলাম যত কিছু প্রার্থনা, যত মানত, যাত্রীদিগের জন্য মঙ্গল কামনা অর্থাৎ তাহার আবেদন ও নিবেদন সমস্তই শিবের সম্মুখে এবং তাঁহারই চরণে।

কৃষ্ণকালী মূর্ত্তি জলে ভিজিয়া অনেকটা বিরূপ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম করতোয়ায় বন্যা আসিয়া এই সকল স্থান জলপ্লাবিত হয়। সেই জলে এই মূর্ত্তি ও গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বিসর্জ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু তিন দিন পরে মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। তখন খেরুকেটু প্রবল জ্বরে অভিভূত ছিল। মঙ্গলবার প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়। বুধবার জ্বর হয় এবং বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বপ্ন হয়। স্বপ্নে মহাদেব বলেন, "প্রতিমা জলে দিলি কেন? কৃষ্ণকে জলে দিতে নাই। গলিয়া বা চূর্ণ হইয়া গেলেও বিসর্জ্জন করিতে নাই। তুই একখানা ঠাকুরও জলে দিবি না প্রতি বৎসর নূতন মৃণ্ময় মূর্ত্তি গড়াইবি ও পুরাতনগুলি রাখিয়া দিবি। স্বপ্নাদেশ পাইয়া খেরকেটু প্রভাত হইতেই কৃষ্ণকালী ও গঙ্গাদেবীকে তুলিতে গিয়া দেখিল মূর্ত্তি জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কোথা হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ সাঁতার দিয়া প্রতিমা লইয়া আসিতেছে এবং এক বৃদ্ধ লাঠি

ধরিয়া জল ভাঙ্গিয়া সঙ্গে আসিতেছে। খেঁরকেটু বৃদ্ধাকে বিনা ভেলা বা ডোঙ্গায় সেই জলরাশি ভেদ করিয়া আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "সে খবরে তোমার প্রয়োজন নাই, তুমি আর প্রতিমা ভাসাইও না।" ঠাকুর ঘরে তুলিয়া খেঁরকেটু ফিরিয়া দেখিল কেহই তথায় নাই। তাঁহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। তদবধি যবন হরিদাসের গৃহে হিন্দুর দেবপ্রতিমাগুলি ক্রমাগত সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে, প্রতিবৎসর নূতন নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে এবং সকলেই এই ভক্ত পিতা ও কন্যার সেবায় তৃপ্ত হইতেছেন।

এখানকার দেবতাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ শুনিলাম। কিছুদিন হইল লক্ষণপুরের জনৈক মুসলমান হিম্মতুল্লা গণেশ ঠাকুরের কাপড় চুরি করিয়া লইয়া যায়। সেই দিনই তাহাকে বাঘে খায়। তাহার পরিবার ও বংশধরেরা পরে ভিটা-ছাড়া হয়। আমরা যাইবার দুইদিন পূর্ব্বে মোহন নামক এক হিন্দুস্থানীর ছেলেকে ভূতে ধরে এবং তাহার উৎকট প্রমেহ রোগ হয়। মোহন এক ছড়া কলা, পাঁচ ছিলিম গাঁজা, ও আধসের মুড়কী ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দেয়। পরদিন তাহার পুত্র আরোগ্য লাভ করে। আর একদিন এক মুসলমান স্ত্রীলোক, নাম ফেলানী বিবি, মহিষমর্দ্দিনীকে নিবেদিত নারিকেল চুরী করিয়া খায়। সে পাঁচ ছয় দিনের জ্বরে ও চুরির তিন দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোকদ্দমা মামলা হইলে অনেকে এখানে আসিয়া পূজা দেয় এবং দেবতাস্থানে মানত করিয়া জয়ী হইয়া যায়। এইরূপ নানা কথা শুনা যায়। পূজাপার্ব্বণে এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুনরনারী আসিয়া যোগদান করে। তখন কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াইশত মাইল দূরে এই নিস্তব্ধ কুটীর ও পল্লীঘাট জনকোলাহল এবং হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠে।

আমাদিগকে আহার করাইবার জন্য প্রেমহরিদাস ও তৎপত্নী চয়ন বিবি বিশেষ অনুরোধ করিলেও আমরা আহারাদি করিয়া

তথায় যাত্রা করিয়াছিলাম' বলিয়া সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। অগত্যা তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমাদেরই জন্য তাহাদের ক্ষেত্র-জাত ধান্য হইতে স্বহস্তে প্রস্তুত তণ্ডুল ও গুড় এবং সদ্যোধৃত কিছু মৎস্য লইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। তথা হইতে আমরা শমী বৃক্ষ দেখিবার জন্য পশ্চিম দিকের পল্লীপথ ধরিয়া বহু ধান্যক্ষেত্র, বিল ও জলাভূমি অতিক্রম করতঃ সেই 'অচিনা গাছে'র দর্শন পাইলাম এবং তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল চলিয়া বিলাইচণ্ডী ষ্টেশন হইতে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিলাম।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(৬)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য বা সমাধি-চৈতন্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নতম চৈতন্য বা প্রতিক্রিয়া-মূলক চৈতন্যের (Reflex action) বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। আমাদের জাগ্রদবস্থার জ্ঞানময় চৈতন্য ব্যতীত আর এক প্রকার নিম্নশ্রেণীর চৈতন্য আছে। উহাকে দৈহিক-চৈতন্য বলা যাইতে পারে, এবং উহাকে জাগ্রৎ-চৈতন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে।

মনে করুন, একটি লোক গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় কলিকাতার কোন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইয়া-ছেন যে একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলা যাইতে পারে—তথাপি যখনই কোন গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল বা মোটর তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে, তখনই তিনি আপনাকে বিপদ্ হইতে

রক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা কলিকাতার রাস্তায় চলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ আত্মরক্ষার জন্য আর জাগ্রৎ-মনের চিন্তা এবং বিবেচনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহাদের স্থূল দেহই যেন চৈতন্যময় হইয়া স্বতঃই এই কার্য্য সম্পন্ন করে। দেহ-বিজ্ঞানের একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

যদি একটি ভেকের মস্তিষ্ক নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন-ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় যদি তাহার সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখা যায়, তাহা হইলে সে তাহা গ্রহণ করিবে না, কিন্তু উহা তাহার মুখের মধ্যে দিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা গিলিয়া ফিলিবে। ইহা ভেকটির জ্ঞানকৃত আহার নহে—যন্ত্রবৎ গিলিয়া ফেলা মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপে খাওয়াইয়া ভেকটিকে বহুদিন যাবৎ এমন কি, এক বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। যদি ভেকটির কোন পাঁয়ে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ঐ পা-টিকে সরাইয়া লইবে। আর যদি বেশী আঘাত করা যায় তাহা হইলে লাফাইয়া সরিয়া যাইবে। অথবা তাহার পায়ে কোন তীব্র দ্রাবক প্রয়োগ করিলে সে অপর পা দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। কিম্বা ভেকটিকে হাতের উপর রাখিয়া হাতটি আস্তে আস্তে কাৎ করিতে থাকিলে যখন সে পড়িয়া যাইবার মত হইবে, তখন এরূপ ভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবে যাহাতে পড়িয়া না যায়।

আপাতদৃষ্টিতে ভেকের এই সমস্ত কার্য্য বুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাতে বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই; কারণ তাহার মস্তিষ্ক নষ্ট করা হইয়াছে। একটি যন্ত্রের কোন একটি অংশ টিপিলে একরূপ কার্য্য হয়, অপর একটি অংশ টিপিলে অন্যরূপ কার্য্য হয়, এইরূপ ব্যবহৃত অংশের পার্থক্য হিসাবে কার্য্যেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। এস্থলেও সেইরূপ ঘটিতেছে। বাহির হইতে যেরূপ উত্তেজনা পাইতেছে ভেকের দেহটিও তদনুরূপ

যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যাইতেছে। সকলের পেশী-ক্রিয়া কিরূপে যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হয়, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

অনেক সময় প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও দেহকে এইরূপ যন্ত্রবৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডারউইন (Darwin) কৃত একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিন তিনি একটি বিষাক্ত সর্পকে একটি কাচের বাক্সে বদ্ধ করিয়া ঐ বাক্সের গাত্রে আপনার গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া সর্পটিকে দংশন করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে দৃঢ় কাচ ব্যবধান থাকায় সর্পের শত চেষ্টাতেও তাঁহার সর্পদংশনের কোনই ভয় নাই, এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেও যতবার ঐ সর্পটি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ছোঁ মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল ততবারই তিনি বাক্স হইতে গণ্ডদেশ সরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগেও সর্পের ছোঁ মারিবার সময় নিজ গণ্ডদেশ বাক্সগাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই।

নিদ্রিতাবস্থায় মশকাদি দংশন করিলে দেখা যায়, নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত আপনা হইতেই উহাকে তাড়াইবার জন্য আঘাত করে। ইহাও দেহেরই প্রতিক্রিয়া।

অনেকে নিদ্রিতাবস্থায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ইহাকে ইংরাজীতে somnambulism বলে। স্বপ্নাবস্থায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান দেহের প্রতিক্রিয়া দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য বোধ হয় নিদ্রাচর ব্যক্তি কখন কখন এরূপ কার্য্য করে যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা দ্বারা আদৌ সম্ভবপর নহে। যেমন কেহ কেহ নিদ্রাবস্থায় বাঁশের উপর দিয়া বা সরু প্রাচীরের উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় দেহের ভারকেন্দ্র এরূপভাবে স্থির রাখিয়া সঙ্কীর্ণ উচ্চস্থানের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেরূপ বিপৎসঙ্কুল কার্য্যে অনেকেরই মন স্থির থাকে না, মনের অস্থিরতাবশতঃ শরীরেরও ভারকেন্দ্র স্থির

না থাকাতে উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায়, দেহের যান্ত্রিক-চৈতন্য নিপুণভাবে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া অনায়াসে সেরূপ সঙ্কটস্থল পার হইয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, নিদ্রাচর ব্যক্তি অন্ধকারে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন খানে একটিও ভুল হয় নাই।*

লেলৎ (Leiut), গাই (Guy) প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, নিদ্রাচর ব্যক্তি কখন কখন সম্পূর্ণরূপে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও দেখিতে পায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই অবস্থায় চক্ষুর মণি (pupil) এত বিস্তৃত হয় যে, চক্ষুর পাতা দুইটির মধ্যে যে সামান্য ফাঁক থাকে, তাহার মধ্য দিয়াই সে দেখিতে পায়। ফ্রাঙ্ক (Frank) একটি নিদ্রাচর মহিলাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষু একেবারে মুদ্রিত থাকিলেও তিনি স্পর্শের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ চিনিতে পারেন।† স্বপ্নাবস্থার এবম্বিধ অনুভূতিসমূহ বিজ্ঞানবিদ্ লম্ব্রোসোর (Lombroso) পরীক্ষিত একটি হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত বালিকার বিবরণের সহিত মিলে। তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হিন্দুদর্শনমতে আমাদের স্থূলদেহের ন্যায় একটি সূক্ষ্মদেহ আছে। এই সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব কেবল হিন্দুদর্শনের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে। যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে এই সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন। আমাদের এরূপ অনেক অবস্থা আছে, যাহা শুধু স্থূলদেহের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, কাজে কাজেই একটি সূক্ষ্ম দেহের সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে।

হিপ্‌নটিজম্ (hypnotism) সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই সূক্ষ্ম দেহের আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত

* Diderot's *Encyclopædie*—vide, article on 'Somnambulism.'

† Sleep—By Marie De Manaceine.

স্বরূপ, ঐ বিষয়ক কতকগুলি পরীক্ষা লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া একখানি ডাক্তারী পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারীর বিজ্ঞান-সভায় পঠিত হিপ্‌নটাইজড্‌ অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি তাহাদের অন্যতম।

যদি কোন সহজ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি একটি উজ্জ্বল চিত্রের প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া সাদা দেয়ালের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে সে সেই উজ্জ্বল চিত্রের একটি প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইবে। কিন্তু ঐ প্রতিচ্ছবির বর্ণ যথার্থ ছবির বর্ণের complementary হইবে। অর্থাৎ যথার্থ ছবিটি লাল হইলে প্রতিচ্ছবিটি সবুজ হইবে অথবা উহা হরিদ্রাবর্ণ হইলে, এই প্রতিচ্ছবিটি নীলবর্ণ হইবে।

যদি কোন লোককে হিপ্‌নটাইজ্‌ করিয়া তাহার হস্তে একখানি সাদা কাগজ দিয়া বলা যায় যে ইহাতে একটি লালরংয়ের ক্রুশ (cross) অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐ সাদা কাগজের উপর যথার্থই একটি লালরংয়ের ক্রুশ দেখিতে থাকিবে। অতঃপর তাহাকে আর একখানি সাদা কাগজ কিম্বা দেওয়ালের উপর তাকাইতে বলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কি দেখিতেছ? তাহা হইলে সে উত্তর দিবে আমি একটি সবুজ রংয়ের ক্রুশ দেখিতেছি, এবং যখন এই হিপ্‌নটাইজড্‌ ব্যক্তি সবুজ রংয়ের ক্রুশের প্রতিচ্ছবি দেখিতেছে, তখন যদি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার নিকট একটি চুম্বক (Magnet) আনা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রতিচ্ছবিটি কিছু বিকৃত হইয়া যায়, অর্থাৎ উহার সবুজ রংয়ের উপর লাল রং দেখা যায় এবং উহার আকৃতিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।†

হিপ্‌নটাইজড্‌ অবস্থায় এইরূপ কোন কোন বিশেষ স্থলে চৌম্বিক শক্তিতে শুদ্ধ মানসিক চিত্রেরই পরিবর্তন হয় এমন নহে, মানসিক সংকল্পেরও পরিবর্তন হইতে দেখা যায়।

---

* Vide—The Calcutta Medical Journal, November, 1910.

† Parinand—*Society-de-Biologie.*

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, স্বপ্নেও চৌম্বিক শক্তিতে মানসিক চিত্রের ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।* উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবার বিরুদ্ধে আমাদের যে সংস্কার আছে, তাহার কারণ ইহাও হইতে পারে।

স্থূল দেহের উপরে চৌম্বিক শক্তির এরূপ প্রভাব দেখা যায় না। কোন কোন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর উপর চৌম্বিক শক্তির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় বটে। যেমন কোন হিষ্টিরিয়া রোগীর শরীরের একদিকের অনুভূতি লোপ পাইলে তাহার ঐ অঙ্গে চৌম্বিক শক্তি প্রয়োগ করিলে উহার অনুভব শক্তি ফিরিয়া আসে; কিন্তু তাহার শরীরের অপর দিকের অনুভবশক্তি লোপ পাইয়া যায়। হিষ্টিরিয়া রোগীর এইরূপ অবস্থার বিষয় লেখক কর্ত্তৃক একখানি ডাক্তারী পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, এই অবস্থা স্থূলদেহের পীড়া বিশেষ মনে করা অপেক্ষা, কোন সূক্ষ্মদেহের পীড়াজনিত মনে করাই সঙ্গত।†

১৯৯৬ সালে মুসেঁা জিয়ান বেকোরায়েল (M. Jean Becquerel) স্নায়ুরশ্মি (Nerve rays) নামক একটি প্রবন্ধে তাঁহার একটি নূতন গবেষণা প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জীবদেহ হইতে একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি বাহির হয়—যাহা উহাকে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অচৈতন্য করিলে আর থাকে না। জীব মরিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে এই রশ্মি লোপ পায়। ইহাও সূক্ষ্মদেহের একরূপ ক্রিয়া বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থূলদেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিতে পারে এমন কোনও চৈতন্যের অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। ১৯১১ সালের ব্রিটিস এসোসিয়েসন সভার শারীর-বিজ্ঞান-শাখার প্রফেসর জে, এস্, ম্যাকডোনাল্ড (J. S. Macdonald)

---

* Vide, Traite de Physiologie Vol. V. Page, 206.

† Vide, Journal Calcutta Medical Club, 1911, Vol. VI. Page 256, and also Vol. V Page 169.

সভাপতি ছিলেন। তিনি এই সভায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন,— আমাদের মন যে স্থূলদেহের ক্রিয়ার ফল এরূপ সিদ্ধান্ত সকল সময় টিকে না। স্থূলদেহ হইতে মনের একটি পৃথক্ সত্ত্বা আছে। নিদ্রিতাবস্থায় এবং ঔষধাদির দ্বারা কৃত অচৈতন্যাবস্থায় মন যে কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল নহে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। * প্রফেসর ম্যাকডোনাল্ডের এই সব কথায় সভার মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং আপত্তি উঠে।*

হিন্দুদর্শনের ন্যায় জীববিজ্ঞান শাস্ত্রে সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জীবতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়।

দার্শনিক প্রবন্ধলেখক এমারসন (Emerson) বলিয়া গিয়াছেন, "Nature is self-similar," অর্থাৎ প্রকৃতি সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতর একটি মিলনের পক্ষপাতী। প্রকৃতির নিম্নস্তরের বিভাগগুলিও যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, উচ্চস্তরের বিভাগগুলিও ঠিক সেই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। প্রকৃতির নিম্নস্তরে যদি আমরা কোন নিয়ম দেখিতে পাই, উহার উচ্চস্তরেও যে ঐরূপ নিয়ম বিদ্যমান তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

আমরা প্রবন্ধারম্ভেই অনুমান করিয়া লইয়াছি যে, আমাদের স্থূলদেহের একটি পৃথক দৈহিক-চৈতন্য আছে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ যদি আমরা অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের সূক্ষ্মদেহেরও এক প্রকার দৈহিক-চৈতন্য আছে, তাহা হইলে স্থূলদেহের দৈহিক-চৈতন্যের সহিত সূক্ষ্মদেহের দৈহিক-চৈতন্যের মিলের একটি লক্ষণ সুস্পষ্টই বুঝা যায়। সেটি

* In man mind was associated with the brain. There was also the point that even in the case of the brain, such phenomena as sleep and deep anæsthesia familiarize us with the fact, that the mind was not necessarily always associated with the brain, but only with this when in a certain condition—Professor J. S. Macdonald's Presidential Speech.

এই যে উভয় চৈতন্যই যেন কোন উত্তেজনায় প্রবুদ্ধ হইয়া নাটকীয় দৃশ্যের ন্যায় অভিনয় দ্বারা স্বীয় উপলব্ধি প্রকাশ করে। স্থূলদেহের দৈহিক-চৈতন্যের লক্ষণ যেমন বাহিরের উত্তেজনার সংঘাতে হস্তপদ-সঞ্চালন প্রভৃতিতে অভিনয়ের ভাবে প্রকাশ পায়, যদি স্বপ্নের সহিত সূক্ষ্মদেহের কোন সম্বন্ধ মানিয়া লওয়া যায়, তবে তাহাও সেইরূপ বাহিরের উত্তেজনার সংঘাতে মনোরাজ্যে ঘটনামূলক দৃশ্যাবলী অভিনয় দ্বারা উপলব্ধি প্রকাশ করে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হয় না।

নিদ্রিতাবস্থায় দেহের উপর নানাপ্রকার উত্তেজনা প্রয়োগে কিরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত মনোবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

(১) নিদ্রিতাবস্থায় পদতলে গরম বোতল লাগাইলে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, শয়তান তাঁহাকে নরকাগ্নির উপর দিয়া লইয়া যাইতেছে। একজন আমেরিকান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাম্র হইতে কিরূপে স্বর্ণ উৎপন্ন করা যায় তাহা বলিয়া দিতেছেন না বলিয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ তাঁহাকে অগ্নির উপর দাঁড় করাইয়াছে। একজন মহিলা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর একজন মহিলা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন একটি ভল্লুকী। তাঁহাকে নৃত্য শিখাইবার জন্য গরম প্লেটের উপর দাঁড় করান হইতেছে।

(২) একজন স্ত্রীলোকের নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষিবার অভ্যাস ছিল। তিনি ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য একদিন শয়ন করিবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তিক্ত ঔষধ মাখাইয়া নিদ্রা গেলেন। অতঃপর স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি যেন নিম্বকাষ্ঠের মত তিক্ত কাষ্ঠের একখানি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইতেছেন। জাহাজের হাওয়া এরূপ তিক্ত যে তাঁহার সর্ব্বশরীর তিক্ত হইয়া যাইতেছে। তিনি যাহা খাইতেছেন, যাহা পান করিতেছেন, সমস্তই তিক্ত বোধ হইতেছে। কূলে আসিয়া তিনি মুখ ধুইয়া

ফেলিবার জন্য এক গ্লাস ভাল জল চাহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে নিম্ব কাষ্ঠ সিদ্ধ করা জল দেওয়ায় তাহাও অত্যন্ত তিক্ত বোধ হইল। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় তিনি তাহাই খাইয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্যারী গিয়া জনৈক বিখ্যাত ডাক্তারের পরামর্শ চাহিলেন। ডাক্তার গরুর পিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে যদিও তাঁহার শরীর হইতে কাঠের তিক্ত রস নির্গত হইয়া গেল, তথাপি ঐ পিত্তের তিক্তরসে তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন জর জর হইয়া উঠিত। অগত্যা তিনি এক ধর্ম্মযাজক পোপের শরণাপন্ন হইলেন। পোপ ব্যবস্থা করিলেন যে, অমুক দেশে অমুক লোকের স্ত্রীর দেহ লবণ-ময় হইয়া রহিয়াছে। এই মহিলা যদি সেখানে গমন করিয়া ঐ মূর্ত্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত কতকটা অংশ ভক্ষণ করেন তাহা হইলে তাঁহার পীড়া সারিয়া যাইবে। মহিলাটি অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেই মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মনে করিলেন ইহার বৃদ্ধাঙ্গুলীটি ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। এই সময় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তিনি দেখিলেন যে, নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীটিই চুষিতেছেন। *

(৩) গন্ধ হইতেও স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। কোন ডাক্তারকে পনীর বিক্রেতার দোকানে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। দোকানটি পনীরের গন্ধে ভরপূর ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তাঁহাকে পনীরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে ইঁদুর আসিয়া তাঁহার শরীর দংশন করিতেছে। ঘরটিতে ইঁদুরের বিশেষ উপদ্রব ছিল এবং নিদ্রার পূর্ব্বে তাঁহার ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছিল।

নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষুর উপরে আলোক ফেলিলে, সে যেন স্বর্গের আলোক বা জ্যোতির মধ্যে কিছু দেখিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার কথা বিরল নহে। †

* Treatise on Insanity by W. A. Hammand.

† Journal of Psychological Medicine, July—1856.

(৪) বিখ্যাত দার্শনিক হেন্‌রী বার্গসের স্বপ্নতত্ত্বের পুস্তকে চক্ষুতে আলো লাগায় স্বপ্নদর্শনের একটি বিবরণ আছে। উহা এইরূপ ;—কোন হাঁসপাতালের নার্শ (Nurse) শয়ন করিতে যাইবার সময় আলো হাতে লইয়া রোগীগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে তাহা একবার দেখিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তস্থিত আলোকের রশ্মি চলিয়া যাইবার সময় এক নিদ্রিত রোগীর চক্ষুর উপর পড়ায় সে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল।—"পীড়িত হইবার পূর্ব্বে সে যে কার্য্যে ছিল, সেই নৌ-সৈনিকের কার্য্যেই পুনরায় নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের কার্য্যে তাঁহাকে ফ্রান্স হইতে কন্‌ষ্টান্টিনোপল্‌, টুলোঁ, ক্রিসিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হইল। সে বিদ্যুৎ দেখিতে পাইল ও বজ্রধ্বনি শুনিতে পাইল। অবশেষে এক যুদ্ধে তাহার সম্মুখে একটি কামানের গোলা পড়িতে দেখিয়া ভয়ে চমকিত হইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিল, গমনশীলা সেবিকার হস্তস্থিত আলোক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের উপর পড়িয়াছে মাত্র।*

নিদ্রিত ব্যক্তির কাণের কাছে পিস্তল আওয়াজ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে, সে কোন স্বপ্ন দেখে কিনা। প্রায়ই দেখা গিয়াছে, তাহার স্বপ্নের কথা মনে থাকে না; কিম্বা হয়ত সে কিছু স্বপ্ন দেখে নাই। কিন্তু কখন কখন এই শব্দ হইতে উৎপন্ন স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে এইরূপ একটি স্বপ্নের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

(৫) নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যেন সে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছে। কিছুদিন সৈনিকের কাজ করিয়া তাহার আর ঐ কাজ ভাল লাগিল না। একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে ধরিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সে অশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়া চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে ধৃত হইল। তখন সামরিক বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হইল,

* Dreams—by Henri Bergson.

এবং তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দেওয়া হইল। অতঃপর যখন তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া গুলি করা হইল, তখন গুলির আওয়াজে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একজন টেলিগ্রাফের সিগ-নালার (Signaller) রাত্রে হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া টেলিগ্রাফের খবর লইতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাহার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। প্রথম ৩।৪টি শব্দ শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার জানিত একটি বড় নাম তারযোগে আসিতেছে। ইতিমধ্যে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে শুনিতে পাইল যে ঐ নামের শেষের অক্ষরগুলি তারযোগে আসিতেছে। বোধ হয় সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ঘুমাইয়াছিল। ইতিমধ্যে সে এক দীর্ঘ ব্যাঘ্র শীকারের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সম্ভবতঃ টেলিগ্রাফের টক্ টক্ শব্দগুলি, স্বপ্নে ব্যাঘ্র-শীকারের গুলির আওয়াজে পরিণত হইয়াছিল।

ডাক্তার ফ্রয়ডের মতে যে সকল স্বপ্ন বাহিরের উত্তেজনা হইতে জাত সেগুলি, মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে, কোন না কোনরূপ উদ্দেশ্যজড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্ন অনেক সময় এইরূপ ভাবে সৃজিত হয় যে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দেওয়াই যেন ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় স্বপ্ন খুব বিকট হয়—তাহার উদ্দেশ্য স্বপ্নের বিকটতা দ্বারা উহার উত্তেজনার, তীব্রতাকে চাপা দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নিজের কোন গূঢ় ইচ্ছার সহিত স্বপ্নদৃশ্যের সংযোগ থাকে। তাহার ফলে উত্তেজনার সত্যতা লোপ পাইয়া উহা স্বপ্নেরই অংশীভূত হইয়া যায়। এইরূপে স্বপ্ন যেন কোন প্রকারে নিদ্রিত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া অবোধ শিশুর মত শান্ত করিয়া রাখে। ফলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেয় না। উত্তেজনার জন্য সে যদি সজাগ হয়, তবে সেই স্বপ্ন ব্যাখ্যার কথা অস্পষ্টভাবে মনে উদয় হওয়ায় বোধ হয় যে উত্তেজনাটি যথার্থ নহে—উহা একটি স্বপ্ন কিম্বা বাজে জিনিস, অতএব আমি নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাই।

স্বপ্ন যেন রাত্রিকালের প্রহরীর কার্য্য করে। পথে কোন গোলমাল হইলে যাহাতে লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, এই জন্য প্রহরী গোলমাল মিটাইয়া দেয়। কিন্তু যদি এরূপ বিশেষ কোন গোলমাল হয় যে সে নিজে উহা মিটাইতে অক্ষম, তখন পল্লীর লোকদিগকে ডাকিয়া তুলিবার চেষ্টা করে।

স্বপ্নের অনুভূতির মধ্যে কোন বিশেষরূপ উত্তেজনা উপস্থিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টাকে জাগাইয়া দিবার চেষ্টার ভাব দেখা যায়। শিশুর মাতা গৃহকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছেন। ঘরের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেলেও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু শিশু-সন্তানের অল্প নড়াচড়ার শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। যাঁহারা রোগীর সেবা করেন, তাঁহাদেরও এইরূপ হইয়া থাকে। রোগীদের সামান্য শব্দেই তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে; অন্য শব্দে তাঁহাদের বড় একটা নিদ্রাভঙ্গ হয় না। অনেকের চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হয় না; কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তির নাম ধরিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। কোন স্থলে আবার শব্দ বন্ধ করিলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। যেমন, বিলাতে রাত্রে যে সব কল চলে তাহা যদি কোন কারণে বন্ধ হইয়া উহার ঘড়ঘড়ানি শব্দ থামিয়া যায়, তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী নিদ্রিত লোকদিগের তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়। *

---

* বিলাতের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁহার প্রসিদ্ধ হাস্যরসময় উপন্যাস "পিক্‌উইক্ পেপারস্"এ একজন জজের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, যতক্ষণ তাঁহার আদালতে উকীলদের বক্তৃতা চলিত ততক্ষণ তিনি চেয়ারে ঠেসান দিয়া ঘুমাইতেন, বক্তৃতা বন্ধ হইলে নিস্তব্ধতার দরুণ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত।

ভিক্টর হিউগো তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "লে মিজারেবল্"এ—বেরিকেডের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে "গ্রাণটেয়ার" নামক একজনের নিদ্রার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। বেরিকেডে যতক্ষণ যুদ্ধ হইতেছিল ততক্ষণ অস্ত্রের ঝঞ্চন ও কোলাহলেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু যখন বেরিকেড অধিকৃত হইল এবং যুদ্ধকোলাহল থামিয়া গেল, তখন সেই নিস্তব্ধতায় গ্রাণটেয়ারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

এ সব স্থলে নিদ্রিত ব্যক্তির মনে জাগিবার একটি ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। স্বপ্ন যেন এই ইচ্ছাটিকে ভুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তেজনা আসিলে এই ইচ্ছাটিকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর স্থলে ভয়ের স্বপ্ন প্রভৃতি দেখাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে স্বপ্ন যেন জাগাইবার চেষ্টা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ দীর্ঘ স্বপ্ন দেখা কিরূপে সম্ভবপর, তাহার ব্যাখ্যা কোন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের পুস্তকে খুঁজিয়া পাই নাই। মস্তিষ্ক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দীর্ঘ চিন্তা করিতে পারে, জাগ্রদবস্থায় তাহার কোন দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই জন্য স্বপ্নে মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য কোনরূপ সূক্ষ্মতর যন্ত্রের ভিতর দিয়া মন কার্য্য করে, এরূপ অনুমান আমাদের বাধ্য হইয়াই করিতে হয়।

থিওজফিক্যাল সোসাইটির বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট সুপ্রসিদ্ধা আনি-বেশান্ত তল্লিখিত একখানি পুস্তকে এইরূপ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পিস্তলের আওয়াজে উৎপন্ন স্বপ্নটির বিষয় লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন নিদ্রিত ব্যক্তির কর্ণের নিকট পিস্তলের আওয়াজ করা হইয়াছিল, তখন এই শব্দ দুইটি বিভিন্ন পথ দিয়া তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছিয়াছিল। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এক পথে তাহার সূক্ষ্মদেহ এই শব্দের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং অন্যপথে এই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। যেন দুইটি পৃথক সংবাদ-বাহক বিভিন্ন সময়ে একই সংবাদ লইয়া আসিল। প্রথম সংবাদদাতা উপস্থিত হইয়া কথায় না বুঝাইয়া অভিনয় করিয়া সংবাদ দানে প্রবৃত্ত হইল এবং পরবর্ত্তী সংবাদদাতার সংবাদ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মনের নিকট আসিতে যে বিলম্ব হইল, তাহারই মধ্যে সে এক বিস্তৃত নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

কর্ণের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে পিস্তলের শব্দ পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহা গণনা করা যায়। ইহা এক সেকেণ্ডের শতাংশের এক ভাগ অপেক্ষাও অল্প। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এত দীর্ঘ স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল।

আনি-বেশান্ত বলিয়াছেন যে, নিদ্রিতাবস্থায় অনেক অনুভূতি আমাদের সূক্ষ্মদেহের দ্বারা অপরোক্ষভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। এই অনুমানটিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে স্বপ্নতত্ত্বের অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা সরল হইয়া যায়—পরবর্ত্তী কতিপয় প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

—*—

গত ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উত্তর-বঙ্গ বন্যা-কার্য্যের বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে দুবলহাটী ও হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র দুইটী, যাহা উক্ত তারিখেও বন্ধ হয় নাই, গত ৪ঠা নভেম্বর ও ৩০শে অক্টোবর তারিখে শেষ বিতরণান্তে বন্ধ করা হইয়াছে। শেষ সপ্তাহে দুবলহাটী কেন্দ্র হইতে ৫।।৪ মণ চাউল ৩৭ খানি গ্রামের ১১২ জন ব্যক্তিকে ও হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র হইতে ৯/৪ মণ চাউল ২৩ খানি গ্রামের ১৮২ জন ব্যক্তিকে এবং ৯৪০টী গরুর জন্য ১৩।।৵০ কাহন খড় সাহায্য করা হইয়াছিল। উক্ত সপ্তাহে ৫০ জোড়া নূতন বস্ত্রও বিতরণ করা হইয়াছিল।

চাউল বিতরণ বন্ধ করিয়া দিলেও মিশনের এলাকাধীনে এরূপ অনেক দুঃস্থ পরিবার ছিলেন যাঁহাদের তখনও সাহায্য করা প্রয়োজন

ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক নহে যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্য করা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল পরিবারবর্গকে এক কালীন কিছু অর্থসাহায্য করিয়া কার্য্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির হয়। ঐরূপ ৫৩৪টী পরিবারকে ১৮৪৪৷৶০ টাকা সাহায্য করিয়া গত ১৮ই নভেম্বর মিশনের সেবকগণ চলিয়া আসিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৫টী কেন্দ্র হইতে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল এবং নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ দেওয়া হইল।

কেন্দ্রের নাম	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
নওগাঁ	৭০	২৭৮৲
দুর্বলহাটী	৮৯	২৫৭৲
হাঁসাইগাড়ী	৩৯	১৪৫৷৶০
ভাণ্ডারগ্রাম ও বিলকৃষ্ণপুর	১০১	৩৬৭৲
রাতওয়াল	২৩৫	৭৯৭৲

যুদ্ধ থামিয়া গেলেও, এখনও নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। কলিকাতায় বস্ত্রের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্য হইলেও রেল কোম্পানী এখনও বস্ত্রের চালান গ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া মফঃস্বলের বাজারসমূহে বস্ত্রের মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। তাহার উপর শীত পড়ায় বস্ত্রাভাব যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এ সংবাদ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পাইতেছেন। এ দেশের দরিদ্রগণ বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ পরিধান করিয়া অপরার্দ্ধ আচ্ছাদনরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকে—কারণ, তাহাদের পৃথক আচ্ছাদন-বস্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। আচ্ছাদন বস্ত্রের অভাব হেতু অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তিই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শীতের প্রথম হইতেই এই ব্যাধিটীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাও দেখা যাইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মিশন যতদূর সাধ্য দেশবাসীর সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণকে বস্ত্রাদি দিয়া সেবা করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। এই কার্য্যে যিনি যেরূপ

সহায়তা করিতে চান তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারীর নামে প্রেরিত হইলে অতি সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে।

গত অগ্রহায়ণ মাসের বস্ত্রবিতরণ-বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর দুপতারায় (ঢাকা) ৩৬ জোড়া, ও সোণারগাঁয় (ঢাকা) ৩০ জোড়া, নোয়াখালীতে ৫২ জোড়া ও বাঁকুড়ায় ৩০ জোড়া বস্ত্র, এবং বস্ত্র বিতরণ জন্য কোটালিপাড়ায় (ফরিদপুর) ৫০৲ টাকা ও কোয়াল-পাড়ায় (বাঁকুড়া) ১০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

নোয়াখালীর চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে অসংখ্য ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সেবার জন্য বস্ত্র, ঔষধ এবং অর্থ প্রেরিত হইয়াছে।

কাশীর চারিদিকেও ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে তথায় সেবাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। রুগ্নকে ঔষধ, পথ্য এবং অভাব বুঝিলে বস্ত্রাদি দিয়া সেবা করা হইবে।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, মান্দ্রাজ প্রদেশেও এ বৎসর অন্নাভাব ঘটিয়াছে। তজ্জন্য এমন কি মান্দ্রাজ সহরে পর্য্যন্ত লুট-পাট আরম্ভ হয়। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ময়লাপুরের (উহা মান্দ্রাজ সহরের একটী পল্লী) দুঃস্থ পরিবারবর্গকে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে চাউল সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিশন যে প্রণালীতে উক্ত সেবাকার্য্য করিয়া থাকেন তথায়ও সেই প্রণালীর অনুসরণ করা হইতেছে। বর্ত্তমানে সেবাকার্য্য অতি অল্পপরিসর লইয়া হইতেছে। প্রত্যহ যেরূপ অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইতে হইবে। কিন্তু উহাতে সাধারণের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। স্থানীয় মিশন বিশ্বাস করেন যে, সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না।

বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২৫ সাল, বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামিজীর জন্মতিথি পূজা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মহাসমাধিলাভের পর ইহাই সর্ব্বপ্রথম জন্মোৎসব। ঐ উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং সমবেত ভক্তবৃন্দ পূজনীয় প্রেমানন্দ স্বামিজীর একখানি প্রতিমূর্ত্তিকে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করেন। তাঁহার সম্মুখে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সংকীর্ত্তন ও ভজনাদি করিয়াছিলেন। যিনি একদিন মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন—যিনি উৎসবাদিতে নিজ শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক খুঁটিনাটিটী পর্য্যন্ত সচক্ষে তত্ত্বাবধান করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তিনি আজ স্থূলশরীরে বিদ্যমান নাই!—এ অভাব যে প্রত্যেক ভক্তহৃদয়ে গভীরভাবে অনুভূত হইতেছিল তাহা আর বলিতে হইবে না।

—*—

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়।

আবেদন ও প্রাপ্তি-স্বীকার।

বিগত শ্রাবণ মাসের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা উক্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ-কল্পে অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল। স্ত্রীশিক্ষারূপ এই মহৎ উদ্দেশ্যে আজ পর্য্যন্ত আশানুরূপ সাহায্য না পাইলেও, ভগবৎকৃপায় সহানুভূতির কখনই অভাব হইবে না, এই স্থির বিশ্বাসেই আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। ভারতগতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় আদর্শে শিক্ষিতা ও অনুপ্রাণিতা হইয়া অস্মদ্দেশীয় বালিকাগণ যাহাতে খাঁটি হিন্দুজননীরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে তদুদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি প্রচলিত পাশ্চাত্য চরিত্রের পরিবর্ত্তে ভারতীয় আদর্শ-স্ত্রীচরিত্র, এবং ভারতীয় ধর্ম্ম, নীতি, ও কলা-বিদ্যা প্রভৃতির ছবি বালিকাগণের সম্মুখে স্থাপন করিতেন। বর্ত্তমান জাতি-সংঘর্ষে ভারতবাসীকে যদি আপনার নিজত্ব বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার শিক্ষার প্রচার করিতেই হইবে। তাঁহার সেই একাগ্র সাধনার বীজকে মহীরুহে পরিণত করিবার ভার এখন দেশ-বাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে যিনি যাহা সাহায্য করিতে চান, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী, মালদহ ১॥
,, রাইমোহন প্রামাণিক ,, ১॥
,, রাধিকামোহন দাস ,, ২॥
,, যোগেন্দ্রনাথ দাস ,, ১॥
,, ললিতমোহন মণ্ডল ,, ১॥
মালদহের জনৈক সেবক কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ১৪॥
শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর,
পোটাও, বর্ম্মা ৫॥
বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরি,
কলিকাতা ৫০॥
শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে, ঐ ১ম কিস্তি ১০॥
,, সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক ও চক্রবর্ত্তী
চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
কলিকাতা ২০।৶০
,, কুঞ্জলাল ভট্টাচার্য্য,
স্বাধীন ত্রিপুরা ১॥
,, টি, কৃষ্ণ মুর্শি, টালুকপিট,
মালয় ষ্টেট ১৫।০
,, টি, পি, দক্ষিণামূর্ত্তি রাপুর,
মালয় ষ্টেট ৫॥
প্রোঃ ডি, এনথোবী, সাঙ্গানি ডায়া,
মালয় ষ্টেট ৪৷৶০
শ্রীযুক্ত কে, ভাস্কর রাম, ঐ ৪৶০
প্রোঃ পি, গেডিস্ ১০০॥
শ্রীযুক্ত প্রাগজী ভাবাণজী,
নেটাল, আফ্রিকা ৬॥৶০
,, মথুরা দাস ,, ৬৷৶০০
,, কার্যণ ক্ষেমজী ,, ৩।৴০
শ্রীযুক্ত বল্লভদাস হেমরাজ ,, ৩।৴০
,, পুরুষোত্তম গোবিন্দজী ,, ৩।৴০
,, গোপাল মিরম্ ,, ৩।৴০
,, ভগবানজী গোবিন্দজী ,, ১॥৴০
,, নাটুদেবজী ,, ১॥৶০
,, পপাৎ কারা ,, ১॥৶০
,, রতণজী মাকমৃজী ,, ১॥৶০
,, হরিদাস তাকারসি ,, ১৩।৶০
,, ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত
কলমা, ঢাকা ১॥
,, গোকুলজী হংসরাজ, বালেশ্বর, ১০॥
,, রাইমোহন মজুমদার, কাগমারী, ২॥
,, প্রবোধচাঁদ দত্ত, কলিকাতা ২॥
,, রামলাল গুরুজী, ইন্দোর ১০॥
,, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণজী, কোহলাপুর ৯॥
,, জীবনধন বন্দ্যোপাধ্যায়,
কালিঘাট ২॥
,, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—২য় কিস্তি,
কলিকাতা ১০
,, নন্দলাল বসু, ২০॥
,, নগিনদাস মগনলাল, মলয় দ্বীপ ৫
,, দেশাই ভাই পাটেল ,, ২॥৴০
,, মন্মথনাথ কুমার, বগুড়া ১
,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁথি ৫॥
মিঃ এন, সি, ঘোষ, কলিকাতা ১॥
শ্রীযুক্ত রাইমোহন তালুকদার, লোহজঙ্গ ২॥
,, ভূপেশচন্দ্র বসু, হাতিগড়, আসাম ৫॥
ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল—১ম কিস্তি,
কলিকাতা ১০০॥

১নং মুখার্জ্জি লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ
সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন।